শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

পঞ্চম সম্ভার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫ম

দেনা-পাওনা

১

চণ্ডীগড়ে ৺চণ্ডী বহু প্রাচীন দেবতা। কিংবদন্তী আছে রাজা বীরবাহুর কোন্ এক পূর্ব্বপুরুষ কি একটা যুদ্ধ জয় করিয়া বারুই নদীর উপকূলে এই মন্দির স্থাপিত করেন, এবং পরবর্ত্তীকালে কেবল ইহাকেই আশ্রয় করিয়া এই চণ্ডীগড় গ্রামখানি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। হয়ত একদিন যথার্থই সমস্ত চণ্ডীগড় গ্রাম দেবতার সম্পত্তি ছিল; কিন্তু আজ মন্দির-সংলগ্ন মাত্র কয়েক বিঘা ভূমি ভিন্ন সমস্তই মানুষে ছিনাইয়া লইয়াছে। গ্রামখানি এখন বীজগাঁর জমিদারীভুক্ত। কেমন করিয়া এবং কোন্ দুজ্ঞের্য় রহস্যময় পথে অনাথ ও অক্ষমের সম্পত্তি এবং এমনি নিঃসহায় দেবতার ধন অবশেষে জমিদারের জঠরে আসিয়া স্থিতিলাভ করে, সে কাহিনী সাধারণ পাঠকের জানা নিষ্প্রয়োজন। আমার বক্তব্যটা কেবল এই যে, চণ্ডীগড় গ্রামের অধিকাংশই এখন চণ্ডীর হস্তচ্যুত। দেবতার হয়ত ইহাতে আসে-যায় না; কিন্তু তাঁহার সেবায়েত যাঁহারা, এ ক্ষোভ তাঁহাদের আজিও যায় নাই; তাই আজিও বিবাদ-বিসংবাদ ঘটিতে ছাড়ে না এবং মাঝে মাঝে সেটা তুমুল হইয়া উঠিবারই উপক্রম করে। অত্যাচারী বলিয়া বীজগাঁয়ের জমিদার-বংশের চিরদিনই একটা অখ্যাতি আছে; কিন্তু বৎসরখানেক পূর্ব্বে অপুত্রক জমিদারের মৃত্যুতে ভাগিনেয় জীবানন্দ চৌধুরী যেদিন হইতে বাদশাহী লাভ করিয়াছেন, সেদিন হইতে ছোট-বড় সকল প্রজার জীবনই একেবারে দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, ভূতপূর্ব্ব ভূস্বামী কালীমোহনবাবু পর্য্যন্ত এই লোকটির উচ্ছৃঙ্খলতা আর সহিতে না পারিয়া ইহাকে ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু আকস্মিক মৃত্যু তাঁহার সে ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে দেয় নাই।

সেই জীবানন্দ চৌধুরী সম্প্রতি রাজ্য-পরিদর্শনচ্ছলে চণ্ডীগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গ্রামের মধ্যে একটা সামান্য রকমের কাছারি-বাড়ি বরাবরই আছে, কিন্তু বাঁকুড়া জেলার এই অসমতল পাহাড়-ঘেঁষা গ্রামখানির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সুনাম থাকায়, এবং বিশেষতঃ বালুময় বারুইয়ের জল অত্যন্ত রুচিকর বলিয়া এই জীবানন্দেরই মাতামহ রাধামোহনবাবু গ্রামপ্রান্তে নদীতীরে শান্তিকুঞ্জ নাম দিয়া একখানি বাংলো-বাটী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এবং প্রায়ই মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিয়া যাইতেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র কালীমোহন কোনদিন এখানে পদার্পণ করেন নাই। সুতরাং একদিন যে গৃহের রূপ ছিল, ঐশ্বর্য্য ছিল, মর্য্যাদা ছিল—চারিদিকের যে উদ্যান দিবারাত্রি ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ থাকিত, তাহাই আবার আর একদিন আর এক হাতে অযত্ন-অবহেলায় জীর্ণ মলিন ও আগাছায় ভরিয়া গিয়াছিল। এখানে

মালী ছিল না, রক্ষক ছিল না, আশেপাশে লোকালয় ছিল না, কেবল বারুইয়ের শুষ্ক উপকূলে মস্ত ভাঙা-চোরা বাড়ি বন-জঙ্গলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া অবমানিত গৌরবের মত অহর্নিশি শূন্য খাঁ খাঁ করিত। কতকাল ধরিয়া যে এখানে কেহ প্রবেশ করে নাই, কতকাল ধরিয়া যে কাছারির প্রধান কর্ম্মচারী সদরে কেবল মিথ্যা কৈফিয়ৎ পেশ করিয়া আসিতেছে, তাহা হিসাব করিয়া লইবার কেহ নাই।

এই যখন অবস্থা, তখন অকস্মাৎ একদিন সায়াহ্ন বেলায় মাত্র জন-দুই লোক সঙ্গে লইয়া নূতন ভূস্বামী আসিয়া গ্রামের কাছারি-বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; পালকি হইতে অবতরণ পর্য্যন্ত করিলেন না, কেবল গোমস্তা এককড়ি নন্দীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, তিনি দিনকয়েক শান্তিকুঞ্জে বাস করিবেন এবং পরক্ষণেই গন্তব্যপথে চলিয়া গেলেন। আশঙ্কায় উৎকণ্ঠায় এককড়ির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। হয়ত সেখানে প্রবেশ করিবার পথ নাই, হয়ত সমস্ত দরজা-জানালা চোরে চুরি করিয়া লইয়া গেছে, হয়ত ঘরে ঘরে বাঘ-ভালুকের দল বসবাস করিয়া আছে—তথায় কি আছে, আর কি যে নাই, তাহার কোন জ্ঞানই এককড়ির ছিল না।

এই সন্ধ্যাবেলায় কোথায় লোকজন, কোথায় আলোর বন্দোবস্ত, কোথায় খাবার-দাবার আয়োজন—হঠাৎ এখন সে কি করিবে, কাহার শরণাপন্ন হইবে, চিন্তা করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভারি এবং মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। চাকুরি ত গেছেই—সে যাক্‌, কিন্তু এই দুর্দ্দান্ত নবীন মনিবের যে-সকল ইতিবৃত্ত সে ইতিমধ্যে লোকপরম্পরায় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, তাহার কোনটাই তাহাকে কোন ভরসা দিল না। এবং এই যে খবর নাই, এত্তেলা নাই, এই হঠাৎ শুভাগমন, এ যখন কেবল তাহারই জন্য, ইহারই জমিদারীতে বাস করিয়া ছেলেপুলে লইয়া কোথায় পলাইয়া যে সে আত্মরক্ষা করিবে, ইহার কোন কিনারাই তাহার চোখে পড়িল না।

মনিবকে সে কখনো চোখে দেখে নাই—তাহার প্রয়োজনই হয় নাই, আজও সে সাহস করিয়া তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে নাই; কিন্তু সঙ্কীর্ণ পথপ্রান্তে বাহকেরা অদৃশ্য হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই পালকির ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে যে মুখের চেহারা তাহার মনশ্চক্ষে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল, তাহা অতি ভয়ঙ্কর। তাহার অনেক গাফ্‌লতি অনেক চুরির এইবার যে কঠোর বোঝা-পড়া সরজমিনে বসিয়া চলিতে থাকিবে, তাহার কোন অংশ আর কাহারও স্কন্ধে আরোপ করা সম্ভবপর হইবে কিনা, ইহাই যখন সে ভাবিবার চেষ্টা করিতেছিল ঠিক এমনি সময়ে কাছারির বড় পেয়াদা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বেচারা তাগাদায় গিয়াছিল; পথের মধ্যে এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়াছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল, নন্দীমশাই, হুজুর আসচেন না?

এককড়ি চোখ তুলিয়া শুধু বলিল, হুঁ।

বিশ্বম্ভর আশ্চর্য্য হইয়া ক্ষণকাল এককড়ির পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরে কহিল, হুঁ কি গো নন্দীমশাই? স্বয়ং হুজুর আসচেন যে!

এককড়ি মনে মনে একপ্রকার মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল; বিকৃত-স্বরে জবাব দিল, আসছেন ত আমি করব কি? খবর নেই, এত্তেলা নেই, হুজুর আসছেন! হুজুর বলে ত আর মাথা কেটে নিতে পারবে না!

এই আকস্মিক উত্তেজনার অর্থ সহসা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া খানিকক্ষণ বিশ্বম্ভর মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার মগজ যেমন পরিষ্কার তেমনি ঠাণ্ডা, এবং পিয়াদা হইলেও গোমস্তার সহিত সম্বন্ধটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এককড়িকে সে ভিতরে লইয়া গিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই সান্ত্বনা দান করিল, এবং মদের বোতল, মাংস এবং আনুষঙ্গিক আরও একটা বস্তুর গোপন ইঙ্গিত করিয়া এত বড় আশার বাণী শুনাইতে ইতস্ততঃ করিল না যে, পুরুষের ভাগ্যের সীমা যখন দেবতারাও নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, তখন হুজুরের নজরে পড়িলে নন্দীমশায়ের অদৃষ্টেও কেন যে একদিন সদরের নায়েবী পদ মিলিবে না, এমন কথা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

অনতিকাল মধ্যেই এককড়ি যখন জন-কয়েক লোক, গোটা-দুই আলো এবং সামান্য কিছু ফলমূল সংগ্রহ করিয়া লইয়া বিশ্বম্ভরকে সঙ্গে করিয়া শান্তিকুঞ্জের ভাঙা গেটের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। দেখিল ইতিমধ্যেই কিছু কিছু ডালপালা ভাঙিয়া ফেলিয়া পথটাকে চলনসহ করা হইয়াছে, তথাপি এই বনময় অন্ধকার পথে সহসা প্রবেশ করিতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও ভরসা হইল না। এবং প্রবেশ করিয়াও পা ফেলিতে প্রতিপদেই তাহাদের গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। বিঘা-দশেক ভূমি ব্যাপিয়া এই বন, সুতরাং পথও অল্প নহে, তাহা অতিক্রম করিবার দুঃখও অল্প নহে। কোথাও একটা দীপ নাই, কেবল চাতালের একধারে যেখানে বাহকেরা পালকি নামাইয়া রাখিয়া একত্রে ধূমপান করিতেছে তাহারই অদূরে একখণ্ড জলন্ত শুষ্ককাষ্ঠ হইতে কতকটা স্থান যৎকিঞ্চিৎ আলোকিত হইয়াছে। খবর পাইয়া ভৃত্য আসিয়া এককড়িকে একটা ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। সমস্ত কক্ষ মদের গন্ধে পরিপূর্ণ, এককোণে মিটমিট করিয়া একটা মোমবাতি জ্বলিতেছে এবং অপরপ্রান্তে একটা ভাঙা তক্তপোষের উপর বিছানা পাতিয়া বীজগাঁয়ের জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী বসিয়া আছেন। লোকটা অত্যন্ত রোগা এবং ফরসা; বয়স অনুমান করা অতিশয় কঠিন, কারণ উপদ্রবে অত্যাচারে মুখখানা শুকাইয়া যেন একেবারে কাঠের মত শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে সুরাপূর্ণ কাঁচের গেলাস এবং তাহারই পার্শ্বে বিচিত্র আকারের একটা মদের বোতল প্রায় শেষ হইয়াছে।

বালিশের তলা হইতে একটা নেপালী কুকরীর কিয়দংশ দেখা যাইতেছে এবং তাহারই সন্নিকটে একটা খোলা বাক্সের মধ্যে একজোড়া পিস্তল সাজান রহিয়াছে।

এককড়ি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনিব কহিলেন, তোমার নাম এককড়ি নন্দী? তুমিই এখানকার গোমস্তা?

ভয়ে এককড়ির হৃৎপিণ্ড দুলিতেছিল, সে অস্ফুট কম্পিত-কণ্ঠে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুজুর!

সে ভাবিয়া আসিয়াছিল এইবার এই বাড়ির কথা উঠিবে, কিন্তু হুজুর তাহার কোন উল্লেখ করিলেন না, শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কাছারির তসিল কত?

এককড়ি বলিল, আজ্ঞে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা।

হাজার পাঁচেক? বেশ আমি দিন-আষ্টেক আছি, তার মধ্যে হাজার দশেক টাকা চাই।

এককড়ি কহিল, যে আজ্ঞে।

তাহার মনিব বলিলেন, কাল সকালে তোমার কাছারিতে গিয়ে বসব—বেলা দশটা-এগারোটা হবে—তার পূর্ব্বে আমার ঘুম ভাঙে না। প্রজাদের খবর দিয়ো।

এককড়ি সানন্দে মাথা নাড়াইয়া কহিল, যে আজ্ঞে। কারণ ইহা বলা বাহুল্য যে, খাজনার অতিরিক্ত টাকা আদায়ের গুরুভারে এককড়ি আপনাকে নিরতিশয় প্রপীড়িত বা বিপন্ন জ্ঞান করে নাই। সে পুলকিত চিত্তে কহিল, আমি রাত্রের মধ্যেই আজ চতুর্দ্দিকে লোক পাঠিয়ে দেব যেন কেউ না বলতে পারে যে, সময়ে খবর পায় নি।

জীবানন্দ মাথা হেলাইয়া সম্মতি দান করিলেন, এবং মদের পাত্রটা মুখে তুলিয়া সমস্তটা এক চুমুকে পান করিয়া সেটা ধীরে ধীরে রাখিয়া দিতে দিতে বলিলেন, এককড়ি, তোমাদের এখানে বোধ করি বিলিতী মদের দোকান নেই। তা না থাক, যা আমার সঙ্গে আছে তাতেই এ ক'টা দিন চলে যাবে, কিন্তু মাংস আমার রোজ চাই।

এককড়ি প্রস্তুত হইয়াই ছিল, কহিল, এ আর বেশী কথা কি হুজুর, মা চণ্ডীর সরেস মহাপ্রসাদ আমি রোজ হুজুরকে দিয়ে যাবো।

হুজুর খুশি হইয়া কহিলেন, বেশ, তারপরে বোতল হইতে কতকটা সুরা পাত্রে ঢালিয়া তাহা পান করিলেন, এবং মুছিতে মুছিতে বলিলেন, আরও একটা কথা আছে এককড়ি।

এককড়ির সাহস বাড়িতেছিল, কহিল, আজ্ঞে করুন?

তিনি মুখের মধ্যে গোটা-দুই লবঙ্গ ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, দেখ এককড়ি, আমি বিবাহ করি নি—বোধ হয় কখনো করবও না।

এককড়ি মৌন হইয়া রহিল। তখন এই মত্তপ ভূস্বামী একটা শুষ্কহাস্য করিয়া কহিলেন, কিন্তু তাই বলে আমি ভীষ্মদেব—বলি মহাভারত পড়েচ ত? আর ভীষ্মদেব সেজেও বসিনি—শুকদেব হয়েও উঠিনি—বলি, কথাটা বুঝলে ত এককড়ি? ওটা চাই।

এককড়ি লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া একটুখানি ঘাড় নাড়িল, মুখ ফুটিয়া জবাব দিতে পারিল না; কিন্তু যে নির্লজ্জ উক্তিতে জমিদারের গোমস্তার পর্য্যন্ত লজ্জা বোধ হয়, এ কথা যিনি অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করিলেন তিনি ইহা গ্রাহ্যও করিলেন না, কহিলেন, অপর সকলের মত চাকরকে দিয়ে এ-সব কথা বলাতে আমি ভালবাসিনে, তাতে ঠকতে হয়। আচ্ছা এখন যাও। আমার বেহারাদের খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করে দিয়ো; ওরা তাড়িটা-আসটাও বোধ করি খায়। সেদিকেও একটু নজর রেখো। আচ্ছা যাও।

এককড়ি মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া আর এক দফা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল; হুজুর হঠাৎ ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, এ গাঁয়ে দুষ্ট বজ্জাত প্রজা কেউ আছে জানো?

এককড়ি ফিরিয়া দাঁড়াইল। এইখানে তাহার অনেকদিনের একটা পুরাতন ক্ষত ছিল—মনিবের প্রশ্নটা ঠিক সেইখানেই আঘাত করিল; কিন্তু বেদনাটাকে সে একটা সংযমের আবরণ দিয়া নিরুৎসুক-কণ্ঠে কহিল, আজ্ঞে না, তা এমন কেউ—শুধু তারাদাস চক্কোত্তি—তা সে আবার হুজুরের প্রজা নয়।

তারাদাসটা কে?

এককড়ি কহিল, গড়চণ্ডীর সেবায়েত।

এই সেবায়েতদিগের সহিত জমিদারী-সংস্পর্শে এককড়ির অনেক কলহ-বিবাদ হইয়া গেছে, কিন্তু সেজন্য তাহার বিশেষ কোন ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু বৎসর-দুই পূর্ব্বে একটা পাকা কাঁঠাল গাছ লইয়া যে লড়াই বাঁধে, সে জ্বালা তাহার যায় নাই। কারণ কাঁঠালের তক্তাগুলো ছিল তাহার নিজের বাটীর জন্য এবং সেই হেতু শেষ পর্য্যন্ত তাহাকেই নতি স্বীকার করিয়া গোপনে মিটমাট করিয়া লইতে হয়।

এককড়ি কহিতে লাগিল, কি করব হুজুর, সদরে আরজি ক রে সুবিচার পাইনে—দেওয়ানজী গেরাহ্যিই করেন না, নইলে চক্কোত্তিকে ঢিট্ করতে কতক্ষণ লাগে! কিন্তু এও নিবেদন করচি, হুজুর আসকারা দিলে ওরা প্রজা বিগড়ে দেবে—তখন গাঁ শাসন করা ভার হবে।

হুজুরের কিন্তু নেশা বাড়িয়া উঠিতেছিল, তিনি নিস্পৃহ জড়িত-কণ্ঠে বলিলেন, তুমি তারাদাসের নামটাই ত করলে এককড়ি —আবার ওরা এল কারা?

এককড়ি কহিল, চক্কোত্তির মেয়ে ভৈরবী। নইলে চক্কোত্তি মশাই নিজে তত লোক মন্দ নয়, কিন্তু মেয়েটাই হচ্চে আসলে সর্ব্বনাশী। দেশের যত বোম্বেটে বদমাশ-গুলো হয়েচে যেন একেবারে তার গোলাম।

জমিদারবাবুর কানে বোধ করি সমস্ত কথাগুলি পৌঁছিল না। তিনি তেমনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, হবারই কথা। কত বয়স? দেখতে কেমন?

এককড়ি কহিল, বয়স তেইশ-চব্বিশ হতে পারে। আর রূপের কথা যদি বলেন হুজুর, ত সে যেন এক কাটখোট্টা সেপাই। না আছে মেয়েলী ছিরি, না আছে মেয়েলী ছাঁদ। যেন চুয়াড়, যেন হাতিয়ার বেঁধে লড়াই করতে চলেচে। তাতেই ত দেশের ছোটলোকগুলো মনে করে গড়ের উনিই হচ্চেন সাক্ষাৎ চণ্ডী।

জীবানন্দ অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া বসিলেন। উৎসাহ ও কৌতূহলে দুই রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, বল কি এককড়ি? ব্যাপারটা কি খুলে বল ত শুনি? না হয় চুয়াড়ের মতই দেখতে, তবু ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে—সর্ব্বনাশীই বা হ'ল কি ক'রে, আর বোম্বেটে বদমাশের দলই বা তার জুটলো কোথা থেকে?

এককড়ি কহিল, তা আর আশ্চর্য্যি কি হুজুর! বলিয়া সে ভৈরবীর যে ইতিহাসটা দিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

ভৈরবী কাহারও নাম নয়, গড়চণ্ডীর প্রধান সেবিকাদের ইহা একটি সাধারণ উপাধি। যেমন বর্ত্তমান ভৈরবীর নাম ষোড়শী এবং ইহার পূর্ব্বে যিনি ছিলেন তাহার নাম ছিল মাতঙ্গিনী ভৈরবী। মাতার আদেশে তাঁহার সেবায়েত কখনও পুরুষ হইতে পারে না, মেয়েরাই এ পদ চিরদিন অধিকার করিয়া আসিতেছে।

আন্দাজ বৎসর পনের-ষোল হইবে হঠাৎ একদিন জানা যায় মাতঙ্গিনী ভৈরবীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। কথাটা অনেক কষ্টে যখন সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়, তখন বাধ্য হইয়া মাতঙ্গিনীকে পদত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া যাইতে হয়।

জীবানন্দ এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, বিধবা হ'লে বুঝি ভৈরবী-গিরি খারিজ হয়ে যায়?

এককড়ি কহিল, হাঁ হুজুর।

তাই বুঝি তিনি স্বামীটিকে অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়েছিলেন?

এককড়ি বলিল, সে ছাড়া আর ত কোন উপায় নেই হুজুর! মায়ের আদেশে বিয়ের তেরাত্রি পরে স্বামীর আর ভৈরবী স্পর্শ করিবারও জো নেই। তাই দূর দেশ থেকে দুঃখী গরীবদের একটা ছেলে ধরে এনে বিয়ে দিয়ে পরের দিনই

টাকাকড়ি দিয়ে সেই যে বিদায় করা হয়, আর কখনো কেউ তার ছায়া পর্য্যন্ত দেখতে পায় না। এই-ই নিয়ম, এ-ই চিরকাল ধরে হয়ে আসচে।

জীবানন্দ সহাস্যে কহিলেন, বল কি এককড়ি, একেবারে দেশান্তর? ভৈরবী মানুষ, রাত্রে নিরিবিলি একপাত্র সুরা ঢেলে দেওয়া—গরম মশলা দিয়ে চাট্টি মহাপ্রসাদ রেঁধে খাওয়ানো—একেবারে কিছুই করতে পায় না?

এককড়ি মাথা নাড়িয়া বলিল, না হুজুর, মায়ের ভৈরবীকে স্বামী স্পর্শ করতে নেই। কিন্তু তাই বলে কি স্বামী ছাড়া গাঁয়ে আর পুরুষ নেই? মাতু ভৈরবীকেও দেখেচি, ষোড়শী ভৈরবীকেও দেখেচি। লোকগুলো কি আর খামকা তার পায়ে পায়ে জড়ায়। কথায় কথায় হুজুরের সঙ্গেই মামলা-মকদ্দমা বাধিয়ে দেয়।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিলেন, মেয়ে-মাহুস্ত আর কি! তার দোষ নেই; কিন্তু মাতুর পরে ইনি জুটলেন কি ক'রে?

এককড়ি বলিল, চক্কোত্তিমশাই হচ্চেন মাতঙ্গিনীর ভাগ্নে। ঢাকা না কোথায় কোন মহাজনের আড়তে খাতা লিখেছিলেন, চিঠি পেয়ে চলে এলেন, সঙ্গে একটা বছর দশেকের মেয়ে। কোথা থেকে একটা পাত্রও জুটিয়ে আনলেন—কি জাত, কার ছেলে, কোথায় ঘর—রাতারাতি বিয়ে হ'ল, রাতারাতি চালান দিয়ে দিলেন—তারপর দিব্যি গদিতে বসিয়ে রাজভোগে আছেন। কেবা কথা কয়, কেবা জিজ্ঞেসা করে? গাঁয়েও মানুষ নেই, রাজারও শাসন নেই! বলিয়া সে জমিদারকেই কটাক্ষ করিল; কিন্তু চাহিয়া বুঝিল এ বক্রোক্তি নিষ্ফল হইয়াছে। রাজা নিমীলিত-চক্ষে এক নিমেষেই যেন তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা নেই—পাছে তাহার কিছুমাত্র অবিবেচনায় এই তন্দ্রা ভাঙিয়া যায়, এই ভয়ে সে পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল দাঁড়াইয়া মনে মনে মাতালের পিতৃপুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবে কিনা ভাবিতেছিল, এমনি সময়ে জীবানন্দ ঠিক সহজ মানুষের মতই পুনরায় কথা কহিলেন। বলিলেন, বছর পোনের পূর্ব্বে না? আচ্ছা, এই তারাদাস লোকটা কি দেখতে খুব বেঁটে আর ফরসা?

এককড়ি কহিল, না হুজুর, চক্কোত্তিমশায়ের রঙ ফরসা বটে, কিন্তু ইনি খুব দীর্ঘাঙ্গ।

দীর্ঘাঙ্গ? আচ্ছা, লোকটা যে ঢাকায় মহাজনের গদিতে খাতা লিখত এ তুমি জানলে কি করে? এমন ত হ'তে পারে সে কলকাতায় রাঁধুনি বামুনের কাজ করত?

এককড়ি মাথা নাড়িয়া বলিল, না হুজুর, সত্যিই তিনি খাতা লিখতেন। তাঁর ছ'মাসের মাইনে বাকি ছিল, আমিই নালিশ করবার ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখে টাকাটা আদায় করে দিই।

জীবানন্দ কহিলেন, তা হ'লে সত্যি। আচ্ছা, এই লোকটাই কি বছর-পাঁচেক পূর্ব্বে একটা প্রজা-উৎখাতের মামলায় মামার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়েছিল ?

এককড়ি মস্ত একটা মাথার ঝাঁকনি দিয়া বলিল, হুজুরের নজর থেকে কিছুই এড়ায় না। আজ্ঞে, এই সেই তারাদাস।

জীবানন্দ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, হুঁ। সেবার অনেক টাকার ফেরে ফেলে দিয়েছিল। এরা কতখানি জমি ভোগ করে ?

এককড়ি মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল, পঞ্চাশ-ষাট বিঘের কম নয়।

জীবানন্দ মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কাল তুমি নিজে গিয়ে একে জানিয়ে এসো যে বিঘে পিছু দশ টাকা আমার নজর চাই। আমি আট দিন আছি।

এককড়ি কুণ্ঠিত এবং সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, আজ্ঞে, সে যে নিষ্কর দেবোত্তর হুজুর।

না, দেবোত্তর এ গাঁয়ে এক ফোঁটা নেই। সেলামী না পেলে সমস্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

এককড়ি নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। সে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জন্য নয়, তাঁহার কন্যা কাটখোট্টা ষোড়শী ভৈরবীর কথাই স্মরণ করিয়া। জমিদার ত একদিন চলিয়া যাইবেন, কিন্তু তাহাকে যে এই গ্রামেই বাস করিতে হইবে। একবার সে অস্ফুটে বলিতেও গেল, কিন্তু হুজুর—

কিন্তু বক্তব্যটা উহার অধিক অগ্রসর হইতে পাইল না। হুজুর মাঝখানেই থামাইয়া দিয়া কহিলেন, কিন্তু এখন থাক এককড়ি। আমার টাকার দরকার, পাঁচ-ছ'শ টাকা আমি ছাড়তে পারব না, ওটা তাদের দিতেই হবে। কাল চক্রবর্ত্তীকে খবর দিয়ো যেন কাছারিতে হাজির থাকে। দলিলপত্র কিছু থাকে ত তাও সঙ্গে আনতে পারে। রাত হ'ল এখন তুমি যেতে পারো। লোকজনদের খাবার বন্দোবস্ত করে দিও—সদরে ফিরে তোমাকে মনে রাখব।

হুজুর মা-বাপ, বলিয়া এককড়ি আর একদফা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২

জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী মাত্র পাঁচদিন চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করিয়াছেন, এইটুকু সময়ে অনাচার ও অত্যাচারে সমস্ত গ্রামখানা যেন জ্বলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। নজরের টাকাও আদায় হইতেছে, কিন্তু সে যে কি করিয়া হইতেছে তাহা জমিদার-সরকারে চাকরি না করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করাও পাগলামি।

তারদাস চক্রবর্ত্তী আদেশমত প্রথম দিন হাজির হইয়া নজর দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, এমন কি ছয় ঘণ্টাকাল তীক্ষ্ণ রৌদ্রে খাড়া দাঁড়াইয়াও স্বীকার করেন নাই। কিন্তু সর্ব্বসমক্ষে কান ধরিয়া ওঠ-বোস, ঘোড়দৌড় এবং ব্যাঙর নাচ নাচাইবার প্রস্তাবে আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। চণ্ডীমাতার নিকট কায়মনে জমিদার-গোষ্ঠির বংশলোপের আবেদন করিয়া, প্রকাশ্যে পাঁচদিনের কড়ারে টাকা আদায় দিবার অঙ্গীকারে অব্যাহতি পাইয়া বাড়ি আসেন। আজ সেই দিন, কিন্তু সকাল হইতে কোথাও তাঁহাকে দেখা যাইতেছে না।

ইতিমধ্যে প্রত্যহ মহাপ্রসাদ যোগাইতে হইয়াছে; পুকুরের মাছ, বাগানের ফলমূল, চালের লাউ-কুমড়া জমিদারের লোক যথেচ্ছা টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে—ষোড়শী প্রতিবাদ করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু তারাদাস কিছুতেই একটা কথাও কহিতে দেয় নাই, তাহার হাতে ধরিয়া কাঁদাকাটা করিয়া যেমন করিয়া হোক নিবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে। পিতার অপমান হইতে আরম্ভ করিয়া এই সকল নির্য্যাতন সে কোনমতে এতদিন সহিয়াছিল, কিন্তু আজিকার ঘটনায় তাহার সমস্ত সঞ্চিত ক্রোধ একমূহূর্ত্তে অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। পিতার নিঃশব্দ অন্তর্দ্ধানের হেতু ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের ভার তাহার মন একাকী যেন আজ আর বহিতে পারিতেছিল না। এমনি করিয়া সমস্ত সকাল ও মধ্যাহ্ন যখন অপরাহ্ণে গড়াইয়া পড়িল, তখন রাত্রের অন্ধকারে উপবাসী পিতার গোপনে ফিরিয়ে আসার প্রত্যাশা করিয়া সে দুটা রাঁধিতে বসিয়াছিল, এমন সময় মন্দিরের পরিচারিকা আসিয়া যে অত্যাচার বর্ণনা করিল, তাহা এই—

মাতাল ভূস্বামীর হঠাৎ খেয়াল হইয়াছে যে, অতঃপর নিষিদ্ধ মাংস ত নহেই, এমন কি বৃথা মাংসও ভোজন করিবেন না। অথচ পাঁঠার মাংস যথেষ্টসুস্বাদু ও রুচিকর নহে। তাই আজ জমিদারের লোক ডোমপাড়া হইতে একটা খাসি আনিয়া মন্দিরে হাজির করে এবং তাহাকে মহাপ্রসাদ করিয়া দিতে বলে। পুরোহিত প্রথমটা আপত্তি করে, কিন্তু শেষে আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া উহাকেই উৎসর্গ করিয়া যথারীতি বলি দিয়া দেবীর মহাপ্রসাদ করিয়া দেয়।

শুনিবামাত্রই ষোড়শী হাঁড়িটা দুম করিয়া চুলা হইতে নামাইয়া দিয়া ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া দ্রুতবেগে মন্দিরে চলিয়াছিল, বহির্দ্বারে জনচারেক হিন্দুস্থানী পাইক তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বম্ভর দূর হইতে বাড়িটা দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। ইহারা জমিদারের পালকি-বেহারা। মুখে তাড়ির দুর্গন্ধ, চোখগুলো রাঙ্গা—অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা। যে লোকটা বাঙলা শিখিয়াছে, সে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, শালা ঠাকুরমশাই ঘোরে আছে? শালা টাকা দেবে না ভেগে ফিরচে।

ষোড়শী চাহিয়া দেখিল কোথাও কেহ নাই। পাছে এই দুর্বিনীত মদমত্ত পশুগুলা হঠাৎ তাহাকেই অপমান করিয়া বসে এই ভয়ে সে দুর্জ্জয় ক্রোধ প্রাণপণে সংবরণ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, বাবা বাড়ি নেই।

কোথায় গিয়েছে?

আমি জানি নে, বলিয়া ষোড়শী পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেই লোকটা হাত বাড়াইয়া একটা অত্যন্ত অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, না আছে ত তুই চোল্। গোলায় গামছা লাগিয়ে খিঁচে লিয়ে যাবো।

এ অপমান ষোড়শীকে একেবারে আত্মহারা করিয়া ফেলিল। সে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া কহিল, খবরদার বলচি। চল্ আমিই যাবো তোদের মাতালটা আমাকে কি করতে পারে দেখি গে। বলিয়া সে পরিণাম-ভয়হীন উন্মাদিনীর ন্যায় নিজেই দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া চলিল।

পথে দুই-একজন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু ষোড়শী ভ্রূক্ষেপও করিল না। জমিদারের লোকগুলো পিছনে হল্লা করিয়া চলিয়াছে, ইহাব অর্থ পল্লীগ্রামের কাহাকেও বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই শুধু নয়, কাহারও সাহায্য-ভিক্ষা করিয়া এত বড় অবমাননাকে আর নিজের মুখে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিতে তাহার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না।

কাছারি-বাড়ি বেশী দূর নয়, এককড়ি সম্মুখেই ছিল। সে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল, আমি জানি নে—কিছুই আমি জানি নে—সর্দ্দারজী, হুজুরের কাছে নিয়ে যাও। বলিয়া সে শান্তি-কুটিরের উদ্দেশে অঙ্গুলি-সংকেত করিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

এতক্ষণে ষোড়শী নিজের বিপদের গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

কোথায় যাইতে হইবে বুঝিয়াও জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কোথায় যেতে হবে?

লোকটা এককড়ির প্রদর্শিত দিকটা নির্দ্দেশ করিয়া কেবল কহিল, চল্।

এ যাইতেই হইবে, তবুও কহিল, আমার কাছে ত টাকা নেই সর্দ্দার, হুজুরের কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে তোমাদের কি লাভ হবে ?

কিন্তু সর্দ্দার বলিয়া যাহাকে ভিক্ষা জানানো হইল, সে এই আবেদনের ধার দিয়াও গেল না। শুধু প্রত্যুত্তরে একটা বিশ্রী ভঙ্গী করিয়া বলিল, চল্ মাগী, চল্।

আর ষোড়শী কথা কহিল না। এই লোকগুলা স্থানান্তর হইতে আসিয়াছে, তাহার মর্য্যাদার কোন ধারণাই ইহাদের নাই। সুতরাং টাকার জন্য, খাজনার জন্য নরনারী-নির্বিচারের সামান্য প্রজার প্রতি যে আচরণে নিত্য অভ্যস্ত, এ ক্ষেত্রেও তাহাদের কোন ব্যতিক্রম হইবে না। অনুনয়-বিনয় নিস্ফল, কাঁদাকাটায় কেহ সাহায্য করিতে আসিবে না। অবাধ্য হইলে হয়ত পথের মধ্যেই টানা-হেঁচড়া বাধাইয়া দিবে। প্রকাশ্য রাজপথে অপমানের এই চরম কদর্য্যতার চিত্র তাহাকে মুখ বাঁধিয়া যেন সুমুখের দিকে ঠেলিয়া দিল। পথে রাখাল বালকেরা গরু লইয়া ফিরিয়াছে, কৃষকেরা দিনের কর্ম্ম শেষ করিয়া বোঝা-মাথায় ঘরে চলিয়াছে—সবাই অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। ষোড়শী কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না, কাহাকেও কিছু বলিবার উদ্যম করিল না, কেবল মনে মনে কহিতে লাগিল, মা ধরিত্রী দ্বিধা হও!

সূর্য্য অস্ত গেল, অন্ধকার অগ্রসর হইয়া আসিল। সে যন্ত্রচালিত পুতুলের মত নীরবে শান্তি-কুটিরের গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল; থামিবার, আপত্তি করিবার, কোথাও এতটুকু চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না।

যে ঘরে আনিয়া তাহাকে হাজির করা হইল, এটা সেই ঘর, এককড়ি যেখানে সেদিন প্রবেশ করিয়া ভয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। যেমনি আবর্জ্জনা, তেমনি মদের গন্ধ। সাদা, কালো, লম্বা, বেঁটে নানা আকারের শূন্য মদের বোতল চারিদিকে ছড়ানো। শিয়রের দেয়ালে খান-দুই চকচকে ভোজালি টাঙানো, এককোণে একটা বন্দুক ঠেস দিয়া রাখা, হাতের কাছে একটা ভাঙা তেপায়ের উপর একজোড়া পিস্তল, অদূরে ঠিক সুমুখের বারান্দায় কি একটা বন্য পশুর কাঁচা চামড়া ছাদ হইতে ঝুলানো—তাহার বিকট দুর্গন্ধ মাঝে মাঝে নাকে লাগিতেছে। বোধ হয় খানিক পূর্ব্বেই গুলি করিয়া একটা শিয়াল মারা হইয়াছে। সেটা তখন পর্য্যন্ত মেঝেয় পড়িয়া -তাহারই রক্ত গড়াইয়া কতকটা স্থান রাঙা হইয়া আছে। জমিদার শয্যার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া কি একখানা বই পড়িতেছিলেন। মাথার কাছে আর একটা মোটা বাঁধানো বইকে বাতিদান করিয়া মোমবাতি জ্বালানো হইয়াছে, সেই আলোকে চক্ষের পলকে অনেক বস্তুই ষোড়শীর চোখে পড়িল। বিছানায় বোধ করি কেবল চাদরের অভাবেই একটা বহুমূল্যের শাল পাতা, তাহার অনেকখানিই মাটিতে লুটাইতেছে; দামী সোনার ঘড়িটার উপরে আধপোড়া একখণ্ড চুরুট হইতে তখনও ধূমের সূক্ষ্ম রেখাটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতেছে; খাটের নীচে একটা

রূপার পাত্রে ভুক্তাবশিষ্ট কতকগুলা হাড়গোড় হয়ত সকাল হইতেই পড়িয়া আছে; তাহারই কাছে পড়িয়া একটা জরি-পাড়ের ঢাকাই চাদর, বোধ হয় হাতের কাছে হাত মুছিবার রুমাল বা গামছার অভাবেই ইহাতে হাত মুছিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

বইয়ের ছায়ায় লোকটার মুখের চেহারা ষোড়শী দেখিতে পাইল না, কিন্তু তবুও তাহার মনে হইল ইহাকে সে আয়নার মত স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছে। ইহার ধর্ম্ম নাই, পুণ্য নাই, লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই—এ নির্ম্মম, এ পাষাণ। ইহার মুহূর্ত্তের প্রয়োজনের কাছেও কাহারও কোন মূল্য কোন মর্য্যাদা নাই। এই পিশাচপুরীর অভ্যন্তরে এই ভয়ঙ্করের হাতের মধ্যে আপনাকে একান্তভাবে কল্পনা করিয়া ক্ষণকালের জন্য ষোড়শীর সকল ইন্দ্রিয় যেন অচেতন হইয়া পড়িতে চাহিল।

সাড়া পাইয়া লোকটা জিজ্ঞাসা করিল, কে?

বাহির হইতে সর্দ্দার ঘটনাটা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া চক্রবর্ত্তীর উদ্দেশে একটা অকথ্য গালি দিয়া কহিল, হুজুর! উস্‌কো বেটিকো পাকড় লায়া।

কাকে? ভৈরবীকে? বলিয়া জীবানন্দ বই ফেলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। বোধ হয় এ হুকুম সে দেয় নাই। কিন্তু পরক্ষণেই কহিল, ঠিক হয়েচে। আচ্ছা যা।

তাহারা চলিয়া গেলে ষোড়শীকে উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল, তোমাদের আজ টাকা দেবার কথা। এনেচ?

ষোড়শীর শুষ্ক কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া রহিল, কিছুতেই স্বর ফুটিল না।

জীবানন্দ ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া পুনরায় কহিল, আনো নি জানি। কিন্তু কেন?

এবার ষোড়শী প্রাণপণ চেষ্টায় জবাব দিল। আস্তে আস্তে বলিল, আমাদের নেই।

না থাকলে সমস্ত রাত্রি তোমাকে পাইকদের ঘরে আটকে থাকতে হবে। তার মানে জানো?

ষোড়শী দ্বারের চৌকাঠটা দুই হাতে সবলে চাপিয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া নীরব হইয়া রহিল। অসম্ভব বলিয়া সে এখানে কিছু ভাবিতেও পারিল না।

তাহার এ ভয়ানক বিবর্ণ মুখের চেহারা দূর হইতেও বোধ হয় জীবানন্দের চোখে পড়িল, এবং মূর্চ্ছা হইতে তাহার এই আত্মরক্ষার চেষ্টাটাও বোধ হয় তাহার অগোচর রহিল না; মিনিট-খানেক সে নিজেও কেমন যেন আচ্ছন্নের ন্যায় বসিয়া রহিল। তারপরে বাতির আলোটা হঠাৎ হাতে তুলিয়া লইয়া এই মৃতকল্প অবচেতন-প্রায় রমণীর একেবারে মুখের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং আরতির পূর্ব্বে পূজারী যেমন করিয়া দীপ জ্বালিয়া প্রতিমার মুখ নিরীক্ষণ করে, ঠিক তেমনি করিয়া এই

মহাপাপিষ্ঠ স্তব্ধ গম্ভীর মুখে এই সন্ন্যাসিনীর নিমীলিত চক্ষের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া তাহার গৈরিক বস্ত্র, তাহার এলায়িত রুক্ষ কেশভার, তাহার পাণ্ডুর ওষ্ঠাধর, তাহার সবল সুস্থ ঋজু দেহ, সমস্তই সে যেন দুই বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া নিঃশব্দে গিলিতে লাগিল

৩

নারীর একজাতীয় রূপ আছে যাহাকে যৌবনের অপর প্রান্তে না পৌঁছিয়া পুরুষে কোনদিন দেখিতে পায় না। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত নারীরূপই আজ ষোড়শীর তৈলহীন বিপর্য্যস্ত চুলে, তাহার উপবাস-কঠিন দেহে, তাহার নিপীড়িত যৌবনের রুক্ষতায়, তাহার উৎসাদিত প্রবৃত্তির শুষ্কতায়, শূন্যতায়, তাহার সকল অঙ্গে অঙ্গে এই প্রথম জীবানন্দের চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

রমণীর দেহ লইয়া যাহার বীভৎস লীলা এই বিশ-বর্ষ ব্যাপিয়া অবাধে বহিয়াছে—কত শোভা, কত লজ্জা, কত মাধুর্য্যই যে এই ব্যাভিচারের ঘূর্ণাবর্ত্তের অতলে তলাইয়াছে, তাহার দাগটুকু পর্য্যন্ত পাষণ্ডের মনে নাই, লালসার সেই অগ্নিজিহ্বা আজ যখন অকস্মাৎ বাধা পাইল, তখন কিছুক্ষণের জন্য এই অপরিচিত বিস্ময়ে তাহার মদোন্মত্ত বিকৃত দৃষ্টি স্তব্ধ, গম্ভীর এবং আবিষ্ট হইয়া রহিল।

ভৈরবীকে মাথায় কাপড় দিতে নাই, সে অধোমুখে চোখ বুজিয়া হতজ্ঞানের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু জীবানন্দ নীরবে ফিরিয়া গিয়া আলোটা রাখিয়া দিল এবং মদের বোতল হইতে কয়েক পাত্র উপর্য্যুপরি পান করিতে লাগিল।

মিনিট পোনের এইভাবে নিঃশব্দে কাটিয়া গেল, হঠাৎ এক সময়ে সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। মনে হইল এতক্ষণে সে তাহার মূর্চ্ছিতপ্রায় পশুপ্রকৃতিটাকে চাবুক মারিয়া মারিয়া উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রশ্ন করিল, তোমার নাম ষোড়শী, না?

এ-পক্ষ হইতে কোন সাড়া আসিল না।

জীবানন্দ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বয়স কত?

কিন্তু তথাপি কোন উত্তর না পাইয়া তাহার কণ্ঠস্বর কঠিন হইল, কহিল, চুপ করে থেকে কোন লাভ হবে না। জবাব দাও।

ষোড়শী অনেক কষ্টে মৃদুস্বরে কহিল, আমার বয়স ছাব্বিশ।

জীবানন্দ বলিল, বেশ! তাহলে খবর যদি সত্য হয় ত এই উনিশ-কুড়ি বৎসর

ধরে তুমি ভৈরবীগিরি করচ; খুব সম্ভব অনেক টাকা জমিয়েচ। দিতে পারবে না কেন?

ষোড়শী তেমনি আস্তে আস্তে উত্তর দিল, আপনাকে ত আগেই জানিয়েচি আমার টাকা নেই।

এই সশঙ্ক মৃদু কণ্ঠস্বরের মধ্যেও যে সত্যের দৃঢ়তা ছিল তাহা জমিদারের কানে বাজিল। সে এ লইয়া আর তর্ক করিল না; কহিল, বেশ, তা হলে আরও দশজনে যা করচে তাই কর। যাদের টাকা আছে তাদের কাছে জমি বাঁধা দিয়ে হোক, বিক্রী করে হোক দাও গে।

ষোড়শী কহিল, তারা পারে, জমি তাদের। কিন্তু দেবতার সম্পত্তি বাঁধা দেবার, বিক্রী করবার ত আমার অধিকার নেই।

জীবানন্দ এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া বলিল, নেবার অধিকার কি ছাই আমারই আছে? এক কপর্দ্দকও না। তবুও নিচ্চি, কেননা আমার চাই। এই চাইটাই হচ্ছে সংসারে খাঁটি অধিকার। তোমার যখন দেওয়া চাই-ই, তখন —বুঝলে?

ষোড়শী নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিল, জীবানন্দ কহিতে লাগিল, ভাবে মনে হয় তুমি লেখাপড়া কিছু জানো, তা যদি হয় ত জমিদারের প্রাপ্যটা নিয়ে আর হাঙ্গামা ক'রো না—দিয়ো।

ষোড়শী এবার সাহস করিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, ওটা কি আপনি জমিদারের প্রাপ্য বলতে চান?

জীবানন্দ কহিল, প্রাপ্য বলতে চাই নে; ওটা তোমাদের দেয় এই বলতে চাই। তোমার মনে হ'তে পারে বটে, অন্য জমিদারকে ত দিতে হয়নি। তার কারণ, তাঁরা আমার মত সরল ছিলেন না। স্পষ্ট করে দাবি করেন নি, কিন্তু প্রায় সমস্ত গ্রামখানাই ধীরে ধীরে বে-দখল করে নিয়েচেন। তাঁরা একরকম বুঝেছিলেন, আমি একরকম বুঝি। যাক্, এত রাত্রে কি একা বাড়ি যেতে পারবে? যাদের সঙ্গে তুমি এসেছিলে তাদের আর সঙ্গে দিতে চাইনে।

এতক্ষণ ও এতগুলা কথাবার্ত্তায় ষোড়শীর ভয়টাও কতকটা অভ্যাস হইয়া আসিতেছিল, সে সবিনয়ে কহিল; আপনার হুকুম হলেই যেতে পারি।

জীবানন্দ সবিস্ময়ে কহিল, একলা? এই অন্ধকার রাত্রে? ভারি কষ্ট হবে যে! বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

তাহার কথা ও হাসির ইঙ্গিত এতই স্পষ্ট যে, যে আশঙ্কা ষোড়শীর কমিতেছিল, তাহাই একেবারে চতুর্গুণ হইয়া ফিরিয়া আসিল। সে মাথা নাড়িয়া ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল, না, আমাকে এখুনি যেতেই হবে। বলিয়া পা বাড়াইবার উদ্যোগ

করিতেই জীবানন্দ তেমনি সহাস্যে কহিল, বেশ ত টাকা না হয় নাই দেবে ষোড়শী। তা ছাড়া আরও অনেক রকমের সুবিধে—

কিন্তু প্রস্তাব শেষ হইতে পাইল না। ইহার মুখে নিজের নাম শুনিয়াই ষোড়শী অকস্মাৎ প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, আপনার টাকা, আপনার সুবিধা, আপনার থাক্, আমাকে যেতে দিন। বলিয়াই সে যথার্থই এবার এক পা অগ্রসর হইয়া গেল। কিন্তু যে লোকগুলোকে এই লোকটাও তাহার সঙ্গে দিতে সাহস করে না, তাহাদিগকেই সম্মুখে কিছু দূরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে আপনিই থমকিয়া দাঁড়াইল।

তাহার বাক্য ও কার্য্যের কোন প্রতিবাদ জমিদার করিল না, কিন্তু তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল।

এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তুমি মদ খাও?

ষোড়শী কহিল, না।

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার জন-দুই অন্তরঙ্গ পুরুষ বন্ধু আছে শুনেছি। সত্যি?

ষোড়শী তেমনি মাথা নাড়িয়া বলিল, মিছে কথা।

জীবানন্দ আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তোমার পূর্ব্বেকার সকল ভৈরবীই মদ খেতেন—সত্যি?

ষোড়শী কহিল, সত্যি!

জীবানন্দ কহিল, মাতঙ্গী ভৈরবীর চরিত্র ভাল ছিল না—এখনো তার সাক্ষী আছে। সত্যি না মিছে?

ষোড়শী লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, সত্যি বলেই শুনেছি।

জীবানন্দ কহিল, শুনেচ? ভাল। তবে হঠাৎ তুমিই বা এমন দলছাড়া গোত্র-ছাড়া ভাল হতে গেলে কেন?

প্রত্যুত্তরে ষোড়শী এই কথা বলিতে গেল যে ভাল হইবার অধিকার সকলেরই আছে; কিন্তু সহসা একটা অত্যন্ত পুরুষ কণ্ঠস্বর তাহাকে মাঝখানেই থামাইয়া দিল। জমিদার জীবানন্দ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্ক আমি করি নে, তাদের মতামতও কখনও জানতে চাই নে। তুমি ভাল কি মন্দ, চুল-চিরে তার বিচার করবারও আমার সময় নেই। আমি বলি চণ্ডীগড়ের সাবেক ভৈরবীদের যেভাবে কেটেচে, তোমারও তেমনিভাবে কেটে গেলেই যথেষ্ট। আজ তুমি এই বাড়িতেই থাকবে।

হুকুম শুনিয়া ষোড়শী বজ্রাহতের ন্যায় একেবারে কাঠ হইয়া গেল। জীবানন্দ কহিতে লাগিল, তোমার সম্বন্ধে কি ক'রে যে এতটা সহ্য করেচি জানি নে, আর

কেউ এ বেয়াদপি করলে এতক্ষণ তাকে পাইকদের ঘরে পাঠিয়ে দিতুম। এমন অনেককে দিয়েচি।

ইহা ভিত্তিহীন শূন্য আস্ফালন নহে, তাহা শুনিলেই বুঝা যায়। ষোড়শী অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিল, গলায় আঁচল দিয়া দুই হাত জোড় করিয়া অশ্রুরুদ্ধ-স্বরে কেবল কহিল, আমার যা-কিছু আছে সব নিয়ে আজ আমাকে ছেড়ে দিন।

জীবানন্দ মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কেন বল ত? এ-রকম কান্নাও নতুন নয়, এ-রকম ভিক্ষেও এই নতুন শুনচি নে। কিন্তু তাদের সব স্বামী-পুত্র ছিল— কতকটা না হয় বুঝতেও পারি।

তাহাদের স্বামী-পুত্র ছিল! শুনিয়া ষোড়শী শিহরিয়া উঠিল।

জীবানন্দ কহিতে লাগিল, কিন্তু তোমার ত সে বালাই নেই! পোনের-ষোল বছরের মধ্যে তোমার স্বামীকে ত তুমি চোখেও দেখ নি। তা ছাড়া তোমাদের ত এতে দোষই নেই।

ষোড়শী যুক্তহস্তেই দাঁড়াইয়া ছিল, অশ্রুরুদ্ধ-স্বরে বলিল, স্বামীকে আমার ভাল মনে নেই সত্যি, কিন্তু তিনি ত আছেন! যথার্থ বলচি আপনাকে, কখনো কোন অন্যায়ই আমি আজ পর্য্যন্ত করিনি। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।

জীবানন্দ হাঁক দিয়া ডাকিল, মহাবীর—

ষোড়শী আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল, আমাকে আপনি মেরে ফেলতে পারেন, কিন্তু—

জীবানন্দ কহিল, আচ্ছা, ও বাহাদুরী কর গে ওদের ঘরে গিয়ে, মহাবীর —

ষোড়শী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, কারও সাধ্য নেই আমাকে প্রাণ থাকতে নিয়ে যেতে পারে। আমার যা-কিছু দুর্দ্দশা, যত অত্যাচার আপনার সামনেই হোক—আপনি আজও ব্রাহ্মণ, আপনি আজও ভদ্রলোক।

কিন্তু এতবড় অভিযোগেও জীবানন্দ হাসিল; সে হাসি যেমন কঠিন তেমনি নিষ্ঠুর। কহিল, তোমার কথাগুলো শুনতে মন্দ নয়; কিন্তু কান্না দেখে আমার দয়া হয় না। ও আমি অনেক শুনি। মেয়েমানুষের ওপর আমার এতটুকুও লোভ নেই— ভাল না লাগলেই চাকরদের দিয়ে দিই। তোমাকেও দিয়ে দিতুম, শুধু এই বোধ হয় আজ প্রথম একটু মোহ জন্মেচে। ঠিক জানিনে—নেশা না কাটলে ঠাওর পাচ্চিনে।

মহাবীর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সাড়া দিল, হুজুর!

জীবানন্দ সম্মুখের কবাটটা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, একে আজ রাত্রের মত ও-ঘরে বন্ধ করে রেখে দে। কাল আবার দেখা যাবে।

ষোড়শী গলদশ্রুনয়নে কহিল, আমার সর্ব্বনাশটা একবার ভেবে দেখুন হুজুর! কাল যে আমি আর মুখ দেখাতে পারবো না।

জীবানন্দ কহিল, দু-একদিন। তারপর পারবে। সেই লিভারের ব্যথাটা আজ ভারি বেড়েচে—আর বেশি বিরক্ত ক'রো না—যাও।

মহাবীর তাড়া দিয়া বলিল, আরে উঠ্‌না মাগী—চোল্‌।

কিন্তু তাহার কথা শেষ না হইতে অকস্মাৎ উভয়েই চমকিয়া উঠিল। জীবানন্দ ভয়ানক ধমক দিয়া কহিল, খবরদার, শুয়োরের বাচ্চা, ভাল করে কথা বল্‌। ফের যদি কখনো আমার হুকুম ছাড়া কোনো মেয়েমানুষকে ধরে আনিস্‌ ত গুলি করে মেরে ফেলব। বলিতে বলিতেই মাথার বালিশটা তাড়াতাড়ি পেটের নীচে টানিয়া লইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল এবং যাতনায় একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া কহিল, আজকের মত ও ঘরে বন্ধ থাকো, কাল তোমার সতীপনার বোঝা-পড়া হবে। এই—যা না আমার সুমুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে।

মহাবীর আস্তে আস্তে বলিল, চলিয়ে—

ষোড়শী নিরুত্তরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নির্দ্দেশমত পাশের অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া জীবানন্দ কহিল, একটু দাঁড়াও—তুমি পড়তে জানো, না?

ষোড়শী মৃদুকণ্ঠে বলিল, জানি।

জীবানন্দ কহিল, তা হলে একটু কাজ করে যাও। ওই যে বাক্সটা—ওর মধ্যে আর একটা ছোট কাগজের বাক্স পাবে। কয়েকটা ছোট-বড় শিশি আছে যার গায়ে বাঙলায় 'মরফিয়া' লেখা, তার থেকে একটুখানি ঘুমের ওষুধ দিয়ে যাও। কিন্তু খুব সাবধান, এ ভয়ানক বিষ। মহাবীর আলোটা ধর্‌।

বাতির আলোকে ষোড়শী কম্পিত-হস্তে বাক্স খুলিয়া শিশি বাহির করিল এবং সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কতটুকু দিতে হবে?

জীবানন্দ তীব্র বেদনায় আবার একটা অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া কহিল, ঐ ত বললুম খুব একটুখানি। আমি উঠতেও পারচিনে, আমার হাতের ঠিক নেই, চোখেরও ঠিক নেই। ওতেই একটা কাঁচের ঝিনুক আছে, তার অর্দ্ধেকেরও কম। একটু বেশি হয়ে গেলে এ ঘুম তোমার চণ্ডীর বাবা এসেও ভাঙাতে পারবে না।

ষোড়শী সন্ধান করিয়া ঝিনুক বাহির করিল, কিন্তু পরিমাণ স্থির করিতে তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। তারপরে অনেক যত্নে অনেক সাবধানে যখন সে নির্দ্দেশমত ঔষধ লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন নির্ব্বিচারে সেই বিষ হাত বাড়াইয়া লইয়া জীবানন্দ মুখে ফেলিয়া দিল। প্রশ্ন করিল না, পরীক্ষা করিল না, একবার চোখ মেলিয়া দেখিল না।

৪

পার্শ্বের অন্ধকার ঘরের মধ্যে রাখিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মহাবীর চলিয়া গেল, কিন্তু ভিতর হইতে বন্ধ করিবার উপায় না থাকায় ষোড়শী সেই রুদ্ধ দ্বারেই পিঠ দিয়া অত্যন্ত সতর্ক হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার দেহ ও মন শ্রান্তি-অবসাদের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, এবং রাত্রের মধ্যেও হয়ত আর কোন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না কিন্তু তথাপি ঘুমাইয়া পড়াও ত কোনমতে চলিবে না। এখানে একবিন্দু শৈথিল্যের স্থান নাই—এখানে একান্ত অসম্ভবের বিরুদ্ধেও তাহাকে সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত থাকিতে হইবে।

কিন্তু বাকী রাত্রিটা যেমন করিয়াই কাটুক, কাল তাহার সতীত্বের অতিশয় কঠোর পরীক্ষা হইবে তাহা সে নিজের কানেই শুনিয়াছে এবং ইহা হইতে বাঁচিবার কি উপায় আছে তাহাও তাহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

নিজের পিতার কথা মনে করিয়া ষোড়শী ভরসা পাইবে কি লজ্জায় মরিয়া গেল। তাঁহাকে সে ভাল করিয়াই চিনিত, তিনি যেমন ভীতু, তেমনি নীচাশয়। অনেক রাত্রে ঘরে ফিরিয়া এ দুর্ঘটনা জানিয়াও হয়ত তিনি প্রকাশ করিবেন না, বরঞ্চ সামাজিক গোলযোগের ভয়ে চাপিয়া দিবারই চেষ্টা করিবেন। মনে মনে এই বলিয়া তর্ক করিবেন, ষোড়শীকে একদিন জমিদার ছাড়িয়া দিবেই, কিন্তু কথাটা ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া দেব-সম্পত্তি হইতেই যদি বঞ্চিত হইতে হয় ত লাভের চেয়ে লোকসানের অঙ্কটাই ঢের বেশি ভারি হইয়া উঠিবে। উপরন্তু নজরের টাকাটার সম্বন্ধেও যে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বহুদূর অগ্রসর হইয়া যাইবে ইহাও ষোড়শী স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। তা ছাড়া, এই দুর্দ্দান্ত ভূস্বামীর বিরুদ্ধে তিনি করিবেনই বা কি! ছয়-সাত ক্রোশের মধ্যে একটা থানা নাই, চৌকি নাই—পুলিশের কাছে খবর দিতে গেলেও যে পরিমাণ সময়, অর্থ এবং লোকবলের প্রয়োজন তাহার কোনটাই তারাদাসের নাই। অতএব অত্যাচার যত বড়ই হোক, এই সুবৃহৎ শক্তির সম্মুখে অবনত-শিরে সহ্য করা ব্যতীত আর যে গত্যন্তর নাই, এই কথাটাই চোখে আঙ্গুল দিয়া ষোড়শীকে বার বার দেখাইয়া দিতে লাগিল।

অথচ সমস্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে মিশিয়া তাহার আর একটা চিন্তার ধারা নীরবে অনুক্ষণ বহিয়া যাইতেছিল—সে ওই চণ্ডীমাতা, যাঁহাকে শিশুকাল হইতেই সে কায়-মনে পূজা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ঐ যে লোকটা ও-ঘরে ঘুমাইতেছে—যাহার গূঢ়, ভারি নিশ্বাসের শব্দ অস্পষ্ট হইয়া তাহার কানে পৌঁছিতেছে, উহার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ভাল ও মন্দ, আপনার ও পর-পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর প্রতি কি গভীর নির্ম্মম

অবহেলা! নারীর চোখের জলে উহার করুণা নাই; রমণীর রূপ ও যৌবনে উহার মমতা নাই, আকর্ষণ নাই, স্বামী-পুত্রবতীর সতীধর্ম্ম নিতান্ত নিরর্থক; হত্যা করিতে উহার বাধে না; তাহাদের হৃদয়ের রক্তে দুই পা ভরিয়া গেলেও ভ্রূক্ষেপ করে না; যে নিজের প্রাণটাকে পর্য্যন্ত এইমাত্র তাহার হাতে তুলিয়া তাহারি প্রদত্ত বিষ অসঙ্কোচে চোখ মুদিয়া ভক্ষণ করিল, এতটুকু দ্বিধা করিল না। অশ্রদ্ধা ও অনাসক্তির এই অপরিমেয় পাষাণ-ভার ঠেলিয়া কি মা-চণ্ডীই তাহার পরিত্রাণের পথ করিতে পারিবেন।

এমনি করিয়া সে যেদিকে দৃষ্টিপাত করিল নিদারুণ আঁধার ব্যতীত এতটুকু আলোক-রশ্মিও চোখে পড়িল না। তখন পরিপূর্ণ নিরাশ্বাস তাহার ওই একমাত্র দেবতার মন্দির ঘুরিয়াই কেবল কল্পনার জাল বুনিতে লাগিল।

ভোরের দিকে বোধ করি সে একটুখানি তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ পিঠের উপর একটা চাপ অনুভব করিয়া ধড়মড় করিয়া সোজা উঠিয়া বসিয়া দেখিল জানালা দিয়া সূর্য্যের আলোক ঘরে প্রবেশ করিয়াছে।

বাহির হইতে যে দ্বার ঠেলিতেছিল, সে কহিল, আপনি বেরিয়ে আসুন, আমি এককড়ি।

ষোড়শী গায়ের বস্ত্র সংযত করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দ্বার খুলিয়া সম্মুখেই দেখিতে পাইল গত রাত্রির সেই শয্যার উপর জীবানন্দ প্রায় তেমনিভাবেই বালিশে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে। কাল দীপের স্বল্প আলোকে তাহার মুখখানা ষোড়শী ভাল দেখিতে পায় নাই, কিন্তু আজ এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টিপাতেই দেখিতে পাইল সুদীর্ঘ অত্যাচার তাহার দেহের প্রতি অঙ্গে কত বড় গভীর আঘাত করিয়াছে। বয়স ঠিক অনুমান হয় না—হয়ত চল্লিশ, হয়ত আরও বেশি—রগের দুইধারে কিছু কিছু চুল পাকিয়াছে, প্রশস্ত ললাট রেখায় ভরা, তাহার উপরে কালো কালো ছাপ পড়িয়াছে। যক্ষ্মা রোগীর চোখের মত দৃষ্টি অস্বাভাবিক তীক্ষ্ম এবং তাহারই নীচে শীর্ণ নাকটা যেন খাঁড়ার মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সমস্ত মুখখানা অত্যন্ত ম্লান, তাহারই সঙ্গে মিশিয়া ভিতরের কি একটা অব্যক্ত বেদনা যেন কালিমা ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে।

জীবানন্দ হাত নাড়িয়া অস্ফুট-কণ্ঠে কহিল, তোমার ভয় নেই, কাছে এসো!

ষোড়শী ধীরে ধীরে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া নতনেত্রে নীরবে দাঁড়াইল।

জীবানন্দ কহিল, পুলিশের লোক বাড়ি ঘিরে ফেলেছে—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গেটের মধ্যে ঢুকেছেন—এলেন বলে।

ষোড়শী মনে মনে চমকিয়া উঠিল, কিন্তু কথা কহিল না। জীবানন্দ বলিতে লাগিল, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট টুরে বেরিয়ে ক্রোশখানেক দূরে তাঁবু ফেলেছিলেন, তোমার

বাবা কাল রাত্রেই তাঁর কাছে গিয়ে সমস্ত জানিয়েছেন। কেবল তাতেই এতটা হ'তো না, কে-সাহেবের নিজেরই আমার উপর ভারি রাগ। গত বৎসর দুবার ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি—আজ একেবারে হাতে হাতে ধরে ফেলেছে. বলিয়া সে একটু হাসিল।

এককড়ি মুখ চুন করিয়া পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, কহিল, হুজুর, এবার বোধ হয় আমাদেরও আর রক্ষে নেই।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সম্ভব বটে। ষোড়শীকে কহিল, শোধ নিতে চাও ত এই-ই সময়। আমাকে জেলে দিতেও পারো।

ষোড়শী জবাব দিতে গিয়া মুখ তুলিয়াই দেখিল জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। চোখ নামাইয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, এতে জেল হবে কেন?

জীবানন্দ কহিল, আইন। তা ছাড়া কে-সাহেবের হাতে পড়েচি। বাদুড়বাগানের মেসে থাকতে, এরই কাছে একবার দিন-কুড়ি হাজত-বাসও হয়ে গেছে। কিছুতে জামিন দিলে না—আর জামিন বা তখন হ'তো কে!

ষোড়শী হঠাৎ উৎসুক-কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, আপনি কি কখনো বাদুড়বাগানের মেসে ছিলেন?

জীবানন্দ কহিল, হাঁ। ওই সময়ে একটা প্রণয়কাণ্ডের বৃন্দে হয়েছিলুম—ব্যাটা আয়ান ঘোষ কিছুতেই ছাড়লে না—পুলিশে দিলে। যাক, সে অনেক কথা। কে আমাকে ভোলেনি, বেশ চেনে। আজও পালাতে পারতুম, কিন্তু ব্যথায় শয্যাগত হয়ে পড়েচি, নড়বার জো নেই।

ষোড়শী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কালকের ব্যথাটা কি আপনার সারে নি?

জীবানন্দ কহিল, না, ভয়ানক বেড়েচে। তা ছাড়া এ সারবার ব্যথাও নয়।

ষোড়শী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমাকে কি করতে হবে?

জীবানন্দ কহিল, শুধু বলতে হবে তুমি নিজের ইচ্ছেয় এসেচ, নিজের ইচ্ছেয় এখানে আছো। তার বদলে তোমার সমস্ত দেবোত্তর ছেড়ে দেব, হাজার টাকা নগদ দেব, আর নজরের ত কথাই নেই।

এককড়ি এই কথাগুলারই বোধ হয় প্রতিধ্বনি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু ষোড়শীর মুখের পানে চাহিয়া সহসা থামিয়া গেল। ষোড়শী সোজা জীবানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এ-কথা স্বীকার করার অর্থ বোঝেন? তারপরেও কি আমার জমিতে, টাকা-কড়িতে প্রয়োজন থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

জীবানন্দের মুখখানা প্রথমে ফ্যাকাশে হইল, এবং সেই পাণ্ডুর মুখের তীক্ষ্ণ তীব্র দুটি চক্ষে কোথা হইতে তাহার গত রাত্রির তেমনি মুগ্ধ দৃষ্টি যেন ধীরে ধীরে ফিরিয়া

আসিয়া স্থির হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে একটা কথাও কহিল না, তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়িয়া বলিল, তাই বটে ষোড়শী, তাই বটে! জীবনে আজও ত তুমি পাপ করোনি—ও তুমি পারবে না সত্যি।

একটুখানি হাসিয়া বলিল, টাকা-কড়ির বদলে যে সম্ভ্রম বেচা যায় না—ও যেন আমি ভুলেই গেছি! তাই হোক, যা সত্যি তাই তুমি বলো—জমিদারের তরফ থেকে আর কোন উপদ্রব তোমার ওপর হবে না।

এককড়ি ব্যাকুল হইয়া আবার কি কতকগুলা বলিতে গেল, কিন্তু বাহিরের রুদ্ধ দ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাতের শব্দে এবারেও তাহা বলা হইল না, কেবল তাহার মুখখানাই শাদা হইয়া রহিল।

জীবানন্দ সাড়া দিয়া কহিল, খোলা আছে, ভিতরে আসুন; এবং পরক্ষণেই উন্মুক্ত দরজার সম্মুখে দেখা গেল ছোট-বড় জন-কয়েক পুলিশ-কর্ম্মচারীর পিছনে দাঁড়াইয়া স্বয়ং জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁহারই কাঁধের উপর দিয়া উঁকি মারিতেছে তারাদাস চক্রবর্ত্তী। সে ভিতরে ঢুকিয়াই কাঁদিয়া বলিল, ধর্ম্মাবতার, হুজুর! এই আমার মেয়ে, মা-চণ্ডীর ভৈরবী। আপনার দয়া না হলে আজ ওকে টাকার জন্যে খুন করে ফেলতো ধর্ম্মাবতার।

কে-সাহেব ষোড়শীর আপাদমস্তক পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া পরিষ্কার বাঙলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম ষোড়শী? তোমাকেই বাড়ি থেকে ধরে এনে উনি বন্ধ করে রেখেছেন?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া কহিল, না, আমি নিজের ইচ্ছেয় এসেচি, কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি।

চক্রবর্ত্তী চেঁচামেচি করিয়া উঠিল, না হুজুর, ভয়ানক মিথ্যে কথা! গ্রামসুদ্ধ সাক্ষী আছে। মা আমার ভাত রাঁধছিল, আটজন পাইক গিয়ে মাকে বাড়ি থেকে মারতে মারতে টেনে এনেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট জীবানন্দের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া ষোড়শীকে পুনশ্চ বলিলেন, তোমার কোন ভয় নেই, তুমি সত্যি কথা বল। তোমাকে বাড়ি থেকে ধরে এনেছে?

না, আমি আপনি এসেচি।

এখানে তোমার কি প্রয়োজন?

ষোড়শী শুধু কহিল, আমার কাজ ছিল।

সাহেব একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, সমস্ত রাত্রিই কাজ ছিল?

ষোড়শী তেমনি মাথা নাড়িয়া শান্ত মৃদু-কণ্ঠে বলিল, হাঁ, সমস্ত রাত্রিই আমার কাজ ছিল। ওঁর অসুখ করেছিল বলে বাড়ি ফিরে যেতে পারিনি।

তারাদাস চেঁচাইয়া বলিল, বিশ্বাস করবেন না হুজুর, সমস্ত মিছে, সমস্ত বানানো। আগাগোড়া শিখানো কথা।

সাহেব তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন, এবং শিস্ দিতে দিতে প্রথমে বন্দুকটা তার পরে রিভলভার দুটো বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া জীবানন্দকে কেবল বলিলেন, আশা করি এ-সকল রাখবার আপনার হুকুম আছে। এবং তারপর ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বাহির হইতে তাঁহার গলা শোনা গেল, হামারা ঘোড়া লাও; এবং ক্ষণেক পরেই ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে বুঝা গেল, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাড়ি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

৫

ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল, পুলিশ-কর্ম্মচারীও আপনার অনুচরগণকে স্থানত্যাগের ইঙ্গিত জ্ঞাপন করিলেন—এইবার তারাদাসের নিজের অবস্থাটা তাহার কাছে প্রকট হইয়া উঠিল। এতক্ষণ সে যেন এক মোহাবৃত প্রগাঢ় কুহেলিকার মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ মধ্যাহ্ন-সূর্য্য-কিরণে তাহার বাষ্পটুকু পর্য্যন্ত উবিয়া গিয়া দুঃখের আকাশ একেবারে দিগন্ত ব্যাপিয়া ধু ধু করিতে লাগিল। যতদূর দৃষ্টি যায়, কোথাও ছায়া, কোথাও আশ্রয়, কোথাও লুকাইবার স্থান নাই—কেবল সে আর তাহার মৃত্যু মুখোমুখি দাঁড়াইয়া দাঁত মেলিয়া হাসিতেছে।

সমস্ত জেলার যিনি ভাগ্যবিধাতা, তাঁহার অনুগ্রহ ও অনুকম্পা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ও আশাতীত সুলভে লাভ করিয়া কল্পনা তাহার দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। মনে করিয়াছিল এ কেবল ওই অত্যাচারী মাতালটাকে তাঁহার হাতে ধরাইয়া দেওয়াই নয়, এ তাহার ভাগ্যলক্ষ্মীর অপর্য্যাপ্ত দান। তাঁহার বরহস্তের দশ অঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে আজ যে বস্তু ঝরিয়া পড়িবে, সে শুধু ওই জমিদারগোষ্ঠীর সর্ব্বনাশ নয়, এ তাহার জমিজমা ও টাকা-মোহরের রাশি। তাহার একমাত্র আশঙ্কা ছিল, পাছে তাহারা সময়ে না পৌঁছিতে পারে, পাছে সংবাদ দিয়া কেহ পূর্ব্বাহ্লেই সতর্ক করিয়া দেয়; এবং এ-পক্ষে তাহার চিন্তা, পরিশ্রম ও উদ্যমের অবধি ছিল না। ইহার বিফলতার দণ্ডও সে যে না ভাবিয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু সে নিষ্ফলতা পৌঁছিল যখন এইদিক দিয়া, যোড়শীর স্বহস্তের আঘাতেই যখন কামনার এতবড় পাষাণ-প্রাসাদ ভিত্তি-সমেত ধূলিসাৎ হইয়া গেল, তখন প্রথমটা

তারাদাস মূঢ়ের মত চেঁচামেচি করিল, তার পর হতজ্ঞানের ন্যায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ অভিভূতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অকস্মাৎ এক বুকফাটা ক্রন্দনে উপস্থিত সকলকে সচকিত করিয়া পুলিশ-কর্মচারীর পায়ের নীচে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, বাবুমশাই, আমার কি হবে! আমাকে যে এবার জমিদারের লোক জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে!

ইন্সপেক্টরবাবুটি প্রবীণ গোছের ভদ্রলোক, তিনি শশব্যস্ত হইয়া তাহাকে চেষ্টা করিয়া হাত ধরিয়া তুলিলেন, এবং আশ্বাস দিয়া সদয়-কণ্ঠে বলিলেন, ভয় কি ঠাকুর, তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো গে। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তোমার সহায় রইলেন—আর কেউ তোমাকে জুলুম করবে না। এই বলিয়া তিনি কটাক্ষে একবার জীবানন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

তারাদাস চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, সাহেব যে রাগ করে চলে গেলেন বাবু!

ইন্সপেক্টরবাবু মুচকিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, না ঠাকুর, রাগ করেননি। তবে আজকের এই ঠাট্টাটুকু তিনি সহজে ভুলতে পারবেন বলে মনে হয় না। তা ছাড়া আমরাও মরিনি, থানাও যা হোক একটা আছে। বলিয়া আর একবার জমিদারের শয্যার প্রতি তিনি আড়-চোখে চাহিয়া লইলেন। এই ইঙ্গিতটুকুর অর্থ তাঁহার যাই হোক, জমিদারের তরফ হইতে কিন্তু ইহার কোনরূপ প্রত্যুত্তর আসিল না। একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, এখন চল ঠাকুর, যাওয়া যাক। যেতেও ত হবে অনেকটা।

সাব্-ইন্সপেক্টরবাবুটির বয়স কম, তিনি অল্প একটু হাসিয়া কহিলেন, ঠাকুরটি তবে কি একাই যাবেন না কি?

কথাটায় সবাই হাসিল। যে চৌকিদার দু'জন দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাও হাসিয়া মুখ ফিরাইল। এমন কি এককড়ি পর্য্যন্ত মুখ রাঙা করিয়া কড়ি-কাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

এই কদর্য্য ইঙ্গিতে তারাদাসের চোখের অশ্রু চোখের পলকে অগ্নি-শিখায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। সে ষোড়শীর প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, যেতে হয় আমি একাই যাবো। আবার ওর মুখ দেখব, আবার ওকে বাড়ি ঢুকতে দেবো আপনারা ভেবেচেন!

ইনপেক্টরবাবু সহাস্যে কহিলেন, মুখ তুমি না দেখতে পারো, কেউ মাথার দিব্যি দেবে না ঠাকুর। কিন্তু যার বাড়ি, তাকে বাড়ি ঢুকতে না দিয়ে আবার যেন নতুন ফ্যাসাদে প'ড়ো না।

তারাদাস আস্ফালন করিয়া বলিল, বাড়ি কার? বাড়ি আমার। আমিই ভৈরবী করেছি, আমিই ওকে দূর করে তাড়াবো। কলকাঠি এই তারা চক্কোত্তির

হাতে। এই বলিয়া সে সজোরে নিজের বুক ঠুকিয়া বলিল, নইলে কে ও জানেন? শুনবেন ওর মায়ের—

ইন্‌স্‌পেক্টর থামাইয়া দিয়া কহিলেন, থামো ঠাকুর, থামো। রাগের মাথায় পুলিশের কাছে সব কথা বলে ফেলতে নেই—তাতে বিপদে পড়তে হয়। ষোড়শীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তুমি যেতে চাও ত আমরা তোমাকে নিরাপদে ঘরে পৌঁছে দিতে পারি। চল, আর দেরি ক'রো না।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত ষোড়শী অধোমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল, এইবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

পুলিশের ছোটবাবু মুখ টিপিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যাবার বিলম্ব আছে বুঝি?

ষোড়শী মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু জবাব দিল ইন্সপেক্টরবাবুকে। কহিল, আপনারা যান, আমার যেতে দেরি আছে।

দেরি আছে? হারামজাদী, তোকে যদি না খুন করি ত আমি মনোহর চক্কোত্তির ছেলে নই! এই বলিয়া তারাদাস উন্মাদের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া বোধ হয় তাহাকে যথার্থই কঠিন আঘাত করিত, কিন্তু ইন্সপেক্টরবাবু ধরিয়া ফেলিয়া ধমক দিয়া কহিলেন, ফের যদি বাড়াবাড়ি কর ত তোমাকে থানায় ধরে নিয়ে যাব। চল, ভালমানুষের মত ঘরে চল।

এই বলিয়া তিনি লোকটাকে এক প্রকার টানিয়া লইয়াই গেলেন, কিন্তু তারাদাস তাঁহার হিত কথায় কর্ণপাতও করিল না। যতদূর শোনা গেল, সে সুউচ্চ কণ্ঠে ষোড়শীর মাতার সম্বন্ধে যা-তা বলিতে বলিতে এবং তাহাকে অচিরে হত্যা করিবার কঠিনতম শপথ পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতে করিতে গেল।

পুলিশের সম্পর্কীয় সকলেই যথার্থ বিদায় গ্রহণ করিল, কিংবা কোথাও কেহ লুকাইয়া রহিয়া গেল, এ বিষয়ে নিঃশয় হইতে ধূর্ত্ত এককড়ি পা টিপিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলে, জীবানন্দ ইঙ্গিত করিয়া ষোড়শীকে আর একটু নিকটে আহ্বান করিয়া অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এদের সঙ্গে গেলে না কেন?

ষোড়শী কহিল, এঁদের সঙ্গে ত আমি আসি নি।

জীবানন্দ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিল, তোমার বিষয়ের ছাড় লিখে দিতে দু-চার দিন দেরি হবে, কিন্তু টাকাটা কি তুমি আজই নিয়ে যাবে?

ষোড়শী কহিল, তাই দিন।

জীবানন্দ শয্যার এক নিভৃত প্রদেশে হাত দিয়া একতাড়া নোট টানিয়া বাহির করিল। সেইগুলো গণনা করিতে করিতে ষোড়শীর মুখের প্রতি বার বার চাহিয়া

দেখিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমার কিছুতে লজ্জা করে না, কিন্তু আমারও এগুলো তোমার হাত তুলে দিতে বাধ বাধ ঠেকচে।

ষোড়শী শান্ত-নম্রকণ্ঠে বলিল, কিন্তু তাই ত দেবার কথা ছিল।

জীবানন্দের পাংশু মুখের উপর ক্ষণিকের জন্য লজ্জার আরক্ত আভা ভাসিয়া গেল, কহিল, কথা যাই থাক ষোড়শী, আমাকে বাঁচাতে তুমি যা খোয়ালে তার দাম টাকায় ধার্য্য করচি, এ মনে করার চেয়ে বরঞ্চ আমার না বাঁচাই ছিল ভাল।

ষোড়শী তাহার মুখের উপর দুই চক্ষুর অচপল দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কহিল, কিন্তু মেয়েমানুষের দাম ত আপনি এই দিয়েই চিরদিন ধার্য্য করে এসেছেন।

জীবানন্দ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল!

ষোড়শী কহিল, বেশ, আজ যদি সে মত আপনার বদলে থাকে, টাকা না হয় রেখে দিন, আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। কিন্তু আমাকে কি সত্যিই এখনো চিনতে পারেননি? ভাল করে চেয়ে দেখুন দিকি?

জীবানন্দ নীরবে চাহিয়া রহিল, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার চোখে পলক পর্য্যন্ত পড়িল না। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিল, বোধ হয় পেরেছি। ছেলেবেলায় তোমার নাম অলকা ছিল না?

ষোড়শী হাসিল না; কিন্তু তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, আমার নাম ষোড়শী। ভৈরবীর দশমহাবিদ্যার নাম ছাড়া আর কোন নাম থাকে না। কিন্তু অলকাকে আপনার মনে আছে?

জীবানন্দ নিরুৎসুক-কণ্ঠে বলিল, কিছু কিছু মনে আছে বৈ কি। তোমার মায়ের হোটেলে মাঝে মাঝে খেতে যেতাম, তখন তুমি ছ-সাত বছরের মেয়ে; কিন্তু আমাকে ত তুমি অনায়াসে চিনতে পেরেচ!

এই কণ্ঠস্বর ও তাহার নিগূঢ় অর্থ অনুভব করিয়া ষোড়শী কিছুক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া অবশেষে সহজভাবে বলিল, তার কারণ অলকার বয়স তখন ছ-সাত নয়, ন-দশ বৎসর ছিল, এবং আপনার মনেও হতে পারে, তার মা তাকে আপনার বাহন বলে পরিহাস করতেন। তা ছাড়া, আপনার মুখের আর যত বদলই হোক, ডান চোখের ওই তিলটির কখনো পরিবর্ত্তন হবে না। অলকার মাকে মনে পড়ে?

জীবানন্দ কহিল, পড়ে। তাঁর সম্বন্ধে তারাদাস যা বলতে বলতে গেল তাও বুঝতে পারচি। তিনি বেঁচে আছেন?

না। বছর-দশেক পূর্ব্বে তাঁর কাশীলাভ হয়েচে। আপনাকে তিনি বড় ভালবাসতেন, না?

জীবানন্দের শীর্ণ মুখের উপর এবার উদ্বেগের ছায়া পড়িল, কহিল, হাঁ।

একবার বিপদে পড়ে তাঁর কাছে একশ' টাকা ধার নিয়েছিলাম, সেটা বোধ হয় আর শোধ দেওয়া হয়নি।

সহসা ষোড়শীর ওষ্ঠাধর চাপা হাসিতে ফুলিয়া উঠিল, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ তাহা সংবরণ করিয়া লইয়া সহজভাবে কহিল, আপনি সে জন্যে কোন ক্ষোভ মনে রাখবেন না। অলকার মা সে টাকা ধার ব'লে আপনাকে দেননি, যৌতুক বলেই দিয়েছিলেন। ক্ষণকাল চুপ করিয়া পুনশ্চ কহিল, আজ অপর্য্যাপ্ত সম্পদের দিনে সে-সব দুঃখের কথা হয়ত মনে হতে চাইবে না, হয়ত সেদিনের একশ' টাকার মূল্য আজ হিসেব করাও কঠিন হবে, কিন্তু চেষ্টা করলে এটুকু মনেও পড়তে পারে যে, সে দিনটাও ঠিক এমনি দুর্দ্দিনই ছিল। আজ ষোড়শীর ঋণটাই খুব ভারি বোধ হচ্চে, কিন্তু সেদিন ছোট্ট অলকার কুলটা মায়ের ঋণটাও কম ভারি ছিল না।

জীবানন্দ আহত হইয়া কহিল, তাই মনে করতে পারতাম যদি না তিনি ওই ক'টা টাকার জন্য তাঁর মেয়েকে বিবাহ করতে আমাকে বাধ্য করতেন।

ষোড়শী কহিল, বিবাহ করতে তিনি বাধ্য করেন নি, বরঞ্চ করেছিলেন আপনি। কিন্তু থাক্ ও-সব বিশ্রী আলোচনা। আপনাকে ত এইমাত্র বলেচি, আজ আর সেই তুচ্ছ টাকা ক'টার মূল্য-নিরূপণ সম্ভব হবে না, কিন্তু ওই মাত্র ছিল অলকার মায়ের জীবনের সঞ্চয়। মেয়ের কোন একটা সদ্‌গতি করবার ও-ছাড়া আর কিছু যখন তাঁর হাতে ছিল না, তখন টাকা ক'টির সঙ্গে মেয়েটাকেও আপনারই হাতে দিতে হ'লো। কিন্তু বিবাহ ত আপনি করেন নি, করেছিলেন শুধু একটু তামাশা। সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই যে নিরুদ্দেশ হলেন, এই বোধ হয় তারপরে কাল প্রথম দেখা।

জীবানন্দ কহিল, কিন্তু তারপরে ত তোমার সত্যিকারের বিবাহই হয়েচে শুনেচি।

ষোড়শী ধৈর্য্য হারাইল না। তেমনি শান্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, তার মানে আর একজনের সঙ্গে। এই না? কিন্তু নিরপরাধ নিরুপায় বালিকার ভাগ্যে এ বিড়ম্বনা যদি ঘটেই থাকে, তবু ত আপনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

জীবানন্দ কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, ষোড়শী, তখন তুমি ছেলেমানুষ ছিলে, অনেক কথাই ঠিক জানো না। তোমার মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তিনি সাক্ষী দিতেন, তিনি সত্যি কি চেয়েছিলেন। তোমার বাবাকে আজকের পূর্ব্বে কখনো দেখি নি, কেবল সেই সম্প্রদানের রাত্রে নামটা মাত্র শুনেছিলাম, কিন্তু তিনিই যে তারাদাস, তুমিই যে অলকা, সে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করি নি।

ষোড়শী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, আজও ত কল্পনা করবার প্রয়োজন নেই।

জীবানন্দ কহিল, নাই থাক্, কিন্তু তোমার মা জানতেন শুধু কেবল তোমাকে তোমার বাপের হাত থেকে আলাদা রাখবার জন্যেই তিনি যা হোক একটা—

বিবাহের গণ্ডী টেনে রেখেছিলেন? তা হবেও বা। অলকার মাও বেঁচে নেই, অলকাই আমি কি না তা নিয়েও আপনার দুশ্চিন্তা করার আবশ্যক নেই। কিন্তু কেন যে ওঁদের সঙ্গে গেলুম না, কেন যে নিজের সর্ব্বনাশের কোথাও কিছু বাকি রাখলুম না, সেই কথাটাই আজ আপনাকে বলে যাব। কাল আপনার সন্দেহ হয়েছিল হয়ত বা আমি লেখা-পড়া জানি; লিখতে-পড়তে ত ওই এককড়িও জানে, সে নয়, কিন্তু আমার যিনি গুরু তিনি হাতে রেখে কিছু দান করেন না, তাই আজ তাঁরই পায়ে নিজেকে এমন করে বলি দিতেও আমার বাধল না।

জীবানন্দ কিছুক্ষণ নীরবে নতমুখে থাকিয়া ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিল, কিন্তু ধর, আসল কথা যদি তুমি প্রকাশ করে বল, তা হলে—

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ কহিল, আসল কথাটা কি? বিবাহের কথা? কিন্তু সেই ত মিথ্যে! বিয়ে ত হয়নি। তা ছাড়া, সমস্তা অলকার, আমার নয়। আমি সারা-রাত এখানে কাটিয়ে গিয়ে ও গল্প করলে সর্ব্বনাশের পরিমাণ তাতেএতটুকু কমবে না। কিন্তু ও-কথা ত আর আমি ভাবচিনে। আমার বড় দুঃখ এখন আর আমি নিজে নয়—সে আপনি। কাল ভেবেছিলুম আপনার বুঝি সাহসের আর অন্ত নেই—নিজের প্রাণটাও বুঝি তার কাছে ছোট, কিন্তু আজ দেখতে পেলাম সে ভুল। শুধু যে এক নিরপরাধ নারীর কলঙ্কের মূল্যেই আজ নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন তাই নয়, একদিন যে অনাথ মেয়েটিকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়েই কেবল আত্মরক্ষা করেছিলে, আজ তাকে চেনবার সাহস পর্য্যন্ত আপনার হয় নি।

জীবানন্দ কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, ষোড়শী, আজ আমি এত নীচে নেমে গেছি যে, গৃহস্থের কুল-বধূর দোহাই দিলেও তুমি মনে মনে হাসবে, কিন্তু সেদিন অলকাকে বিবাহ করে বীজগাঁর জমিদার-বংশের বধূ বলে সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটাই কি ভালো কাজ হতো?

ষোড়শী অসঙ্কোচে উত্তর দিল, সে ঠিক জানিনে, কিন্তুসত্য কাজ হ'তো এ জানি। যার সমস্ত দুর্ভাগ্য জেনেও যাকে হাত পেতে নিতে আপনার বাধেনি, তাকে অমন করে ফেলে না পালালে এতবড় লাঞ্ছনা আজ আপনার ভাগ্যে ঘটতো না। সেই সত্যই আজ আপনাকে এ দুর্গতি থেকে বাঁচাতে পারতো। কিন্তু আমি মিথ্যে বকচি, এখন এ সব আর আপনার কাছে বলা নিষ্ফল। আমি চললুম—আপনি কোন-কিছু দেবার চেষ্টা ক'রে আমাকে অপমান করবেন না।

জীবানন্দ কিছুই কহিল না, কিন্তু এককড়িকে দ্বারপ্রান্তে দেখিতে পাইয়া সে হঠাৎ যেন কাঙাল হইয়া বলিয়া উঠিল, এককড়ি, তোমাদের এখানে কোন ডাক্তার

আছেন? একবার খবর দিয়ে আনতে পারো? তিনি যা চাবেন আমি তাই দেব।

ষোড়শী চমকিয়া উঠিল। নিজের অভিমান ও উত্তেজনার মধ্যে দিয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকেই আবদ্ধ ছিল।

এককড়ি কহিল, ডাক্তার আছে বৈ কি হুজুর—আমাদের বল্লভ ডাক্তারের খাসা হাত-যশ। বলিয়া সে সমর্থনের জন্য ভৈরবীর প্রতি চাহিল।

ষোড়শী কথা কহিল না, কিন্তু জীবানন্দ ব্যগ্র-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তাঁকেই আনতে পাঠাও এককড়ি, আর এক মিনিট দেরি ক'রো না। আর ঐখানে সব খালি বোতল পড়ে আছে—কাউকে বলে দাও গরম জল করে আনুক। কোথায় গেল এরা?

এককড়ি কহিল, ঐ কথাটাই ত নিবেদন করতে আসছিলুম হুজুর, পুলিশের ভয়ে কে যে কোথায় সরেচে কাউকে খুঁজে পেলাম না!

কেউ নেই, সব পালিয়েচে?

সব, সব, জনপ্রাণী নেই। ওরা কি আর মানুষ হুজুর! কই, আমি ত—

জীবানন্দ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, ডাক্তার আনা কি হবে না এককড়ি?

এককড়ি বাধা পাইয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া কহিল, হবে না কেন হুজুর, আমি নিজে যাচ্চি, এখনো তিনি ঘরেই আছেন। কিন্তু গরম জল করতে গেলে ত বড় দেরি হয়ে যাবে? তা ছাড়া হুজুরকে একলা -

কিন্তু কথাটা শেষ হইবার সময় হইল না। ভিতরের একটা উচ্ছ্বসিত দুঃসহ বেদনায় জীবানন্দের মুখখানা চক্ষের পলকে বিবর্ণ হইয়া উঠিল, এবং ইহাকেই দমন করিতে সে উপুড় হইয়া পড়িয়া কেবল অস্ফুট-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, উঃ—আর আমি পারি নে!

ষোড়শীকে কিসে যেন কঠিন আঘাত করিল। এত বড় করুণ, হতাশ কণ্ঠস্বরও যে এমন দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে, এ যেন তাহার স্বপ্নাতীত। আসলে মানুষ যে কত দুর্ব্বল, কত নিরুপায়, দুঃখে বেদনায় মানুষে মানুষে যে কত এক, কত আপনার, এই কথাটা মনে করিয়া তাহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া সে হতবুদ্ধি এককড়ির প্রতি চাহিয়া কহিল, তুমি বল্লভ ডাক্তারকে ডেকে আনো গে এককড়ি, এখানে যা করবার আমি করব এখন। পথে কাউকে যদি দেখতে পাও, পাঠিয়ে দিয়ো, ব'লো, পুলিশের ভয় আর কিছু নেই।

এককড়ি আশ্চর্য্য হইল না, বরঞ্চ খুশী হইয়া বলিল, ডাক্তারবাবুকে যেখানে পাই আমি আনবই। কিন্তু রান্নাঘরটা কি আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যাব?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া কহিল, দরকার নেই, আমি নিজেই খুঁজে নিতে পারব। তুমি কিন্তু কোন কারণে কোথাও দেরি ক'রো না।

আজ্ঞে না, আমি যাব আর আসব, বলিতে বলিতে এককড়ি দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

৬

সন্ধান করিয়া রান্নাঘর হইতে যখন ষোড়শী বোতলে জল গরম করিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল, তখনও লোক-জন কেহ ফিরিয়া আসে নাই। জীবানন্দ তেমনি উপুড় হইয়া পড়িয়া। সে পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, তুমি? ডাক্তার আসেনি?

ষোড়শী কহিল, এখনও ত তাদের আসবার সময় হয়নি। বলিয়া সে হাতের বোতল দু'টা শয্যার একধারে রাখিয়া দিল।

জীবানন্দ কথাটাকে ঠিক যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না; কহিল, এখনও আসবার সময় হয় নি? ডাক্তার কতদূরে থাকেন জানো?

ষোড়শী কহিল, জানি, কিন্তু পনের মিনিটের মধ্যেই কি আসা যায়?

জীবানন্দ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সবে পনের মিনিট? আমি ভেবেছি দু'ঘণ্টা তিন ঘণ্টা, কি আরও কতক্ষণ যেন এককড়ি তাঁকে আনতে গেছে। হয়ত তিনিও ভয়ে এখানে আসবেন না অলকা! এই বলিয়া সে চুপ করিয়া আবার উপুড় হইয়া শুইল। তাঁর কণ্ঠস্বরে এবং চোখের দৃষ্টিতে ব্যাকুল নিরাশ্বাসের কোথাও যেন আর শেষ রহিল না।

ষোড়শী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া স্নিগ্ধ-স্বরে কহিল, ডাক্তার আসবেন বৈ কি। গরম জলের বোতল ততক্ষণ টেনে নিন না?

জীবানন্দ তেমনিভাবেই মাথা নাড়িয়া বলিল, না, ও থাক্। ওতে আমার কিছু হয় না, কেবল কষ্ট বাড়ে।

ষোড়শী সহসা কোন প্রতিবাদ করিল না। এই উপায়হীন রোগগ্রস্ত লোকটির মুখ হইতে তাহার নিজের শিশুকালের নামটা এতক্ষণ পরে যেন এই প্রথম তাহার কানে কানে গুন্ গুন্ করিয়া কি একটা অজানা রহস্যের অর্থ বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বোধ হয় ইহাতেই মগ্ন হইয়া সে নিজের ও পরের, সুমুখের ও পশ্চাতের সমস্ত ভুলিয়া গিয়া অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ জীবানন্দের প্রশ্নেই তাহার হুঁস হইল।

অলকা!

নামটাকে আর সে উপেক্ষা করিতে পারিল না। কহিল, আজ্ঞে?

জীবানন্দ বলিল, এখনও সময় হয়নি? হয়ত তিনি আসবেন না, হয়ত কোথাও চলে গেছেন।

ষোড়শী কহিল, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি আসবেন—তিনি কোথাও যাননি।

বাড়িতে কেউ কি এখনও ফিরে আসেনি?

ষোড়শী বলিল, না।

জীবানন্দ একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বোধ হয় তারা আর আসবে না, বোধ হয় এককড়িও একটা ছল ক'রে চ'লে গেল।

ষোড়শী মৌন হইয়া রহিল। জীবানন্দ নিজেও বোধ হয় একটা ব্যথা সামলাইয়া লইয়া একটু পরেই বলিল, সবাই গেছে, তারা যেতে পারে—কেবল তোমারই যাওয়া হবে না।

কেন?

বোধ করি আমি বাঁচব না—তাই। আমার নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্চে, পৃথিবীতে আর বুঝি হাওয়া নেই।

আপনার কি বড্ড কষ্ট হচ্ছে?

হুঁ। অলকা, আমাকে তুমি মাপ কর।

ষোড়শী নির্বাক হইয়া রহিল। জীবানন্দ একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, আমি ঠাকুর-দেবতা মানি নে, দরকারও হয় না; কিন্তু একটু আগেই মনে-মনে ভাবছিলুম। জীবনে অনেক পাপ করেচি, তার আর আদি-অবধি নেই। আজ থেকে থেকে কেবলি মনে হচ্চে বুঝি সব দেনা মাথায় নিয়েই যেতে হবে।

ষোড়শী তেমনি নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। জীবানন্দ কহিল, মানুষ অমরও নয়, মৃত্যুর বয়সও কেউ দাগ দিয়ে রাখে নি, কিন্তু এই যন্ত্রণা আর সইতে পারচি নে—উঃ—মাগো! বলিতে বলিতে তাহার সর্ব্বশরীর ব্যথার অসহ্য তীব্রতায় যেন আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ষোড়শী চাহিয়া দেখিল তাহার কেবল দেহই নয়, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়াছে এবং বিবর্ণ মুখে, দুই নিমীলিত চক্ষের নীচে রক্তহীন ওষ্ঠাধর একটা অত্যন্ত কঠিন রেখায় সংবদ্ধ হইয়া গেছে।

পলকের জন্য কি একটা ভাবিয়া লইল, বোধ হয় একবার একটু দ্বিধাও করিল; তার পরে এই পীড়িতের শয্যায় হতভাগ্যের পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল। গরম জলের বোতল দু'টা সাবধানে তাহার পেটের কাছে টানিয়া দিতে জীবানন্দ কেবল ক্ষণিকের জন্য একবার চোখ মেলিয়াই আবার মুদ্রিত করিল। ষোড়শী আঁচল দিয়া

তাহার ললাটের স্বেদ মুছাইয়া দিল, এবং হাত-পাখার অভাবে সেই অঞ্চলটাই জড় করিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

জীবানন্দ কোন কথা কহিল না, কেবল তাহার ডান হাতটা ধীরে ধীরে তুলিয়া ষোড়শীর ক্রোড়ের উপর রাখিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

মিনিট দশ-পনের এমনি নীরবে কাটিবার পরে জীবানন্দই প্রথমে কথা কহিল। ডাকিল, অলকা!

ষোড়শী কহিল, আপনি আমাকে ষোড়শী বলে ডাকবেন।

আর কি অলকা হতে পারো না?

না।

কোনদিন কোন কারণেই কি—

আপনি অন্য কথা বলুন।

কিন্তু অন্য কথা জীবানন্দের মুখ দিয়া আর বাহির হইল না, শুধু নিবারিত দীর্ঘশ্বাসের শেষ বাতাসটুকু তাহার বক্ষের সম্মুখটাকে ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া দিয়া শূন্যে মিলাইল।

মিনিট দুই-তিন পরে ষোড়শী মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কষ্টটা কিছুই কমে নি?

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বোধ হয় একটু কমেচে। আচ্ছা, যদি বাঁচি, তোমার কি কোন উপকার করতে পারিনে?

ষোড়শী বলিল, না, আমি সন্ন্যাসিনী—আমার নিজের কোনও উপকার করাই কারও সম্ভব নয়।

জীবানন্দ কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, এমন কিছুই কি নেই, যাতে সন্ন্যাসিনীও খুশী হয়?

ষোড়শী কহিল, তা হয়ত আছে, কিন্তু সেজন্য আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন?

জীবানন্দ এইবার একটুখানি ক্ষীণ হাসিয়া কহিল, আমার ঢের দোষ আছে, কিন্তু পরের উপকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, এ দোষ আজও কেউ আমাকে দেয় নি। তা ছাড়া এখন বলেচি বলেই যে ভাল হয়েও বলবো, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই—এমনিই বটে! এমনিই বটে! সারাজীবনে এ ছাড়া আর আমার কিছুই বোধ হয় নেই।

ষোড়শী নীরবে আর একবার তাহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিল। জীবানন্দ হঠাৎ সেই হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, সন্ন্যাসিনীর কি সুখ-দুঃখ নেই? সে খুশী হয়, পৃথিবীতে এমন কি কিছুই নেই?

ষোড়শী বলিল, কিন্তু সে ত আপনার হাতের মধ্যে নয়।

জীবানন্দ বলিল, যা মানুষের হাতের মধ্যে? তেমন কিছু?

ষোড়শী বলিল, তাও আছে, কিন্তু ভাল হয়ে যদি কখনো জিজ্ঞাসা করেন তখনই জানাবো।

তাহার হাতটাকে জীবনন্দ সহসা বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বার বার মাথা নাড়িয়া কহিল, না না, আর ভাল হয়ে নয়—এই কঠিন অসুখের মধ্যে আমাকে বল। মানুষকে অনেক দুঃখ দিয়েচি, আজ নিজের ব্যথার মধ্যে পরের ব্যথা, পরের আশার কথাটা একটু শুনে নিই। নিজের দুঃখটার আজ একটা সদ্গতি হোক।

ষোড়শী আপনার হাতটাকে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া লইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। জীবানন্দ নিজেও মিনিট-খানেক স্থিরভাবে থাকিয়া কহিল, বেশ তাই হোক, সকলের মত আমিও তোমাকে আজ থেকে ষোড়শী বলেই ডাকব। কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত আমি এত যন্ত্রণার মধ্যেও মাঝে মাঝে অনেক কথাই ভেবেচি। বোধ হয় তোমার কথাটাই বেশি। আমি বেঁচে গেলুম, কিন্তু তোমার যে এখানে—

ষোড়শী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমার কথা থাক্।

জীবানন্দ বাধা পাইয়া ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি বুঝেচি ষোড়শী! তোমার জন্যে আমি ভাবি এও আর তুমি চাও না। এমনি হওয়া উচিত বটে! বলিয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ষোড়শী বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দ চোখ মেলিয়া কহিল, তুমিও চললে?

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। ঘরটা ভারি নোংরা হয়ে রয়েচে, একটু পরিষ্কার করে ফেলি। বলিয়া সে সম্মতির জন্য অপেক্ষা না করিয়াই গৃহ-কার্য্যে নিযুক্ত হইল। ঘরের অধিকাংশ জানালা দরজাই এ পর্য্যন্ত খোলা হয় নাই, বিস্তর টানাটানি করিয়া সেগুলো খুলিয়া ফেলিতেই উন্মুক্ত আকাশ দিয়া একমুহূর্ত্তে আলো ও বাতাসে ঘর ভরিয়া গেল; মেঝের উপর আবর্জনার রাশি নানাস্থানে প্রতিদিন স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছিল, একটা ঝাঁটা সন্ধান করিয়া আনিয়া ষোড়শী সমুদয় পরিষ্কার করিয়া ফেলিল, এবং অঞ্চল দিয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বালিশ দু'টা যখন যথাস্থানে গুছাইয়া দিল, তখনও জীবানন্দ একটা কথা কহিল না, কেবল তাঁহার মলিন মুখের উপর একটা স্নিগ্ধ আলোক যেন কোথা হইতে আসিয়া ধীরে ধীরে স্থিতি লাভ করিতেছিল। ষোড়শী কাজ করিতেছিল, সে শুধু দুই চক্ষু মেলিয়া তাহাকে নীরবে অনুসরণ করিতেছিল, যেন শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা কি, সমস্ত বেদনা ভুলিয়া সে সংসারে সর্ব্বোত্তম বিস্ময়ের মত জীবনে এই প্রথম দেখিতেছিল।

সহসা বাহিরে অনেকগুলো পদশব্দ শুনিয়া ষোড়শী ঝাঁটাটা রাখিয়া দিয়া সোজা

হইয়া দাঁড়াইল। এককড়ি দ্বারের কাছে মুখ বাহির করিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু এসেচেন।

ষোড়শী কহিল, তাঁকে নিয়ে এস। বলিয়া সে তাহার পূর্ব্বস্থানে গিয়া উপবেশন করিল।

পরক্ষণেই যে চিকিৎসকের হাত যশ এ অঞ্চলে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, সেই বল্লভ ডাক্তার আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং ষোড়শীকে এখানে এভাবে দেখিয়া তিনি একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

এককড়ি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, ঐ যে হুজুর। যদি ভাল করতে পারেন ডাক্তারবাবু, বক্‌সিসের কথা ছেড়েই দিন—আমরা সবাই আপনার কেনা হয়ে থাকব।

ডাক্তার নীরবে আসিয়া শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, এবং পকেট হইতে কাঠের চোঙাটা বাহির করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে রোগ পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। বিস্তর ঘষা-মাজা করিয়া তিনি বেশ বড় ডাক্তারের মতই রায় দিলেন। বলিলেন, অত্যাচার করিয়া রোগ জন্মিয়াছে, সাবধান না হইলে প্লীহা কিংবা লিভার পাকা অসম্ভব নয়, এবং তাহাতে ভয়ের কথাও আছে; কিন্তু সাবধান হইলে নাও পাকিতে পারে; এবং তাহাতে ভয়ও কম। তবে এ-কথা নিশ্চয় যে ঔষধ খাওয়া আবশ্যক।

জীবানন্দ প্রশ্ন করিল, এ অবস্থায় কলকাতায় যাওয়া সম্ভব কি না বলতে পারেন?

ডাক্তার কহিলেন, যদি যেতে পারেন, তা হ'লে সম্ভব, নইলে কিছুতেই সম্ভব নয়।

জীবানন্দ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, এখানে থাকলে ভাল হবে কিনা বলতে পারেন?

ডাক্তার অত্যন্ত বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া জবাব দিলেন, আজ্ঞে না হুজুর, তা বলতে পারিনে। তবে, এ-কথা নিশ্চয় যে, এখানে থাকলে ভাল হতে পারেন, আবার কলকাতা গিয়ে ভাল নাও হতে পারেন।

জীবানন্দ মনে মনে বিরক্ত হইয়া আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না। ডাক্তার ঔষধের জন্য লোক পাঠাইবার ইঙ্গিত করিয়া উপযুক্ত দর্শনী লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। এককড়ি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দ্বারের বাহির পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গেলে জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কি হবে এককড়ি?

এককড়ি সাহস দিয়া বলিল, ভয় কি হুজুর, ওষুধ এলো বলে। বল্লভ ডাক্তারের একশিশি মিক্সচার খেলেই সব ভাল হয়ে যাবে।

জীবানন্দ মাথা নাড়িয়া বলিল, না এককড়ি, তোমাদের বল্লভের মিক্সচার তোমাদের থাক, আমাকে তুমি কেবল কলকাতা যাবার একটা বন্দোবস্ত আজই

করে দাও। এই বলিয়া সে যে-দ্বার দিয়া ষোড়শী কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে অন্যত্র সরিয়া গিয়াছিল, সেইদিকে উৎসুক-চক্ষে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু কেহই ফিরিয়া আসিল না। মিনিট দুই-তিন পরে তাঁহার অধৈর্য্য আর মানা মানিল না, কহিলেন, ওঁকে একবার ডেকে দিয়ে তুমি যাবার একটা ব্যবস্থা কর গে এককড়ি। আজ যাওয়া আমার চাই-ই।

এ সঙ্কেত এককড়ি চক্ষের নিমিষে বুঝিল, এবং যে আজ্ঞে হুজুর, বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। কিন্তু ফিরিয়া আসিতে তাহার বিলম্ব হইতে লাগিল; এবং মিনিট-পনের বিলম্বে যখন সে যথার্থই আসিল, তখন একাকীই আসিল; কহিল, তিনি নেই, বাড়ি চলে গেছেন হুজুর!

জীবানন্দ বিশ্বাস করিতে পারিল না। ব্যগ্র ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমাকে না জানিয়ে চলে যাবেন? এমন হতেই পারে না এককড়ি।

বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন। অলকা কোন ব্যবস্থা না করিয়াই চলিয়া গেল, একটা কথা বলিয়া গেল না—ডাক্তারের অভিমতটুকু শুনিয়া যাইবার পর্য্যন্ত তাহার ধৈর্য্য রহিল না -এ কথা জীবানন্দ কিছুতেই যেন মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না।

এককড়ি বলিল, হাঁ হুজুর, তিনি ডাক্তারবাবু যাবার পরেই চলে গেছেন। বাইরে গোপাল কাওরা বসে আছে, সে দেখেচে ভৈরবী সোজা চলে গেলেন।

জীবানন্দ আর প্রতিবাদ করিল না। এককড়ি কহিল, তা হলে একটু বেলাবেলি যাত্রা করবার ব্যবস্থা করি গে হুজুর?

হাঁ, তাই কর, বলিয়া জীবানন্দ পাশ ফিরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইল। এককড়ি কলিকাতা-যাত্রার বিস্তর খুঁটিনাটি আলোচনা করিতে লাগিল, কিন্তু প্রভুর নিকট হইতে কোন কথারই প্রত্যুত্তর আসিল না। কথাগুলা তাহার কানেই গেল কি-না, তাহাও বুঝা গেল না।

৭

জমিদারের বিলাস-কুঞ্জ হইতে ষোড়শী যখন নিঃশব্দে সরিয়া গেল, তখন বেলা বোধ হয় ন'টা-দশটা। এমনি করিয়া চলিয়া আসাটা তাহার বিশ্রী ঠেকিতে লাগিল, কিন্তু তখনই মনে হইল, বলিয়া কহিয়া বিদায় লইয়া আসাটা আরও অশোভন, আরও বাড়াবাড়ি হইত। কিন্তু গেটের বাইরে আসিয়া দেখিল, আর এক পদও অগ্রসর হওয়া চলে না। এবার নাবী বর্ষায় কৃষকদের ধান্য-রোপণের কাজ-কর্ম্ম

তখনও মাঠে শেষ হইয়া যায় নাই, উহাদের মাঝখান দিয়া গ্রামের একমাত্র পথ। এই প্রকাশ্য দিনের বেলায় এই পথের উপর দিয়া মুখ উঁচু বা নীচু করিয়া কোনভাবেই হাঁটিয়া যাইতে তাহার পা উঠিল না। আকাশের বিদ্যুৎ একমুহূর্ত্তে অন্ধকারের পর্দ্দা তুলিয়া মেঘাচ্ছন্ন পৃথিবীর বক্ষটাকে যেমন সুস্পষ্ট করিয়া দেয়, দূরের ঐ চাষীগুলাও ঠিক তেমনি করিয়া চক্ষের পলকে ষোড়শীর বিগত রাত্রিটাকে তাহার কাছে অত্যন্ত অনাবৃত করিয়া দিল। আবরণের নীচে যে এত জিনিস ঢাকা ছিল, কোন মানুষের জীবনেই যে একটা রাত্রির মধ্যে এত বড় ব্যাপার ঘটিয়া উঠিতে পারে, দেখিতে পাইয়া সে ক্ষণিকের জন্য যেন হতজ্ঞান হইয়া রহিল। সম্পূর্ণ একটা দিনও কাটে নাই, মাত্র কাল সায়াহ্ন বেলায় অপমানের প্রবল তাড়নে দিগ্বিদিক্ না ভাবিয়া এই পথ দিয়াই সে হাঁটিয়া গেছে, কিন্তু তাহার পরে? তাহার পরের ঘটনা ঘটিতে মানুষের বহু যুগ লাগিতে পারে, অথচ তাহার লাগে নাই। এ-যেন একটা ভোজ-বাজী হইয়া গেল, তাই আজ পরিচিত পথটারই ও-ধারে তাহার জন্য কি যে অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহা কল্পনা করিতেও পারিল না। ফটকের বাহিরে বাগানের ধার দিয়া একটা পায়ে-হাঁটা পথ নদীর দিকে গিয়াছে, কেবলমাত্র সম্মুখের রাস্তাটা বলিয়াই সে এই পথ দিয়া ধীরে ধীরে নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। এ দিকে গ্রাম নাই, গরু-ছাগল চরাইতে ক্বচিৎ কোন রাখাল ভিন্ন এ পথে সচরাচর কেহ চলে না—এই নিরালা স্থানটায় সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করিয়া সে অন্ধকারে গা ঢাকিয়া ঘরে ফিরিবে মনে করিয়া একটা প্রাচীন তেঁতুলগাছের তলায় বসিয়া পড়িল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াছিল, তাহাতে বর্ত্তমানের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই তার মনে ছিল না। এইবার যে ভবিষ্যৎ সাগ্রহে তাহার পথ চাহিয়া আছে, তাহার কথাই একটি একটি করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে লাগিল। তাহাদের ছোট গ্রামে এতক্ষণ কোন কথাই কাহারো অবিদিত নাই; জমিদার তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে, সারারাত্রি আটক রাখিয়াছে—এই কয়দিনের অত্যাচারে গ্রামে ইহা এমনিই একটা সাধারণ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে যে, এজন্য বিশেষ কোনরূপ চিন্তিত হইবার আবশ্যক নাই। এমন কি, কেন যে সে মিথ্যা করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের কবল হইতে জমিদারকে উদ্ধার করিয়াছে, এ রহস্যোদ্ভেদ করিবারও গ্রামে বুদ্ধিমান লোকের অভাব হইবে না। এ যে একটা বড় রকমের ঘুষের ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিবে। কিন্তু আসল বিপদ হইতেছে তাহার পিতা তারাদাসকে লইয়া। বহুকাল হইতেই উভয়ের সহজ সম্বন্ধটা বাহিরের অগোচরে ভিতরে ভিতরে পচিয়া উঠিতেছিল, এইবার তাহা ঘৃণার বাষ্পে অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া জ্বলিতে থাকিবে। ইহার শিখা কাহারও দৃষ্টি হইতে আড়াল করা সম্ভব

হইবে না। সংসারে সে লোকটার অসাধ্য কার্য্য নাই। তাহার অনেক কুকর্ম্মে বাধা দিয়া পিতা ও কন্যার মধ্যে অনেক গোপন সংগ্রাম হইয়া গেছে, চিরদিন পিতাকেই পরাভব মানিতে হইয়াছে, অথচ, নানা কারণে এতকাল তাহাকে ষোড়শীর মাতার সম্বন্ধে মৌন থাকিতেই হইয়াছে। কিন্তু আজ যখন তারাদাস ক্রোধবশে একবার কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, তখন আর সে কোনমতেই চুপ করিয়া থাকিবে না। এই কলঙ্কের কালি দুই হাতে ছড়াইয়া নিজের সঙ্গে আর একজনের সর্ব্বনাশ করিয়া তবে গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে। ইহা যে অকিঞ্চিৎকর নয়, ইহা যে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎটাকে আঁধার করিয়া তুলিবে, তাহাও ষোড়শী দূর হইতে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল; কিন্তু সেই অন্ধকারের অভ্যন্তরে যে কি সঞ্চিত আছে, তাহার কোন আভাসই তাহার চোখে পড়িল না। বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, এইখানে বসিয়া ভিতরের উদ্যোগ-আয়োজনের অস্পষ্ট কোলাহল মাঝে মাঝে তাহার কানে আসিতে লাগিল, এবং তাহারই ফাঁকে ফাঁকে জীবানন্দের মুখের অলকা নাম, তাহার সলজ্জ ক্ষমাভিক্ষা, তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা, এমনি কত-কি যেন একটা ভুলে-যাওয়া কবিতার ভাঙা-চোরা চরণের মত রহিয়া রহিয়া তাহার মনের মধ্যে অকারণে আনাগোনা করিতে লাগিল; অথচ যে সঙ্কট ওই গ্রামখানার মধ্যে তাহারই প্রতীক্ষায় উদ্যত হইয়া আছে, তাহার বিভীষিকা সেই মনের মধ্যেই অনুক্ষণ তেমনি ভীষণ হইয়াই রহিল।

ক্রমশঃ, ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব অপর প্রান্তে হেলিয়া পড়িলেন, এবং তাহারই একটা দীপ্ত রশ্মি হইতে মুখ ফিরাইতে গিয়া হঠাৎ বহুদূরে পরপারের মাঠের মধ্যে জমিদারের পালকিখানা তাহার চোখে পড়িল। এই দিকেই যখন তাহারা গিয়াছে, তখন এক সময়ে নিকট দিয়াই গিয়াছে, সে খেয়াল করে নাই, হয়ত চেষ্টা করিলে একটু দেখা যাইতেও পারিত, কিন্তু এখন অজ্ঞাতসারে শুধু কেবল তাহার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

অপরাহ্ণ সায়াহ্নে এবং সায়াহ্ন সন্ধ্যায় অবসান হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। ষোড়শী গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখনও মানুষ চেনা যায়, কিন্তু মাঠে লোক ছিল না। এবং এই নির্জ্জন পথটা অতিক্রম করিয়া যখন নিজের গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছে। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না হইলেও তাহার মনের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল, কিন্তু সদর দরজায় তালা বন্ধ দেখিয়া সে যেন একটা কঠিন দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ঘুরিয়া খিড়কির দ্বারে গিয়া দেখিল ভিতর হইতে তাহা আবদ্ধ; ইহাই সে প্রত্যাশা করিয়াছিল। কিন্তু কবাটটা সে বাহির হইতে খুলিবার কৌশল জানিত। অনতিবিলম্বে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল

ঘরে ঘরে তালা বন্ধ, কেহ কোথাও নাই—সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার, শূন্য খাঁ খাঁ করিতেছে।

সন্ন্যাসিনীকে অনেক উপবাস করিতে হয়, খাওয়ার কথা তাহার মনেও ছিল না; কোথাও নিরালায় একটু শুইতে পাইলেই সে আপাততঃ বাঁচিয়া যাইত, কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার যখন উপায় নাই, তখন বারান্দার উপরেই একধারে সে নিজের অঞ্চলটা পাতিয়া শুইয়া পড়িল। তারাদাস গৃহে নাই, কেন নাই, কি জন্য নাই, কোথায় গিয়াছে, এই সকল কূট প্রশ্নমালা হইতে তাহার নিরতিশয় শ্রান্ত দেহ-মন অত্যন্ত সহজেই সরিয়া দাঁড়াইল। এবং রাত্রিটার মত যে সে নিরুপদ্রবে ঘুমাইতে পাইবে, এই তৃপ্তিটুকু লইয়াই সে দেখিতে দেখিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

ভোরবেলায় ষোড়শীর যখন ঘুম ভাঙিল তাহার অব্যবহিত পরেই সদর দরজায় চাবি খোলার শব্দ হইল, এবং যে বিধবা স্ত্রীলোকটি মন্দিরের ও গৃহের কাজ-কর্ম্ম করে সে আসিয়া প্রবেশ করিল। ষোড়শীকে দেখিয়া সে অধিক বিস্মিত হইল না, কহিল, কখন এলে মা, রাত্তিরেই? খিড়কির দোর খুলে ঢুকেছিলে বুঝি?

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলে সে বলিল, এই কথাই সকলে বলাবলি করছিল মা, রাজাবাবু ত অ-বেলায় চলে গেল, এইবার তোমাকে ছেড়ে দেবে। খাওয়া-দাওয়া হয়নি বুঝি? কি করব মা, ঘরের চাবি বাবাঠাকুর ত রেখে যায়নি, সঙ্গে নে গেছে। তা হোক গে, দোকান থেকে চাল-ডাল এনে দি, কাঠ-কুটো দুটো যোগাড় করে দি চান করে এসে যা হোক দু-মুঠো ফুটিয়ে নিয়ে মুখে দাও। তার পরে যা হবার তা হবে।

ষোড়শী জিজ্ঞাসা করিল, বাবা কোথায় গেছে জানিস্ রাণীর মা?

রাণীর মা কহিল, শুনেচি ত মা, কে নাকি তার বোনের মেয়ে আছে, তাকেই আনতে গেছে—এলো বলে। আজ বড়কর্ত্তাবাবুর নাতির মানত পূজো, আজ কি আর কোথাও থাকবার জো আছে? মন্দিরে ত পহর-রাত থাকতে ধুম লেগে গেছে মা।

ষোড়শীর দপ্ করিয়া মনে পড়িল, আজ মঙ্গলবার, আজ জনার্দ্দন রায়ের দৌহিত্রের মানত-পূজা উপলক্ষ্যে জয়চণ্ডীর মন্দিরে তুমুল কাণ্ড। আজ কোনমতে কোথাও তাহার লুকাইয়া থাকিবার পথ নাই। সে দেবীর ভৈরবী, এতবড় ব্যাপারে তাহাকে হাজির হইতেই হইবে।

এইখানে জনার্দ্দন রায়ের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। লোকটি যেমন ধনী, তেমনি ভীষণ। একবার একজন প্রজার বেগার দেওয়ার উপলক্ষে ষোড়শীর সহিত ইঁহার অত্যন্ত মনোমালিন্য ঘটে, যে-কথা কোন পক্ষই আজও বিস্মৃত হয় নাই। এব কেবল ষোড়শীই নয়, এ অঞ্চলের সকলেই ইঁহাকে অত্যন্ত ভয়

করে। দার ইহাকে খাতির করে, এককড়ি ইহার হাত-ধরা; অনাদায়ী বৎসরে ইনিই জমিদারের সদর খাজনার যোগান দেন। দুই শত বিঘা ইহার নিজ চাষ, এবং ধান-চা:ল-গুড় হইতে তেজারতী ও বন্ধকী কারবার ইহার একচেটে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ, এই বড়কর্ত্তাই একদিন অতি নিঃস্ব ছিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, এ সমস্তই তাঁহার মধ্যম জামাতা মিস্টার বসুর টাকা। তিনি পশ্চিমের কোন একটা হাইকোর্টের বড় ব্যারিস্টার। বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতিতে উঠিয়াছেন। আজ তাঁহারই একমাত্র পুত্রের সর্ব্ববিধ মঙ্গল-কামনায় চণ্ডীর পূজার আয়োজন হইতেছে। এবং আয়োজন কেবল আজ নয়, মাসাধিক কাল হইতেই গ্রামের মধ্যে ইহার কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। বড়কর্ত্তার যে মেয়েটি এত বড় ঘরে পড়িয়াছে, সেই হৈমবতীকে ষোড়শী ছেলেবেলায় চিনিত। তাহার চেয়ে বয়সে সামান্য কিছু ছোটই হইবে। মন্দির-প্রাঙ্গণে যে ছোট পাঠশালাটি এখনও বসে, সকলের সঙ্গে সেও পড়িতে আসিত; এবং খেলাচ্ছলে যদি কোনদিন ষোড়শী উপস্থিত হইত, দেবীর ভৈরবী বলিয়া সকলের সঙ্গে সেও প্রণাম করিয়া পদধূলি লইত। আজ সে বড় ঘরের ঘরণী। আজ হয়ত তাহার দেহে সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের মণিমাণিক্য ধরে না, আজ হয়ত সে তাহাকে চিনতেও পারিবে না; কিন্তু একদিন এমন ছিল না। সেদিন তাহার রূপ এবং বয়স কোনটাই বেশি ছিল না; তবু যে সে এতবড় ঘরে পড়িয়াছে, শুনা যায়, সে কেবল এই দেবীর মাহাত্ম্যে। কোন এক অমাবস্যায় নাকি এক সিদ্ধ তান্ত্রিক দেবী-দর্শনে আসিয়াছিলেন; রায় মহাশয় গোপনে এই কন্যার কল্যাণেই কি সব যাগ-যজ্ঞ করাইয়া লইয়াছিলেন। এই পুত্রটিও নাকি তাঁহারই করুণায়। হতাশ হইয়া হৈম বিদেশে এই দেবীকেই মানত করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছে।

দাসী কাজ করিতে করিতে কহিল, মা, মন্দিরে আজ হঠাৎ কখন ডাক পড়ে বলা যায় না, এই বেলা কেন চানটানগুলো সেরে নিলে না?

ষোড়শী অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল, মন্দিরের ডাক-পড়ার নামে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু সেজন্য না হোক, বেলা বাড়িবার পূর্ব্বেই নিভৃতে স্নান করিয়া আসাই ভাল মনে করিয়া সে কালবিলম্ব না করিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া পুষ্করিণীতে চলিয়া গেল। এই পুকুরটায় পাড়ার কেহ বড় একটা আসে না, তাই সেখানে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। ফিরিয়া আসিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িবার দ্বিতীয় বস্ত্র নাই, গা-মাথা মুছিবার একটা গামছা পর্য্যন্ত বাহিরে নাই। রাণীর মা লক্ষ্য করিয়া ক্ষুণ্ন হইল। সে তারা-দাসকে দেখিতে পারিত না, রাগ করিয়া কহিল, বিট্‌লে খড়কুটোটি পর্য্যন্ত তালাবন্ধ করে গেছে—আমার একখানি কাচা মটকার কাপড় আছে মা, নে আসবো? তাতে ত দোষ নেই?

ষোড়শী কহিল, না থাক্।

ভিজে কাপড় গায়ে শুখোবে মা, অসুখ করবে যে ?

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল। দাসী তাহার শুষ্ক মুখের প্রতি চাহিয়া ব্যথার সহিত বলিল, কদ্দিন যে উপোস করচ মা, তা কে জানে ! মেলেচ্ছ ব্যাটাদের ঘরে যে তুমি জলটুকু ছোঁবে না তা আমি বেশ জানি। এইবেলা দুটো চাল-ডাল দোকান থেকে না হোক, আমার বাড়ি থেকে এনে রেখে যাইনে মা ?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া শুধু কহিল, না, ও সব এখন থাক্ রাণীর মা।

এই দাসীটি কায়স্থের মেয়ে· তাহার বোধ-শোধ ছিল, এ লইয়া আর নিষ্ফল পীড়াপীড়ি করিল না। কাজ-কর্ম্ম শেষ করিয়া, যাইবার সময় প্রশ্ন করিল, বাবা-ঠাকুরকে মন্দিরে দেখতে পেলে কি একবার আড়ালে ডেকে পাঠিয়ে দেব ?

ষোড়শী কহিল, থাক্, তার আবশ্যক নেই।

দাসী কহিল, তালা দেবার দরকার নেই, দোরটা তুমি ভেতর থেকেই বন্ধ করে দাও। কিন্তু, আচ্ছা মা, কেউ যদি কোন কথা জিজ্ঞেসা করে ত কি—

ষোড়শী ক্ষণকাল মাত্র চুপ করিয়া রহিল, তাহার পরে মুখ তুলিয়া কহিল, হাঁ ব'লো আমি বাড়িতেই আছি। এবং রাণীর মা চলিয়া গেলে সে দ্বার আর রুদ্ধ হইল না, তেমনি উন্মুক্তই রহিল। সুমুখের বারান্দার উপরে নিঃশব্দে নত-মুখে বসিয়া ঘণ্টা দুই-তিন যে কেমন করিয়া কোথা দিয়া চলিয়া গেল, ষোড়শী জানিতেও পারে নাই ; কেবল একটা নির্দ্দিষ্ট বেদনার মত তাহার মনের মধ্যে এই ভাবটা ছিল যে, এইবার তাহার একটা অত্যন্ত কঠোর দুঃসময় আসিতেছে। পরীক্ষাচ্ছলে একটা অতিশয় কদর্য্য আন্দোলন এইবার গ্রামের মধ্যে উত্তাল হইয়া উঠিবে। অথচ যুদ্ধের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য আজ তাহার মন কিছুতেই বদ্ধপরিকর হইতে চাহিল না, বরঞ্চ সে যেন কেবলি তাহার কানে কানে এই কথাই কহিতে লাগিল, তুমি সন্ন্যাসিনী, এই সকল কথার বড় কথাটা আজ তোমার মনে রাখিতে হইবে। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, একদিন যে তোমার এই দেহটা দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হইয়াছিল, এই সকল সত্যের বড় সত্যটা আজ তোমার কিছুতেই অস্বীকার করিলে চলিবে না। তোমাকে পণ রাখিয়া মিথ্যার বাজী যাহারা দেখিতেছিল, মরুক না তাহারা মারা-মারি কাটা-কাটি করিয়া, তুমি এইবার মুক্তি লইয়া বাঁচো।

ঠিক এমনি সময়ে দ্বার খুলিয়া মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, মা, এঁরা একবার তোমাকে ডাকচেন।

চল, বলিয়া ষোড়শী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। কেন, কোথায় বা কাহারা ডাকিতেছেন, প্রশ্নমাত্র করিল না, যেন এইজন্যই সে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিল।

তাহার উদ্যত বিপদ সম্বন্ধে পুরোহিত বেচারার বোধ হয় কিছু আভাস দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভৈরবীর মুখের প্রতি চাহিয়া তাহার কোন কথাই মুখে আসিল না।

আজ মন্দির-প্রাঙ্গণের দ্বার খোলা। প্রবেশ করিতেই দেখিতে পাইল ও-ধারের দেয়ালের গায়ে গোটা-দুই কালো রঙের পাঁঠা বাঁধা আছে, এবং বারান্দার এক প্রান্তে পূজার উপকরণ ভারে ভারে স্তূপাকার করা হইয়াছে। তথায় পাঁচ-ছয়জন বর্ষীয়সী রমণী বাক্যে এবং কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আছেন, এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড কলরব উঠিয়াছে প্রাঙ্গণের নাট-মন্দিরের মধ্যে। সেখানে রায় মহাশয়ের সুদৃশ্য এবং প্রশস্ত সতরঞ্চ বিছানো রহিয়াছে, এবং তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া গ্রামের প্রবীণের দল যথাযোগ্য মর্য্যাদায় আসীন হইয়া সম্ভবতঃ বিচার করিতেছে এবং তাহা ষোড়শীকে লইয়া। এতক্ষণ কে শুনিতেছিল বলা যায় না, অথচ, আশ্চর্য্য এই যে, যাহার শোনা সবচেয়ে প্রয়োজন, সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই এই শতকণ্ঠের উদ্দাম বক্তৃতা একেবারে পলকে নিবিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কোন পক্ষ হইতেই কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল না। পুরুষেরা সকলেই ষোড়শীর পরিচিত, এবং মেয়েরাও যাহারা কাজ ফেলিয়া একে একে থামের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল তাহারও তাহার অপরিচিত নয়, কেবল যে মেয়েটি সকলের পরে মন্দিরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া ঠিক তাহার সম্মুখের জোড়া থামটা আশ্রয় করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, সে অচেনা হইলেও ষোড়শী একমুহূর্ত্তে বুঝিল, এই হৈমবতী। এই মেয়েটি তাহার স্বামী-গৃহ ছাড়িয়া বহুকাল যাবৎ বাপের বাড়ি আসিতে পারে নাই; তাই তাহার সম্বন্ধে জনশ্রুতিও এই বাপের বাড়ির দেশে উত্তরোত্তর বিবিধ হইয়াই উঠিতেছিল। সে অখাদ্য খানা খায়, ঘাগ্‌রা এবং জুতা-মোজা পরে, রাস্তায় পুরুষদের হাত ধরিয়া বেড়ায়, সে একেবারে খ্রীষ্টান মেমসাহেব হইয়া গেছে—এমনি কত কি। আজ কিন্তু ষোড়শী তাহার কিছুই দেখিতে পাইল না। পরণে একখানি মূল্যবান বেনারসী শাড়ী এবং গায়ে দু-একখানা দামী অলঙ্কার ব্যতীত জুতা-মোজা-ঘাগ্‌রার কিছুই ছিল না। বরঞ্চ সিঁথির সিঁদূর এবং পায়ের আলতা বেশ মোটা করিয়াই দেওয়া, দেখিলে কোনমতেই মনে হয় না এ-সকল সে বিশেষ করিয়া কেবল আজকার জন্যই ধারণ করিয়া আসিয়াছে। সে সুন্দরী সত্য, কিন্তু অসাধারণ নয়। দেহের রঙটা হয়ত একটু ময়লার দিকেই, তবে ধনী-ঘরের মেয়েরা যেমন নিরন্তর মাজিয়া-ঘষিয়া বর্ণটাকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে ইহারও তেমনি—তাহার অধিক নয়। নিমিষের দৃষ্টিপাতেই ষোড়শীর মনে হইল এই ধনী-গৃহিণী ধনের আড়ম্বরেও যেমন তাহার দেহকে বস্ত্রালঙ্কারের দোকান করিয়া সাজায় নাই, লজ্জা এবং নির্লজ্জতা কোনটার বাড়াবাড়িতেও তেমনি তাহার শিশুকালের গ্রামখানিকে

বিড়ম্বিত করিয়া তোলে নাই। মেয়েটি নীরবে চাহিয়া রহিল, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত এমনি নীরবেই রহিবে, কিন্তু ইহারই সম্মুখে নিজের আসন্ন দুর্গতির আশঙ্কায় ষোড়শীর লজ্জায় ঘাড় হেঁট হইয়া গেল।

আরও মিনিট দুই তিন নিঃশব্দে কাটিয়া গেলে বৃদ্ধ সর্ব্বেশ্বর শিরোমণি প্রথমে কথা কহিলেন, ষোড়শীকে উদ্দেশ করিয়া অতিশয় সাধুভাষায় তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, আজ হৈমবতী তাঁর পুত্রের কল্যাণে যে পূজা দিতেছেন তাতে তোমার কোন অধিকার থাকবে না, তাঁর এই সঙ্কল্প তিনি আমাদের জানিয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা তোমাকে দিয়ে তাঁর কার্য্য সুসিদ্ধ হবে না।

ষোড়শীর মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়াছিল, কিন্তু তাহার গলায় জড়িমা ছিল না। কহিল, বেশ, তাঁর কাজ যাতে সুসিদ্ধ হয় তিনি তাই করুন।

তাহার এই কণ্ঠস্বরের সুস্পষ্টতায় সর্ব্বেশ্বর শিরোমণি নিজের গলাতেও যেন জোর পাইলেন; বলিলেন, কেবল এইটুকুই ত নয়! আমরা গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী আজ স্থির-সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েচি যে, দেবীর কাজ আর তোমাকে দিয়ে হবে না। মায়ের ভৈরবী তোমাকে রাখলে আর চলবে না। কে আছ, একবার তারাদাস ঠাকুরকে ডাক ত?

একজন তাহাকে ডাকিতে গেল। ষোড়শীর মুখে যে প্রত্যুত্তর আসিয়াছিল, তাহার পিতার নামে সেইখানেই তাহা বাধিয়া গেল, সে মুখ তুলিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, কেন চলবে না? কিন্তু বলিয়া ফেলিয়া সে নিজেই যেন চমকিয়া গেল।

ভিড়ের মধ্য হইতে কে একজন কহিল, সে তোমার বাবার মুখেই শুনতে পাবে।

ষোড়শী এ-কথার আর কোন উত্তর দিল না, চাহিয়া দেখিল, তাহার পিতা কে-একটি বছর দশেকের মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আসিতেছে, এবং তাহাদের পশ্চাতে আর একটি বয়স্থা স্ত্রীলোক সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। ইহাদের কাহাকেও ষোড়শী পূর্ব্বে দেখে নাই, তথাপি বুঝিল উনিই পিসি এবং এই মেয়েটিই সেই অচেনা পিসির কন্যা।

এ সমস্তই যে রায় মহাশয়ের কৃপায়, তাহা ভিতরে ভিতরে সকলেই জানিত, ষোড়শীরও অজানিত নয়। রায় মহাশয় নীরব থাকিলেও তাঁহার চোখের উৎসাহ পাইয়াও তারাদাস প্রথম কথা কহিতে পারিল না, পরে জড়াইয়া জড়াইয়া যাহা কহিল. তাহারও অধিকাংশ স্পষ্ট হইল না, কেবল একটা কাজের কথা বুঝা গেল যে, জেলার ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং ইহাকে সেবায়েত হইতে অপসারিত না করিলে ভাল হইবে না।

ইহাই যথেষ্ট। একটা কলরব উঠিল, অনেকেই রায় দিলেন যে এতবড় গুরুতর ব্যাপারে কাহারও কোন আপত্তি খাটিতে পারে না। পারে না তাহা ঠিক। যাঁহারা

চুপ করিয়া রহিলেন তাঁহারাও এই সত্যটাই মানিয়া লইলেন। কারণ, কেন পারে না, এমন প্রশ্ন করিবার মত দুঃসাহস কাহারও ছিল না। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, ঠিক তাহাই ঘটিল। কোলাহল থামিলে শিরোমণি এই নিষ্পত্তিটিই বোধ হয় আর একটু ফলাও করিতে যাইতেছিলেন, সহসা একটি মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বাবা?

সবাই মুখ তুলিয়া চাহিল। রায় মহাশয় নিজের মুখ তুলিয়া এ-দিকে ও-দিকে চাহিয়া পরিশেষে কন্যার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া সস্নেহে সাড়া দিলেন, কেন মা?

হৈম মুখখানি আরও একটু বাড়াইয়া কহিল, আচ্ছা বাবা, সাহেব যে রাগ করেচেন, এ কি ক'রে জানা গেল?

বড়কর্ত্তা প্রথমে একটু বিস্মিত হইলেন, তারপরে বলিলেন, জানা গেছে বই কি মা! বেশ ভাল করেই জানা গেছে। বলিয়া তিনি তারাদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

হৈম পিতার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কহিল, পরশু থেকে ত সমস্তই শুনচি বাবা, তাকে কি ওঁর কথাটাই সত্যি বলে মেনে নিতে হবে?

রায় মহাশয় ইহার ঠিক জবাবটা খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু বলিলেন, নয়ই বা কেন শুনি?

হৈম তারাদাসের পুরোবর্ত্তী সেই ছোট মেয়েটাকে দেখাইয়া বলিল, ঐটিকে যখন যোগাড় করে এনেচেন, তখন মিথ্যে বলা কি এতই অসম্ভব বাবা? তা ছাড়া সত্য-মিথ্যে ত যাচাই করতে হয়, এ-ত এক-তরফা রায় দেওয়া চলে না।

কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইল, এমন কি, ষোড়শী পর্য্যন্ত বিস্মিত-চক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। ইহার উত্তর দিলেন সর্ব্বেশ্বর শিরোমণি। তিনি স্মিতহাস্যে মুখখানি সরস করিয়া কহিলেন, বেটি কৌঁসুলির গিন্নী কিনা, তাই জেরা ধরেচে। আচ্ছা, আমি দিচ্চি থামিয়ে। বলিয়া তিনি হৈমর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, এটা দেবীর মন্দির—পীঠস্থান! বলি, এটা ত মানিস?

হৈম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মানি বৈ কি।

শিরোমণি বলিলেন, তা যদি হয়, তা হলে তারাদাস বামুনের ছেলে হয়ে কি দেবমন্দিরে দাঁড়িয়ে মিছে কথা কইচে পাগলী? বলিয়া তিনি প্রবল হাস্যে সমস্ত স্থানটা গরম করিয়া তুলিলেন।

তাঁহার হাসির বেগ মন্দীভূত হইলে হৈম কহিল, আপনি নিজেও ত তাই শিরোমণি জ্যাঠামশাই! অথচ এই দেবমন্দিরে দাঁড়িয়েই ত মিছে-কথার বৃষ্টি করে গেলেন। আমি বলেচি ওঁকে দিয়ে পুজো করালে আমার কাজ সিদ্ধ হবে না, এর বিন্দু বিসর্গও ত সত্যি নয়!

শিরোমণি হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন; রায় মহাশয় মনে মনে অত্যন্ত কুপিত হইয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিলেন, কে তোমাকে বললে হৈম, সত্যি নয়, শুনি?

হৈম একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমিই বলচি, সত্যি নয় বাবা! তার কারণ আমি কখনো অমন কথা বলা ত দূরে, মনেও করিনে। আমি ওঁকে দিয়েই পূজো করাবো। এতে আমার ছেলের কল্যাণই হোক আর অকল্যাণই হোক। ষোড়শীর প্রতি চাহিয়া বলিল, আপনি হয়ত আমাকে চিনতে পারচেন না, কিন্তু আমার আপনাকে তেমনি মনে আছে। চলুন মন্দিরে, আমাদের সময় বয়ে যাচ্চে। এই বলিয়া সে এক পদ অগ্রসর হইয়া বোধ হয় তাহার কাছেই যাইতেছিল, কিন্তু নিজের মেয়ের কাছে অপমানের এই নিদারুণ আঘাতে পিতা ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিলেন; তিনি অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীষণ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, কখনো না। আমি বেঁচে থাকতে ওকে কিছুতেই মন্দিরে ঢুকতে দেব না। তারাদাস, বল তো ওর মায়ের কথাটা! একবার শুনুক সবাই। ভেবেছিলাম ওটা আর তুলতে হবে না, সহজেই হবে।

শিরোমণি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, না, তারাদাস, থাক্। ওর কথা আপনার মেয়ে হয়ত বিশ্বাস করবে না রায়মশাই! ও ই বলুক। চণ্ডীর দিকে মুখ করে ও-ই নিজের মায়ের কথা নিজেই বলে যাক। কি বলেন চৌধুরীমশাই? তুমি কি বল হে যোগেন ভট্‌চার্য? কেমন, ও-ই নিজেই বলুক।

গ্রামের এই দুই দিক্‌পালের সাংঘাতিক অভিযোগে উপস্থিত সকলেই যেন বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল। ষোড়শীর পাণ্ডুর ওষ্ঠাধর কি একটা বলিবার চেষ্টায় বারংবার কাঁপিতে লাগিল, মুহূর্ত্ত পরে হয়ত সে কি একটা বলিয়াও ফেলিত, কিন্তু, হৈম দ্রুতপদে তাহার কাছে আসিয়া হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া শান্ত দৃঢ়-স্বরে বলিল, না, আপনি কিছুতেই কোন কথা বলবেন না। পিতার মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আপনারা ওঁর বিচার করতে চান নিজেরাই করুন, কিন্তু ওঁর মায়ের কথা নিজের মুখ দিয়ে কবুল করিয়ে নেবেন, এতবড় অন্যায় আমি কোনমতেই হতে দেব না। ওঁরা যা পারেন করুন, চলুন আপনি আমার সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে। এই বলিয়া সে আর কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া ষোড়শীকে একপ্রকার জোর করিয়াই সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

৮

মন্দিরের অভ্যন্তরে একপাশে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ষোড়শী কহিল, না বোন, আমি পূজো করব না।

কেন? বলিয়া হৈম সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, ভৈরবীর মুখ ম্লান, কোনরূপ আনন্দ বা উৎসাহের লেশমাত্র নাই এবং তাহার প্রশ্নের উত্তর সে যেন একটু চিন্তা করিয়াই দিল। কহিল, এর কারণ যদি কখনো বলবার দরকার হয়, সে শুধু তোমাকেই বলব, কিন্তু আজ নয়। তা ছাড়া, আমি নিজেও বড়-একটা পূজা করিনে ভাই, যিনি এ কাজ নিত্য করেন, তিনিই করুন, আমি কেবল এইখানেই দাঁড়িয়ে তোমার ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করি, সে যেন দীর্ঘজীবী হয়, নীরোগ হয়, মানুষ হয়।

সন্তানের প্রতি ভৈরবীর এই ঐকান্তিক আশীর্ব্বচনেও মায়ের মন হইতে অপ্রসন্নতা ঘুচিল না। সে কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, কিন্তু আজকের দিনটা যে একটু অন্যরকমের দিদি! আপনি নিজের হাতে পূজো না করলে যে ওঁদের কাছে ভারি ছোট হয়ে যাবো! বলিয়া সে একবার উন্মুক্ত-দ্বার দিয়া বাহিরের বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

ষোড়শীর নিজের দৃষ্টিও উহাকে অনুসরণ না করিয়া পারিল না। দেখিল সকলে এই দিকেই চাহিয়া আছে। তাহাদের চোখ ও মুখের উপর উৎকট কলহের চিহ্ন একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—ঠিক যেন অধীর সৈনিকের দল কেবলমাত্র তাহাদের অধিপতির ইঙ্গিতের অপেক্ষায় বহু দুঃখে তাহাদের যুদ্ধ-বেগ সংযত করিয়া আছে; কিন্তু রায় মহাশয় সে ইঙ্গিত দিলেন না। তিনি ঘোর সংসারী লোক, মুহূর্ত্তেই বুঝিলেন উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি প্রকাশ্যে ধনী কন্যা-জামাতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না। অল্পকালেই তাঁহার রক্তচক্ষু অবনত হইয়া আসিল, এবং কাহাকেও আর একটি কথাও না কহিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে মন্দিরপ্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া গেলেন। দুই-চারিজন অনুগত ব্যক্তি ভিন্ন কেহই তাঁহার সঙ্গ লইল না। বৃদ্ধ শিরোমণি মহাশয় রহিয়া গেলেন, এবং অনেকেই ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত কি গড়ায় জানিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল।

হৈম মিনতি করিয়া কহিল, মা ভৈরবীর আশীর্ব্বাদ আমরা মাতা-পুত্রে মাথায় ক'রে নিলাম, কিন্তু সে আশীর্ব্বাদ আমি আপনাকে দিয়েই পাকা ক'রে নিতে চাই দিদি। বেশ, আমি অপেক্ষা করতে পারব; পূজো আজ বন্ধ থাক্—যেদিন আপনি আদেশ করবেন, এই উদ্যোগ-আয়োজন আবার না হয় সেইদিনই হবে।

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া কহিল, সে সুবিধে আর হবে কি না এ-কথা ত আজ তোমাকে নিশ্চয় করে বলতে পারবো না বোন্!

হৈম সবিস্ময়ে প্রশ্ন কহিল, তবে কি মা-চণ্ডীর ভৈরবী আর আপনি থাকবেন না?

ষোড়শী শুধু বলিল, আজও ত তাই আছি।

হৈম কহিল, তবে? বলিয়াই দেখিতে পাইল, দ্বারের চৌকাঠ ধরিয়া শিরোমণি দাঁড়াইয়া আছেন। চোখাচোখি হইতেই তিনি সদর্পে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, তোমার বাবা আর আমি সেই কথাই ত এতক্ষণ বকে মরচি গো! ভালো, আমাদের সবুর সইবে। উনি কাল হোক, পরশু হোক, দু'দিন পরে হোক, দশদিন পরে হোক, পূজা করুন। দিন তার জবাব!

হৈম ষোড়শীর মুখের প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল, কিন্তু সে তার কোন উত্তর দিল না।

শিরোমণি ভৈরবীর ম্লান-মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন, মা হৈম, এ ত সোজা প্রশ্ন নয়! এ পীঠস্থান, জাগ্রত দেবতা, দেবীর ভৈরবী ছাড়া এ দেব অঙ্গ স্পর্শ করা ত যে-সে স্ত্রীলোকের কর্ম্ম নয়। বুকের জোর থাকে, থাকুন উনি মায়ের ভৈরবী—আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা জানি সে আর ওঁর সাধ্যই নেই।

ইঙ্গিতটা এতই সুস্পষ্ট যে লজ্জায় হৈমর পর্য্যন্ত মাথা হেঁট হইয়া গেল। ষোড়শী নিজেও অভিভূতের মত ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অকস্মাৎ আপনাকে আপনি ধাক্কা মারিয়া যেন সম্পূর্ণ সচেতন করিয়া তুলিল। শিরোমণিকে সে কোন উত্তর করিল না, কিন্তু বুড়ো পূজারীকে হঠাৎ একটা ধমক দিবার মত তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, ছোট ঠাকুরমশাই, তুমি ইতস্ততঃ করচ কিসের জন্যে? আমার আদেশ রইল, দেবীর পূজা যথারীতি সেরে তুমি নিজের প্রাপ্য নিয়ো, বাকি মন্দিরের ভাঁড়ার বন্ধ করে চাবি আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। হৈমর প্রতি চাহিয়া কহিল, অনেক আয়োজন করেচ, এ-সব নষ্ট করা উচিত হবে না ভাই। আমি আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্চি এতেই তোমার ছেলের সর্ব্বাঙ্গীর্ণ কল্যাণ হবে। আমার নিজের পূজো-আহ্নিক এখনো বাকী রয়েচে আমি এখন চললাম—সময় যদি পাই ত আবার আসব। এই বলিয়া সে আর বাদানুবাদ না করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মুহূর্ত্ত-কয়েকের জন্য সকলেই নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল, কিন্তু ক্ষণপরেই অপমান ও অবহেলায় বৃদ্ধ শিরোমণি অঙ্কুশ-আহত পশুর ন্যায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বয়সোচিত মর্য্যাদা-বোধ ও ছদ্ম-গাম্ভীর্য্য কোথায় ভাসিয়া গেল, দৃষ্টিবহির্ভূত ষোড়শীর উদ্দেশে একটা অভদ্র ইঙ্গিত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, এবার মন্দিরে ঢুকলে গলা-ধাক্কা খেয়ে মরতে হবে জানিস! নষ্ট মেয়েমানুষ কোথাকার! ভেবেচিস

গাঁয়ে মানুষ নেই? আজও জনার্দন রায় বেঁচে, আজও সর্ব্বেশ্বর শিরোমণি মরেনি, তা জানিস্!

এই সকল অভিযোগ ও আস্ফালনের প্রতিবাদ করিবার তথায় কেহ ছিল না, বরঞ্চ তাঁহারই পোষকতায় রমণীগণের মধ্য হইতে বর্ষীয়সী কে একজন বলিয়া ফেলিল, হতভাগীকে ঝাঁটা মেরে দূর কর শিরোমণিমশাই। বড় অহঙ্কার! বড় অহঙ্কার! জমিদারের বাগান-বাড়িতে এক রাত এক দিন কাটিয়ে এসে বলে কি-না বাবুর অসুখ হয়েছিল! হয়েই যদি থাকে ত তোর কি? কিন্তু, বলিতে বলিতেই সহসা প্রতিমার প্রতি চক্ষু পড়িতেই তাঁহার ঈর্ষা-পীড়িত উচ্ছৃঙ্খল রসনা চক্ষের পলকে শান্ত ও সংযত হইয়া গেল। নিজের দুই কান তিনি তৎক্ষণাৎ দুই হাতে স্পর্শ করিয়া কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুমিষ্ট ও কোমল করিয়া অতঃপর কহিতে লাগিলেন, মায়ের ভৈরবী, নিন্দে করলে মহাপাপ হবে, নিন্দে আমি করচিনে, কিন্তু তাই বলে কি এতটা ভাল! সাহেব ভালমানুষ, তাই ছেড়ে দিলে, নইলে মিথ্যের দায়ে নিজের বাপের হাতেই যে দড়ি পড়ত।

কিন্তু ইহাতে উপস্থিত কেহই আর কথা যোগ করিল না। ষোড়শী যাহাই করুক সে যে চণ্ডীমাতার ভৈরবী এই সত্যটা হঠাৎ উপস্থিত হইয়া না পড়িলে কু-কথার প্রবাহটা বোধ করি এমন করিয়া তখনি থামিত না। কিন্তু তাই বলিয়া শিরোমণি মহাশয়ের রাগ পড়ে নাই, তিনি পুনশ্চ কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, হৈম মলিন অবসন্ন মুখখানি তুলিয়া আস্তে আস্তে কহিল, ও-সব কথা এখন থাক্ শিরোমণি জ্যাঠামশাই! তাড়াতাড়ি ত নেই—এখন আমার ছেলের পুজোটি হয়ে যাক।

তাই হোক, তাই হোক, বলিয়া শিরোমণি তাঁহার দুঃসহ বিরক্তি ও ক্রোধ তখনকার মত সংবরণ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং হৈম অদূরে একধারে নির্জীবের মত নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল। এই লজ্জাকর ও নিয়তিশয় অপ্রিয়কর আলোচনা সে এইভাবে বন্ধ করিয়া দিল সত্য, পুরোহিতও সাড়ম্বরে দেবীর পূজা করিয়া দিলেন, কিন্তু হৈম তাহার অন্তরের মধ্যে উৎসাহ বা আনন্দের লেশমাত্র খুঁজিয়া পাইল না। তাহার পিতা ও লোকগুলোর দুর্ব্যবহারে এবং বিশেষ করিয়া ওই ব্রাহ্মণের জঘন্য ইতরতায় তাহার যেমন বিতৃষ্ণা জন্মিল, ষোড়শীর অদ্ভুত আচরণেও তাহার মনের ভিতরটা তেমনি অজ্ঞাত গ্লানি ও সংশয়ের ব্যথায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিল। তথাপি পুরোহিতের কাজটা কলের মত অবাধে চলিল। জাগ্রত দেবতার পূজা, বলিদান, হোম প্রভৃতি যাহা-কিছু অনেক সময় লইয়া সমস্তই ধীরে ধীরে সমাধা হইয়া আসিল, তাহার পুত্রের কল্যাণে শুভকর্ম্মে কোথাও কোন বিঘ্নই ঘটিল না, কিন্তু ষোড়শী আর ফিরিল না।

দাসীর ক্রোড়ে ছেলেকে দিয়া হৈম যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিল তখন বেলা প্রায় অপরাহ্ণ। আসিয়া দেখিল তাহার পিতা কিংবা শিরোমণি মহাশয় কেহই এতক্ষণ আলস্যে সময় কাটান নাই। বাহিরের বসিবার ঘরে তুমুল কোলাহল হইতেছে। তাহার প্রাবল্য দেখিয়া সহজেই বুঝা গেল একযোগে অনেকগুলি বক্তাই স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশের প্রয়াস করিতেছেন। অলক্ষ্যে কোনমতে পাশ কাটাইয়া তাহার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পিতার দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না, তিনি হাত নাড়িয়া আহ্বান করিয়া কহিলেন, হৈম, এদিকে একবার শুনে যা ত মা?

সে ক্লান্তদেহে মলিন-মুখে ধীরে ধীরে গিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই দেখিল তথায় একটিমাত্র প্রাণী নীরবে বসিয়া আছেন, যাঁহাকে শ্রোতা বলিয়া গণ্য করা যাইত পারে—সে তাহার স্বামী মিস্টার এন. বসু ব্যারিস্টার। সকলের সমবেত বক্তৃতার উপলক্ষ্য একমাত্র তিনিই। বেলা দেড়টার ট্রেনে তাঁহার আসিবার একটা কথা ছিল বটে, কিন্তু ঠিক কিছু ছিল না। স্বামীকে দেখিয়া সে মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া দ্বারের অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার পিতা সস্নেহ অনুযোগের কণ্ঠে বলিলেন, তখন না বুঝে-সুঝে আমাদের কথায় হঠাৎ রাগ করে ফেললে মা, কিন্তু এখন নিজের কানেই ত সব শুনলে? ব্যাপার বুঝতে ত আর তোমার বাকি নেই; এখন তুমিই বল দেখি মা, অমন মেয়েমানুষকে কি ঠাকুর-দেবতার স্থানে রাখা যায়? এ ত ছেলে-খেলা নয়!

হৈম অত্যন্ত মৃদুস্বরে জবাব দিল, আপনারা যা ভাল বোঝেন করুন।

তাহার পিতা হাস্য করিলেন, কহিলেন, করব বই-কি মা, করব বই-কি! করতেই ত গিয়েছিলাম। নির্ম্মল এসেচে ভালই হয়েচে। যদি একটা মামলা-মকদ্দমাই বাধে ত বল পাওয়া যাবে। অপর পক্ষে বোধ করি তিনি জমিদারের সাহায্যের আশঙ্কাই করিলেন, কিন্তু শিরোমণি খামোকাই উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং হাঁকিয়া কহিলেন, ঘাড় ধরে বার করে দেব, তার আবার নালিশ-ফরিয়াদ কি হে জনার্দ্দন! জামাইবাবাজী যখন উপস্থিত আছেন, তখন তিনিই বিচার করুন। তিনিই আমাদের জজ, তিনিই আমাদের ম্যাজিস্টর। আমরা অন্য জজ-ম্যাজিস্টর মানি নে। কি বল হে যোগেন-ভায়া? তুমিই কি বল হে মিত্তিরজা? এই বলিয়া তিনি কয়েকজনের মুখের প্রতি সস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। এ-ক্ষেত্রে যোগেন-ভায়া ও মিত্তিরজার সম্মতি-গ্রহণের তাৎপর্য্য ঠিক বুঝা গেল না, কিন্তু এটা বুঝা গেল, বড়লোক এবং দানশীল জামাইবাবাজী বিচার করুন, আর না করুন, ভবিষ্যতে তাঁহার অনুগ্রহ-লাভের পথটা শিরোমণি নিজের জন্য কথঞ্চিৎ প্রশস্ত এবং সুগম করিয়া রাখিলেন।

এই জামাইবাবাজী মানুষটির মাথার ডগা হইতে জুতার তলা পর্য্যন্ত সমস্তই নিষ্কলঙ্ক সাহেবী। সুতরাং প্রত্যুত্তরে মৃদু-মধুর হাসিয়া তিনিও যে জবাবটুকু দিলেন তাহাও নিখুঁত সাহেবী। কহিলেন, এই সব মোহন্ত মোহন্তানী জাতের লোকগুলোর ব্যাপার সবাই জানে, এরা যেমন অসাধু তেমনি অসচ্চরিত্র। এদের অসাধ্য কাজ নেই। কোন কারণেই এদের প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত, কিন্তু আপনাদের ভৈরবীটি ঠিক কি করেচেন না-করেচেন সেটাও নিশ্চিত জানা উচিত।

শিরোমণি বলিয়া উঠিলেন, বাবা নির্ম্মল, জানার আর বাকি কোথাও কিছুই নেই—কি বল মা, এখনো কি তোমার সন্দেহ আছে? তা ছাড়া তার মা—সেই যে একটা মস্ত কথা! এই বলিয়া তিনি হৈমর দিকে বিশেষ একটু কটাক্ষ করিলেন।

হৈম অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার সলজ্জ নীরবতায় ইহাই সকলে অনুভব করিলেন যে, সে ভৈরবীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ করিতে লজ্জা এবং সংকোচ বোধ করিতেছে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে ভাল কথা বলিবারও তাহার কিছু নাই।

জনার্দ্দন কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মা, সমস্তদিন উপোস ক'রে তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে, যাও, তুমি বাড়ির ভেতরে যাও। ভৈরবীকে ডাকতে লোক পাঠানো হয়েচে, যদি আসে ত তোমাকে খবর দেবো।

হৈম চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় যে লোকটা ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া যাহা জানাইল তাহার সারমর্ম্ম এই যে, ভৈরবী কেবল যে তাহার প্রজা দিগম্বর ও বিপিনকে দিয়া তালা ভাঙ্গাইয়া সমস্ত ঘরগুলো দখল করাইয়া লইয়াছেন তাই নয়, রায় মহাশয়ের হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া এখানে আসিতেও সম্মত হয় নাই। শুধু কেবল ফকির সাহেবের অনুরোধেই অবশেষে স্বীকার করিয়াছেন। বোধ হয় দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই আসিতে পারেন।

বোধ হয় আসিতে পারেন! তা বটে! জ্বলন্ত অঙ্গারে ঘৃতাহুতি পড়িল এবং সামান্য একটা স্ত্রীলোকের অভাবনীয় দুঃসাহস ও স্পর্দ্ধায় সম্ভ্রান্ত পুরুষগুলির মুখ দিয়া যে-সকল শব্দ ও বাক্যাবলীর প্রবাহ নিঃসৃত হইল তাহার আদ্যোপান্ত উল্লেখ না করিয়াও একটা কথা বলার আবশ্যক যে, এই ভ্রষ্টা নারীকে কেবল এই মুহূর্ত্তেই গ্রাম হইতে বিদূরিত করা নয়, ইহাকে তালা-ভাঙা ও অনধিকার প্রবেশের জন্য পুলিশের হাতে দিয়া জেল-খাটানোর প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা অসংশয়ে প্রকাশ করিলেন। শুধু জামাতা-বাবাজীই এই কোলাহলে যোগদান করিলেন না; খুব সম্ভব, তিনি তাঁহার সাহেবী ও ব্যারিস্টারী এই উভয় মর্য্যাদা রক্ষা করিতেই গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কোলাহল কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে জামাতা সাহেব প্রশ্ন করিলেন, এই ফকির সাহেবটি কে? হঠাৎ ইনি জুটলেন কি করে?

ইহার সম্বন্ধেও নানা জনে নানা অভিমত প্রকাশ করিলেন। শিরোমণি তাহার সারোদ্ধার করিয়া কহিলেন, ভালো না ছাই। মোচলমান আবার সিদ্ধ-পুরুষ! সে-সব কিছু নয়, তবে লোকটা কারও মন্দ-টন্দ করে না। বারুইয়ের ওপরে একটা বটগাছের তলায় আড্ডা; অনেককাল আছে—তবে মাঝে মাঝে কোথায় যায়, আবার আসে। বছর-দুই ছিল না, আবার শুনচি নাকি দিন পাঁচ-ছয় হ'লো ফিরেচে। হয়ত ওরই মতলবে তালা ভেঙেচে। বলা কিছু যায় না—হাজার হোক মেলেচ্ছ ত।

জামাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আজ এলেন কি করে?

তারাদাস এতক্ষণ নীরবেই ছিল, এবার কথা কহিল। বলিল, ও-পারের ওই বটগাছের সঙ্গে জায়গাগুলো সব মা-চণ্ডীর। তাই থেকে আলাপ। ফকিরসাহেব ষোড়শীকে বড় ভালবাসেন, থাকলে ওখানে ষোড়শী প্রায়ই যায়। তাঁর কাছে পড়াশুনাও করে দেখেচি।

জামাইসাহেব একটু হাসির ভাবে কহিলেন, ভালবাসে! বিদ্যা-চর্চ্চাও চলে! এই ফকির সাহেবটির বয়স কত?

তারাদাস লজ্জিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, বুড়োমানুষ তিনি। বয়স ষাট-বাষট্টির কম নয়, মা বলে ডাকেন। একবার ষোড়শীর ভারি অসুখ হয়েছিল—প্রায় মরতে বসেছিল—উনিই ভাল করেন।

সাহেব বলিলেন, ওঃ—তাই নাকি! তবে কি জানো বাপু, ওদিকেও সাধু-ফকির, এদিকেও ডাকিনী-যোগিনী! এই সব ভৈরব-ভৈরবীর দলটাকে—কিন্তু শেষ করিতে পারিলেন না। হঠাৎ স্ত্রীর মুখের একাংশে চক্ষু পড়িয়া এই বেফাঁস কথাটা ওখানেই রহিয়া গেল। আর কেহই কথা যোগ করিল না, কেবল অপ্রতিহত-গতি শিরোমণি নিবৃত্ত হইলেন না। অপরাধের বাকিটুকু সদম্ভে সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া তিনিই কেবল বলিয়া উঠিলেন, একশো-বার বাবাজী, একশো-বার। এই সব ভণ্ড বেটা-বেটিরা যেমন নষ্ট তেমনি ভ্রষ্ট! তিনি বাম ও দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করিয়া বোধ করি তাঁহার যোগেন-ভায়া ও মিত্তিরজার মাথা-নাড়াটাও অন্ততঃ প্রত্যাশা করিলেন। কিন্তু এবার তাহারাও নির্ব্বাক্ রহিল, এবং দ্বারের অন্তরালবর্ত্তিনী হৈমবতীর শুষ্ক মুখখানি ক্ষণেকের জন্য একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়ে ভৈরবীকে সঙ্গে করিয়া সেই ভণ্ড মুসলমান ফকির ধীর-পদক্ষেপে প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কাহারও সংশয় রহিল না যে, শিরোমণির উচ্চকণ্ঠ তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছে।

অনতিবিলম্বে উভয়ে যখন নিকট-সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন কাহারও মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। একটা অভ্যর্থনা না, বসিতে বলার একটা সামান্য ভদ্রতা-রক্ষা পর্য্যন্ত না। অথচ মনে মনে সকলেই যেন বিশেষ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। শিরোমণির পর্য্যন্ত মনে হইতে লাগিল, কি যেন ঠিক হইল না— কিসে যেন ভারি একটা ত্রুটি হইয়াছে, অথচ সবাই তেমনিই বসিয়া রহিলেন।

মিস্টার বসুসাহেবের কাছে উভয় আগন্তুকই একেবারে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মিনিট দুই-তিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তিনি দুইজনকেই আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিলেন। এই ফকিরটির মাথার চুল হইতে দীর্ঘ দাড়ি-গোঁফ সমস্তই একেবারে তুষার-শুভ্র, অঙ্গে মুসলমান ফকিরের সাধারণ পোষাক। সচরাচর যাহা দেখা যায় তাহার অধিক কিছু নয়, অথচ মনে হয় এই সবল সুদীর্ঘ দেহের উপর এগুলি সমস্ত যেন তাদের সামান্যতাকে বহু ঊর্দ্ধে অতিক্রম করিয়া গেছে। তাঁহার গায়ের রঙ জলে ভিজিয়া এবং রৌদ্রে পুড়িয়া এমন একপ্রকার হইয়াছে, যাহা আগে কি ছিল কিছুতেই অনুমান করা যায় না। ফকিরের মুখ ও চোখের উপর সামান্য একটুখানি উৎকণ্ঠিত কৌতূহলের ছায়া পড়িয়াছে বাটে, কিন্তু আরও একটু মন দিয়া দেখিলেই দেখা যায়, ইহারই অন্তরালে যে চিত্তখানি বিরাজ করিতেছে তাহা যেমন শান্ত তেমনি নিরুদ্বেগ তেমনি ভয়হীন। ইঁহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল ষোড়শী। তাহার গৈরিক বস্ত্র, তাহার সুন্দর সুগঠিত, অনাবৃত মাথাটি ভরিয়া রুক্ষ বিস্রস্ত কেশ-ভার, তাহার উপবাস-কঠিন যৌবন-সমৃদ্ধ দেহের সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জ্জিত আশ্চর্য্য সুষমা, সর্ব্বোপরি তাহার নত-নেত্রের অপরিদৃষ্ট বেদনার অনুক্ত ইতিহাস—সমস্ত একসঙ্গে মিশিয়া ক্ষণকালের জন্য সাহেবকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

এই আচ্ছন্ন ভাবটা তাঁহার কাটিয়া গেল ফকিরের একটা কথার ধাক্কায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিজের দুর্ব্বলতায় তিনি অকারণ লজ্জিত হইয়া তাঁহার কথার জবাবে খামোকা রূঢ় হইয়া উঠিলেন। ফকির নিজেদের প্রথামত অভিবাদন করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবুসাহেব, আপনি কি ডেকে পাঠিয়েছিলেন? বাবুসাহেব তখন উত্তর দিলেন, তোমাকে ডেকে পাঠাইনি, তুমি যেতে পারো।

ফকির রাগ করিলেন না। একটু হাসিয়া ষোড়শীকে দেখাইয়া শান্তস্বরে বলিলেন, আসামীকে কিন্তু আমিই হাজির করেচি বাবুসাহেব। উনি ত আসতেই চাননি। নেহাৎ দোষ দেওয়াও যায় না, কারণ সবাই মিলে হট্টগোল করে যে বিচার তাতে বিচারের চেয়ে অবিচারই বেশি হয়। আর সেও ত সকালবেলায় একদফা সাঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু আপনার নাম শুনে আমি বললুম, চল মা আমরা যাই। তিনি আইনজ্ঞ মানুষ, তাতে বাইরের লোক—যদি সম্ভব হয় তিনি সুমীমাংসাই করে দেবেন।

ব্যারিস্টার সাহেব মনে মনে বুঝিলেন, এই ফকিরের সম্বন্ধে তিনি ভুল ধারণা করিয়াছেন। ইনি যেই হোন, অশিক্ষিত সাধারণ ভিক্ষুক-শ্রেণীর নয়। সুতরাং প্রত্যুত্তরে তাঁহাকেও কতকটা ভদ্র হইতে হইল, কহিলেন, এঁরা ত তালা-ভাঙ্গা এবং অনধিকার-প্রবেশের জন্য পুলিশের হাত দিয়ে ওঁকে প্রথমটা জেল খাটিয়ে নিতে চান। আর শুনলাম তালা-ভাঙ্গা নাকি আপনার হুকুমেই হয়েছে।

ফকির হাসিয়া কহিলেন, ওরে বাপ্‌রে, একা কেবল অপরাধী নয়, তার সঙ্গে আবার তার সাহায্যকারা! কিন্তু বাবুসাহেব, আমি শুধু তালা ভাঙবারই মতলব দিয়েচি, কিন্তু আইন ভাঙবার পরামর্শ দিইনি। বাড়িটা দেবোত্তর সম্পত্তি এবং মা ভৈরবীই তার অভিভাবিকা। তারাদাস খামোকা যদি তালা বন্ধ না করতে যেতেন ত ভাল ভাল তালাগুলো এমন ভেঙ্গে নষ্ট করতে হ'তো না। তারাদাসের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তারাদাস, ও-বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছিলেন বাবা? কিন্তু যিনিই দিন সুবুদ্ধি দেননি।

তারাদাস ইহার উত্তর দিতে পারিল না, এবং অন্য কেহও যখন কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না, নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল, তখন শিরোমণি সাড়ম্বরে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, ওকে ভৈরবী কে করেছিল জানেন ফকিরসাহেব? সে ওই তারাদাস। এখন ও যদি ওকে না রাখতে চায় ত সে তার ইচ্ছা। এই আমার মত।

ফকির কহিলেন, শিরোমণিমশাই, মতটাও আপনার বটে, ইচ্ছাটাও তারাদাসের সত্য, কিন্তু সম্পত্তিটা অন্যের। এই অন্য লোকটি এ দুটোর কোনটাতেই সম্মত নয়। কি করবেন বলুন!

তাঁহার উত্তর এবং সেটা বলিবার ভঙ্গীতে ব্যারিস্টারসাহেব হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, নালিশ এই যে, বর্ত্তমান ভৈরবী যে অপরাধ করেচেন তাতে তিনি দেবীর সেবায়েত হবার সম্পূর্ণ অনধিকারী। উনি তার কিছু সাফাই দিতে পারেন কি? এই বলিয়া তিনি ষোড়শীর আনত মুখের প্রতি একবার কটাক্ষে চাহিয়া লইলেন।

ফকির কহিলেন, ওঁকে আসামী করেই আপনাদের সুমুখে দাঁড় করিয়েচি, আবার অপরাধ অপ্রমাণ করবার বোঝাটাও ওঁকেই বইতে অনুরোধ করব, এতবড় জুলুম ত আমি পেরে উঠব না বাবুসাহেব।

ব্যারিস্টারসাহেব মনে মনে লজ্জিত হইয়া নীরব হইলেন, কিন্তু শিরোমণি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী যে ভৈরবীকে পেয়াদা দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে সারারাত আটক রেখেছিল, সে আমরা সবাই জানি, তবে কেন সে সকালে ম্যাজিস্টারসাহেবের কাছে মিছে কথা বললে যে, সে স্ব-ইচ্ছায় গিয়েছিল, আর জমিদারের অসুখ হ'লো বলেই সমস্ত রাত্রি নিজের ইচ্ছায় সেখানে ছিল! ও যদি নিষ্পাপ ত এ কথার জবাব দিক?

ফকির জবাব দিলেন, কহিলেন, জমিদারের অত্যাচারে ও অনাচারে উনি যে রাগের মাথায় নিজেই গিয়েছিলেন এ-কথা ত মিথ্যে নয় শিরোমণিমশায় ? এবং তিনি যে হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়েছিলেন, এ-ঘটনাও ত সত্য।

জনার্দ্দন রায় এতক্ষণ নীরবেই সমস্ত বাদানুবাদ শুনিতেছিলেন আর সহিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন, এই যদি সত্য হয় ফকিরসাহেব, ত নিজের বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অত্যাচারীকে বাঁচাবার কি প্রয়োজন হয়েছিল ? তাঁর অসুখ ত ওঁর কি ? অসুখে সেবা করবার জন্য ত বীজগাঁয়ের জমিদার পালকি পাঠিয়ে নিয়ে যায়নি ? মোট কথা আমরা ওকে রাখব না আমরা ভিতরের ব্যাপার জানি। তা ছাড়া, ওর যদি কিছু বলবার থাকে ওকেই বলতে দিন ! আপনি মুসলমান, বিদেশী, আপনার ত হিন্দুধর্ম্মের মাঝখানে পড়ে মধ্যস্থ হবার দরকার নেই !

তাঁহার কথার ঝাঁজ এবং তীক্ষ্ণতা কিছুক্ষণ অবধি যেন ঘর ভরিয়া রি রি করিয়া বাজিতে লাগিল। ব্যারিস্টারসাহেব নিজেও কেমন একপ্রকার অস্বচ্ছন্দ এবং অপ্রতিভ হইয়া উঠিলেন, এবং বাক্যহীনা ভৈরবীর নিস্তব্ধ বক্ষঃকুহরেও কি একটা উত্তর বাহিরে আসিবার জন্য বারবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহারই চিহ্ন ফকিরসাহেব ষোড়শীর মুখের উপরে চক্ষের পলকে অনুভব করিয়া শুধু একটুখানি হাসিলেন, তার পর জনার্দ্দন রায়কে লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, রায়মশায়, অনেকদিনের কথা হ'লো, আপনার হয়ত মনে নেই, মন্দিরের দক্ষিণে ঐ যে বুড়ো নিম গাছটা তারই তলায় তখন থাকি। ষোড়শী তখন এতটুকু মেয়ে, তখন থেকেই মা বলে ডাকি— মুসলমান হয়েও যে ভুলটা করে ফেলেচি সেটা আজ আমাকে মাপ করতে হবে। সেই মায়ের এতবড় বিপদে না এসে থাকতে পারি ? মা জিনিসটা ত তুচ্ছ নয় ! তা না হলে আজই সকালে যখন ওঁরই মুখ থেকে ওঁর মায়ের লজ্জার কাহিনী টেনে বার করতে চেয়েছিলেন, তখন আপনার নিজের ওই মা'টির কাছে ধমক খেয়ে অমন বিহ্বল ব্যাকুল হতে আপনাকে হ'তো না। এই বলিয়া ফকির দ্বারসংলগ্ন মূর্ত্তিবৎ স্থির হৈমবতীকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন।

হতবুদ্ধি জনার্দ্দন হঠাৎ উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া কহিলেন, ও-সব বাজে কথা।

ফকির তেমনি হাসিমুখে বলিলেন, পাকা বীজও পাথরের উপর পড়ে বাজে হয়ে যায়, আমার এতটা বয়সে সে আমি জানতুম। আমি কাজের কথাও বলচি। ওই মহাপাপিষ্ঠ জমিদারটিকে কেন যে মা আমার বাঁচাতে গেলেন সে আমিও জানিনে— জিজ্ঞেস করেও জবাব পাইনি। আমার বিশ্বাস, কারণ ছিল—আপনাদের বিশ্বাস সেই হেতুটা মন্দ। এখানে মাতঙ্গিনী ভৈরবীর কথাটা তুলতে পারতুম, কিন্তু একজনের ভাল করবার জন্যেও অন্যের গ্লানি করা আমাদের ধর্ম্মে নিষেধ, তাই আমি সে নজির দেব না। কিন্তু আপনাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে রায়মশায়।

এ যদি কেবল তারাদাসের সঙ্গেই হ'তো, হয়তো আমি মাঝে পড়তে যেতাম না, ও বেচারা তার বুদ্ধি এবং সাধ্যমত কর্ত্তব্য করবার চেষ্টা করেচে, কিন্তু আপনারা, বিশেষ করে আপনি নিজে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছেন, কিসের জন্য শুনি? ষোড়শী ত একা নয়, আরও অনেক মেয়ে আছে। গ্রামের বুকের মধ্যে বসে লোকটা যখন রাত্রির পর রাত্রি মানুষের মান-ইজ্জত অপহরণ করছিল, তখন কোথায় ছিলেন শিরোমণি, কোথায় ছিলেন জনার্দ্দন রায়? সে যখন গরীবের সর্ব্বস্ব শোষণ করে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করে নিয়ে গেল, তার কতখানি বুকের রক্ত আপনি তাদের জমি-জমা, বাড়ি-ঘর-দ্বার বাঁধা রেখে যুগিয়েছিলেন শুনি? কিন্তু থাক, রায়মশায়, আপনার মেয়ে-জামাই দাঁড়িয়ে আছেন, তাদের চোখের সুমুখে আর আপনার মহাপাপের ভরা উন্মুক্ত করে ধরব না।

এই বলিয়া সেই মুসলমান ফকির নীরব হইলেন কিন্তু তাহার নিদারুণ অভিযোগের শেষ বাক্যটা যেন শেষ হইয়াও নিঃশেষ হইল না। কাহারও মুখে কথা নাই, সমস্ত ঘরটা স্তব্ধ হইয়া রহিল, কেবল একটা তীব্র কণ্ঠের রেশ যেন চারদিকের প্রাচীর হইতে বারংবার প্রতিহত হইয়া কেবল ধিক্! ধিক্! করিতে লাগিল।

হৈম কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র করিল না, নীরবে নতমুখে ধীরে ধীরে অন্যত্র সরিয়া গেল এবং ব্যারিস্টারসাহেব সেইখানে তাঁহার চৌকির উপর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ফকির ভৈরবীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, মা, চল আমরা যাই। এই বলিয়া তিনি আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সদর দরজার একপাশে দাঁড়াইয়া হৈম। তাহার দুই চক্ষু ছল ছল করিতেছে। সে অশ্রু-সজল দৃষ্টি ফকিরের মুখের প্রতি তুলিয়া কহিল, বাবা, আমার স্বামীকে আপনি মাপ করুন।

ফকির বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন মা?

হৈম তাহার উত্তর না দিয়া কহিল, আমার স্বামীকে নিয়ে যদি আপনার আশ্রমে যাই আপনি দেখা করবেন?

এবার ফকির হাসিলেন; তারপরে স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, করব বই কি মা! তোমাদের দুজনের নিমন্ত্রণ রইল, সময় পেলে যেয়ো।

৯

মন্দির-সংক্রান্ত গোলযোগটা যে ওখানেই মিটিয়া শেষ হইয়া গেল না ষোড়শী তাহা ভাল করিয়াই জানিত; কিন্তু বিপত্তি যেদিক দিয়া তাহাকে পুনশ্চ আক্রমণ করিল তাহা সম্পূর্ণ অভাবনীয়। এখানে থাকিলে ফকিরসাহেব মাঝে মাঝে এমন আসিতেন বটে, কিন্তু মাত্র কাল সন্ধ্যাকালে তিনি গিয়াছেন, মাঝে একটি দিন কেবল গিয়াছে, আবার আজই প্রত্যুষে আসিয়া উপস্থিত হইবেন এইরূপ তাঁহার কোনদিন নিয়ম নয়। ষোড়শী সেইমাত্র স্নান করিয়া, আসিয়া নিত্যক্রিয়াগুলি সারিয়া লইতে ঘরে ঢুকিতেছিল, অসময়ে হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া চিন্তিত হইল। তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া, একটা আসন পাতিয়া দিয়া উদ্বিগ্ন-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, এত সকালে যে?

তিনি উপবেশন করিয়া একটু হাসির চেষ্টা করিয়া কহিলেন, ফকির মানুষ, সংসারে সুখ-দুঃখের ধার বড় ধারিনে মা, তবুও কাল রাত্রিটায় ভাল করে ঘুমোতে পারিনি, ষোড়শী, দেহ-ধারণের এমনই বিড়ম্বনা। কবে যে এটা মাটির তলায় যাবে!

ষোড়শী শারীরিক পীড়ার কথাই মনে করিয়া কহিল, আপনার কি কোন অসুখ করেচে?

ফকির ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, আমার শরীর ভালই আছে। কাল বিকালে এরা সকলেই আমার কুটীরে পায়ের ধূলো দিয়েছিলেন, সঙ্গে জামাইবাবু-সাহেবও ছিলেন এককড়িও ছিল। তাকে চিনি এই যা—নইলে সে অনেক কথাই বললে। তবুও দু-একটা কথা তোমাকে না জিজ্ঞাসা করেও থাকতে পারলাম না মা।

ষোড়শী কহিল, বলুন।

ফকির বলিলেন, দেখ মা, আমি মুসলমান, তোমাদের দেব-দেবীর সম্বন্ধে আমার কৌতূহল থাকা উচিতও নয়, নেইও—কিন্তু, তোমাকে আমি মা বলে ডাকি, তুমি কি জানিয়েছ স্বহস্তে আর কখনো চণ্ডীর পূজা করতে পারবে না?

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, এ-কথা সত্য।

ফকির বলিলেন, কিন্তু এতকাল ত তোমার সে বাধা ছিল না?

ইহার উত্তরে ষোড়শী যখন মৌন হইয়াই রহিল, তখন তিনি কহিলেন, যাঁরা তোমাকে চান না তাঁরা যদি তোমার এই নূতন আচরণটা মন্দ বলেই গ্রহণ করেন, তাতে ত কোন জবাব দেওয়া যায় না ষোড়শী?

ইহারও কোনরূপ সদুত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া ষোড়শী যখন তেমনি নীরব হইয়াই রহিল, তখন ফকিরের মুখও অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল; তিনি নিজেও

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলেন, এর কারণ বলবার হলে তুমি আমাকে নিশ্চয়ই বলতে। এ-ছাড়া এককড়ি আরও একটা কথা বললে। সে বললে, জমিদারবাবু ভারি আশা করেছিলেন, তুমি তার সঙ্গে যাবে। এমন কি, আর একটা পাল্‌কি আনিয়ে যাই যাই করেও তাঁর শেষ পর্য্যন্ত ভরসা ছিল হয়ত তুমি ফিরে আসবে।

এবার ষোড়শী কথা কহিল, বলিল, তাঁর আশা-ভরসার জন্যেও কি আমাকে দায়ী হতে হবে?

ফকির তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, নিশ্চয় না, নিশ্চয় না। কিন্তু কথাটা শুনতেও নাকি বিশ্রী, তাই উল্লেখ করলাম। আচ্ছা মা, যে ব্যাপারটায় সকল কুৎসিত কথার সৃষ্টি, তার যথার্থ হেতুটা কি তুমি আমাকে বলতে পারো না? ও লোকটাকে যে তুমি কেন এমন করে বাঁচিয়ে দিলে এর কোন মীমাংসাই ত খুঁজে পাইনে ষোড়শী?

ষোড়শীর প্রথমে মনে হইল এ প্রশ্নের সে কোন উত্তর দিবে না, কিন্তু বৃদ্ধের উদ্বিগ্ন মুখের স্নেহ-করুণ চোখ-দুটির প্রতি চাহিয়া সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল, ফকিরসাহেব, ওই পীড়িত লোকটিকে জেলে পাঠানোই কি উচিত হতো?

ফকির বিস্মিত হইলেন, মনে মনে বোধ করি বা একটু বিরক্তও হইলেন, বলিলেন, সে বিবেচনার ভার ত তোমার নয় মা, সে রাজার। তাই তাঁর জেলেও হাসপাতাল আছে, পীড়িত অপরাধীরও তিনি চিকিৎসা করান। কিন্তু এই যদি হয়ে থাকে, তুমি অন্যায় করেচ বলতে হবে।

ষোড়শী তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

ফকির বলিলেন, যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে এর ত্রুটি শুধরে নিতে হবে।

ষোড়শী তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, তার অর্থ?

ফকির বলিলেন, ওই লোকটার অপরাধ ও অত্যাচারের অন্ত নেই, এ ত তুমি জানো। তার শাস্তি হওয়া উচিত?

এবার ষোড়শী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপরে মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি সমস্ত জানি। তাঁহাকে শাস্তি দেওয়াই হয়ত আপনাদের উচিত, কিন্তু আমার কথা কাউকে বলবার নয়—তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আমি কোনদিন পারব না!

ফকির কহিলেন, ব্যাপার কি ষোড়শী?

ষোড়শী অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল, এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও মুখ দিয়া কোন বাক্যই বাহির হইল না। দাসী সংসারের কাজ করিতে আসিয়াছিল, দ্বারের

কাছে তাহাকে দেখিতে পাইয়া ফকির আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া মৃদু-কণ্ঠে কহিলেন, এখন তা হলে আমি চললাম।

ষোড়শী কেবল হেঁট হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল; তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

তাঁহার প্রশান্ত মুখের গম্ভীর বিষণ্ণতাই শুধু যে কেবল ষোড়শীর সমস্তদিন সকল কাজ-কর্ম্মের মধ্যেই যখন-তখন মনে হইতে লাগিল তাই নয়, যে অনুচ্চারিত বাক্য তিনি সহসা দমন করিয়া লইয়া নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন, তাহাও নানা আকারে নানা ছন্দে তাহার কানে বাজিতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিল এই সাধু ব্যক্তি যে শ্রদ্ধা, যে স্নেহ এতদিন তাহার প্রতি ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন ঠিক কিছু না জানিয়াও আজ যেন তাহাকে খর্ব্ব করিয়া লইয়া গেলেন। এই ক্ষতি যে কত বড় তাহার পরিমাণ সে নিজে ছাড়া আর কেহই অধিক জানিত না। কিন্তু তথাপি ইহাকে ফিরিয়া পাইবারও কোন পন্থা তাহার চোখে পড়িল না। তাহার বাল্য ইতিহাস কাহারও কাছে ব্যক্ত করা চলে না, এমন কি এই ফকিরসাহেবের কাছেও না। কারণ ইহাতে যে-সকল পুরাতন কাহিনী উঠিয়া পড়িবে তাহা মেয়ের পক্ষে যতবড় লজ্জার কথাই হোক, তাহার যে মা আজ পরলোকে তাঁহাকেই সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে একেবারে পথের ধূলায় টানিয়া আনা হইবে। এবং এইখানেই ইহার শেষ নয়। স্বামী-স্পর্শ ভৈরবীর একান্ত নিষিদ্ধ। কত যুগ হইতে এই নিষ্ঠুর অনুশাসন ইহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া আসিতে হইয়াছে। সুতরাং ভাল-মন্দ যাই হোক, জীবানন্দের শয্যা-প্রান্তে বসিয়া একটা রাত্রির জন্য তাহাকে যে-হাত দিয়া তাঁহার সেবা করিতে হইয়াছে, সেই হাত দিয়া আর যে দেবীর সেবা করা চলিবে না তাহা নিশ্চিত, অথচ এইখানেই এই দেবীর প্রাঙ্গণতলেই তারাদাস যখন তাহাকে অজ্ঞাত-কুলশীল একজনের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল তখন সে কোন কথা কোন আপত্তিই করে নাই, এবং সমস্ত জানিয়াও যে সে নিঃসঙ্কোচে এতকাল ভৈবরীর কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, ইহার জবাব-দিহি আজ যদি সমস্ত ক্রুদ্ধ হিন্দু-সমাজের কাছে করিতে হয়, ত সে যে কি হইবে সে তাহার চিন্তাতীত। আবার এ-সকল ত গেল কেবল একটা দিকের কথা, কিন্তু যে দিকটা একেবারেই তাহার আয়ত্তাতীত, তথায় কি যে হইবে সে তাহার কি জানে? যে জীবানন্দ একদিন তাহাদের বিবাহটাকে কেবল পরিহাস করিয়া গিয়াছিল, সে যদি আজ সমস্ত ইতিহাসটাকে নিছক গল্প বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, ত তাহাকে সত্য বলিয়া সপ্রমাণ করিতে সে নিজে ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জীবিত নাই।

গৃহস্থালী-সম্বন্ধে রাণীর মায়ের দুই-একটা কথার উত্তরে ষোড়শী কি যে জবাব

দিল তাহার ঠিকানা নাই। মন্দিরের পুরোহিত কি একটা বিশেষ আদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়া অন্যমনস্ক ভৈরবীর কাছে কি যে হুকুম পাইল তাহা ভাল বুঝিতেই পারিল না। নিত্যনিয়মিত পূজা-আহ্নিকে বসিয়া আজ ষোড়শী কোনমতেই মনস্থির করিতে পারিল না, অথচ যেজন্য তাহার সমস্ত চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত এবং চঞ্চল হইয়া রহিল, তাহার যথার্থ রূপটাও তাহাকে ধরা দিল না— কেবলমাত্র কতকগুলো অস্ফুট অনুচ্চারিত বাক্যই সমস্ত সকালটা অর্থহীন প্রলাপে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। রান্নার উদ্যোগ-আয়োজন পড়িয়া রহিল, সে রান্নাঘরে প্রবেশ কবিল না—এ-সকল তাহার ভালই লাগিল না। এমনি করিয়া সমস্ত দিনটা যখন কোথা দিয়া কিভাবে কাটিয়া গেল, একপ্রকার ঘোলাটে মেঘলায় শীতের দিনের অপরাহ্ণ যখন অসময়েই গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল, তখন সে একাকী ঘরের মধ্যে আর থাকিতে না পারিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া আসিল এবং ফকিরসাহেবকে স্মরণ করিয়া বারুইয়ের পরপারে তাঁহারই আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। এমন অনেকদিন হইয়াছে সে একটুখানি ঘুরিয়া তাহার অনুগত বিপিন কিংবা দিগম্বরকে তাহাদের বাটীর সম্মুখ হইতে ডাক দিয়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছে; কিন্তু আজ পাড়ার পথ দিয়া তাহাদিগকে ডাকিতে যাইতে তাহার সাহসও হইল না, প্রবৃত্তিও হইল না—একাকীই মাঠের পথ ধরিয়া নদীর অভিমুখে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেল। তাহার মনেও পড়িল না যে ঘরগুলা খোলাই পড়িয়া রহিল।

এই পথটা বেশী নহে, বোধ করি অর্দ্ধক্রোশের মধ্যেই, এবং নদীতেও এমন জল এ-সময়ে ছিল না যাহা স্বচ্ছন্দে হাঁটিয়া পার হওয়া না যায়, সুতরাং অভ্যাসবশতঃ এদিকে চিন্তিত হইবার কিছুই ছিল না। কেবল ফিরিয়া আসার কথাটাই একবার মনে হইল, অথচ ভিতরে ভিতরে বোধ হয় তাহার ভরসা ছিল যদি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া অন্ধকার হইয়াই আসে ত ফকিরসাহেব কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন না, কিছু একটা উপায় করিবেনই। মনের এই অবস্থাই তাহাকে জনহীন পথ ও ততোধিক নির্জন বালুময় নদীর উপকূলে আসন্ন সন্ধ্যা জানিয়াও দ্বিধামাত্র করিতে দিল না, বারুইয়ের পরপারে সোজা সেই বিপুল বটবৃক্ষতলে সাধুর আশ্রমে আনিয়া উপনীত করিল এবং প্রথমে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, তিনি ফকিরসাহেব নহেন, রায়মহাশয়ের জামাতা ব্যারিস্টারসাহেব। আজ তাঁহার পরিধানে কোট-প্যান্টের পরিবর্ত্তে সাধারণ ভদ্র বাঙালীর ধুতি চাদর প্রভৃতি ছিল। তিনিও ঠিক ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না; কি করিবেন সহসা ভাবিয়া না পাইয়া বোধ হয় কেবলমাত্র অভ্যাসবশতঃই দাঁড়াইয়া কোনমতে একটা নমস্কার করিলেন।

ভৈরবী চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কোথায়?

বসুসাহেব কহিলেন, আমারও জিজ্ঞাস্য তাই। হয়ত কাছাকাছি কোথাও গেছেন মনে করে আমিও প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে আছি।

ভৈরবী মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিল, তিনি সন্ধ্যার সময় কোথাও থাকেন না, বোধ হয় এখুনি এসে পড়বেন।

বসুসাহেব কহিলেন, এখানে থাকলে তাই তাঁর নিয়ম বটে, আমিও শুনে এসেচি। কিন্তু সন্ধ্যা ত হ'লো। আকাশের গতিকও তেমন ভাল নয়, বলিয়া তিনি সম্মুখে মাঠের প্রান্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। ষোড়শী তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেইদিকে চাহিয়া নীরব হইল।

পশ্চিমদিগন্তে তখন কালো কালো খণ্ড মেঘ ধীরে ধীরে জমা হইয়া উঠিতেছিল। এই নিস্তব্ধ জনহীন প্রান্তরে ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতলের ঘনায়মান অন্ধকারে দাঁড়াইয়া উভয়ের কেহই কিছুক্ষণের জন্য কথা খুঁজিয়া পাইলেন না, অথচ এই বিসদৃশ অবস্থায় দুজনেই কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন। এবং বোধ হয় এই মৌনতার সঙ্কট হইতে অব্যাহতিলাভের জন্যই যেন বসুসাহেব হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, কাল আমি চলে যাচ্চি, শীঘ্র আর আসা হবে কি না জানিনে, কিন্তু ফকিরের সঙ্গে আর একবার দেখা না করে যেতে হৈম আমাকে কিছুতেই দিলে না তাই—কিন্তু তিনি ত কোথাও চলে যাননি? এই বলিয়া তিনি দু-এক পদ অগ্রসর হইয়া গেলেন, এবং অনতি-দূরবর্ত্তী কুটীরের সম্মুখে আসিয়া গলা বাড়াইয়া ক্ষণকাল ঘরের মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন ভাল দেখা যায় না, কিন্তু কোথাও কিছু আছে বলেও মনে হয়না। মুসলমান ফকিরেরা ধুনি জ্বালে কি-না জানিনে, কিন্তু এইরকম কি একটা জল দিয়ে কে যেন নিবিয়ে দিয়ে গেছে বলে মনে হচ্চে। আপনি দেখুন দেখি, আমি আর ভিতরে যাবো না। তা হলে নিরর্থক অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই। বলিয়া তিনি ষোড়শীর প্রতি চাহিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

কথাটা শুনিয়াই ষোড়শীর বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল, এবং তাঁহার থাকা না-থাকার পরীক্ষা না করিয়াই তাহার নিশ্চয় মনে হইল সংসারে তাহার একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী আজ নিঃশব্দে চলিয়া গেছেন, এবং এই নীরব প্রস্থানের হেতু জগতে সে ছাড়া আর কেহ জানে না। ষোড়শী যন্ত্রচালিতের ন্যায় সন্ন্যাসীর কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাঝখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোথাও যে কিছু নাই, এই ছোট ঘরখানি আজ যে একেবারে একান্ত শূন্য সে তাহার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়িয়াছিল, কিন্তু তবুও সে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিতে পারিল না। তাহার বুকের মধ্যে কেবল এই কথাটাই অঙ্গারের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, তিনি যথার্থ-ই দোষীজ্ঞানে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেছেন, এবং তাহার আভাস মাত্র দিবারও প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সেইখানে পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল

দাঁড়াইয়া তাহার অনেক কথাই মনে হইতে লাগিল; ফকির যে তাহাকে কত ভালবাসিতেন, তাহা তাহার চেয়ে বেশি আর কে জানে? তথাপি না জানিয়া যে তিনি অপরাধীর পক্ষ লইয়া বিবাদ করিয়াছেন, এই লজ্জা ও গ্লানি সেই সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসীকে এমন করিয়া আজ স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে, ইহা সে নিঃসংশয়ে অনুভব করিল, এবং যে বেদনা লইয়া তিনি নীরবে বিদায় লইয়াছেন ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে তাহার বিলম্ব হইল না। অথচ এ-কথা জানাইবার অবকাশ যে তাহার কবে মিলিবে, কিংবা কোনদিন মিলিবে কি না তাহাও ভবিষ্যতের গর্ভে আজ সম্পূর্ণ লুক্কায়িত। এমনি একইভাবে তাহার অনেকক্ষণ কাটিল, এবং বোধ হয় আরও কিছুক্ষণ কাটিত, সহসা মুক্তদ্বার দিয়া ঘরের মধ্যে একটা দমকা বাতাস অনুভব করিয়া তাহার চৈতন্য হইল, বাহিরে আর একজন হয়ত এখনও তাহার অপেক্ষা করিয়া আছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে যে আকাশে এমন মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার এত প্রগাঢ় হইয়া উঠিতে পারে এবং বাতাস প্রবল হইয়া ঝড় ও জলের সম্ভাবনা আসন্ন হইয়া উঠিতে পারে, ইহাও তাহার মনে আসে নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিল অনতিদূরে একটা শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডের উপর বসুসাহেব বসিয়া আছেন, তাঁহার শুভ্র পরিচ্ছদ ভিন্ন আর কিছুই প্রায় দেখা যায় না। তাঁহাকে এইভাবে বাস্তবিক অপেক্ষা করিতে দেখিয়া ষোড়শী মনে মনে অতিশয় সংকোচ বোধ করিল।

সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, কই, ফকির ত এখনো এলেন না, আসবেন বলে কি আপনার আশা হয়?

ষোড়শী অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, কি জানি, বোধ হয় নাও আসতে পারেন।

বসু কহিলেন, ফকিরসাহেবের জিনিসপত্র কি ছিল আমি জানিনে, কিন্তু তাঁর ঘরটি ত একেবারে খালি—এমন হঠাৎ যাওয়া কি আপনার সম্ভব মনে হয়?

ষোড়শী তেমনি আস্তে আস্তে বলিল, একেবারে অসম্ভবও নয়। এমনি সহসা তিনি মাঝে মাঝে কোথায় চলে যান।

আবার কতদিনে ফিরে আসেন?

কিছু ঠিক নেই। এবার ত প্রায় বছর-তিনেক পরে ফিরে এসেছিলেন।

বসু কহিলেন, তা হলে চলুন আমরা বাড়ি ফিরে যাই।

চলুন, বলিয়া ষোড়শী অগ্রসর হইতেই বসু কহিলেন, কিন্তু যাবার সুযোগ ত দেখচি যোল আনাই হয়েচে। একে ত বালির ওপর পথের চিহ্নমাত্র নেই, তাতে অন্ধকার এমনি যে নিজের হাত-পা পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

ষোড়শী নীরবে ধীরে ধীরে চলিতে শুরু করিয়াছিল, কিছুই বলিল না।

বসু কহিলেন, হাওয়ার শব্দে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু বৃষ্টি পড়চে। গাছতলা পার হলেই ভিজতে হবে। এ-কথাতেও ষোড়শী যখন কথা কহিল না, তখন বসু

কহিলেন, দেখুন, পথ-ঘাট আমি কিছুই চিনিনে, তা ছাড়া শুনেচি এ-অঞ্চলে সাপ-খোপের ভয়টাও খুব বেশী। এই ভয়ানক অন্ধকারে কি—

ষোড়শী থামিল না, চলিতে চলিতে কহিল, পথ আমি চিনি। আপনি আমার ঠিক পিছনে পিছনে আসুন।

বসুসাহেব হাসিলেন, কহিলেন, অর্থাৎ সর্পাঘাতের দুর্ঘটনা ঘটে ত আপনার উপর দিয়েই যাক। তা বটে! আপনি সন্ন্যাসিনী, এ প্রস্তাব আপনি করতেও পারেন, কিন্তু আমার মুস্কিল এই যে, আমিও পুরুষমানুষ। অবশ্য এ-কথা আপনি কাউকে বলবেন না জানি, এমন কি হৈমকেও না, কিন্তু তবুও ওটা ঠিক পেরে উঠব না।

এবার ষোড়শী থমকিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে দেখা গেল না বটে, কিন্তু সাহেবের কথা শুনিয়া তাহারও মুখে হাসি ফুটিল। মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া কহিল, আপনি তাহলে কি রকম করতে বলেন?

সাহেব কহিলেন, বলা শক্ত। কিন্তু পরামর্শ স্থির হবার পূর্ব্বেই ভিজে উঠতে হবে। বটপত্রে আর বৃষ্টি মানচে না।

কথাটা সত্য। কারণ; উপরের জলধারা ফোঁটায় ফোঁটায় নীচে নামিতে সুরু করিয়াছিল। ষোড়শী কহিল, আপনি বরঞ্চ ওই ঘরটার মধ্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি হৈমকে খবর দিয়ে আলো এবং লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিই গে! আমার অভ্যাস আছে, এ জলে বিশেষ ক্ষতি হবে না।

সাহেব কহিলেন, অত্যন্ত মনোরম প্রস্তাব। কারণ, বাঙালী সাহেব হয়ে উঠলে যা হন সে আপনি বেশ জানেন দেখচি। কিন্তু আমার সম্বন্ধে আজও একটুখানি ত্রুটি রয়ে গেছে। হৈম মাঝে থাকায় আমার ভেতরের সঙ্গে বাইরের এখনও সম্পূর্ণ একাকার হয়ে উঠতে পায়নি। এ প্রস্তাবও অচল, সুতরাং চলাই স্থির। চলুন।

বৃক্ষতল ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দুইজনেই বুঝিলেন অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ, বায়ুবেগে বৃষ্টিধারাই যে কেবল গায়ে সূচের মত বিঁধিতেছে তাই নয়, ইতিপূর্ব্বে যে শুষ্ক বালুকারাশি আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া শূন্যে উড়িয়াছে জলধারায় ধুইয়া মাটিতে না পড়া পর্য্যন্ত চোখ চাহিয়া পথ চলা দুঃসাধ্য।

নিঃশব্দে চলিতে চলিতে ষোড়শী হঠাৎ পিছনে শব্দ শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনার লাগল না কি?

বসুসাহেব কোনমতে সামলাইয়া লইয়া সোজা হইয়া, কহিলেন, হাঁ কিন্তু প্রত্যাশার অতিরিক্ত কিছু নয়। চশমা-শুদ্ধ চোখ আমার চারটে বটে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তিটা চার ভাগের এক ভাগ থাকলেও বাঁচতাম। চলুন।

ষোড়শী চলিল না, একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ভাল দেখতে পাচ্চেন না?

বসু কহিলেন, সত্যি। তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, বিস্তর ইংরাজী বই মুখস্থ করে সাহেব হতে হয়েচে—তার দক্ষিণাটাও তারা বেশ বড় করেই নিয়েচে। কিন্তু তাই বলে আর দাঁড়িয়ে ভেজাবেন না—এগোন, দু'চক্ষু বুজে চললে যতটা দেখতে পাওয়া যায়, আমি ততটা দেখতে পাবই, এ আমি আপনাকে নিশ্চয় ভরসা দিচ্চি।

ষোড়শীর কণ্ঠস্বর করুণায় কোমল হইয়া উঠিল, কহিল, তা হলে নদীটা পার হতে আপনার ত ভারি কষ্ট হবে।

বসু বলিলেন, তা ঠিক জানিনে। তবে নদী পার হবার পূর্ব্বেও বিশেষ আরাম পাচ্চিনে। কিন্তু তাই বলে এই মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও সমস্যার মীমাংসা হবে না।

ষোড়শী এক পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, আপনি আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে আসুন, এই বলিয়া সে তাহার হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

এই অপরাচিতা নারীর আচরণ ও সাহস দেখিয়া বাক্‌পটু ব্যারিস্টার ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। কিন্তু সে ওই ক্ষণকালমাত্রই। তারপর সে প্রসারিত হাতখানি নিঃশব্দ ব্যগ্রতায় আশ্রয় করিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, চলুন। এইবার আমি সত্যি সত্যিই দু'চক্ষু বুজে চলতে পারব।

ষোড়শী ইহার কোন উত্তর দিল না। উভয়ে ধীরে ধীরে কিছুদূর অগ্রসর হইলে বসুসাহেব অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, আপনার প্রতি আমি সেদিন ভদ্র ব্যবহার করিনি। তার জন্য ক্ষমা চাইচি, আপনি আমাকে মাপ করবেন।

ষোড়শী এ-কথার উত্তরেও কিছুই বলিল না, তেমনি নিঃশব্দে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

বসু কহিলেন, আপনি হৈমর ছেলেবেলার বন্ধু। আমার সেদিনের আচরণ যাই হোক, আমাকেও ঠিক শত্রু বলেই মনে রাখবেন না। বলিয়া তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিলেন।

ষোড়শী একেবারেই নির্ব্বাক্। বসুসাহেব নিজেও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, এঁরা যে আপনাকে সহজে ছাড়বেন তা মনে হয় না। খুব সম্ভব মামলা-মকদ্দমাও হবে। ফকিরসাহেব হয়ত সত্যিই চলে গেছেন, আমিও বোধ হয় থাকব না—

ষোড়শী কিছুই বলিল না। তিনি নিজেও একটু মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আপনি নিজে আর দেবীর পূজো করবেন না বলেচেন, এ কি রাগ করে?

ষোড়শী এবার জবাব দিল, কহিল, না।

তা হলে এর কি সত্যই কোন কারণ আছে?

ষোড়শী এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, কিন্তু কথা কহিল, বলিল, আমরা এবার নদীতে এসেচি, আপনাকে একটু সাবধানে নামতে হবে।

ইহার পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথাই হইল না। ষোড়শী সযত্নে সাবধানে তাঁহাকে জল পার করিয়া লইয়া গেল। আসিবার সময় সাহেব জুতা খুলিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আর সাহস করিলেন না, যেমন ছিলেন তেমনই গিয়া পরপারে উঠিলেন। একটা তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল, বাঁচলাম।

এই মস্ত ফাঁড়া কাটাইয়া দিয়া সাহেব অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইয়া কহিলেন, পূজারী একজন আছে বটে, কিন্তু পূজাটা আপনারও একটা কাজের মধ্যেই। অথচ সে-প্রশ্নটা আপনি চাপা দিলেন। এদিকে যে ভীষণ দুর্দ্দান্ত শয়তান জমিদারটাকে বাঁচানো আপনার কর্ত্তব্যের অঙ্গ ছিল না, তাঁকে যে উপায়ে বাঁচালেন তা কেবল আশ্চর্য্য নয়, অদ্ভুত। এই দুটো ব্যাপারই এমন দুর্বোধ্য যে, গ্রামের লোক বুঝলে না বলে অভিমান করা চলে না।

ষোড়শী তেমনি মৃদু-স্বরেই এ অনুযোগের জবাব দিয়া কহিল, অভিমান আমি করিনি।

বসু বলিলেন, করেননি? সেও অদ্ভুত। আপনার বাবার আচরণ আবার আরও অদ্ভুত। হৈম বলে—কিন্তু হৈমর কথা এখন থাক্। কিন্তু আমি বলি, এদের সমস্ত অপরাধটা কেন বুঝিয়েই বলুন না? তাতে কতটা কাজ হবে আমি জানিনে, কিন্তু সে যাই হোক, নারীর সুনামটা ত অবহেলার বস্তু নয়। এই বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন, কিন্তু ষোড়শী কোন প্রত্যুত্তরই যখন দিল না, তখন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বুঝা গেল এই সুনাম-দুর্নাম সম্বন্ধেও সাধারণ রমণীর মত আপনার বিশেষ কোন মাথা-ব্যথা নেই। আর সাধারণও ত আপনি ন'ন। তা ছাড়া চুপ করে থাকার এই জিদ—এও অদ্ভুত। বাস্তবিক আপনার সকলই অদ্ভুত। এই বলিয়া নিজে একটুখানি চুপ করিয়া কহিলেন, সেদিন একটিবার মাত্র আপনাকে দেখেচি, আর আজ হাত ধরে এগিয়ে চলেচি। যাকে আশ্রয় করেচি, তিনিও আমার কাছে যেমন অন্ধকার, যার মধ্যে দিয়ে চলেচি সেও তেমনি অন্ধকার। তবুও নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে যাত্রা করার কোন বাধা হয়নি। আপনাকে ভক্তি না করে থাকবার জো নেই। এই বলিয়া আবার কিছুক্ষণ কোন একটা কথার প্রত্যাশায় থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, আপনি ত সন্ন্যাসিনী। শ্বশুরমশাই আমার যাই কেন করুন না, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে এই-সব মামলা-মকদ্দমা করায় আপনার গরজ কি?

ষোড়শী এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল, কোন গরজ নাই।

তা হলে?

ষোড়শী কহিল, আপনি কোন আশঙ্কা করবেন না; নিরুপায় দুর্ব্বল নারীর ভাগ্যে চিরদিন যা হয়ে আসচে এ-ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হবে না।

কথার খোঁচাটা বসুসাহেবের বিঁধিল, কিন্তু তিনি প্রতিবাদও করিলেন না, প্রতিঘাতও করিলেন না। তারপর উভয়েই নিঃশব্দে চলিতে লাগিলেন। ঝড় এবং জল কোনটাই থামে নাই বটে, কিন্তু গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার প্রকোপ মন্দীভূত হইল, এবং পথের বাঁকটা ঘুরিতেই অদূরে সনাতন মাইতির কুটীরের আলোক দু'জনেরই চোখে পড়িল। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ষোড়শী থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তেমন অন্ধকার আর নেই, আপনি এই পথ ধরে সোজা গেলেই রায়মশায়ের দোরগোড়ায় গিয়ে পৌঁছবেন।

আর আপনি?

আমার পথ এই বাঁ দিকের বাগানের ভেতর দিয়ে।

বসু হাত ছাড়িলেন না, কহিলেন, পরের মুখে শুনেচি আপনি অতিশয় শিক্ষিতা, আমি নিজে কতটুকু জেনেচি সে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এর বেশী জানবার অবকাশ আর যদি কখনো ভাগ্যে নাও ঘটে, আজকের এই অভিযানের স্মৃতিটা আমার চিরদিন বড় শ্রদ্ধার সঙ্গেই মনে থাকবে।

ষোড়শী মৃদু হাসিয়া কহিল, কিন্তু, কেবলমাত্র এইটুকুই যদি কেউ বাইরে থেকে দেখে থাকে, তার সঙ্গে আপনার মতের মিল হবে না।

সাহেব মনে মনে চমকিয়া গেলেন। তারপরে সেই ধরা হাতটির উপর আর একটুখানি চাপ দিয়া ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, না, বানিয়ে বলা গল্পের মত শোনাবে। তাই একে ঘুলিয়ে নোঙরা করে না তুলে বরঞ্চ চুপ করে থাকাই ভাল। এই না?

ষোড়শী ইহার জবাব না দিয়া কহিল, আমার জন্যে অপেক্ষা করে অনেক ভিজেছেন, অনেক দুঃখ পেয়েচেন—আর না। আমিও চললাম।

বসু কহিলেন, এই কথাটাই হয়ত আমাকে অনেকদিন ধরে ভাবতে হবে। কাল আমরা যাচ্চি—হৈমকে কি কিছু বলে পাঠাবেন না?

ষোড়শী একমুহূর্ত্ত ভাবিয়া কহিল, না। কেবল তার ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করচি, যদি ইচ্ছে হয় এইটুকু জানাবেন। এই বলিয়াই সে আর কোন প্রশ্নোত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অন্ধকার বন-পথ ধরিয়া নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সাহেব সেইখানে বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটা নমস্কার পর্য্যন্ত করা হইল না—যে ফকিরের জন্য এই, তাঁহার উদ্দেশ্যে একটা

নমস্কার পর্য্যন্তও জানানো হইল না। তাহার পরে নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

১০

বসুসাহেব যখন শ্বশুরবাটীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহারই জন্য বাড়িময় একটা উৎকণ্ঠার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ঘরে এবং বাইরে সেখানে যত আস্ত এবং ভাঙা লণ্ঠন ছিল সংগ্রহ হইয়াছে, এবং এই দুর্য্যোগের রাত্রে এগুলিকে কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় বাড়িশুদ্ধ সকলে গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। চাকর-বাকর ও আত্মীয়-অনুগত লইয়া একটা অভিযানের দল তৈরি হইয়াছে এবং রায়মহাশয় নিজে সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেছেন; কাহারা কোন্‌দিকে যাইবে, কোন্ পথ, কোন্ মাঠ, কোন্ বনজঙ্গল অনুসন্ধান করিবে, বারংবার উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার আচরণে ও কণ্ঠস্বরে কেবল উদ্বেগ নয়, আতঙ্ক প্রকাশ পাইয়াছে। এখনও প্রকাশ করিয়া কিছু বলেন নাই সত্য, কিন্তু যে ভয়টা তাঁহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতেছে তাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তিনি জানিতেন ষোড়শীর কয়েকজন একান্ত অনুগত ভূমিজ ও বাগ্‌দী প্রজা আছে। তাহারা এমন উদ্ধত তেমনি নিষ্ঠুর, ডাকাতি করে বলিয়া পুলিশের খাতায় নাম-ধাম পর্য্যন্ত লেখা আছে—ইহারা এই অন্ধকার রাত্রে কোথাও একাকী পাইয়া যদি তাহাদের ভৈরবী-মায়ের প্রতি অবিচার স্মরণ করিয়া সহসা প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া উঠে ত, সেখানেও বিচারের আশা করা বৃথা।

হৈম একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিল, পিতার আশঙ্কাও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সে ভিতরের আসল কথাটা জানিত না। এইটাই আত্মপ্রকাশ করিল তাহার জননীর কথায়। তিনি হঠাৎ বাহিরে আসিয়া স্বামীকে কঠোর অনুযোগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, সে জামাই মানুষ, তাকে কেন তোমাদের ঝগড়ার মধ্যস্থ মানা? যার পিছনে ডাকাতের দল রয়েচে তাকে করবে তোমরা জব্দ? যেখানে পাও আমার নির্ম্মলকে খুঁজে এনে দাও, নইলে যেখানে দু'চক্ষু যায় এই অন্ধকারে আমি বেরিয়ে যাবো। এই বলিয়া তিনি কাঁদ-কাঁদ হইয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন, এবং কিছুক্ষণের জন্য কন্যা ও পিতা উভয়েই নির্ব্বাক বিবর্ণমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

জনার্দ্দন রায় আত্মসংবরণ করিয়া সান্ত্বনা ও সাহসসূচক কি একটা কথা হৈমকে বলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক এমনি সময়ে জামাতা প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া জল ঝরিতেছে, জামা কাপড় জুতা কাদামাখা। শ্বশুরের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল—কিন্তু পরক্ষণেই, যে সাহেব-জামাইকে তিনি যথেষ্ট খাতির এবং ভয় করিতেন তাহাকেই আনন্দের উৎকট প্রাবল্যে যা মুখে আসিল তাই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

সাহেব নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া হাতের ভাঙ্গা ছড়িটা রাখিয়া দিলেন, এবং পায়ের জুতা হাত দিয়া টানিয়া ফেলিয়া গায়ের ভিজা জামাটা খুলিয়া ফেলার মধ্যে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, আত্মীয়-পর সকলে একযোগে ও নির্ব্বিশেষে প্রশ্ন করতে লাগিল, কি করিয়া এ দুরবস্থা ঘটিল এবং কোথায় ঘটিল ?

রায়মহাশয় প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, আচ্ছা, সে পরে হবে, তুমি বাড়ির ভেতরে যাও। মা হৈম, দাঁড়িয়ে থেকো না, একটা শুক্‌নো কাপড়-চোপড় দাও গে।

বাটীর মধ্যে শাশুড়ী ও সমবেত কুটুম্বিনীগণের প্রশ্নের উত্তরে নির্ম্মল জানাইল, সে ও-পারে ফকিরসাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু সাক্ষাৎ হয় নাই, তিনি আশ্রমে নাই।

ও-পারের নামে নানা প্রকার আতঙ্কসূচক অস্ফুট ধ্বনি উঠিল। রায়মহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া! আমাকে বললে ত তাকে ডেকে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু এই অন্ধকারে পথ চিনলে কি করে ?

নির্ম্মল কহিল, পথ চেনবার আমার দরকার হয়নি, হলে পারতাম না।

কিন্তু এলে কি করে ?

একজন আমাকে হাত ধরে এনে বাড়ির সামনে দিয়ে গেছেন।

চতুর্দ্দিকে প্রশ্ন উঠিল—কে ? কে ? কি নাম তার ?

নির্ম্মল একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিল, কি জানি, নামটা জানাতে হয়ত তাঁর আপত্তি আছে।

রায়মহাশয় প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, আপত্তি ? কখ্‌খনো না, আমাদের দেশের লোককে তুমি চেনো না। কিন্তু যাই হোক তাকে খুশী করে দেওয়া চাই ত ? বলিয়া চাকরকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া হুকুম করিয়া দিলেন, অধর চাটুয্যে যদি বাইরে থাকে, এখনি বলে দে কাল সকালেই খবর নিয়ে যেন বক্‌শিস দেওয়া হয়। পুরো টাকাই যেন তার হাতে পড়ে—কেটে যেন কিছু না রাখে। চাটুয্যেটা আবার যে কৃপণ! বলিয়া তিনি ঔদার্য্যের আবেগে প্রথমে গৃহিণী ও পরে কন্যা-জামাতার মুখের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন।

রাত্রে আহারাদি পর নিরালা ঘরের মধ্যে স্বামীকে একাকী পাইয়া হৈম কহিল, বাবা ত পুরস্কারের ঘোষণা করে দিলেন, পুরো টাকাটা দেবার চেষ্টাও হয়ত কিছু হবে, কিন্তু ফল হবে না।

নির্ম্মল কহিল, না, আসামীকে পাওয়া যাবে না।

হৈম একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তুমি সেই দয়ালু লোকটিকে কি পুরস্কার দিলে ?

নির্ম্মল কহিল, দেওয়া জিনিসটা কি তুমি এতই সোজা মনে কর ? ও কি কেবল মাত্র দাতার মর্জ্জির উপরেই নির্ভর করে ?

তা হলে দিতে পারোনি ?

না, দেবার চেষ্টাও করিনি।

হৈম স্বামীর মুখের প্রতি একমুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমার উচিত। বাবা তাঁকে বার করতে পারবেন না, কিন্তু আমি পারব।

নির্ম্মল সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কহিল, আমার মনে হয় তোমার বাবার মত তুমিও তাঁকে খুঁজে পাবে না।

হৈম বলিল, যদি পাই ত আমাকেও কিছু পুরস্কার দিয়ো। কিন্তু আমি তাঁকে চিনেচি। কারণ তোমার মত অন্ধ মানুষকে যে এই ভয়ানক অন্ধকারে নির্ব্বিঘ্নে নদী পার করে ঘরের সামনে রেখে যেতে পারে, অথচ আত্মপ্রকাশ করে না, তাঁকে চিনতে পারা শক্ত নয়। তা ছাড়া, সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢেকে আমিও একবার তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি ঘর-দোর খোলা; তিনি নেই বটে; কিন্তু তারাদাস ঠাকুর সব দখল করে বসে আছেন। লুকিয়ে পালিয়ে এলাম। পথে একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হ'লো, সে বলে দিলে ষোড়শীকে সে সোজা নদীর পথে যেতে দেখেচে। এখন বুঝলে, যে দয়ালু লোকটি তোমাকে দিয়ে গেছেন তাঁকে আমি চিনি। কিন্তু সত্যি-সত্যিই কি একেবারে হাত ধরে রেখে গেছেন ?

নির্ম্মল ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, সত্যই তাই। যে-মুহূর্ত্তে তিনি নিশ্চয় বুঝলেন আমি অন্ধের সমান, সেই মুহূর্ত্তে নিঃসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমার হাত ধরে আসুন। কিন্তু পরের জন্য একাজ তুমি পারতে না।

হৈম অত্যন্ত সহজে স্বীকার করিয়া কহিল, না।

তাহার স্বামী কহিল, তা জানি। ইহার পরে কি করিয়া কি হইল সমস্ত ঘটনা একে একে বিবৃত করিয়া কহিল, অথচ এ ছাড়া আমার পক্ষে যে কি উপায় ছিল জানিনে। আবার ওদিকে তাঁর বিপদের গুরুত্বটা একবার ভেবে দেখ। আমাকে তিনি সামান্যই জানতেন এবং তাও বোধ হয় ভাল করে জানতেন না। তবুও আমাকেই এই যে নির্জ্জন অন্ধকার পথ দিয়ে নিয়ে এলেন, এর দায়িত্বটা কত বিশ্রী, কত ভয়ঙ্কর! বস্তুতঃ পথে চলতে চলতে আমার অনেকবার ভয় হয়েচে যদি কারো

সুমুখে পড়ি, তার চোখে এটা কিরকম দেখাবে? দেখ হৈম, তোমাদের দেবীর এই ভৈরবীটিকে আমি চিনতে পারিনি সত্যি, কিন্তু এটুকু আজ নিশ্চয় বুঝেচি এঁর সম্বন্ধে বিচার করার ঠিক সাধারণ নিয়ম খাটে না। হয় সতীত্ব জিনিসটা এঁর কাছে নিতান্তই একটা বাহুল্য বস্তু—তোমাদের মত তার যথার্থ রূপটা ইনি চেনেন না, না হয় এর সুনাম দুর্নাম একে স্পর্শ পর্য্যন্ত করতে পারে না।

হৈম ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তুমি কি জমিদারের ঘটনা মনে করেই এ-সব বলচ?

নির্ম্মল বলিল, আশ্চর্য্য নয়। স্ত্রীলোকটি ভাল কি মন্দ আমি জানিনে, কিন্তু এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি, ইনি যেমন গম্ভীর, তেমনি শিক্ষিত, তেমনি নিঃশঙ্ক। শাস্ত্রে বলে, সাত পা একসঙ্গে চললে বন্ধুত্ব হয়; এতবড় পথটায় এই দুর্ভেদ্য আঁধারে নিতান্তই তাঁকে নির্ভর করে অনেক পা আমরা একসঙ্গে চলে এসেচি, একটি একটি করে অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেচি, কিন্তু কালও তিনি যেমন রহস্যে ঢাকা ছিলেন আজও তেমনি রয়ে গেলেন।

হৈম কহিল, তোমার জেরাও মানলে না, বন্ধুত্বও স্বীকার করলে না?

নির্ম্মল কহিল, না, কোনটাই হ'লো না।

হৈম এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, একটুও না? তোমার দিক থেকেও না?

নির্ম্মল কহিল এতবড় কথাটা কেবল ফাঁকি দিয়ে বার করে নিতে চাও? কিন্তু নিজেকে জানতেও যে দেরি লাগে হৈম। কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে চমকিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল হৈমও তাহার প্রতি দুই চক্ষের স্থির দৃষ্টি পাতিয়া আছে। তাহার মুখে কি ভাব প্রকাশ পাইল, প্রদীপের স্বল্প আলোকে ঠিক বোঝা গেল না, এবং সে নিজেও যে নিজের পূর্ব্ব কথায় যোগ রাখিয়া হঠাৎ কি বলিবে, ভাবিয়া স্থির করিবার পূর্ব্বেই হৈম ধীরে ধীরে কহিল, সে ঠিক। তবু পুরুষমানুষদের বুঝতে হয়ত একটু দেরিই হয়, কিন্তু মেয়েমানুষের এমনি অভিশাপ যে, আমরণ নিজের অদৃষ্টকে বুঝতেই তার কেটে যায়। আচ্ছা তুমি ঘুমোও, আমি এখুনি আসচি, বলিয়া সে আর কোন কথার পূর্ব্বেই উঠিয়া সাবধানে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

নির্ম্মল তাহার হাত ধরিল না—রহস্যের অন্তরালে স্ত্রীর এই অর্থহীন সংশয় ও অবিচারের বেদনা তাহাকে যেন অকস্মাৎ ক্রোধে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সুমুখের বড় ঘড়িটার অত্যন্ত ক্লেশকর মিনিটের কাঁটাটা নড়িতে নড়িতে নীচে ঝুলিয়া পড়িল, কিন্তু তখন পর্য্যন্তও যখন সে ফিরিয়া আসিল না, তখন সে আর একাকী শয্যায় থাকিতে না পারিয়া ধীরে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, অন্ধকার বারান্দায় একটা থামের পাশে হৈম চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কাছে আসিয়া

মাথায় গায়ে হাত দিয়া দেখিল, বৃষ্টির ছাটে সমস্ত ভিজিয়া গেছে। হাত ধরিয়া ঘরে আনিয়া কহিল, তুমি পাগল হয়েচ হৈম ?

ইহার অধিক আর তাহার মুখেও আসিল না, আসার প্রয়োজনও বোধ করিল না। প্রদীপের আলোকে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল, অশ্রুর আভাস চোখের কোণ হইতে তখন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই।

১১

সকালে উঠিয়া হৈম নিজের গত রাত্রির ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। নির্দ্দোষ ও চরিত্রবান স্বামীর প্রতি এই অহেতুক অভিমানের উৎপাতটাকে সে ঝড় জল ও দুর্যোগের মধ্যে তাহার আকস্মিক নিরুদ্দেশের আতঙ্কটার ঘাড়েই চাপাইয়া দিয়া মনে মনে হাসিতে চাহিল কিন্তু সমস্ত প্রাণটাকে খুলিয়া দিয়া যে হাসি তাহার চিরদিনের অভ্যাস, কিছুতেই আজ তাহার আর নাগাল পাইল না। চোখের বালি বাহির হইয়া গিয়াছে বুঝিয়াও অবোধ চোখ-দুটা যেন তাহার কোন মতে নিঃশঙ্ক হইতে চাহিল না। শিরোমণিমহাশয় নিজে আসিয়া শুভক্ষণ স্থির করিয়া দিয়াছেন—সাড়ে দশটা না কিছুতেই উত্তীর্ণ হয়। মা ভাঁড়ার-ঘরে যাত্রার আয়োজন ও রান্নাঘরে খাবার ব্যবস্থা করিতে অতিশয় ব্যস্ত; তাঁহার মুহূর্ত্তের অবকাশ নাই, এমনি সময়ে সদর হইতে ডাক আসিল, রায়মহাশয় কন্যাকে আহ্বান করিয়াছেন।

হৈম বাহিরে আসিয়া দেখিল কিসের যেন একটা উৎসব চলিয়াছে। পিতা ফরাসের উপর বাঁধা-হুঁকা হাতে বার দিয়া বসিয়াছেন. শিরোমণি মহাশয় আছেন, জমিদারের গোমস্তা এককড়ি নন্দী আছে, তারাদাস আছে, আরও কয়েকজন গণ্য-মান্য ব্যক্তি আছেন, তাহার স্বামীও একধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। উৎসাহ ও আনন্দের প্রাবল্যে সবাই একযোগে সংবাদটা হৈমর গোচর করিতে গিয়া প্রথমটা কি বলিল কিছু বুঝাই গেল না। শিরোমণির দাঁত নাই, কিন্তু আওয়াজ আছে—তাহার বিপুল শক্তি মুহূর্ত্তেই আর সমস্ত থামাইয়া দিয়া যাহা প্রকাশ করিল তাহা এইরূপ—কাল ভয়ানক দুর্য্যোগের রাত্রে মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে—নির্ব্বিঘ্নে শত্রুপুরী হস্তগত হইয়াছে। ভৈরবী বাড়ি ছিল না, চরের মুখে খবর পাইয়া তারাদাস সেই মেয়েটাকে লইয়া এই অবকাশে গিয়া সমস্ত দখল করিয়া লইয়াছে। বিবাদ করা দূরে থাক্‌, ভয়ে সে কথাটি পর্য্যন্ত বলে নাই, সামান্য কিছু কিছু জিনিস-পত্র লইয়া রাত্রেই বাহির হইয়া গেছে। প্রাচীরের বাহিরে মন্দির-সংলগ্ন যে

চালাটার মধ্যে দূরের যাত্রীরা কেহ কেহ রান্না-বাড়া করিয়া খায়, তাহাতেই আশ্রয় লইয়াছে। এ-সমস্ত মা-চণ্ডীর কৃপা এবং এই কৃপাটা আর একটুখানি বৃদ্ধি পাইলেই তাহাকে গ্রাম হইতে দূর করিয়া দেওয়াও কঠিন কাজ হইবে না।

উৎফুল্ল তারাদাস উপরের দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া সবিনয় হাস্যে কহিল, সমস্তই মায়ের কাজ—যা করবার তিনি করেচেন, নইলে অত বড় রায়বাঘিনী একেবারে ভেড়া হয়ে গেল। তামাকটি ধরিয়ে সবে ফুঁ দিচ্চি, মেয়েটা পাশে বসে চা-সিদ্ধটুকু ছেঁকে দিচ্চে, এমনি সময়ে কোথা থেকে ভিজতে ভিজতে এসে হাজির। আমাদের দেখে ভয়ে যেন একেবারে কাঠ হয়ে গেল; খানিক পরে আস্তে আস্তে বললে, বাবা, আমি ত কখনও বলিনি, তুমি যাও, কিংবা এখানে থেকো না। নিজে রাগ করে চলে গিয়ে কত না কষ্ট পেলে!

আমি বললাম, হুঃ—

দোরের উপরে উঠে বলল, এ ঘরে তুমি কি তালা দিয়েচ বাবা?

বললাম, হুঃ—দিইচি। কি করবি কর্।

চুপ করে থেকে বললে, তোমার সঙ্গে আমি কিছুই করব না বাবা, তোমরা থাকো। কেবল ঘরটা একবার খুলে দাও, আমার কাপড় দুখানা নিই।

দিলাম খুলে। মা-চণ্ডীর দয়ায় আর কোন দাঙ্গা করলে না; পরবার খান-দুই কাপড়, একটা কম্বল, আর একটা ঘটী নিয়ে অন্ধকারেই ভিজতে ভিজতে দূর হয়ে গেল। মাকে গড় হয়ে নমস্কার করে বললাম, মা, এমনি দয়া যেন ছেলের ওপর থাকে। তোর নাম না করে কখনো জলগ্রহণ করিনে।

শিরোমণি হাত নাড়িয়া কহিলেন, থাকবে। থাকবে। আমি বলচি তারাদাস, মা মুখ তুলে চাইবেন। নইলে তাঁর জগদম্বা নামই যে বৃথা।

এককড়ি কহিল, কিন্তু ঠাকুর, যাই বল, মায়ের গদি কখনো খালি থাকতে পারবে না, তোমার মেয়েটিকে নতুন ভৈরবী করতে বিলম্ব করলেও চলবে না বলে রাখচি।

রায়মহাশয় পোড়া হুঁকাটা পাশের লোকটির হাতে দিয়া পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, হবে, সব হবে, আমি সমস্ত ঠিক করে দেব, তোমরা ব্যস্ত হ'য়ো না। জামাতার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, কি বাবা, ছুঁড়ির কাছ থেকে একছত্র লিখিয়ে নেওয়া ত চাই? চাই বই কি! তাও হবে—ডেকে আনিয়ে দুটো ধমক দিয়ে এও আমি করিয়ে নেব। কিন্তু তাও বলে রাখচি তারাদাস, কদমতলার ওই জমিটে নিয়ে হাঙ্গামা করলে চলবে না। ধানের আড়তটা আমার সামনে সরিয়ে না আনলে চারদিকে আর চোখ রাখতে পারচিনে। মেলার নাম করে ষোড়শীর মত ঝগড়া করলে কিন্তু—

কথাটা সমাপ্ত করিতেও হইল না। অনেকেই তারাদাসের হইয়া রাজী হইয়া গেল, এবং সে নিজে জিভ কাটিয়া গদগদ-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, অমন কথা মুখেও আনবেন না রায়মশাই, আপনারই ত সব! হাতীর সঙ্গে মশার বিবাদ! কি বল মা? বলিয়া সে একটা ভাল কথা কিংবা একটুখানি ঘাড়-নাড়া কিংবা এমনি কিছু একটা শুনিবার প্রত্যাশায় হৈমর মুখের প্রতি চাহিল, এবং সেইসঙ্গে অনেকেরই দৃষ্টি তাহার উপরে গিয়া পড়িল। হৈম কিছুই কহিল না; পরন্তু তাহার মুখের চেহারায় ষোড়শীর সেই প্রথম বিচারের দিনটাই সকলের দপ্ করিয়া মনে পড়িয়া অপ্রত্যাশিত একটা নিরুৎসাহের মেঘ যেন কোথা হইতে আসিয়া পলকের নিমিত্ত ঘরের মধ্যে ছায়াপাত করিল—কিন্তু পলকমাত্রই। রায়মহাশয় সোজা হইয়া বসিয়া তামাকের জন্য একটা উচ্চ হাঁক দিয়া কহিলেন, বাবা নির্ম্মল, যাত্রার সময়টা শিরোমণি-মশায় দশটার মধ্যেই দেখে দিয়েচেন; মেয়েদের কাণ্ড—একটু সকাল সকাল তৈরি না হতে পারলে বার হওয়াই যাবে না।

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই হৈম নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

মুখ হাত ধোয়া হইতে স্নান পর্য্যন্ত সমাধা করিতে বোসসাহেবের বেশি বিলম্ব হইল না। বাটীর মধ্যে পা দিয়াই শাশুড়ীর উচ্চ-কণ্ঠ রান্নাঘর হইতে শুনা গেল, তিনি মেয়েকে লইয়া পড়িয়াছেন। সে যে ঘরের মধ্যে কি করিতেছে তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না। নির্ম্মল ঘরে ঢুকিয়া দেখিতে পাইল হৈম মেঝের উপর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি, তোমার মা যে ভারি বকাবকি করচেন? তা ছাড়া সময় ত বেশি নেই।

হৈম কহিল, ঢের সময় আছে—আজ ত আমাদের যাওয়া হতে পারে না।

কেন?

হৈম বলিল, কেন কি? ষোড়শীর এতবড় বিপদে তার সঙ্গে একবার দেখা না করেই যাবো?

নির্ম্মল কহিল, বেশ ত, দেখা করেই এসো না। তারও ত সময় আছে।

হৈম বলিল, আর তুমিই বা একবার দেখা না করে কি করে যেতে পারবে?

এ যে সেই গত-রাত্রির প্রতিক্রিয়া তাহা মনে মনে বুঝিয়া নির্ম্মল কহিল, চেষ্টা করলে তাও বোধ হয় পারা যাবে। অসম্ভব রকমের শক্ত কাজ নয়, কিন্তু আমি একবার দেখা করে গেলেই যে এ বিপদে তার সুবিধে হবে মনে হয় না।

হৈম প্রবল-বেগে মাথা নাড়িয়া শুধু কহিল, না, কোনমতেই সে হবে না।

হবে না কেন? তা ছাড়া আমার যে সেই সৈদাবাদের চামড়ার মামলা আছে—

থাক্ তোমার চামড়ার মামলা, একটা তার করে দাও, আজ তোমার কিছুতেই যাওয়া হবে না।

বেশ ত, চল না হয় দুজনে একবার দেখা করেই আসি? সে সময় ত আছে।

হৈম মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া বলিল, না, সে তোমার সেখানে হয়, কিন্তু এখানে হয় না। আর এত লোকের সামনে বাবাই বা কি মনে করবেন? রাত্রে আমরা লুকিয়ে যাবো।

নির্ম্মলের যথার্থই অত্যন্ত জরুরি মকদ্দমা ছিল, তা ছাড়া কোন্ ছুতায় যে যাওয়া এমন হঠাৎ স্থগিত করা যাইতে পারে, সে ভাবিয়া পাইল না, বিশেষতঃ শ্বশুরের সঙ্গে ইহাতে নিদারুণ বিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা। চিন্তা করিয়া সে কহিল, সে হয় না হৈম, যেতে আমাদের আজ হবেই। আর মনে হয় আমরা মাঝে পড়ে বিপদটা হয়ত তাঁর বাড়িয়ে তুলব। আমার কথা শোন, চল, অযাচিত মধ্যস্থতায় কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি হয়।

হৈম স্বামীর মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, আমাকে ত তুমি জানো, আজ আমি কিছুতেই যেতে পারব না। আর কালকের অপরাধে যদি আমাকে তুমি শাস্তি দিতেই চাও, ত ফেলে রেখে যাও। আমি আর তোমাকে আটকাবো না।

নির্ম্মল আর কিছু না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। শরীর ভাল নয়, আজ যাওয়া হইল না শুনিয়া শাশুড়ীঠাকুরাণী আশ্চর্য্য হইলেন, উদ্বিগ্ন হইলেন এবং ততোধিক খুশী হইয়া উঠিলেন, কিন্তু বাহিরের ঘরে বসিয়া শ্বশুরমহাশয় শুধু একটা হুঁ বলিয়াই তামাক টানিতে লাগিবেন। তিনি আশ্চর্য্যও হইলেন না, উদ্বিগ্নও হইলেন না, এবং যাহার কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান আছে, সে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া খুশীর কথা মুখে আনিলে না।

মকদ্দমার ব্যবস্থা করিতে নির্ম্মল তার করিয়া দিল এবং কাজটা যে কেবল নিরর্থক নয় মন্দ, তাহাও সে মনে মনে বুঝিল, তবুও সেই মনটাই তাহার সারাদিন একান্ত সংগোপনে সেই দিনান্তের জন্যই উন্মুখ হইয়া রহিল। বিগত রাত্রির হৈমর কান্নাটা যে কত হাস্যাস্পদ, কত অসম্ভব অপেক্ষাও অসম্ভব, সমস্তদিন ধরিয়া এ-কথা তাহার বহুবার মনে হইয়াছে, তবুও সেই একফোঁটা জল যেন কোনমতেই আর শুকাইতে চাহিল না এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই সে এমনই একটা অজ্ঞাত ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব রহস্যের সৃষ্টি করিয়া চলিল, যাহা একই কালে মাধুর্য্য ও তিক্ততায় মিশিয়া একাত্ম হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাত্রির অন্ধকারও পিতার চক্ষুকে ফাঁকি দিবার প্রয়াস নিষ্ফল বুঝিয়া হৈম স্বামী ও তাহার পশ্চিমা চাকরটাকে সঙ্গে করিয়া যখন ষোড়শীর নূতন বাসার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ষোড়শী একখানি কম্বলের উপর বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি একখানা বই পড়িতেছিল, সম্মুখে জুতার শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আসুন। এস দিদি, এস। এই বলিয়া সে গুটানো কম্বলখানি প্রসারিত করিয়া পাতিয়া দিল।

আসন গ্রহণ করিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিঃশব্দে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া হৈম কহিল, দিদির এই নতুন ঘরখানির আর যাই দোষ থাক্, অপব্যয়ের অপবাদ শিরোমণি-মশাই এমন কি আমার বাবা পর্য্যন্ত দিতে পারবেন না। এই আশ্চর্য্য বস্তুটি দেখবার লোভ দিয়েই আজ এঁকে ধরে রেখেচি, নইলে আমাকে সুদ্ধ নিয়ে দুপুরের গাড়িতে চলে গিয়েছিলেন আর কি! স্বামীকে কহিল, কেমন, এ না দেখে গেলে অনুতাপ করতে হ'তো?

নির্ম্মল কহিল, দেখেও ত কিছু কম করতে হবে মনে হয় না।

হৈম স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, সে ঠিক। হয়ত চোখে না দেখলেই ছিল ভাল। তাহার পর ষোড়শীর শান্ত মলিন মুখখানির উপর নিজের স্নিগ্ধ চোখ দুটি রাখিয়া বলিল, আমরা সমস্তই শুনেচি, কিন্তু এ পাগলামি কেন করতে গেলে দিদি, এ-ঘরে তুমি ত থাকতে পারবে না! আবেগে ও করুণায় শেষ দিকটায় তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

কিন্তু ষোড়শীর গলায় ইহার প্রতিধ্বনি বাজিল না। সে অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, অভ্যাস হয়ে যাবে। এর চেয়ে কত খারাপ ঘরে কত মানুষকে ত থাকতে হয় ভাই। তা ছাড়া বাবার বড় কষ্ট হচ্ছিল।

হৈম প্রশ্ন করিল, তা হলে সমস্তই ছেড়ে দিলে?

ইহার উত্তর তাহার স্বামীর নিকট হইতে আসিল, সে কহিল, এ-ছাড়া আর কি উপায় আছে বলতে পারো? সমস্ত গ্রামের সঙ্গে ত একজন অসহায় স্ত্রীলোক দিবারাত্রি বিবাদ করে টিকতে পারে না। ষোড়শীকে কহিল, এই ভাল। যদি স্বেচ্ছায় এইখানে থাকাই সঙ্কল্প করে থাকেন, এবং কুটীর-বাসও অভ্যাস হয়ে যাবে বিশ্বাস করে থাকেন—সংসারে কিছুই ত্যাগ করা আপনার শক্ত হবে না।

ষোড়শী মৌন হইয়া রহিল এবং তাহার মুখ দেখিয়াও তাহার মনের কথা কিছুই বুঝা গেল না।

হৈম বলিল, তুমি সন্ন্যাসিনী, বিষয়-আশয় ছাড়া তোমার কঠিন নয়, কুঁড়েও তোমার সইবে আমি জানি, কিন্তু এর সঙ্গে যে মিথ্যে দুর্নাম লেগে রইল সেও কি সইবে দিদি?

ষোড়শী হাসিমুখে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিল, দুর্নাম যদি মিথ্যেই হয়, সইবে না কেন? হৈম, সংসারে মিথ্যে কথার অভাব নেই, কিন্তু তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে যে আবার মিথ্যে কাজের সৃষ্টি হয় তার গুরুভারটাই সওয়া যায় না।

হৈম কহিল, কিন্তু এককড়ি নন্দী যে কথা এবং কাজ দুই-ই মিথ্যে রটিয়ে বেড়াচ্চে? মেয়েমানুষের জীবনে সে যে অসহ্য।

ষোড়শী লেশমাত্র উত্তেজিত হইল না, আস্তে আস্তে কহিল, আমি যতদূর শুনেচি, এককড়ি মিথ্যে ত বিশেষ বলেনি। জমিদারবাবু হঠাৎ অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন, ঘরে আর কেউ ছিল না—আমি তার সেবা করেছি। এ ত অসত্য নয়।

হৈম উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। আর একজনের ধীরতার তুলনায় তাহার কণ্ঠস্বর কিছু অনাবশ্যক তীক্ষ্ণ শুনাইল, কিন্তু সকলেই ত সব কাজ পারে না দিদি। আর্ত্তের সেবা করারও ত একটা ধারা আছে।

ষোড়শী মৃদুকণ্ঠে বলিল, আছে বৈ কি। কিন্তু স্থান কাল না বুঝে কেবল বাইরে থেকে ধারাটা স্থির করে দেওয়া যায় না হৈম। আপনি কি বলেন? এই বলিয়া সে নির্ম্মলের প্রতি চাহিয়া একটু হাসিল।

নির্ম্মল এ ইঙ্গিত সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া কহিল, অন্ততঃ আমি ত কোনমতেই অস্বীকার করতে পারিনে। তা ছাড়া কাজের ধারা সকলের একও নয়—এই যেমন সন্ন্যাসিনীর।

স্বামীর এই উক্তিটাকে হৈম তলাইয়া দেখিল না, কহিল, হোক সন্ন্যাসিনী, কিন্তু তাঁর কি ধর্ম্ম নেই? তিনি কি নারী নন? আপনাকে সে ঘর থেকে ধরে নিয়ে গেল, অথচ বললেন নিজে গিয়েছিলেন। এই মিথ্যের কি আবশ্যক ছিল? তার অসুখ ত কেবল নিজের দোষে। তবুও এতবড় ঘোর পাপিষ্ঠকে বাঁচাবার আপনার কি দরকার ছিল? এর পরেও মানুষে যদি সন্দেহ করে, সে কি তাদের দোষ?

স্ত্রীর কথা শুনিয়া নির্ম্মল ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়া উঠিল। সে জানিত, অভিযোগ করিতে হৈম ঘর হইতে বাহির হয় নাই—বাড়ি চড়িয়া অপমান করিবার মত ক্ষুদ্র এবং হীন সে নয়, বস্তুতঃ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া একটা বড় রকমের ভরসা দিতেই সে উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু কথায় কথায় এ-সকল কি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পাছে আত্মবিস্মৃত হইয়া আরও বেশি কিছু বলিয়া বসে, এই ভয়ে ব্যস্ত হইয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আবশ্যক হইল না। ষোড়শী হাসিয়া বলিল, তোমার স্বামী বলছিলেন সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম অ-সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে নাও মিলতে পারে, এই যেমন কুঁড়ের মধ্যে নিরাশ্রয়, ধূলোবালির ওপর একাকী

বাস করা তোমার সহ্য হবে না। বলিয়া সে পুনরায় হাসিয়া কহিল, সত্যই আমাকে ঘর থেকে টেনে-হিঁচড়ে কেউ ধরে নিয়ে যায়নি, আমি রাগের মাথায় আপনি বেরিয়ে পড়েছিলাম।

নির্ম্মল কহিল, কিন্তু আপনার রাগ আছে বলে ত মনে হয় না?

ষোড়শী হাসি চাপিয়া শুধু বলিল, আছে বৈ কি! হৈমকে কহিল, কিন্তু সে তর্ক আমি করচিনে, সত্যই আমি মিথ্যে বলেছিলাম। কিন্তু ঘোর পাপিষ্ঠ বলে কি তাঁকে বাঁচাবার অধিকারও কারও নেই? তোমার স্বামী উকিল, তাঁকে বরঞ্চ সময়মত জিজ্ঞাসা করে দেখো।

নির্ম্মল বলিল, সময়মত সাধারণ বুদ্ধিতে একটা জবাব দিতে পারি, কিন্তু ওকালতি বুদ্ধিতে ত কিছুই খুঁজে পাচ্ছিনে।

ষোড়শী কহিল, তা ছাড়া এমন ত হতে পারে সজ্ঞানে অনেক কর্ম্মই তিনি করেন না—

হৈম বাধা দিয়া কহিল, তাই বলে কি নিজের বাপের বিরুদ্ধেও যেতে হবে? এও কি সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম?

ষোড়শী রাগ করিল না, হাসিমুখে কহিল, সন্ন্যাসিনীর হোক না হোক মেয়েমানুষের অন্ততঃ এমন জিনিস সংসারে থাকতে পারে যা বাপেরও বড়! তাই যদি না হ'তো হৈম, এই ভাঙা কুঁড়ের মধ্যে তোমার পায়ের ধুলোই বা পড়ত কি করে?

হৈম শশব্যস্তে হেঁট হইয়া তাহার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া কহিল, অমন কথা তুমি মুখেও এনো না দিদি। আমার শ্বশুরকে কোন এক রাজা একখানি তলোয়ার খিলাত দিয়েছিলেন, ছেলেবেলায় আমি প্রায় সেখানি খুলে খুলে দেখতাম। খাপখানা তার ধুলো-বালিতে মলিন হয়ে গেছে, কিন্তু আসল জিনিসে কোথাও এতটুকু ময়লা ধরেনি। সে যেমন সোজা, তেমনি কঠিন, তেমনি খাঁটি—তার কথা আমার তোমার পানে চাইলেই মনে পড়ে। মনে হয়, দেশশুদ্ধ লোক সবাই ভুল করেচে, কেউ কিছু জানে না—ইচ্ছে করলে চোখের পলকে সেই খাপখানা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারো। কেন দিচ্চ না দিদি?

ষোড়শী তাহার ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া কহিল, আজ তোমাদের যাওয়ার কথা ছিল, হ'লো না কেন? বোধ হয় কাল যাওয়া হবে?

হৈম তাহার স্বামীকে দেখাইয়া কহিল, রাত্রে কে একে হাত ধরে নদী মাঠ প্রান্তর নির্ব্বিঘ্নে পার করে এনে বাড়িতে দিয়ে গেছেন, আমার বাবা তাঁকে পুরো এক টাকা বকশিস দিতে চেয়েছেন। কিন্তু টাকাটা তাঁর হাতে পড়বে না, কারণ তিনি তাঁকে খুঁজে পাবেন না। এই অন্ধ মানুষটিকে অমন করে দিয়ে না গেলে যে

কি হ'তো সে কেবল আমিই জানি, আর আমিই কেবল তাঁর নাম জানি। কিন্তু টাকা-কড়ি ত তাঁকে দেবার জো নেই—তাই কেবল একটু পায়ের ধুলো নিতে—বলিয়া সে তাহার হাতখানি টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই ষোড়শী নিজের মুঠাটা শক্ত করিয়া রাখিয়া কেবল একটু হাসিল।

হৈম বাঁ হাত দিয়া তাহার চোখের কোণটা মুছিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, পায়ের ধুলো দিতে হবে না দিদি, মুঠোটা একটু আলগা কর—আমার হাত ভেঙ্গে গেল। শক্ত কেবল মনই নয়, হাতটাও কম নয়! ইস্পাতের তলোয়ারটা কি সাধে মনে পড়ে! কিন্তু এই কথাটি আজ দাও দিদি, আপনারা লোকের যদি কখনো দরকার হয় এই প্রবাসী বোনটিকে তখন স্মরণ করবে?

ষোড়শী তাহার হাতের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল, কিছুই বলিল না।

হৈম কহিল, তাহলে কথা দিতে চাও না?

ষোড়শী বলিল, আমার জন্যে তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয় এই কি আমি চাইতে পারি ভাই?

নির্ম্মল কহিল, ঝগড়া না করেও ত অনেক কিছু করা যায়?

ষোড়শী বলিল, আমি বলি তা-ও আপনাদের করে কাজ নেই। কিন্তু তাই বলে প্রবাসী বোনটিকে আমি ভুলে যাবো না। আমার খবর আপনারা পাবেন।

চাকরটা এতক্ষণ চুপ করিয়া বাহিরে বসিয়াছিল, সে কহিল, মা, কালকের মত আজও ঝড়-জল হতে পারে—মেঘ উঠেচে।

হৈম বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিয়া প্রণাম করিয়া এবার পায়ের ধুলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মল হাত তুলিয়া একটা নমস্কার করিয়া কহিল, আমি চিরদিন ঋণীই রয়ে গেলাম, শোধ দেবার আর কোন পথ রইল না। আদালতের মানুষ, বিষয় সম্পত্তিওয়ালা ভৈরবীর কাজে লাগলেও লাগতে পারতাম, কিন্তু কুঁড়ে-ঘরের সন্ন্যাসিনীরা আমাদের হাতের বাইরে। সমস্ত না ছেড়েও উপায় ছিল না সত্যি, কিন্তু ছেড়েও যে উপায় হবে তা ভরসা হয় না।

ষোড়শী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কে বললে আমি সমস্ত ছেড়ে দিয়েচি? আমি ত কিছুই ছাড়িনি।

নির্ম্মল ও হৈম উভয়েই অবাক হইয়া একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, ছাড়েননি? কোন স্বত্বই আপনি ত্যাগ করেননি।

ষোড়শী তেমনি শান্ত সহজ-কণ্ঠে কহিল, না, কিছুই না। আমি স্ত্রীলোক, আমি নিরুপায়, কিন্তু আমার ভৈরবীর অধিকার এক তিল শিথিল হয়নি। তাঁরা পুরুষ-মানুষ, তাঁদের জোর আছে, কিন্তু সেই জোরটা তাঁদের ষোল-আনা সপ্রমাণ না

করে আমার হাত থেকে কিছুই পাবার জো নেই—মাটির একটা ঢেলা পর্য্যন্ত না। নির্ম্মলবাবু, আমি মেয়েমানুষ, কিন্তু সংসারে সেটাই আমার বড় অপরাধ যাঁরা স্থির করে রেখেচেন, তাঁরা ভুল করেচেন। এ ভ্রম তাঁদের সংশোধন করতে হবে।

কথা শুনিয়া দুজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘরে তখনও আলো জ্বলে নাই—অন্ধকারে তাহার মুখ, তাহার চোখ, তাহার ক্ষীণ দেহের অস্পষ্ট ঋজুতা ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য হইল না, কিন্তু ওই শান্ত অবিচলিত কণ্ঠস্বরও যে মিথ্যা আস্ফালন উদ্গীর্ণ করে নাই, তাহা মর্ম্মের মাঝখানে গিয়া উভয়কেই সবলে বিদ্ধ করিল।

অনতিদূরের পথের বাঁকটার কাছে একটা গোলমাল শুনা গেল। আগে এবং পিছনে কয়েকটা আলোর সঙ্গে গোটা-দুই পাল্‌কি চলিয়াছে।

অন্ধকারে নজর করিয়া দেখিয়া নির্ম্মল কহিল, জমিদারবাবু তা হলে আজই পদধূলি দিলেন দেখচি।

ষোড়শী ভিতর হইতে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, জমিদারবাবু! তাঁর কি আসবার কথা ছিল? বলিয়া সে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নির্ম্মল কহিল, হাঁ, তাঁর নদীর ধারের নরককুণ্ডর ঝাড়ামোছা চলছিল। এককড়ি বলছিল, শরীর সারাবার জন্যে হুজুর আজকালের মধ্যেই স্বরাজ্যে পদার্পণ করবেন। করলেনও বটে।

ষোড়শী নির্ব্বাক্ হইয়া সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। বিদায় লইয়া নির্ম্মল আস্তে আস্তে কহিল, যত দূরেই থাকি, আমরা বেঁচে থাকতে নিজেকে একেবারেই নিরুপায় এবং নিরাশ্রয় ভেবে রাখবেন না। বলিয়া সে হৈমর হাত ধরিয়া অন্ধকারে অগ্রসর হইল। ষোড়শী তেমনি স্থির তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিল, এ কথার কোন উত্তর দিল না।

১২

বিপুলকায় মন্দিরের প্রাচীরতলে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর পাল্‌কি দুটা নিমেষে অন্তর্হিত হইল। এই অত্যন্ত আঁধারে মাত্র গোটা-কয়েক আলোর সাহায্যে মানুষের চক্ষে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু ষোড়শীর মনে হইল লোকটিকে সে যেন দিনের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইল। এবং শুধু কেবল তিনিই নন, তাঁহার পিছনে ঘেরা-টোপ ঢাকা যে পাল্‌কিটি গেল, তাহার অবরোধের মধ্যেও যে মানুষটি নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহারও শাড়ির চওড়া কালো পাড়ের এক প্রান্ত ঈষদুন্মুক্ত দ্বারের ফাঁক দিয়া ঝুলিয়া আছে, সেটুকুও যেন তাহার চোখে প'ড়্‌ল। তাহার

হাতে তীর-কাটা চুড়ির স্বর্ণাভা লণ্ঠনের আলোকে পলকের জন্য যে খেলিয়া গেল এ-বিষয়ে তার সংশয় রহিল না। তাহার দুই কানে হীরার দুল্ ঝল্‌মল্ করিতেছে, তাহার আঙুলে আঙটির পাথরে সবুজ রং ঠিকরাইয়া পড়িতেছে –

সহসা কল্পনা তাহার বাধা পাইয়া থামিল। তাহার স্মরণ হইল এ সমস্তই সে এইমাত্র হৈমর গায়ে দেখিয়াছে। মনে পড়িয়া একাকী অন্ধকারেও সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। চণ্ডী! চণ্ডী! বলিয়া সে সম্মুখের মন্দিরের উদ্দেশে চৌকাঠে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, এবং সকল চিন্তা দূর করিয়া দিয়া দ্বার ছাড়িয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইতে আর দুটি নর-নারীর চিন্তায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল।

ক্ষণেক পূর্ব্বেও সকল কথাবার্ত্তার মধ্যেও ঝড়-বৃষ্টির আশু সম্ভাবনা তাহার মনের মধ্যে নাড়া দিয়া গেছে। উপরে কালো ছেড়া মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইতেছে, হয়ত দুর্য্যোগের মাতামাতি অচিরেই আরম্ভ হইয়া যাইবে। বিগত রাত্রির অর্দ্ধেক দুঃখ ত তাহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেছে, বাকী রাতটুকু মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে দাঁড়াইয়া কোনমতে কাটিয়াছে; এই প্রকার শারীরিক ক্লেশ সহ্য করা তাহার অভ্যাস নয় দেবীর ভৈরবীকে এ সকল ভোগ করিতেও হয় না, তবুও কাল তাহার বিশেষ দুঃখ ছিল না। যে বাড়ি, যে ঘর-দ্বার স্বেচ্ছায় সে তাহার হতভাগ্য পিতাকে দান করিয়া আসিয়াছে, সে-সম্বন্ধে সারাদিন আজ কোন চিন্তাই সে করে নাই। কিন্তু এখন হঠাৎ সমস্ত মন যেন তাহার একেবারে বিকল হইয়া গেল। এই নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তে একাকিনী এই ভাঙা স্যাঁত-সেঁতে গৃহের মধ্যে কি করিয়া তাহার রাত্রি কাটিবে? নিজের আশে-পাশে চাহিয়া দেখিল। স্তিমিত দীপালোকে ঘরের ও-দিকের কোণ দুটা আবছায়া হইয়া আছে, তাহারই মাঝে মাঝে ইন্দুরের গর্ত্তগুলা যেন কালো কালো চোখ মেলিয়া রহিয়াছে, তাহাদের বুজাইতে হইবে, মাথার উপরে চালে অসংখ্য ছিদ্র, ক্ষণেক পরে বৃষ্টি শুরু হইলে সহস্রধারে ঝরিবে, দাঁড়াইবার স্থানটুকু কোথাও রহিবে না, এইসব লোক ডাকাইয়া মেরামত করিতে হইবে; কবাটের অর্গল নিরতিশয় জীর্ণ, ইহার সংস্কার সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, দিন থাকিতে লক্ষ্য করে নাই ভাবিয়া বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এই অরক্ষিত, পরিত্যক্ত পর্ণকুটীরে—কেবল আজ নয়—দিনের পর দিন বাস করিবে সে কেমন করিয়া?

তাহার মনে পড়িল, এইমাত্র বিদায়ক্ষণে নির্ম্মলের কথার উত্তরে কিছুই বলা হয় নাই, অথচ শীঘ্র আর হয়ত দেখা হইবে না। সে ভরসা দিয়া বলিয়া গেছে, নিজেকে একেবারে নিরুপায় না ভাবিতে। হয়ত সহস্র কাজের মধ্যে এ-কথা তাহার মনেও থাকিবে না। থাকিলেও, পশ্চিমের কোন একটা সুদূর সহরে বসিয়া সে সাহায্য

করিবেই বা কি করিয়া, এবং তাহা গ্রহণ করিবেই বা সে কোন্ অধিকারে? আবার হৈমকে মনে পড়িল। যাইবার সময় একটি কথা বলে নাই, কিন্তু স্বামীর আহ্বানে যখন তাঁহার হাত ধরিয়া সে অগ্রসর হইল, তখন তাঁহার প্রত্যেক কথাটিকে সে যেন নীরবে অনুমোদন করিয়া গেল। সুতরাং স্বামী ভুলিলেও ভুলিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রী যে তাহার অনুচ্চারিত বাক্য সহজে বিস্মৃত হইবে না, ষোড়শী তাহা মনে মনে বিশ্বাস করিল।

হৈমর সহিত পরিচয় তাহার বহুদিনব্যাপীও নয়, ঘনিষ্ঠও নয়। অথচ কোনমতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে যখন তাহার কম্বলের শয্যাটি বিস্তৃত করিয়া ভূমিতলে উপবেশন করিল, তখন এই মেয়েটিকে তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল। সেই যে সে প্রথম দিনটিতেই অযাচিত তাহার দুঃখের অংশ লইয়া গ্রামের সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে, পিতার বিরুদ্ধে, বোধ করি বা আরও একজনের বিরুদ্ধে গোপনে যুদ্ধ করিয়াছিল, সে চলিয়া গেলে কাল তাহার পাশে দাঁড়াইতে এখানে আর কেহ থাকিবে না; প্রতিকূলতা উত্তোরত্তর বাড়িয়া উঠিতেই থাকিবে; কিন্তু আপনার বলিতে, একটা সান্ত্বনার বাক্য উচ্চারণ করিতে লোক মিলিবে না, অথচ এই ঝঞ্ঝা যে কোথায় গিয়া কি করিয়া নিবৃত্ত হইবে তাহারও কোন নির্দ্দেশ নাই। এমনি করিয়া এই নির্ব্বান্ধব জনহীন আলয়ে চারিদিকের ঘনীভূত অন্ধকারে একাকিনী বসিয়া সে অদূর ভবিষ্যতের সুনিশ্চিত বিপদের ছবিটাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু কখন অজ্ঞাতসারে সে পরিপূর্ণ উপদ্রবের আশঙ্কাকে সরাইয়া দিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত এক অপরিজ্ঞাত ভাবের তরঙ্গ তাহার বিক্ষুব্ধ চিত্তের মাঝে উত্তাল হইয়া উঠিল, সে জানিতে পারিল না।

এতদিন জীবনটাকে সে যেভাবে পাইয়াছে সেইভাবেই গ্রহণ করিয়াছে। সে চণ্ডীর ভৈরবী—ইহার যে দায়িত্ব আছে, কর্ত্তৃত্ব আছে, সম্পদ আছে, বিপদ আছে—স্মরণাতীত কাল হইতে ইহার অধিকারিণীগণের পায়ে পায়ে যে পথ পড়িয়াছে, তাহা কোথাও সঙ্কীর্ণ কোথাও প্রশস্ত, পথ চলিতে কেহ বা সোজা হাঁটিয়াছেন, কাহারও বা বাঁকা পদচিহ্ন পরম্পরাগত ইতিহাসের অঙ্কে বিদ্যমান। ইহার অলিখিত পাতাগুলো লোকের মুখে মুখে কোথাও বা সদাচারের পুণ্য-কাহিনীতে উদ্ভাসিত, কোথাও বা ব্যভিচারের গ্লানিতে কালো হইয়া আছে, তথাপি ভৈরবী-জীবনের সুনির্দ্দিষ্ট ধারা কোথাও এতটুকু বিলুপ্ত হয় নাই। যাত্রা করিয়া সহজ ও দুর্গম, দুজ্ঞেয় ও জটিল অনেক গলি-ঘুঁজি অনেককেই পার হইতে হইয়াছে, তাহার সুখ ও দুঃখভোগ কম নয়; কিন্তু কেন, কিসের জন্য, এ প্রশ্নও বোধ করি কেহ কখনো করে নাই, কিংবা ইহাকে অস্বীকার করিয়া আর কোন একটা পথ খুঁজিতেও কাহারো প্রবৃত্তি হয় নাই। ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট সেই পরিচিত খাদের মধ্যে দিয়েই ষোড়শীর জীবনের

এই কুড়িটা বছর প্রবাহিত হইয়া গেছে, ইহাকে ভৈরবীর জীবন বলিয়াই সে অসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছে ; একটা দিনের তরেও আপনার জীবন নারীর জীবন বলিয়া ভাবে নাই। চণ্ডীর সেবায়েত বলিয়া সে নিকটে ও দূরের বহু গ্রাম ও জনপদের গণনাতীত নর-নারীর সহিত সুপরিচিত। কত সংখ্যাতীত রমণী—কেহ ছোট, কেহ বড়, কেহ বা সমবয়সী—তাহাদের কত প্রকারের সুখ-দুঃখ, কত প্রকারের আশা-ভরসা, কত ব্যর্থতা, কত অপরূপ আকাশ-কুসুমের নির্ব্বাক ও নির্ব্বিকার সাক্ষী হইয়া আছে; দেবীর অনুগ্রহলাভের জন্য কতকাল ধরিয়া কত কথাই না ইহারা গোপনে মৃদু-কণ্ঠে তাহাকে ব্যক্ত করিয়াছে, দুঃখী-জীবনের নিভৃততম অধ্যায়গুলি অকপটে তাহার চোখের উপর মেলিয়া ধরিয়া প্রসাদ-ভিক্ষা চাহিয়াছে ; এ সমস্তই তাহার চোখে পড়িয়াছে, পড়ে নাই কেবল রমণী-হৃদয়ের কোন্ অন্তঃস্তল ভেদিয়া এই সকল সকরুণ অভাব ও অনুযোগের স্বর উত্থিত হইয়া এতকাল ধরিয়া তাহার কানে আসিয়া পশিয়াছে। ইহাদের গঠন ও প্রবৃত্তি এমনি কোন্ এক বিভিন্ন জগতের বস্তু, যাহাকে জানিবার ও চিনিবার কোন হেতু, কোন প্রয়োজন তাহার হয় নাই। সেই প্রয়োজনের প্রথম আঘাত এইখানে এই পরিত্যক্ত অন্ধকার আলয়ে এই প্রথম তাহার গায়ে লাগিল। দুর্য্যোগের রাত্রে নির্ম্মলের হাত ধরিয়া নদী পার করিয়া আনিয়া সে তাঁহাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল ; হয়ত দুটি লোক ছাড়া এ-কথা আর কেহ জানে না, এবং এখন এইমাত্র সেই স্বল্প-দৃষ্টি লোকটির আহ্বানে হৈম যে তাঁহার হাত ধরিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইল, এ-কথাও বোধ করি কয়েকটি লোক ছাড়া আর কেহ জানিবে না, কিন্তু কাল এবং আজিকার এই কর্ত্তব্যের কত বড়ই না পার্থক্য।

আজ একবার তাহার চোখের উপর হৈমর কাপড়ের পাড়টুকু হইতে, তাহার আঙুলের সবুজরঙের আঙটি হইতে তাহার কানের হীরের দুল পর্য্যন্ত সমস্ত খেলিয়া গেল, এবং সর্ব্বপ্রকার দুর্ভেদ্য আবরণ ও অন্ধকার অতিক্রম করিয়া তাহার অভ্রান্ত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির বাহিরে ওই মেয়েটির প্রত্যেক পদক্ষেপ যেন অনুসরণ করিয়া চলিল। সে দেখিতে পাইল, স্বামীর হাত ছাড়িয়া এইবার তাহাকে লুকাইয়া বাড়ি ঢুকিতে হইবে, সেখানে তাহার চিন্তিত ও ব্যাকুল পিতা-মাতার শত-সহস্র তিরস্কার ও কৈফিয়ত নিরুত্তরে মাথায় করিয়া লজ্জিত দ্রুতপদে নিজের ঘরে গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে, সেখানে হয়ত তাহার নিদ্রিত পুত্র ঘুম ভাঙিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে—তাহাকে শান্ত করিয়া আবার ঘুম পাড়াইতে হইবে, কিন্তু ইহাতেই কি অবসর মিলিবে? তখনও কত কাজ বাকী থাকিয়া যাইবে। অন্তরাল হইতে স্বামীর খাওয়াটুকু পর্যবেক্ষণ করা চাই—ত্রুটি না হয় ; ছেলেকে তুলিয়া দুধ খাওয়াইতে হইবে—সে অভুক্ত না থাকে, পরে নিজেও খাইয়া লইয়া যেমন-তেমন করিয়া বাকি রাতটুকু কাটাইয়া আবার প্রত্যূষে উঠিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই।

তাহার কত রকমের প্রয়োজন, কত রকমের গুছান-গাছান। তাহার স্বামী, তাহার পুত্র, তাহার লোকজন, দাসী-চাকর তাহাকে আশ্রয় করিয়াই যাত্রা করিবে। দীর্ঘ পথে কাহার কি চাই—তাহাকেই যোগাইতে হইবে, তাহাকেই সমস্ত ভাবিয়া সঙ্গে লইতে হইবে।

নিজের জীবনটাকে ষোড়শী কোনদিন পরের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখে নাই, আলোচনা করিবার কথাও কখনো মনে হয় নাই, তবুও সে মনের মাঝখানে গৃহিণী-পনার সকল দায়িত্ব, সকল ভার, জননীর সকল কর্ত্তব্য, সকল চিন্তাকে কে যেন কবে সুনিপুণ হাতে সম্পূর্ণ করিয়া সাজাইয়া দিয়া গেছে। তাই কিছু না জানিয়াও সে সব জানে, কখনও কিছু না শিখিয়াও হৈমর সকল কাজ তাহারি মত নিখুঁত করিয়া করিতে পারে এই কথাই তাহার মনে হইল।

অনতিদূরে একখণ্ড কাঠের উপর সংস্থাপিত মাটির প্রদীপটা নিব-নিব হইয়া আসিতেছিল, অন্যমনে ইহাকে উজ্জ্বল করিয়া দিতে তাহার চমক ভাঙিয়া মনে পড়িল সে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী। এতবড় সম্মানিত গরীয়সী নারী এ-প্রদেশে আর কেহ নাই। সে সামান্য একজন রমণীর অত্যন্ত সাধারণ গৃহস্থালীর অতি তুচ্ছ আলোচনায় মুহূর্ত্তের জন্যও আপনাকে বিহ্বল করিয়াছে মনে করিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। ঘরে আর কেহ নাই, ক্ষণকালের এতটুকু দুর্ব্বলতা জগতে কেহ কখনো জানিবেও না, শুধু কেবল যে দেবীর সেবিকা সে, সেই চণ্ডীর উদ্দেশ্যে আর একবার যুক্ত-করে নত-শিরে কহিল, মা, বৃথা চিন্তায় সময় বয়ে গেল, তুমি ক্ষমা ক'রো।

রাত্রি কত হইয়াছে ঠিক জানিবার জো নাই, কিন্তু অনুমান করিল অনেক হইয়াছে। তাই শয্যাটুকু আরও একটু বিস্তৃত করিয়া এবং প্রদীপে আরও খানিকটা তেল ঢালিয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল। শ্রান্ত চক্ষে ঘুম আসিতেও বোধ করি বিলম্ব ঘটিত না; কিন্তু বাহিরে দ্বারের কাছেই একটা বিকট শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া বসিল। বাতাসেও একটু জোর ধরিয়াছিল, শিয়াল-কুকুর হওয়া অসম্ভব নয়, তবুও ক্ষণকাল কান পাতিয়া থাকিয়া সভয়ে কহিল, কে?

বাহির হইতে সাড়া আসিল, ভয় নেই মা, তুমি ঘুমোও—আমি সাগর।

কিন্তু এত রাত্তিরে তুই কেন রে?

সাগর কহিল, হরখুড়ো বলে দিলে, জমিদার এয়েচে, রাতটাও বড় ভাল নয়—মা একলা রয়েচে, যা সাগর লাঠিটা হাতে নিয়ে একবার বস্‌ গে। তুমি শুয়ে পড় মা, ভোর না দেখে আমি নড়ব না।

ষোড়শী বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তাই যদি হয় সাগর, একা তুই কি করবি বাবা?

বাহিরের লোকটি একটু হাসিয়া কহিল, একা কেন মা, খুড়োকে একটা হাঁক

দেব। খুড়ো-ভাইপোয় লাঠি ধরলে—জান ত মা সব। সেদিনকার লজ্জাতেই মরে আছি, একটিবার যদি হুকুম দিয়ে পাঠাতে মা!

এই দুই খুড়ো ও ভাইপো হরিহর ও সাগর ডাকাতি অপবাদে একবার বছর-দুই করিয়া জেল খাটিয়াছিল। জেলের মধ্যে বরঞ্চ ছিল ভাল, কিন্তু অব্যাহতি পাইয়া ইহাদের প্রতি বহুকাল যাবৎ একদিকে জমিদার ও অন্যদিকে পুলিশ-কর্ম্মচারীর দৌরাত্ম্যের অবধি ছিল না। কোথাও কিছু একটা ঘটিলে দুইদিকের টানাটানিতে ইহাদের প্রাণান্ত হইত। স্ত্রী-পুত্র লইয়া না পাইত ইহারা নির্বিঘ্নে বাস করিতে, না পাইত দেশ ছাড়িয়া কোথাও উঠিয়া যাইতে। এই অযথা পীড়ন ও অহেতুক যন্ত্রণা হইতে ষোড়শী ইহাদের যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়াছিল। বীজগাঁর জমিদারী হইতে বাস উঠাইয়া আনিয়া নিজের মধ্যে স্থান দিয়া এবং নানা উপায়ে পুলিশকে প্রসন্ন করিয়া জীবনযাত্রার ব্যাপারটা ইহাদের অনেকখানি সুসহ করিয়া দিয়াছিল। সেই অবধি দস্যু অপবাদগ্রস্ত এই দুই পরম ভক্ত ষোড়শীর সকল সম্পদে বিপদে একান্ত সহায়। শুধু কেবল নীচ জাতীয় ও অস্পৃশ্য বলিয়া সঙ্কোচে তাহারা দূরে দূরে থাকিত, এবং ষোড়শী নিজেও কখনো কোনদিন তাহাদের কাছে ডাকিয়া ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করে নাই। অনুগ্রহ কেবল দিয়াই আসিয়াছে, ফিরিয়া কখনো গ্রহণ করে নাই, বোধ করি প্রয়োজনও হয় নাই। আজ এই নির্জ্জন নিশীথে সংশয় ও সঙ্কটের মাঝে তাহাদের আড়ম্বরহীন এই স্নেহ ও নিঃশব্দ সেবার চেষ্টায় ষোড়শীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। মুছিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সাগর, তোদের জাতের মধ্যেও বোধ হয় আমার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়, না রে; কে কি বলে?

বাহির হইতে সাগর আস্ফালন করিয়া জবাব দিল, ইস্! আমাদের সামনে! দুই তাড়ায় কে কোথায় পালাবে ঠিক পায় না মা!

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ সলজ্জে অনুভব করিল, ইহার কাছে এরূপ প্রশ্ন করাই তাহার উচিত হয় নাই। অতএব কথাটাকে আর না বাড়াইয়া মৌন হইয়া রহিল। অথচ চোখেও তাহার ঘুম ছিল না। বাহিরে আসন্ন ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া তাহারি খবরদারিতে একজন জাগিয়া বসিয়া আছে জানিলেই যে নিদ্রার সুবিধা হয় তাহা নয়, তাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার সে এই কথাই পাড়িল, কহিল, যদি জল আসে তোর যে ভারি কষ্ট হবে সাগর, এখানে ত কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই।

সাগর কহিল, নাই থাকল মা। রাত বেশি নেই, প্রহর দুই জলে ভিজলে আমাদের অসুখ করে না।

বাস্তবিক ইহার কোন প্রতিকারও ছিল না, তাই আবার কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ষোড়শী অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল। কহিল, আচ্ছা, তোরা কি সব সত্যিই মনে

করেচিস্, জমিদারের পিয়াদারা আমাকে সেদিন বাড়ি থেকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ?

সাগর অনুতপ্ত-স্বরে কহিল, কি করবে মা, তুমি যে একলা মেয়েমানুষ। এ পাড়ায় মানুষ বলতেও কেউ নেই, আমরা খুড়ো-ভাইপোও সেদিন হাটে গিয়ে তখনও ফিরতে পারিনি। নইলে সাধ্য কি মা, তোমার গায়ে কেউ হাত দেয়।

ষোড়শী মনে মনে বুঝিল এ আলোচনাও ঠিক হইতেছে না, কথায় কথায় হয়ত কি একটা শুনিতে হইবে ; কিন্তু থামিতেও পারিল না, কহিল, তাদের কত লোক-জন, তোরা দুটিতে থাকলেই কি আটকাতে পারতিস ?

বাহির হইতে সাগর মুখে অস্ফুট ধ্বনি করিয়া বলিল, কি হবে মা আর মনের দুঃখ বাড়িয়ে। হুজুরও এয়েচেন, আমরাও জানি সব। মায়ের কৃপায় আবার যদি কখনো দিন আসে, তখন তার জবাব দেব। তুমি মনে ক'রো না মা, হরখুড়ো বুড়ো হয়েছে বলে মরে গেছে। তাকে জান্‌তো মাতু ভৈরবী, তাকে জানে শিরোমনি-ঠাকুর। জমিদারের পাইক-পিয়াদা বহুত আছে তাও জানি, গরীব বলে আমাদের দুঃখও তারা কম দেয়নি, সেও মনে আছে—ছোটলোক আমরা নিজেদের জন্যে ভাবিনে, কিন্তু তোমার হুকুম হলে মা ভৈরবীর গায়ে হাত দেবার শোধ দিতে পারি। গলায় দড়ি বেঁধে টেনে এনে ওই হুজুরকেই রাতারাতি মায়ের স্থানে বলি দিতে পারি মা, কোন শালা আটকাবে না।

ষোড়শী মনে মনে শিহরিয়া কহিল, বলিস্ কি সাগর, তোরা এমন নিষ্ঠুর, এমন ভয়ঙ্কর হতে পারিস ? এইটুকুর জন্যে একটা মানুষ খুন করবার ইচ্ছে হয় তোদের ?

সাগর কহিল, এইটুকু ! কেবল এইটুকুর জন্যেই কি আজ তোমার এই দশা ! জমিদার এয়েচেন শুনে খুড়ো যেন জ্বলতে লাগল। তুমি ভেবো না মা, আবার যদি কিছু একটা হয়, তখন সেও কেবল এইটুকুতেই থেমে থাকবে।

ষোড়শী কহিল, হাঁরে সাগর তুই কখনো গুরুমশায়ের পাঠশালে পড়েছিলি ?

বাহিরে বসিয়া সাগর যেন লজ্জিত হইয়া উঠিল, বলিল, তোমার আশীর্ব্বাদে অমনি একটু রামায়ণ-মহাভারত নাড়তে-চাড়তে পারি। কিন্তু এ-কথা কেন জিজ্ঞেসা করলে মা ?

ষোড়শী বলিল, তোর কথা শুনলে মনে হয় খুড়ো তোর না বুঝতেও পারে, কিন্তু তুই বুঝতে পারবি। সেদিন আমাকে কেউ ধরে নিয়ে যায়নি সাগর, কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি, আমি কেবল রাগের মাথায় আপনি চলে গিয়েছিলাম।

সাগর কহিল, সে আমরাও শুনেছি, কিন্তু সারারাত যে ঘরে ফিরতে পারলে না মা, সেও কি রাগ করে ?

ষোড়শী এ প্রশ্নের ঠিক উত্তরটা এড়াইয়া গিয়া কহিল, কিন্তু যে জন্যে তোদের

এত রাগ, সে-দশা আমার ত আমি নিজেই করেচি। আমি ত নিজের ইচ্ছামতেই বাবাকে ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েচি।

সাগর কহিল, কিন্তু এতকাল ত এ আশ্রয় নেবার ইচ্ছে হয়নি মা। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ তাহার কণ্ঠস্বর যেন উগ্র ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, তারাদাস ঠাকুরের ওপরও আমাদের রাগ নেই, রায়মশায়কেও আমরা কেউ কিছু বলব না, কিন্তু জমিদারকে আমরা সুবিধে পেলে সহজে ছাড়ব না। জান মা, আমাদের বিপিনের সে কি করেচে? সে বাড়ি ছিল না -তার লোকজন তার ঘরে ঢুকে —

ষোড়শী তাড়াতাড়ি তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিল, থাক্ সাগর, ওসব খবর আর তোরা আমাকে শোনাস্‌নে।

সাগর চুপ করিল। ষোড়শী নিজেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন প্রশ্ন করিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সাগর পুনরায় যখন কথা কহিল, তাহার কণ্ঠস্বরে মৃঢ় বিস্ময়ের আভাস ষোড়শী স্পষ্ট অনুভব করিল। সাগর কহিল, মা, আমরা তোমার প্রজা, আমাদের দুঃখ তুমি না শুনলে শুনবে কে?

ষোড়শী কহিল, কিন্তু শুনেও ত অতবড় জমিদারের বিরুদ্ধে আমি প্রতিকার করতে পারব না বাছা।

সাগর কহিল, একবার ত করেছিলে। আবার যদি দরকার হয়, তুমিই পারবে। তুমি না পারলে আমাদের রক্ষা করতে কেউ নেই মা!

ষোড়শী বলিল, নতুন ভৈরবী যদি কেউ হয় তাকেই তোদের দুঃখ জানাস্।

সাগর চমকিয়া কহিল, তাহলে তুমি কি আমাদের সত্যিই ছেড়ে যাবে মা? গ্রামশুদ্ধ সবাই যে বলাবলি করচে—সে সহসা থামিল, কিন্তু ষোড়শী নিজেও এ প্রশ্নের হঠাৎ উত্তর দিতে পারিল না। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, দেখ্, সাগর, তোদের কাছে এ-কথা তুলতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যায়। কিন্তু আমার সম্বন্ধে সব ত শুনেচিস্? গ্রামের আরও দশজনের মত তোরা নিজেও দেখচি বিশ্বাস করেচিস্, তার পরেও কি তোরা আমাকেই মায়ের ভৈরবী করে রাখতে চাস্ রে?

বাহিরে বসিয়া সাগর আস্তে আস্তে উত্তর দিল, অনেক কথাই শুনি মা, এবং আরও দশজনের মত আমরাও ভেবে পাইনে কেনই বা তুমি সে রাত্রে ঘরে ফিরলে না, আর কেনই বা সকালবেলা সাহেবের হাত থেকে হুজুরকে বাঁচালে! কিন্তু সে যাই হোক মা, আমরা ক'ঘর ছোট-জাত ভূমিজ তোমাকেই মা বলে জেনেচি; যেখানেই যাও আমরাও সঙ্গে যাব। কিন্তু যাবার আগে একবার জানিয়ে দিয়ে যাব।

ষোড়শী কহিল, কিন্তু তোরা ত আমার প্রজা নয়, মা-চণ্ডীর প্রজা। আমার মত মায়ের দাসী কত হয়ে গেছে, কত হবে; তার জন্যে তোরা কেনই বা ঘর-দোর ছেড়ে যাবি, কেনই বা উপদ্রব-অশান্তি ঘটাবি। এমন ত হতে পারে, আমার নিজেরই আর এ-সমস্ত ভাল লাগচে না।

সাগর সবিস্ময়ে কহিল, ভাল লাগচে না?

ষোড়শী বলিল, আশ্চর্য্য কি সাগর? মানুষের মন কি বদলায় না?

এবার প্রত্যুত্তরে লোকটি কেবল একটা হুঁ বলিয়াই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু রাত আর বেশি বাকী নেই মা, আকাশে মেঘও কেটে যাচ্ছে, এইবার তুমি একটু ঘুমোও।

ষোড়শীর নিজেরও এ-সকল আলোচনা ভাল লাগিতেছিল না, তাহাতে সে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিল। সাগরের কথায় আর দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু সে-চক্ষে ঘুম যতক্ষণ না আসিল, কেবল ঘুরিয়া-ফিরিয়া উহারই কথাগুলো তাহার মনে হইতে লাগিল, এই যে লোকটি বিনিদ্র-চক্ষে বাহিরে বসিয়া রহিল, তাহাকে সে ছেলেবেলা হইতেই দেখিয়া আসিয়াছে; ইতর ও অন্ত্যজ বলিয়া এতদিন শুধু তুচ্ছ ও ছোট কাজেই লাগিয়াছে, কোনদিন কোন সম্মানের স্থান পায় নাই, আলাপ করিবার কল্পনা ত কাহারও স্বপ্নেও উঠে নাই, কিন্তু আজ এই দুঃখের রাত্রে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়া তাহার অনেক কথাই বাহির হইয়া গেছে, এবং তাহার ভালমন্দ হিসাব করিবার দিন হয়ত একদিন আসিতেও পারে; কিন্তু শ্রোতা হিসাবে এই ছোটলোকটিকে সে একান্ত ছোট বলিয়া আজ কিছুতেই ভাবিতে পারিল না।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিলে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া দেখিল সকাল আর নাই—ঢের বেলা হইয়াছে; এবং অনতিদূরে অনেকগুলা লোক মিলিয়া তাহারই রুদ্ধ দরজার প্রতি চাহিয়া কি যেন একটা তামাসার প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও এতটুকু পর্দ্দা, এতটুকু আব্রু নাই। সহসা মনে হইল, তৎক্ষণাৎ দ্বার বন্ধ না করিয়া দিলে এই লোকগুলার উৎসুক দৃষ্টি হইতে বুঝি সে বাঁচিবে না। এই ক্ষুদ্র গৃহটুকু যত জীর্ণ যত ভগ্নই হোক, আত্মরক্ষা করিবার এ-ছাড়া আর বুঝি সংসারে দ্বিতীয় স্থান নাই, এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইল ভিড় ঠেলিয়া এককড়ি নন্দী তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সবিনয়ে কহিল, গ্রামে হুজুর পদার্পণ করচেন, শুনেচেন বোধ হয়।

জমিদারের গোমস্তা এই এককড়ি ইতিপূর্ব্বে কোনদিন তাহাকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করে নাই। তাহার বিনয়, তাহার এই সম্ভাষণের পরিবর্ত্তন ষোড়শীকে

যেন বিদ্ধ করিল, কিন্তু কিছু একটা জবাব দিবার পূর্ব্বেই সে পুনশ্চ সসম্ভ্রমে কহিল, হুজুর একবার আপনাকে স্মরণ করেচেন।

কোথায়?

এই যে কাছারী-বাড়িতে। সকাল থেকে এসেই প্রজার নালিশ শুনচেন। যদি অনুমতি করেন ত পাল্‌কি আনতে পাঠিয়ে দিই?

সকলে হাঁ করিয়া শুনিতেছিল, ষোড়শীর মনে হইল তাহারা যেন এই কথায় হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার ভিতরটা অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, এটা তাঁর প্রস্তাব, না তোমার সুবিবেচনা এককড়ি?

এককড়ি সসম্ভ্রমে বলিল, আজ্ঞে, আমি ত চাকর, এ স্বয়ং হুজুরের আদেশ।

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, তোমার হুজুরের কপাল ভাল। জেলের ঘানি টানার বদলে পাল্‌কি চড়ে বেড়াচ্চেন, তাও আবার শুধু স্বয়ং নয়, পরের জন্যও ব্যবস্থা করেচেন। কিন্তু বল গে এককড়ি, আমার পাল্‌কি চড়বার ফুরসুৎ নেই—আমার ঢের কাজ।

এককড়ি কহিল, ও-বেলায় কিংবা কাল সকালেও কি একটু সময় পাবেন না?

ষোড়শী কহিল, না।

এককড়ি কহিল, কিন্তু হলে যে ভালো হ'তো! আর দশজন প্রজার যে নালিশ আছে।

ষোড়শী কঠোর-স্বরে উত্তর দিল, বিচার করবার মত বিদ্যে-বুদ্ধি থাকে ত তাঁর নিজের প্রজার করুন গে। কিন্তু আমি তোমার হুজুরের প্রজা নই, আমার বিচার করবার জন্যে রাজার আদালত আছে। এই বলিয়া সে গামছাটা কাঁধের উপর ফেলিয়া পুষ্করিণীর উদ্দেশ্যে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

১৩

জমিদারের নিভৃত নিবাস সাজাইতে-গুছাইতে দিন-চারেক গিয়াছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, হুজুর এবার একাদিক্রমে মাস-দুই চণ্ডীগড়ে বিশ্রাম করিয়া যাইবেন। আজ সকালবেলাতেই উত্তরদিকের বড় হলটায় মজলিশ বসিয়াছিল। ঘর-জোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপরে সাদা জাজিম বিছানো এবং মাঝে মাঝে দুই-চারিটা মোটা তাকিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। গৃহের একধারে আজ গ্রামের মাতব্বরেরা বার দিয়া বসিয়াছিলেন—জমিদারের কাছে তাঁহাদের মস্ত নালিশ ছিল। রায়মহাশয়

ছিলেন, শিরোমণি ছিলেন, ঘোষজা ছিলেন, বোসজা ছিলেন, এমন কি তারাদাস ঠাকুরও ইহাদের আড়ালে মুখ নীচু করিয়া ও কান খাড়া করিয়া সতর্ক হইয়া বসিয়াছিলেন। আরও যাঁহারা যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের কেহই যদিও অবহেলার বস্তু নহেন, তবুও ইহাদের নাম-ধাম ও বিবরণ সবিস্তারে বিদিত না হইলেও পাঠকের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিবে না বিবেচনা করিয়াই তাহাতে নিরস্ত হইলাম। যাই হোক ইহাদের সমবেত চেষ্টায় অভিযোগের ভূমিকাটা একপ্রকার শেষ হইয়া গেলেও আসল কথাটি উঠি উঠি করিয়াও থামিয়া যাইতেছিল—ঠিক যেন মুখে আসিয়াও কাহারও বাহির হইতে চাহিতেছিল না।

জীবানন্দ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। সকলের সঙ্গে থাকিয়াও একটুখানি দূরে একটা তাকিয়ার উপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়া বসিয়া তিনি মন দিয়াই যেন সমস্ত শুনিতেছিলেন। মন প্রফুল্ল। একেবারে স্বাভাবিক না হইলেও সম্পূর্ণ কৃত্রিম বলিয়াও সন্দেহ হয় না। খুব সম্ভব মদের ফেনা তখনও তাঁহার মগজের সমস্ত অলিগলি দখল করিয়া বসে নাই। সম্মুখের বড় বড় খোলা দরজা দিয়া বারুইয়ের শুকনা বালু ও ভিজা মাটির গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল, এবং পাশের ঘরটাতেই বোধ করি রান্না হইতেছিল বলিয়া তাহারই রুদ্ধ দ্বারের কোন্ একটা ফাঁক দিয়া এক জাতীয় শব্দ ও গন্ধ মাঝে মাঝে এই বাতাসেই ভর দিয়া লোকের কানে ও নাকে আসিয়া পৌঁছিতেছিল, তাহা ব্যক্তিবিশেষের কাছে উপাদেয় ও রুচিকর হইলেও শিরোমণিমহাশয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি বার-দুই কাসিয়া ও উত্তরীয় প্রান্তে নাকের ডগাটা মার্জ্জনা করিয়া উঠিয়া গিয়া আর এক ধারে বসিতেই জীবানন্দ সহাস্যে কহিলেন, শিরোমণিমশায়ের কি অর্দ্ধভোজন হয়ে গেল নাকি ?

অনেকেই হাসিয়া উঠিল, শিরোমণির নাকের ডগার মত মুখখানাও রাঙা হইয়া উঠিল। জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই ঠাকুর জাত যাবে না ; ওটা আপনাদের মা-চণ্ডীরই মহাপ্রসাদ। তবে যিনি রাঁধচেন তাঁর গোত্রটি ঠিক জানিনে, হয়ত এক না হতেও পারে।

শিরোমণি আপনাকে কতকটা সামলাইয়া কহিলেন, তা হোক, তা হোক। ব্রাহ্মণ পাচক—দরিদ্র হলেও একটা গোত্র আছে বই কি।

জীবানন্দ হাঃ হাঃ করিয়া কহিলেন, জানিনে ঠাকুর, ও-সব বালাই ওর কিছু আছে কি-না। কিন্তু হাতা-বেড়ির সঙ্গে মিলে সোনার চুড়ির আওয়াজটাও আমার বড় মিঠে লাগে। আর সেই হাতে পরিবেশন করলে—তা নিমন্ত্রণ করলে ত আর—বলিয়া তিনি পুনশ্চ প্রবল হাসির শব্দে ঘর ভরিয়া দিলেন।

শিরোমণি অধোবদন হইলেন, এবং ভিতরেব কদর্য্য ব্যাপার যদিচ সকলেই

জানিতেন, তথাপি এই অভাবনীয় প্রকাশ্য নির্লজ্জতায় উপস্থিত কেহই লোকটার মুখের প্রতি সহসা চাহিতে পর্য্যন্ত পারিল না।

হাসি থামিলে তিনি কহিলেন, সদালাপ ত হ'লো এবং দয়া করে মাঝে মাঝে এলে এমন আরও ঢের হতে পারবে, কিন্তু আপনাদের নালিশটা কি শুনি?

কিন্তু উত্তরে কাহারও মুখে কথা ফুটিল না, সকলে যেমন নীরবে বসিয়াছিল তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

জীবানন্দ কহিলেন, বলতে কি আপনাদের লজ্জা বোধ হচ্ছে?

এবার রায়মহাশয় মুখ তুলিয়া চাহিলেন; বলিলেন, নন্দীমশাই ত সমস্ত জানেন, তিনি কি হুজুরের গোচর করেননি?

জীবানন্দ কহিলেন, হয়ত করেচেন, কিন্তু আমার মনে নেই। তা ছাড়া, তার গোচর করার প্রতি খুব বেশী আস্থা না রেখে ব্যাপারটা আপনারাই বলুন। দ্বিরুক্তি দোষ ঘটতে পারে, কিন্তু কি আর করা যাবে। জমিদারের গোমস্তা—একটু মোকাবিলে হয়ে থাকা ভাল। ঠিক না?

প্রভুর মুখে এককড়ির এই সুখ্যাতিটুকুতে রায়মহাশয় মনে মনে আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, হুজুর সর্ব্বজ্ঞ। ভৃত্যের সম্বন্ধে যথা ইচ্ছা আদেশ করতে পারেন, কিন্তু আমাদের অভিযোগ—

কি অভিযোগ?

জনার্দ্দন রায় কহিলেন, আমরা গ্রামস্থ ষোল-আনা ইতর-ভদ্র একত্র হয়ে—

জীবানন্দ একটু হাসিয়া বলিলেন, তা দেখতে পাচ্চি। ওইটি কি সেই ভৈরবীর বাপ তারাদাস ঠাকুর নয়? এই বলিয়া তিনি তাহার প্রতি অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিলেন।

তারাদাস সাড়া দিল না, জাজিমটার অংশ-বিশেষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, এবং রায়মহাশয়ের আনত মুখের পরেও একটা ফ্যাকাসে ছায়া পড়িল। কিন্তু মুখ রক্ষা করিলেন শিরোমণি-ঠাকুর। তিনি সবিনয়ে কহিলেন, রাজার কাছে প্রজা সন্তানতুল্য, তা দোষ করলেও সন্তান, না করলেও সন্তান। আর কথাটা একরকম ওরই। ওর কন্যা ষোড়শীর সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয় স্থির করেচি, তাকে আর মহাদেবীর ভৈরবী রাখা যেতে পারে না। আমাদের নিবেদন, হুজুর তাকে সেবায়েতের কাজ থেকে অব্যাহতি দেবার আদেশ করুন।

জমিদার চকিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, কেন? তার অপরাধ?

দুই-তিনজন প্রায় সমস্বরে জবাব দিয়া ফেলিল, অপরাধ অতিশয় গুরুতর।

জীবানন্দ একে একে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া অবশেষে জনার্দ্দনের প্রতি

দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তিনি হঠাৎ এমন কি ভয়ানক দোষ করেচেন রায়মশায়, যার জন্য তাঁকে তাড়ানো আবশ্যক?

জনার্দ্দন মুখ তুলিয়া শিরোমণিকে চোখের ইঙ্গিত করিতেই জীবানন্দ বাধা দিয়া কহিলেন, না, না, উনি অনেক পরিশ্রম করেচেন, বুড়োমানুষকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই, ব্যাপারটা আপনিই ব্যক্ত করুন।

রায় মহাশয়ের চোখে ও মুখে দ্বিধা ও অত্যন্ত সঙ্কোচ প্রকাশ পাইল, মৃদু-কণ্ঠে কহিলেন, ব্রাহ্মণকন্যা—এ আদেশ আমাকে করবেন না।

জীবানন্দ হাসিমুখে কহিলেন, দেব-দ্বিজে আপনার অচল ভক্তির কথা এ-দিকে কারও অবিদিত নেই। কিন্তু এতগুলি ইতর-ভদ্রকে নিয়ে আপনি নিজে যখন উপস্থিত হয়েচেন, তখন ব্যাপার যে অতিশয় গুরুতর তা আমার বিশ্বাস হয়েচে; কিন্তু সেটা আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

কিন্তু জনার্দ্দন রায় অত সহজে ভুল করিবার লোক নহেন। প্রত্যুত্তরে তিনি শিরোমণির প্রতি একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, হুজুর যখন নিজে শুনতে চাচ্চেন তখন আর ভয় কি ঠাকুর? নির্ভয়ে জানিয়ে দিন না।

খোঁচা খাইয়া বৃদ্ধ শিরোমণি হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, সত্যি কথায় ভয় কিসের জনার্দ্দন? তারাদাসের মেয়েকে আর আমরা কেউ ভৈরবী রাখব না হুজুর! তার স্বভাব-চরিত্র ভারি মন্দ হয়ে গেছে—এই আপনাকে আমরা জানিয়ে দিচ্চি।

জীবানন্দের পরিহাস-দীপ্ত প্রফুল্ল মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর ও কঠিন হইয়া উঠিল, এক-মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন, তাঁর স্বভাব-চরিত্র মন্দ হবার খবর আপনারা নিশ্চয় জেনেছেন?

তৎক্ষণাৎ অনেকেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল যে, ইহাতে কাহারও কোন সংশয় নাই—এ কথা গ্রামশুদ্ধ সবাই জানিয়াছে। জনার্দ্দন মুখে কিছু না কহিলেও চুপ করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন। জীবানন্দ আবার ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাঁহারই মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তাই সুবিচারের আশায় বেছে বেছে একেবারে ভীষ্ম-দেবের কাছে এসে পড়েছেন রায়মহাশয়? বিশেষ সুবিধে হবে বলে ভরসা হয় না।

এ-কথার ইঙ্গিত সকলে বুঝিল কি না সন্দেহ, কিন্তু জনার্দ্দন এবং শিরোমণি বুঝিলেন। জনার্দ্দন মৌন হইয়া রহিলেন, কিন্তু শিরোমণি জবাব দিলেন, বলিলেন, আপনি দেশের রাজা—সুবিচার বলুন, অবিচার বলুন, আপনাকেই করতে হবে। আমাদের তাই মাথা পেতে নিতে হবে। সমস্ত চণ্ডীগড় ত আপনারই।

কথা শুনিয়া জীবানন্দের মুখের ভাব একটু সহজ হইয়া আসিল; মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, দেখুন শিরোমণিমশাই, অতি-বিনয়ে আপনাদের খুব হেঁট হয়ে

কাজ নেই, অতি-গৌরবে আমাকেও আকাশে তোলবার আবশ্যক নেই। আমি শুধু জানতে চাই, এ অভিযোগ কি সত্য?

সাগ্রহে রায়মহাশয়ের মুখ আশান্বিত হইয়া উঠিল। শিরোমণি ত একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, অভিযোগ? সত্য কি না! আচ্ছা, আমরা না হয়, কিন্তু তারাদাস, তুমিই বল ত! রাজদ্বার! যথাধর্ম্ম ব'লো—

তারাদাস একবার পাংশু একবার রাঙা হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু উপস্থিত সকলের একাগ্র দৃষ্টি খোঁচা দিয়া যেন তাহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। সে একবার ঢোক গিলিয়া, একবার কণ্ঠের জড়িমা সাফ করিয়া অবশেষে মরিয়ার মত বলিয়া উঠিল, হুজুর—

জীবানন্দ চক্ষের নিমেষে হাত তুলিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, থাক্। ওর মুখ থেকে ওর নিজের মেয়ের কাহিনী আমি যথাধর্ম্ম বললেও শুনব না। বরঞ্চ আপনাদের কেউ পারেন ত যথাধর্ম্ম বলুন।

সভা পুনশ্চ নীরব হইল, কিন্তু এবার সেই নীরবতার মধ্য হইতে অস্ফুট উদ্যম পরিস্ফুট হইবার লক্ষণ দেখা দিল। পাশের দরজা খুলিয়া বেহারা টম্ব্লার ভরিয়া হুইস্কি ও সোডা প্রভুর হাতে আনিয়া দিল; তিনি এক নিঃশ্বাসে তাহা নিঃশেষে পান করিয়া ভৃত্যের হাতে ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, আঃ—বাঁচলাম। একটু হাসিয়া কহিলেন, সকালবেলাতেই আপনাদের বাক্যসুধা পান করে তেষ্টায় বুক পর্য্যন্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চুপ-চাপ যে! কি হলো আপনাদের যথাধর্ম্মের?

শিরোমণি হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এই যে বলি হুজুর, আমি যথাধর্ম্ম বলব।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সম্ভব বটে। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ ব্রাহ্মণ, কিন্তু একজন স্ত্রীলোকের নষ্ট-চরিত্রের কাহিনী তার অসাক্ষাতে বলার মধ্যে আপনার যথা-ধর্ম্মের যথাটা যদি-বা থাকে, ধর্ম্মটা থাকবে কি? আমার নিজের বিশেষ কোন আপত্তি নেই—ধর্ম্মাধর্ম্মের বালাই আমার বহুদিন ঘুচে গেছে, তবু আমি বলি ওতে কাজ নেই। বরঞ্চ আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার জবাব দিন। বর্ত্তমান ভৈরবীকে আপনারা তাড়াতে চান—এই না?

সবাই একযোগে মাথা নাড়াইয়া জানাইল, ঠিক তাই।

এঁকে নিয়ে আর সুবিধা হচ্ছে না।

জনার্দ্দন প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা তুলিয়া কহিলেন, সুবিধে-অসুবিধে কি হুজুর, গ্রামের ভালোর জন্যই প্রয়োজন।

জীবানন্দ হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, অর্থাৎ গ্রামের ভালমন্দর আলোচনা না তুলেও এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আপনার নিজের ভালমন্দ কিছু একটা

আছে। তাড়াবার আমার ক্ষমতা আছে কি না জানিনে, কিন্তু আপত্তি বিশেষ নেই। কিন্তু আর কোন একটা অজুহাত তৈরি করা যায় না? দেখুন না চেষ্টা করে। বরঞ্চ আমাদের এককড়িটিকেও না হয় সঙ্গে নিন, এ-বিষয়ে তার বেশ একটু সুনাম আছে।

কথা শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল। হুজুর একটু থামিয়া কহিলেন, এঁদের সতীপনার কাহিনী অত্যন্ত প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ, সুতরাং তাকে আর নাড়া-চাড়া করে কাজ নেই। ভৈরবী থাকলেই ভৈরব এসে জোটে এবং ভৈরবীদেরও ভৈরব নইলে চলে না, এ অতি সনাতন প্রথা—সহজে টলানো যাবে না। দেশশুদ্ধ ভক্তের দল চটে যাবে, হয়ত দেবী নিজেও খুশী হবেন না—একটা হাঙ্গামা বেধে যাবে। মাতঙ্গী ভৈরবীর গোটা-পাঁচেক ভৈরবও ছিল এবং তাঁর পূর্ব্বে যিনি ছিলেন তাঁর নাকি হাতে গোনা যেতো না। কি বলেন শিরোমণিমশাই, আপনি ত এ অঞ্চলের প্রাচীন ব্যক্তি, জানেন ত সব? এই বলিয়া তিনি শিরোমণি অপেক্ষা রায়মহাশয়ের প্রতি বিশেষ করিয়া কটাক্ষপাত করিলেন। এ প্রশ্নের কেহ উত্তর দিবে কি, সকলে যেন বুদ্ধি-বিহ্বল হইয়া গেল। জমিদারের কণ্ঠস্বর সোজা না বাঁকা, বক্তব্য সত্য না মিথ্যা, তাৎপর্য্য বিদ্রূপ না পরিহাস, তামাসা না তিরস্কার, কেহ ঠাহর করিতেই পারিল না।

সম্মুখের বারান্দা ঘুরিয়া একজন ভদ্রবেশধারী সৌখীন যুবক প্রবেশ করিল। হাতে তার ইংরেজী বাঙলা কয়েকখানা সংবাদপত্র এবং কতকগুলো খোলা চিঠিপত্র। জীবানন্দ দেখিয়া কহিলেন, কি হে প্রফুল্ল, এখানেও ডাকঘর আছে নাকি? আঃ—কবে এইগুলো সব উঠে যাবে?

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে ঠিক। গেলে আপনার সুবিধে হ'তো। কিন্তু সে যখন হয়নি তখন এগুলো দেখবার কি সময় হবে?

জীবানন্দ কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, না, এখনও হয় না, অন্য সময়েও হবে না। কিন্তু অনেকটা বাইরে থেকেই উপলব্ধি হচ্চে। এই যে হীরালাল-মোহনলালের দোকানের ছাপ। পত্রখানি তাঁর উকিলের, না একেবারে আদালতের হে? ও খামখানা তো দেখচি সলোমন সাহেবের। বাবা, বিলিতি সুধার গন্ধ যেন কাগজ ফুঁড়ে বার হচ্ছে। কি বলেন সাহেব, ডিক্রীজারি করবেন, না এই রাজবপুখানি নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবেন—জানাচ্চেন? আঃ—সেকালের ব্রাহ্মণ্য তেজ যদি কিছু বাকী থাকতো ত এই ইহুদি বেটাকে একেবারে ভস্ম করে দিতাম। মদের দেনা তার শুধতে হ'তো না।

প্রফুল্ল ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কি বলচেন দাদা? থাক্, থাক্, আর একসময়ে আলোচনা করা যাবে। এই বলিয়া সে ফিরিতে উদ্যত হইতেই জীবানন্দ সহাস্যে কহিলেন, আরে লজ্জা কি ভায়া, এঁরা সব আপনার লোক, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, এমনকি

মণি-মাণিক্যের এ-পিঠ ও-পিঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তা ছাড়া তোমার দাদাটি যে কস্তুরী মৃগ; সুগন্ধ আর কতকাল চেপে রাখবে ভাই। টাকা! টাকা! এর নালিশ আর তার নালিশ, অমুকের ডিক্রী আর তমুকের কিস্তিখেলাপ—ওহে, ও তারাদাস, সে দিনটা নেহাৎ ফস্কে গিয়েছিল, কিন্তু হতাশ হ'য়ো না ঠাকুর, যা করে তুলেচি, তাতে মনস্কামনা তোমার পূর্ণ হতে খুব বেশী বিলম্ব হবে বলে আশঙ্কা হয় না। প্রফুল্ল, রাগ ক'রো না ভায়া, আপনার বলতে আর কাউকে বড় বাকী রাখিনি, কিন্তু এই চল্লিশটা বছরের অভ্যাস ছাড়তে পারবো বলেও ভরসা নেই, তার চেয়ে বরঞ্চ, নোট-টোট জাল করতে পারে এমন যদি কাউকে যোগাড় করে আনতে পারতে হে—

প্রফুল্ল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াও হাসিয়া ফেলিল, কহিল, দেখুন, সবাই আপনার কথা বুঝবেন না, সত্য ভেবে যদি কেউ—

জীবানন্দ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, যদি কেউ সন্ধান করে আনেন? তা হলে বেঁচে যাই প্রফুল্ল। রায়মশায়, আপনি ত শুনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনার জানাশুনা কি এমন কেউ—

রায়মহাশয় ম্লান-মুখে অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বেলা হয়ে গেল, যদি অনুমতি করেন ত এখন আসি।

জীবানন্দ ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, বসুন, বসুন, প্রফুল্লর জাঁক বেড়ে যাবে। তা ছাড়া, ভৈরবীর কথাটাও শেষ হয়ে যাক। কিন্তু আমি যাও বললেই কি সে যাবে?

রায়মহাশয় না বসিয়াই সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, সে ভার আমাদের।

কিন্তু আর কাউকে ত বহাল করা চাই। ও ত খালি থাকতে পারে না।

এবার অনেকেই জবাব দিল, সে ভারও আমাদের।

জীবানন্দ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, যাক্ বাঁচা গেল, এবার সে যাবেই। এতগুলো মানুষের নিশ্বাসের ভার একা ভৈরবী কেন, স্বয়ং মা-চণ্ডীও সামলাতে পারবেন না, তা বোঝা গেল। আপনাদের লাভ-লোকসান আপনারাই জানেন, কিন্তু আমার এমন অবস্থা যে, টাকা পেলে আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। নতুন বন্দোবস্তে আমার কিছু পাওয়া চাই। ভাল কথা, কেউ দেখ্‌ত রে, এককড়ি আছে না গেছে? কিন্তু গলাটা যে এদিকে শুকিয়ে একেবার মরুভূমি হয়ে গেল।

বেয়ারা আসিয়া প্রভুর ব্যগ্র-ব্যাকুল শ্রীহস্তে পূর্ণ-পাত্র দিয়া খবর দিল, সে সদরে বসিয়া খাতা লিখিতেছে। হুজুরের আহ্বানে ক্ষণেক পরে এককড়ি আসিয়া যখন সসম্ভ্রমে একপাশে দাঁড়াইল, জীবানন্দ শুষ্ক কণ্ঠ আর্দ্র করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, সেদিন ভৈরবীকে যে কাছারিতে তলব করেছিলাম, কেউ তাঁকে খবর দিয়েছিলে?

এককড়ি কহিল, আমি নিজে দিয়েছিলাম।

তিনি এসেছিলেন।

আজ্ঞে না।

না কেন?

এককড়ি অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জীবানন্দ উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, তিনি কখন আসবেন জানিয়েছিলেন?

এককড়ি তেমনি অধোমুখে থাকিয়াই অস্ফুট-কণ্ঠে কহিল, এত লোকের সামনে আমি সে-কথা হুজুরে পেশ করতে পারব না।

জীবানন্দ হাতের শূন্য গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া হঠাৎ কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এককড়ি, তোমার গোমস্তাগিরি কায়দাটা একটু ছাড়। তিনি আসবেন—না, না?

না।

কেন?

এবার প্রত্যুত্তরে যদিচ এককড়ি তাহার জমিদারি কায়দাটা সম্পূর্ণ ছাড়িল না, কিন্তু সবাই শুনিতে পায় এমনি সুস্পষ্ট করিয়াই কহিল, তিনি আসতে পারবেন না, এ-কথা যত লোক দাঁড়িয়েছিল শুনেচে। বলেছিলেন, তোমার হুজুরকে ব'লো এককড়ি, তাঁর বিচার করবার মত বিদ্যে-বুদ্ধি থাকে ত নিজের প্রজাদের করুন গে। আমার বিচার করবার জন্যে আদালত খোলা আছে।

সহসা মনে হইল জমিদারের এতক্ষণের এত রহস্য, এত সরল ঔদাস্য, হাস্যোজ্জ্বল মুখ ও তরল কণ্ঠস্বর চক্ষের পলকে নিবিয়া যেন অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে শুধু আস্তে আস্তে কহিলেন, হুঁ। আচ্ছা তুমি যাও। প্রফুল্ল, সেই যে কি একটা চিনির কোম্পানি হাজার বিঘে জমি চেয়েছিল, তাঁদের কোন জবাব দিয়েছিলে?

আজ্ঞে না।

তা হলে লিখে দাও যে জমি তারা পাবে। দেরি ক'রো না।

না, দিচ্চি লিখে, এই বলিয়া সে এককড়িকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিল। আবার কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত গৃহটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। শিরোমণি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, আমরা আজ তা হলে আসি?

আসুন।

রায়মহাশয় হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, অনুমতি হয় ত আর একদিন চরণ দর্শন করতে আসব।

বেশ, আসবেন।

সকলেই ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। বাহিরে আসিয়া তাঁহারা জমিদারের হাঁক শুনিতে পাইলেন, বেয়ারা—

অনেকখানি পথ কেহই কাহারো সহিত বাক্যালাপ করিল না। অবশেষে শিরোমণি আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া রায়মহাশয়কে একপাশে একটু টানিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, জনার্দ্দন, জমিদারকে তোমার কিরূপ মনে হ'লো ভায়া?

জনার্দ্দন সংক্ষেপে বলিলেন, মনে ত অনেক রকমই হ'লো।

মহাপাপিষ্ঠ—লজ্জা-সরম আদৌ নেই।

না।

কিন্তু দিব্যি সরল। মাতাল কি না! দেখলে, দেনার দায়ে চুল পর্য্যন্ত বাঁধা, তাও বলে ফেললে।

জনার্দ্দন বলিলেন, হুঁ।

শিরোমণি বলিলেন, কিছুই থাকবে না, সব ছারখার হয়ে যাবে, তুমি দেখে নিয়ো।

জনার্দ্দন বলিলেন, খুব সম্ভব।

হয়ত বেশীদিন বাঁচবেও না।

হতেও পারে।

কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিয়া শিরোমণি পুনশ্চ বলিলেন, যা ভাবা গিয়েছিল, বোধ হয় ঠিক তা নয়—নেহাৎ হাবাগোবা বলে মনে হয় না। কি বল?

জনার্দ্দন শুধু জবাব দিলেন, না।

কিন্তু বড় দুর্ম্মুখ। মানীর মান-মর্য্যাদার জ্ঞান নেই!

জনার্দ্দন চুপ করিয়া রহিলেন।

উত্তর না পাইয়াও শিরোমণি কহিলেন, কিন্তু দেখেচ ভায়া কথার ভঙ্গি—অর্দ্ধেক মানে বোঝাই যায় না। সত্য বলচে, না, আমাদের বাঁদর নাচাচ্চে, ঠাওর করাই শক্ত। জানে সব, কি বল?

রায়মহাশয় তথাপি কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না, তেমনি নীরবে পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বাটীর কাছাকাছি আসিয়া শিরোমণি আর কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলেন না, আস্তে আস্তে বলিলেন, ভায়াকে বড় বিমর্ষ দেখাচ্চে—বিশেষ সুবিধে হবে না বলেই যেন ভয় হচ্চে, না?

রায়মহাশয় যেন অনিচ্ছা-সত্ত্বেও একটু দাঁড়াইয়া কহিলেন, মায়ের অভিরুচি।

শিরোমণি ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তার আর কথা কি! কিন্তু ব্যাপারটা যেন খিচুড়ি-পাকিয়ে গেল—না গেল একে ধরা, না গেল তাকে মারা। তোমার কি ভায়া—পয়সার জোর আছে—কিন্তু বাঘের গর্ত্তের মুখে ফাঁদ পাততে গিয়ে না শেষে মারা পড়ি।

জনার্দ্দন একটু রুক্ষ-কণ্ঠে কহিলেন, আপনি কি ভয় পেয়ে এলেন না-কি?

শিরোমণি বলিলেন, না না, ভয় নয়, কিন্তু তুমিও যে খুব ভরসা পেয়ে এলে, তা ত তোমার মুখ দেখেও অনুভব হচ্চে না। হুজুর ত কানকাটা সেপাই—কথাও যেমন হেঁয়ালি, কাজও তেমনি অদ্ভুত। ও যে ধরে গলা টিপে মদ খাইয়ে দেয়নি এই আশ্চর্য্য। এককড়ির মুখে ঠাকরুণটির হুমকিও ত শুনলে? আমিই মেলা কথা কয়ে এসেচি—ভাল করিনি। কি জানি, এককোড়ে ব্যাটা ভেতরে ভেতরে সব বলে দেয় না কি। দুয়ের মাঝে পড়ে শেষকালে না বেড়াজালে ধরা পড়ি!

জনার্দ্দন উদাস-কণ্ঠে কহিলেন, সকলই চণ্ডীর ইচ্ছা। বেলা হয়ে গেল—ও-বেলায় একবার আসবেন।

তা আসবো।

গলির মোড় ফিরিতে বাঁ দিকে গাছের ফাঁকে মন্দিরের অগ্রভাগ দেখা দিতেই বৃদ্ধ শিরোমণি হাত তুলিয়া যুক্তকরে প্রণাম করিলেন, কানে এবং নাকে হাত দিলেন, কিন্তু অস্ফুটে কি প্রার্থনা যে করিলেন তাহা শোনা গেল না। তার পরে ধীরে ধীরে বাড়ি চলিয়া গেলেন।

১৪

অন্যান্য স্থানের মত চণ্ডীগড়েও দিন আসে যায়, বাহির হইতে কোন বিশেষত্ব নাই। দেবীর সেবা সমভাবে চলিতেছে, গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে যাত্রীরা দল বাঁধিয়া তেমনি আসিতেছে, যাইতেছে, মানস করিতেছে, পূজা দিতেছে, পাঁঠা কাটিতেছে, প্রসাদের ভাগ লইয়া পূজারীর সহিত তেমনি বিবাদ করিতেছে, এবং ঠিক তেমনি মুক্ত-কণ্ঠে আপনার খ্যাতি ও প্রতিবেশীর অখ্যাতি প্রচার করিয়া দেহ ও মনের স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিকতার প্রমাণ দিতেছে। বস্তুতঃ কোথাও কোন ব্যতিক্রম নাই; বিদেশীর বুঝিবার জো নাই যে, ইতিমধ্যে হাওয়ার বদল হইয়াছে, এবং ঝঞ্ঝার পূর্ব্বলক্ষণের ন্যায় চণ্ডীগড়ের মাথার আকাশ গোপন ভাবে থম্‌থম্ করিতেছে। এ গ্রামের সাধারণ চাষা-ভুষারাও যে ঠিক নিশ্চয় করিয়া কিছু বুঝিয়া লইয়াছে তাহা

নহে, কিন্তু ষোড়শীর সম্বন্ধে মোড়ল-পদবাচ্যদের মনোভাব যা-ই হোক, এই দীন-দুঃখীরা তাহাকে যেমন ভক্তি করিত, তেমনি ভালবাসিত। এককড়ি নন্দীর উৎপাত হইতে বাঁচিবার সেই কেবল একমাত্র পথ ছিল। ছোট-খাটো ঋণ যখন আর কোথাও মিলিত না, তখন ভৈরবীর কাছে গিয়া হাত পাতিতে তাহাদের বাধিত না। তাহার বাড়ি ছাড়িয়া আসার জন্য ইহাদের সত্য সত্যই বিশেষ কোন দুশ্চিন্তা ছিল না, তাহারা জানিত পিতা ও কন্যার মনোমালিন্য একদিন না একদিন মিটিবেই। ষোড়শীর দুর্নামের কথাটাও অপ্রকাশ ছিল না। কেবল সে-ই বলিয়া ইহা না রটিলেই ভাল হইত; না হইলে দেবীর ভৈরবীদের স্বভাব-চরিত্র লইয়া মাথা গরম করার আবশ্যকতা কেহ লেশমাত্র অনুভব করিত না—দীর্ঘকালের অভ্যাসবশতঃ ইহা এতই তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহাকেই উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া মায়ের মন্দির লইয়া যে তুমুল কাণ্ড বাধিবে, কর্ত্তারা তারাদাস ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই হুজুরের কাছে আনাগোনা করিয়া কি-যেন কি-একটা ওলট-পালট ঘটাইবার মতলব করিবেন, এবং ওই যে অচেনা ছোট মেয়েটাকে কোথাহইতে কিসের জন্য আনিয়া রাখা হইয়াছে—এমনি সব সংশয়ের বিদ্যুৎ কথায় কথায় ক্ষণে ক্ষণে যখন চমকিতে লাগিল, তখন চোখের আড়ালে কোথাও আকাশের গায়ে যে অকালের মেঘ জমিয়া উঠিতেছে এবং তাহাতে দেশের ভাল হইবে না, এই ভাবটাই সকলের মধ্যে ক্রোধ ও ক্ষোভের মত আবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

সেদিন অষ্টমী তিথির জন্য মন্দির-প্রাঙ্গণে লোক-সমাগম কিছু অধিক হইয়াছিল। প্রতিমার অনতিদূরে বারান্দার একধারে বসিয়া ষোড়শী আরতির উপকরণ সজ্জিত করিতেছিল, তারাদাস ও সেই মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া এককড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। ষোড়শী কাজ করিতে লাগিল, মুখ তুলিয়া চাহিল না। এককড়ি কহিল, মা মঙ্গলা, তোমার চণ্ডী-মাকে প্রণাম কর।

পূজারী কি একটা করিতেছিল, সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। ষোড়শী চোখ না তুলিয়াও ইহা লক্ষ্য করিল। মেয়েটি প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই পূজারী কহিল, মায়ের সন্ধ্যারতি কি তুমি দেখবে মা? তা হলে দেবীর দক্ষিণে ওই যে আসন পাতা আছে ওর ওপরে গিয়ে ব'সো।

এককড়ি ষোড়শীর প্রতি একটা বাঁকা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যে কহিল, ওঁর নিজের স্থান উনি নিজেই চিনে নেবেন ঠাকুর, তোমাকে চেনাতে হবেনা, কিন্তু মায়ের জিনিস-পত্র যা যা আছে দেখিয়ে দাও দিকি।

পূজারী একটু লজ্জিত হইয়া কহিল, দেখিয়ে দিতে হবে বই কি, সমস্তই একটি একটি করে দেখাতে হবে। লিষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে সব ঠিক আছে, কোন চিন্তা নেই। মা, ওই দিকে বড় সিন্দুক দেখা যাচ্ছে, ওতে পূজার পাত্র এবং সমস্ত পিতল-

কাঁসার তৈজসাদি তালা-বন্ধ আছে, বড় বড় কাজ-কর্ম্মে শুধু বার করা হয়। আর এই যে গুল-বসানো ছোট কাঠের সিন্দুকটি, এতে মখমলের চাঁদোয়া, ঝালর প্রভৃতি আছে, আর এই কুঠুরিটির মধ্যে সতরঞ্চি, গালচে, কানাত—বসবার আসন এই-সব—

এককড়ি কহিল, আর—

পূজারী বলিলেন, আর ওই যে পূবের দেওয়ালের গায়ে গায়ে বড় তালা ঝুলচে, ওটা লোহার সিন্দুক, মন্দিরের সঙ্গে একেবারে গাঁথা। ওর মধ্যে মায়ের সোনার মুকুট, রামপুরের মহারাণীর দেওয়া মোতির মালা, বীজগাঁর জমিদারবাবুদের দেওয়া সোনার বাউটি, হার, আরও কত শত ভক্তের দেওয়া কত কি সোনা-রূপার অলঙ্কার, তা ছাড়া টাকাকড়ি, দলিলপত্র, সোনা-রূপার বাক্স—অর্থাৎ মূল্যবান যা কিছু সমস্তই ওই সিন্দুকটিতে।

এককড়ি কহিল, আমি আজকের নয় ঠাকুর, সব জানি। কিন্তু ওসব কেবল তোমার মুখেই আছে, না সিন্দুকটা হাতড়ালে কিছু পাওয়া যাবে? ওই ত উনি বসে আছেন, চাবিটা চেয়ে এনে একবার খুলে দেখাও না? গ্রামের ষোল আনার প্রার্থনা মঞ্জুর করে হুজুর কি হুকুম দিয়েচেন শোননি? চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্ব্বে সমস্তই যে একদফা মিলিয়ে দেখতে হবে।

পূজারী হতবুদ্ধির ন্যায় চুপ করিয়া রহিল। মন্দির হইতে ষোড়শীর কর্তৃত্ব যে ঘুচিয়া গেছে তাহা সে শুনিয়াছে এবং নন্দীমহাশয়ের প্রত্যক্ষ আদেশ অমান্য করাও যে অতিশয় সাঙ্ঘাতিক তাহাও জানে, কিন্তু কর্ম্মনিরতা ওই যে ভৈরবী অনতিদূরে বসিয়া স্বকর্ণে সমস্ত শুনিয়াও শুনিতেছে না, তাহাকে মুখের সম্মুখে গিয়া জানাইবার সাহস তাহার নাই। সে ভয়ে ভয়ে কহিল, কিন্তু তার ত এখনো দেরি আছে নন্দী-মশাই। এদিকে সূর্য্যাস্ত হয়ে এল—

তারাদাস এতক্ষণ কথা কহে নাই, এবং সঙ্কোচ ও ভয়ের চিহ্ন কেবল পূজারীর মুখে-চোখেই প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা নয়। আস্তে আস্তে কহিল, মিলিয়ে নিতে অনেক বিলম্ব হবে নন্দীমশাই, একটু সকাল করে এসে আর একদিন এ কাজটা সেরে নিলে হবে না? কি বলেন?

এককড়ি চিন্তা করিয়া কহিল, আচ্ছা, তাই না হয় হবে? পূজারীকে কহিল, কিন্তু মনে থাকে যেন চক্রবর্ত্তীমশাই, এই শনিবারেই সংক্রান্তি। ষোল-আনা পঞ্চায়েতি নাটমন্দিরেই হবে। হুজুর স্বয়ং এসে বসবেন। উত্তর ধারটা কানাত দিয়ে ঘিরে দিয়ে তাঁর জন্যে মখমলের গালচেটা পেতে দিতে হবে। আলোর সেজ কটাও তৈরি রাখা চাই।

এককড়ি একটু জোর গলায় কথা কহিতেছিল, সুতরাং অনেকেই কৌতূহলবশে

বারান্দার নীচে প্রাঙ্গণে আসিয়া জমা হইয়াছিল। সে তাহাদের শুনাইয়া আরও একটু হাঁকিয়া পূজারীকে কহিল, সেদিন ভিড় ত বড় কম হবে না—ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। মঙ্গলা মেয়েটাকে আদর করিয়া কহিল, কি গো মা, ক্ষুদে ভৈরবী! দেখে-শুনে সব চালাতে পারবে ত? তবে আমরা আছি, হুজুর এখন থেকে নিজে দৃষ্টি রাখবেন বলেচেন, নইলে ভার বড় সহজ নয়। অনেক বিদ্যে-বুদ্ধির দরকার। বলিয়া ষোড়শীর প্রতি আড়-চোখে চাহিয়া দেখিল সে ঠাকুরের পূজার সজ্জায় তেমনি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া আছে। তারাদাসকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিল, কি গো ঠাকুরমশাই, নূতন অভি-ষেকের দিনক্ষণ কিছু স্থির হয়েছে শুনেচ? লোকে ত আমাদের একেবারে ব্যস্ত করে তুলেচে, নাবার খাবার সময় দিতে চায় না।

প্রত্যুত্তরে তারাদাস অস্ফুটে কি যে বলিল বুঝিতে পারা গেল না। তাহারা সদর দরজা দিয়া যখন বাহির হইয়া গেল, তখন পিছনে পিছনে অনেকেই গেল এবং গুঞ্জন-ধ্বনি তাহাদের প্রাঙ্গণের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্পষ্ট শুনা গেল, কিন্তু চণ্ডীর আরতির প্রতীক্ষায় যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা দূর হইতে ষোড়শীর আনত মুখের প্রতি শুধু নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, এমন ভরসা কাহারও হইল না কাছে গিয়া একটা প্রশ্ন করে।

যথাসময়ে দেবীর আরতি শেষ হইল। প্রসাদ লইয়া যে যাহার গৃহে চলিয়া গেলে, মন্দিরের ভৃত্য যখন দ্বার রুদ্ধ করিতে আসিল, তখন ষোড়শী পূজারীকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিল, চক্রবর্ত্তীমশাই, ঠাকুরের সেবায়েত আমি, না এককড়ি নন্দী?

চক্রবর্ত্তী লজ্জিত হইয়া বলিল, তুমি বই কি মা, তুমিই ত মায়ের ভৈরবী!

ষোড়শী কহিল, কিন্তু তোমার ব্যবহারে আজ অন্য ভাব প্রকাশ পেয়েচে। যত-দিন আছি, গোমস্তার চেয়ে আমার মান্যটা মন্দিরের ভেতর বেশি থাকা দরকার। ঠিক না?

পূজারী কহিল, তাতে আর সন্দেহ কি মা! কিন্তু—

ষোড়শী কহিল, ওই কিন্তুটা তোমাকে সে কটা দিন বাদ দিয়ে চলতে হবে।

এই শান্ত মৃদুকণ্ঠ পূজারীর অত্যন্ত সুপরিচিত; সে অধোমুখে নিরুত্তরে রহিল এবং ষোড়শীও আর কিছু কহিল না। মন্দির-দ্বারে তালা পড়িলে সে চাবির গোছা আঁচলে বাঁধিয়া নীরবে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে স্নান করিয়া আসিয়া দূর হইতে দেখিতে পাইল এইটুকু সময়ের মধ্যে তাহার পর্ণকুটীরখানি ঘেরিয়া বহু লোক জড় হইয়া বসিয়া আছে। কাছে আসিতেই লোকগুলা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পদধূলির আশায় একযোগে প্রায়

পঁচিশখানি হাত বাড়াইয়া দিতে ষোড়শী পিছাইয়া গিয়া হাসিয়া কহিল, ওরে, অত ধুলো পায়ে নেই রে নেই, আবার আমাকে নাইয়ে মারিসনে, আমার মন্দিরের বেলা হয়ে গেছে। কি হয়েচে বল্‌?

ইহারা প্রায় সকলেই তাহার প্রজা; হাত জোড় করিয়া কহিল, মা আমরা যে মারা যাই! সর্ব্বনাশ হয় যে!

তাহাদের মুখের চেহারা যেমন বিষণ্ণ তেমনি শুষ্ক। কেহ কেহ বোধ করি সারারাত্রি ঘুমাইতে পর্য্যন্ত পারে নাই। এই সকল মুখের প্রতি চাহিয়া তাহার নিজের হাসি-মুখখানি চক্ষের পলকে মলিন হইয়া গেল। বুড়া বিপিন মাইতি অবস্থা ও বয়সে সকলের বড়; ইহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া ষোড়শী জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ কি সর্ব্বনাশ হ'লো বিপিন?

বিপিন কহিল, কে একজন মাদ্রাজী সাহেবকে সমস্ত দক্ষিণের মাঠকে মাঠ জমিদার-তরফ থেকে বিক্রি করা হচ্চে। আমাদের যথাসর্ব্বস্ব। কেউ তা হলে আর বাঁচব না—না খেতে পেয়ে সবাই শুকিয়ে মারা যা'বো মা!

ব্যাপারটা এমনি অসম্ভব যে, ষোড়শী হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, তা হলে তোদের শুকিয়ে মরাই ভাল। যা, বাড়ি যা, সকালবেলা আর আমার সময় নষ্ট করিস্‌নে।

কিন্তু তাহার হাসিতে কেহ যোগ দিতে পারিল না, সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, না মা, এ সত্যি।

ষোড়শী বিশ্বাস করিতে পারিল না, বলিল, না রে না, এ কখনো সত্যি হতেই পারে না, তোদের সঙ্গে সে তামাসা করেচে। বিশ্বাস না করিবার তাহার বিশেষ হেতু ছিল। একে ত এই সকল জমি-জমা তাহারা পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে সমস্ত মাঠ শুধু কেবল বীজগ্রামের সম্পত্তিও নহে। ইহার কতক অংশ ৺চণ্ডীমাতার এবং কিছু রায়মহাশয়ের খরিদা। অতএব জীবানন্দ একাকী ইচ্ছা করিলেও ইহা হস্তান্তর করিয়া দিতে পারেন না। কিন্তু বৃদ্ধ বিপিন মাইতি যখন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, কাল কাছারি-বাটীতে সকলকে ডাকাইয়া আনিয়া নন্দী মহাশয় নিজের মুখে জানাইয়া দিয়েছেন এবং তথায় জনার্দ্দন ও তারাদাস উভয়েই উপস্থিত ছিলেন, এবং দেবীর পক্ষ হইতে তাহার পিতা তারাদাসই দলিলে দস্তখত করিয়া দিয়াছেন, তখন অপরিসীম ক্রোধ ও বিস্ময়ে ষোড়শী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে ধীরে ধীরে কহিল, তাই যদি হয়ে থাকে তোরা আদালতে নালিশ কর্‌ গে।

বিপিন নিরুপায়ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, তাও কি হয় মা? রাজার সঙ্গে কি বিবাদ করা চলে? কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা করে জলে বাস করলে যার যা কিছু আছে—ভিটেটুকু পর্য্যন্তও থাকবে না!

ষোড়শী কহিল, তা বলে বাপ-পিতামহের কালের পৈতৃক বিষয়টুকু তোরা মুখ বুজে ছেড়ে দিবি ?

বিপিন কহিল, তুমি যদি কৃপা করে আমাদের বাঁচিয়ে দাও মা, দীন দুঃখী আমাদের, নইলে ছেলেপিলের হাত ধরে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাই ত তোমার কাছে সবাই ছুটে এসেচি।

ষোড়শী একে একে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। ইহাদের কাহারও কিছু করিবার সাধ্য নাই; তাই এই একান্ত বিপদের দিনে দল বাঁধিয়া অপরের কৃপা-ভিক্ষা করিতে তাহারা বাহির হইয়াছে। এই সব নিরুত্তর ভরসাহীন মুখের সকরুণ প্রার্থনায় তাহার বুকের ভিতরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল; কহিল, তোরা এতগুলো পুরুষমানুষ মিলে নিজেদের বাঁচাতে পারবিনে, আর মেয়েমানুষ হয়ে আমি যাবো তোদের বাঁচাতে। রাগ ক'রো না বিপিন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ জমি না হয়ে মাইতিগিন্নীকে যদি জমিদারবাবু এমনি জবরদস্তি আর একজনকে বিক্রী করে দিতেন, আর সে আসতো তাকে দখল করতে, কি করতে বাবা তুমি ?

ষোড়শীর এই অদ্ভুত উপমায় অনেকের মুখই চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কিন্তু বৃদ্ধের চোখের কোণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিয়া সহজ কণ্ঠে বলিল, মা, আমি না হয় বুড়ো হয়েচি, আমার কথা ছেড়েই দাও, কিন্তু মাইতিগিন্নীর পাঁচ-পাঁচজন জোয়ান বেটা আছে, তারা তখন জেল কেন, ফাঁসি-কাঠের ভয় পর্য্যন্ত করবে না, একথা তোমাকে মা-চণ্ডীর দিব্যি করেই জানিয়ে দিচ্ছি।

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ষোড়শী বাধা দিয়া কহিল, তাই যদি সত্যি হয় বিপিন, তোমার সেই পাঁচ-পাঁচজন জোয়ান বেটাকে ব'লো, এই পিতা-পিতামহের কালের ক্ষেত-খামারটুকুও তাদের বুড়ো মায়ের চেয়ে একতিল ছোট নয়; এঁরা দুজনেই তাদের সমান প্রতিপালন করে এসেচেন।

বৃদ্ধ চক্ষের নিমেষে সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ঠিক! ঠিক কথা মা! আমাদের মা-ই ত বটে! ছেলেদের এখনি গিয়ে আমি এ-কথা জানাবো, কিন্তু তুমি আমাদের সহায় থেকো।

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া বলিল, শুধু আমি কেন বিপিন, মা চণ্ডী তোমাদের সহায় থাকবেন; কিন্তু আমার পূজোর সময় বয়ে যাচ্চে বাবা, আমি চললুম। বলিয়া সে দ্রুতপদে গিয়া আপনার কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু বিপিনের গম্ভীর গলা সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল। সে সকলকে ডাকিয়া কহিতেছে, তোরা সবাই শুনলি ত রে, শুধু গর্ভধারিণীই মা নয়, যিনি পালন করেন তিনিও মা। যা হবার হবে, ঘরের মাকে আমরা কিছুতেই পরের হাতে তুলে দিতে পারব না।

১৫

চৈত্রের সংক্রান্তি আসন্ন হইয়া উঠিল। চড়ক ও গাজন-উৎসবের উত্তেজনায় দেশের কৃষিজীবীর দল প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—এতবড় পর্ব্বদিন তাহাদের আর নাই। নরনারী-নির্ব্বিশেষে যাহারা সমস্ত মাস ব্যাপিয়া সন্ন্যাসের ব্রত ধারণ করিয়া আছে, তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয়ের গৈরিকে দেশের বাতাসে যেন বৈরাগ্যের রঙ ধরিয়া গেছে। পথে পথে 'শিব-শম্ভু' নিনাদের বিরাম নাই, চণ্ডীর দেউলে তাহাদের আসা-যাওয়া শেষ হইতেছে না—প্রাঙ্গণ-সংলগ্ন শিবমন্দির ঘেরিয়া দেবতার অসংখ্য সেবকে যেন মাতামাতি বাধাইয়া দিয়াছে। পূজা দিতে, তামাসা দেখিতে, বেচা-কেনা করিতে যাত্রী আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, বাহিরে প্রাচীরতলে দোকানীরা স্থান লইয়া লড়াই করিতে শুরু করিয়া দিয়াছে—চোখ চাহিলেই মনে হয় চণ্ডীগড়ের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত মহোৎসবের সূচনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে আর বিলম্ব নাই।

ষোড়শী মনের অশান্তি দূর করিয়া দিয়া অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও কাজে লাগিয়া গেছে—সকলদিকে দৃষ্টি রাখিতে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার মন্দির ছাড়িবার জো নাই। বিকালের দিকে মন্দিরের রকে বসিয়া সে নিবিষ্টচিত্তে হিসাবের খাতাটায় জমা-খরচের মিল করিতেছিল, নানা জাতীয় শব্দতরঙ্গ অভ্যস্ত ব্যাপারের ন্যায় তাহার কানে পশিয়াও ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল না, এমন সময়ে হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত নীরবতা খোঁচার মত যেন তাহাকে আঘাত করিল। চোখ তুলিয়া দেখিল স্বয়ং জীবানন্দ চৌধুরী। তাঁহার দক্ষিণে, বামে ও পশ্চাতে পরিচিত ও অপরিচিত অনেকগুলি ভদ্র ব্যক্তি। রায়মহাশয়, শিরোমণি ঠাকুর তারাদাস, এককড়ি এবং গ্রামের আরও অনেকে প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আরও তিন-চারিজনকে সে চিনিতে পারিল না; কিন্তু পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখিয়া অনুভব করিল ইহারা কলিকাতা হইতে বাবুর সঙ্গে আসিয়াছেন। খুব সম্ভব পল্লীগ্রামের বিশুদ্ধ বায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করাই অভিপ্রায়। জন-চারেক ভোজপুরী পাইক-পেয়াদাও আছে। তাহাদের মাথায় রঙ্গিন পাগড়ী ও কাঁধে সুদীর্ঘ যষ্টি। অনতিকাল পূর্ব্বে হোলী-উৎসবের সমস্ত চিহ্ন আজও তাহাদের পরিচ্ছদে দেদীপ্যমান। মনিবের শরীর-রক্ষা ও গৌরব বৃদ্ধি করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। ষোড়শী ক্ষণেকের জন্য চোখ তুলিয়াই আবার তাহার খাতার পাতায় দৃষ্টি সংযোগ করিল, কিন্তু মনঃসংযোগ করিতে পারিল না। জীবানন্দ আর কখনও এখানে আসেন নাই; তিনি সকৌতুকে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া

পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং সুপ্রাচীন শিরোমণিমহাশয় তাঁহার বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া সেখানে-যা কিছু আছে—তাহার ইতিহাস, তাহার প্রবাদ-বাক্য—সমস্তই এই নবীন জমিদার প্রভৃটিকে শুনাইতে শুনাইতে সঙ্গে চলিলেন। এইভাবে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল ঘুরিয়া ফিরিয়া, এই দলটি আসিয়া এক সময়ে মন্দিরের দ্বারের কাছে উপস্থিত হইল, এবং মিনিট-দুই পরেই পূজারী আসিয়া ষোড়শীকে কহিল, মা, বাবু তোমাকে নমস্কার জানিয়ে একবার আসতে অনুরোধ করলেন।

ষোড়শী মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, আচ্ছা চল, যাচ্চি। বলিয়া সে তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া জমিদারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দ মিনিট পাঁচ-ছয় নিঃশব্দে তাহার আপদ-মস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, সকলের অনুরোধে তোমার সম্বন্ধে আমি কি হুকুম দিয়েছি শুনেচ?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

জীবানন্দ কহিলেন, তোমাকে বিদায় করা হয়েচে, এবং ওই ছোট মেয়েটিকে নতুন ভৈরবী করে মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়েচে। অভিষেকের দিন স্থির হয়নি, কিন্তু শীঘ্রই হবে। কাল সকালে রায়মশায় প্রভৃতি সকলে আসবেন। তাঁদের কাছে দেবীর সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে আমার গোমস্তার হাতে সিন্দুকের চাবি দেবে। এ সম্বন্ধে তোমার কোন বক্তব্য আছে?

ষোড়শী পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়াছিল; তাই তাহার কণ্ঠস্বরে কোন প্রকার উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না, সহজকণ্ঠে কহিল, আমার বক্তব্যে আপনাদের কি কিছু প্রয়োজন আছে?

জীবানন্দ কহিলেন, না। তবে পরশু সন্ধ্যার পর এখানেই একটা সভা হবে, ইচ্ছে কর ত দশের সামনে তোমার দুঃখ জানাতে পার। ভাল কথা, শুনতে পেলাম তুমি নাকি আমার বিরুদ্ধে আমার প্রজাদের বিদ্রোহী করে তোলবার চেষ্টা করচ?

ষোড়শী বলিল, তা জানিনে। তবে, আমার নিজের প্রজাদের আপনার উপদ্রব থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করচি।

জীবানন্দ অধর দংশন করিয়া কহিলেন, পারবে?

ষোড়শী কহিল, পারা না পারা মা চণ্ডীর হাতে।

জীবানন্দ কহিলেন, তারা মরবে।

ষোড়শী কহিল, মানুষ অমর নয় সে তারা জানে।

ক্রোধে ও অপমানে সকলের চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। এককড়ি ত এমনি ভাব দেখাইতে লাগিল যে, সে বহু কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে।

জীবানন্দ একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, তোমার নিজের প্রজা আর কেউ

নেই। তারা যার প্রজা তিনি নিজে দলিলে দস্তখত করে দিয়েচেন। তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ষোড়শী মুখ তুলিয়া কহিল, আপনার আর কোন হুকুম আছে?

জীবানন্দ স্পষ্ট অনুভব করিলেন, বলিবার সময়ে তাহার ওষ্ঠাধর তাচ্ছিল্যের আভাসে যেন স্ফুরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সংক্ষেপে জবাব দিয়া কহিলেন, না, আর কিছুই নেই।

ষোড়শী কহিল, তা হলে দয়া করে এইবার আমার কথাটা শুনুন।

বল।

ষোড়শী কহিল, কাল দেবীর অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দেবার সময় আমার নেই এবং পরশু মন্দিরের কোথাও সভা-সমিতির স্থানও হবে না। এগুলো এখন বন্ধ রাখতে হবে।

শিরোমণি অনেক সহিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। সহসা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কখনো না, কিছুতেই নয়। এ-সব চালাকি আমাদের কাছে খাটবে না বলে দিচ্চি···এবং শুধু জীবানন্দ ছাড়া যে যেখানে ছিল ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল।

জনার্দ্দন রায় এতক্ষণ কথা কহেন নাই; কলরব থামিলে অকস্মাৎ উষ্মার সহিত বলিয়া উঠিলেন, তোমার সময় এবং মন্দিরের ভেতর জায়গা কেন হবে না শুনি ঠাকরুণ?

ইহার শেষ কথাটার শ্লেষ উপলব্ধি করিয়াও ষোড়শী সহজ বিনীতকণ্ঠে কহিল, আপনি ত জানেন রায়মশাই, এখন গাজনের সময় যাত্রীর ভিড়, সন্ন্যাসীর ভিড়, আমারই বা সময় কোথায়, তাদেরই বা সরাই কোথায়!

সত্যই তাই। এবং এই নিবেদনের মধ্যে যে কিছুমাত্র অসঙ্গতি নাই, বোধ করি জীবানন্দ তাহা বুঝিলেন, কিন্তু দেশের যাঁহারা, তাঁহারা নাকি বদ্ধপরিকর হইয়া আসিয়াছিলেন, তাই এই নম্র কণ্ঠস্বরে উপহাস কল্পনা করিয়া একেবারে জ্বলিয়া গেলেন। জনার্দ্দন রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, হতেই হবে। আমি বলচি হতে হবে এবং দলের মধ্যে হইতে একজন কটূক্তি পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিল।

কথা ষোড়শীর কানে গেল এবং মুখের ভাব তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত কঠোর ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। পলকমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া জীবানন্দকে বিশেষ করিয়া উদ্দেশ করিয়া কহিল, ঝগড়া করতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। তবে ও-সব করবার এখন সুযোগ হবে না, এই কথাটা আপনার অনুচরদের বুঝিয়ে বলে দেবেন। আমার সময় অল্প; আপনাদের কাজ মিটে থাকে ত আমি চললাম।

এই মুখ, এই কণ্ঠস্বর, একান্ত অবহেলা হঠাৎ জীবানন্দকেও তীক্ষ্ণ আঘাত করিল, এবং তাঁহার নিজের কণ্ঠস্বরও তপ্ত হইয়া উঠিল, কহিলেন, কিন্তু আমি হুকুম দিয়ে যাচ্ছি, কালই এ-সব হতে হবে এবং হওয়াই চাই।

জোর করে?

হ্যাঁ, জোর করে।

সুবিধে অসুবিধে যাই-হোক?

হ্যাঁ, সুবিধে-অসুবিধে যাই-ই হোক।

ষোড়শী আর কোন তর্ক করিল না। পিছনে চাহিয়া ভিড়ের মধ্যে একজনকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আহ্বান করিয়া কহিল, সাগর, তোমাদের সমস্ত ঠিক আছে?

সাগর সবিনয়ে কহিল, আছে মা, তোমার আশীর্ব্বাদে অভাব কিছুই নেই।

ষোড়শী কহিল, বেশ। জমিদারের লোক কাল একটা হাঙ্গামা বাধাতে চায়, কিন্তু আমি তা চাইনে। এই গাজনের সময়টা রক্তপাত হয় আমার ইচ্ছে নয়, কিন্তু দরকার হলে করতেই হবে। এই লোকগুলোকে তোরা দেখে রাখ্; এদের কেউ যেন আমার মন্দিরের ত্রিসীমানায় না আসতে পারে। হঠাৎ মারিসনে—শুধু গলা-ধাক্কা দিয়ে বার করে দিবি। এই বলিয়া সে আর দৃক্‌পাত-মাত্র না করিয়া মন্দপদে বারান্দা পার হইয়া গেল। ষোড়শীকে বিশ বছর ধরিয়া লোকে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাকে জানিবার যে কিছু বাকী আছে কেহ মনেও করে নাই। কিন্তু আজ তাহার প্রকৃতির এই অসাধারণ দিকটার প্রথম পরিচয় পাইয়া হুজুর হইতে পিয়াদা পর্য্যন্ত যেন পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

১৬

চৈত্রের সংক্রান্তি নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল—'শিব-শম্ভু'র গাজন উৎসবে কোথাও কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটিল না। দর্শকের দল ঘরে ফিরিল, দোকানীরা দোকান ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইল, বাতাসে তেলে-ভাজা খাবারের গন্ধ ফিকা হইয়া আসিল, এবং গেরুয়া-ধারীরাও চীৎকার ছাড়িয়া গৃহকর্ম্মে মন দিবার প্রয়োজন অনুভব করিল। চিরদিনের অভ্যস্ত সুরে চারিদিকের আবহাওয়ায় সুখ-দুঃখের আবার সেই পরিচিত স্রোত দেখা দিল, কেবল চণ্ডীগড়ের ভৈরবীর দেহের মধ্যে কি যে রোগ প্রবেশ করিল, তাহার সে চেহারা আর ফিরিয়া আসিল না—কি এক প্রকার ভয়ে ভয়ে মন যেন তাহার অহর্নিশি চকিত হইয়াই রহিল। উৎসবের কয়টা দিন যেন নির্ব্বিঘ্নে কাটাই সম্ভব এ আশা

ষোড়শীর ছিল, কারণ দেবতার ক্রোধোদ্রেকের দায়িত্ব আর যে কেহ মাথায় করিতে চা'ক, জনার্দ্দন চাহিবে না সে নিশ্চিত জানিত। কিন্তু এইবার?

তবুও দিনগুলা এমনি নিঃশব্দে কাটিতে লাগিল যেন আর কোন হাঙ্গামা নাই, সমস্ত মিটিয়া গেছে। কিন্তু সত্য সত্যই মিটিয়া যে কিছু যায় নাই, অলক্ষ্যে গোপনে কঠিন কিছু একটা দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে, এ আশঙ্কা শুধু ষোড়শীর নহে, মনে মনে প্রায় সকলেরই ছিল। সেই মাঠ-সংক্রান্ত কৃষকদের কাছে আজ সে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছিল। কথা ছিল তাহারা দেবীর সন্ধ্যা-আরতির পরে মন্দির-প্রাঙ্গণে জমা হইবে; কিন্তু আরতি শেষ হইয়া গেল, রাত্রি আটটা ছাড়াইয়া নয়টা এবং নয়টা ছাড়াইয়া দশটা বাজিতে চলিল, কিন্তু কাহারও দেখা নাই। প্রণাম করিতে যাহারা নিত্য আসে, প্রসাদ লইয়া একে একে তাহারা প্রস্থান করিল, পূজারী অন্তর্হিত হইল, এবং মন্দিরের ভৃত্য দুয়ার বন্ধ করিবার অনুমতি চাহিল। আর অপেক্ষা করিয়া ফল নাই, এবং কি একটা ঘটিয়াছে তাহাতেও ভুল নাই; কিন্তু ঠিক তাহা জানিতে না পারিয়া সে অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিল। এমনি সময় ধীরে ধীরে সাগর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে একাকী দেখিয়া ষোড়শী ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল, এত দেরি যে সাগর? কিন্তু আর কেউ ত আসেনি? এরা কি তবে খবর পায়নি বাবা?

সাগর কহিল, পেয়েচে বই কি মা। আমি নিজে গিয়ে সকলের ঘরে ঘরে তোমার ইচ্ছে জানিয়ে এসেচি।

ষোড়শী শঙ্কিত হইয়া কহিল, তবে?

সাগর বলিল, আজ বোধকরি কেউ আর সময় করে উঠতে পারলে না। হুজুরের কাছারি-বাড়িতে ষোল-আনার পঞ্চায়েতি ছিল, তা এইমাত্র সাঙ্গ হ'লো। পঞ্চু, অনাথ, রামময়, নবকুমার, অক্ষয় মাইতি, মায় আমাদের বুড়ো বিপিন-খুড়ো পর্য্যন্ত তার সাজোয়ান ব্যাটাদের নিয়ে। কেউ বাদ যায়নি মা, আমি একটা বাতাপি নেবুগাছের তলায় দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলাম।

ষোড়শী কহিল, ভাল করিসনি সাগর, কেউ দেখে ফেললে—

সাগর হাসিয়া বলিল, একা-যাইনি মা, ইনি সঙ্গে ছিলেন, বলিয়া সে বাঁ হাতের সুদীর্ঘ বংশদণ্ডখানি সস্নেহে সসম্ভ্রমে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিল।

ষোড়শী কহিল, কিন্তু এইখানে হবার যে কথা ছিল?

সাগর কহিল, কথাও ছিল, হুজুরের ভোজপুরীগুলোর ইচ্ছেও ছিল কিন্তু গ্রামের কেউ রাজী হলেন না। তাঁরা ত এদিককার মানুষ—আমাদের খুড়ো-ভাইপোকে হয়ত চেনেন।

ষোড়শী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সভায় কি স্থির হ'লো?

সাগর কহিল, তা সব ভাল। এই মঙ্গলেই মেয়েটার অভিষেক শেষ হবে। তবে তোমারও ভাবনা নেই—কাশীবাসের বাবদে প্রার্থনা জানালে শ-খানেক টাকা পেতে পারবে।

ষোড়শী কহিল, প্রার্থনা জানাতে হবে কার কাছে?

সাগর বলিল, বোধ হয় হুজুরের কাছেই।

ষোড়শী জিজ্ঞাসা করিল, আর সকলের? যাদের জমি-জমা সব গেল তাদের?

সাগর বলিল, ভয় নেই মা, চিরকাল ধরে যা হয়ে আসচে তা থেকে তারা বাদ যাবে না। এই যে সেদিন প্রজার পক্ষ থেকে পাঁচ হাজারের নজর দাখিল হ'লো তার খতের কাগজগুলো ত রায়মশাইয়ের সিন্দুক ছাড়া আর কোথাও জায়গা পায়নি, নইলে তিনি একটা হুকুম দিতে না-দিতে ভিড় করে আজ সকলে যাবেই বা কেন?

ষোড়শী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল, আর তোদের?

সাগর কহিল, আমাদের খুড়ো-ভাইপোর? একটু হাসিয়া বলিল, সে ব্যবস্থাও তিনি করেচেন, সাত-সাতটা দিন কিছু আর চুপ করে বসে ছিলেন না। পাকা লোক, দারোগা-পুলিশ মুঠোর মধ্যে, কোশ-দশেকের মধ্যে কোথাও একটা ডাকাতি হতে যা দেরি। জানো ত মা, বছর-দুই করে একবার খেটে এসেচি, এবার দশ বছরের মত একেবারে নিশ্চিন্ত, খুড়োর গঙ্গালাভ তার মধ্যেই হবে, তবে আমার বয়সটা এখনও কম, হয়ত আর একবার দেশের মুখ দেখতে পাবো। বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ষোড়শী ভয় পাইয়া কহিল, হাঁ রে, এ কি তোরা সত্যি বলে মনে করিস্?

সাগর বলিল, মনে করি? এ ত চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি মা। জেলের বাইরে আমাদের রাখতে পারে এ সাধ্যি কারও নেই। বেশি নয়, দু'মাস এক মাস দেরি, হয়ত নিজের চোখেই দেখে যেতে পারবে মা।

ষোড়শী কহিল, আর যারা ওখানে গেছে, তাদের?

সাগর বলিল, তাদের অবস্থা আমাদের চেয়েও মন্দ। জেলের মধ্যে খেতে দেয়, যা হোক আমরা দুটো খেতে পাবো, কিন্তু এরা তাও পাবে না। নালিশগুলো সব ডিক্রি হতে যা বিলম্ব, তার পরে রায়মশায়ের নিজ জোতে জন-খেটে দু'মুঠো জোটে ভাল, না হয় আসামের চা-বাগান ত আছেই। কেমন মা, তোমারই কি মনে পড়ে না ওই বোনের ডাঙাটায় আগে আমাদের কত ঘর ভূমিজ বাউরির বসতি ছিল, কিন্তু আজ তারা কোথায়? কতক গেল কয়লা খুঁড়তে, কতক গেল চালান হয়ে চা-বাগানে। কিন্তু আমি দেখেচি ছেলেবেলায় তাদের জমি-জমা হাল-বলদ। দু-মুঠো ধানের সংস্থান তাদের সব্বায়ের ছিল। আজ তাদের অর্দ্ধেক এককড়ি নন্দীর, অর্দ্ধেক রায়মশায়ের।

ষোড়শী স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া সমস্ত ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে লাগিল।

এই সেদিন যাহারা দল বাঁধিয়া তাহার আশ্রয় চাহিতে আসিয়াছিল, আজ অক্ষম জানিয়া প্রবলের চোখের ইঙ্গিতে তাহারই বিরুদ্ধে তাহারা মন্ত্রণা করিতে একত্র হইয়াছে—সেদিনের সমস্ত সঙ্কল্প তাহাদের কোথায় ভাসিয়া গেল! যে প্রবল, যে ধনবান, যে ধর্ম্মজ্ঞান বিরহিত, তাহার অত্যাচার হইতে বাঁচিবার কোন পথ দুর্ব্বলের নাই। কোথাও ইহার নালিশ চলে না, ইহার বিচার করিবার কেহ নাই—ভগবান কান দেন না, সংসারে চিরদিন ইহা অবারিত চলিয়া আসিতেছে। এই যে আজ এতগুলি লোক গিয়া একটিমাত্র প্রবলের পদতলে তাহাদের বিবেক, ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব সমস্ত উজাড় করিয়া দিয়া কোনমতে বাঁচিয়া থাকিবার একটুখানি আশ্বাস লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল, ইহার লজ্জা, ইহার দৈন্য, ইহার ব্যথা যত বড়ই হোক, যতদূর দেখা যায়, এই দুঃখীদের এই ক্ষুদ্র কৌশলটুকু ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই চোখে পড়ে না। যে অন্যায় এতগুলি মানুষকে এমন অমানুষ করিয়া দিল, তাহাকে প্রতিহত করিবার শক্তি এতবড় বিশ্ব-বিধানে কই? এই যে সাগর সর্দ্দার সেদিন পীড়িতের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিল, দুর্ব্বলের এতবড় স্পর্দ্ধার সহস্র গুণ বড় দণ্ড তাহার তোলা আছে—অব্যাহতির কোন পথ নাই। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সাগর, এ সব তুই শুনলি কার মুখে?

সাগর কহিল, স্বয়ং হুজুরের মুখে।

তাহলে এ-সকল তাঁরই মতলব?

সাগর চিন্তা করিয়া কহিল, কি জানি মা, কিন্তু মনে হয় রায়মশায়ও আছেন।

ষোড়শী একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, আচ্ছা সাগর, তুই বলতে পারিস্, জমিদার আমার উপর অত্যাচার করেন না কেন? আমি ত ভাঙা কুঁড়েয় একলা থাকি, ইচ্ছে করলেই ত পারেন?

সাগর হাসিল, কহিল, কে তোমাকে বললে মা, তুমি একলা থাকো? মা, আমাদের নিজের পরিচয় নিজে দিতে নেই, গুরুর নিষেধ আছে, বলিতে বলিতে সহসা তাহার বলিষ্ঠ দক্ষিণ হাতের পাঁচটা আঙ্গুল লাঠির গায়ে যেন ইস্পাতের সাঁড়াসির মত চাপিয়া বসিল, কহিল, যার ভয়ে চণ্ডীর মন্দিরে না বসে ষোল-আনা বসতে গেল আজ এককড়ির কাছারি-বাড়িতে, তারই ভয়ে কেউ তোমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। হরিহর সর্দ্দারের ভাইপো সাগরের নাম দশ-বিশ ক্রোশের লোকে জানে, তোমার উপর অত্যাচার করবার মানুষ ত মা পঞ্চাশখানা গ্রামে কেউ খুঁজে পাবে না।

ষোড়শীর দুই চক্ষু অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, সাগর, এ কি সত্য?

সাগর হেঁট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার হাতের লাঠিটা ষোড়শীর পায়ের নীচে রাখিয়া দিয়া কহিল, বেশ ত মা, সেই আশীর্ব্বাদই কর না, কথা যেন আমার মিথ্যে না হয়।

ষোড়শীর চোখের দৃষ্টি একবার একটুখানি কোমল হইয়াই আবার তেমনি জ্বলিতে লাগিল, কহিল, আচ্ছা সাগর, আমি ত শুনেচি তোদের প্রাণের ভয় করতে নেই?

সাগর সহাস্যে কহিল, মিথ্যে শুনেচ তাও ত আমি বলচিনে মা।

ষোড়শী কহিল, কেবল প্রাণ দিতেই পারিস্, আর নিতে পারিস্‌নে?

সাগর কহিল, একটা হুকুম দিয়ে আজ রাত্রেই কেন যাচাই কর না মা? এই বলিয়া সে ষোড়শীর মুখের উপর দুই চোখ মেলিয়া ধরিতে ষোড়শী বিস্ময়ে ও ভয়ে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল। সাগরের চাহনি এক পলকে বদলাইয়া গেছে। সেই স্বাভাবিক দীপ্তি নাই, সে তেজ নাই, সে কোমলতা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে—নিষ্প্রভ, সঙ্কুচিত গভীর দৃষ্টি—এ যেন আর সে সাগর নয়, এ যেন আর কেহ। সাগর কথা কহিল। কণ্ঠস্বর শান্ত কঠিন, অত্যন্ত ভারি। কহিল, রাত বেশি হয়নি—ঢের সময় আছে। মা চণ্ডীর কপাট এখনো খোলা আছে মা, আমি তোমার হুকুম শুনতে পেয়েচি। বেশ, তাই হবে মা, পাপের শেষ করে দেব—সকালেই শুনতে পাবে, তোমার সাগর সর্দ্দার মিছে অহঙ্কার করে যায়নি। তাহার পিতৃপিতামহের হাতের সুদীর্ঘ লাঠিখানা ত ষোড়শীর পায়ের কাছে পড়িয়া ছিল, হেঁট হইয়া তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

ষোড়শী কথা কহিতে গেল, তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, নিষেধ করিতে চাহিল, কণ্ঠে স্বর ফুটিল না, ভূমিকম্পের সমুদ্রের মত অকস্মাৎ সমস্ত বুক জুড়িয়া দোলা উঠিল, এবং নিমিষের জন্য সাগরের এই একান্ত অপরিচিত ঘাতকের মূর্ত্তি তাহার চোখের উপর হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। সাগর কি যেন একটা কহিল, কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না, কেবল এইটুকুমাত্র উপলব্ধি করিল যে, সে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া যাইতেছে।

১৭

ষোড়শীর যখন চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন সাগর চলিয়া গেছে।

মন্দিরের ভৃত্য ডাকিয়া কহিল, মা, এবার দোর বন্ধ করি?

কর, বলিয়া সে চাবির জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলেবেলা হইতে জীবনটা তাহার যথেষ্ট সুখেরও নয়, নিছক আরামেও দিন কাটে নাই; বিশেষ করিয়া যে অশুভ মুহূর্ত্তে বীজগ্রামের নূতন জমিদার চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন হইতে উপদ্রবের ঘূর্ণ-হাওয়া তাহাকে অনুক্ষণ দেখিয়া নিরন্তর অশান্ত, চঞ্চল ও বিশ্রামহীন করিয়া রাখিয়াছে। তবুও সে-সকল সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের ন্যায়, আজ সেখানে

সাগর সর্দ্দার তাহাকে এইমাত্র নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইল। অথচ যথার্থই সে যে এত বড় ভয়ঙ্কর কিছু একটা এই রাত্রির মধ্যে করিয়া উঠিতে পারিবে, তাহা এমনি অসম্ভব যে ষোড়শী বিশ্বাস করিল না অথবা, এ আশঙ্কাও তাহার মনের মধ্যে সত্য-সত্যই স্থান পাইল না যে, যে লোক হত্যা, রক্তপাত ও হিংসার সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও আয়োজনে পরিবৃত হইয়া অহর্নিশি বাস করে, পাপ তাহার যত বড়ই হোক, কেবলমাত্র সাগরের লাঠির জোরেই তাহাব পরিসমাপ্তি ঘটিবে। তথাপি দৈব বলিয়া যে শক্তির কাছে সকল অঘটনই হার মানে, তাহারই ভয়ে বুকের মধ্যে তাহার মুগুরের ঘা পড়িতে লাগিল।

মন্দিরের দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া ভৃত্য চাবির গোছা হাতে আনিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাত অনেক হয়েচে মা, সঙ্গে যেতে হবে কি?

ষোড়শী মুখ তুলিয়া অন্যমনস্কের মত বলিল, কোথায় বলাই?

তোমাকে পৌঁছে দিতে মা।

পৌঁছে দিতে? না, বলিয়া ষোড়শী ধীরে ধীরে স্বপ্নাবিষ্টের মত বাহির হইয়া গেল। প্রত্যহের মত এই পথটুকুর মধ্যেও অতি সর্তকতা আজ তাহার মনেই হইল না। রাত্রির গাঢ় অন্ধকার, কিন্তু এ কয়দিনের ন্যায় ঝাপ্সা মেঘের আচ্ছাদন আজ ছিল না। স্বচ্ছ নির্ম্মল কৃষ্ণা-দ্বাদশীর কালো আকাশ এইমাত্র যেন কোন অদৃশ্য পারাবারে স্নান করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে, তাহার আর্দ্র গা-মাথায় এখনও যেন জল মাখানো রহিয়াছে। মন্দির হইতে ষোড়শীর কুটীরখানির ব্যবধান যৎসামান্য; এই আঁকাবাঁকা পায়ে হাঁটা ধূসর পদরেখাটির উপরে একটি স্নিগ্ধ আলোক অসংখ্য নক্ষত্রলোক হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছে; তাহারই উপর দিয়া সে নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাহার ঘরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শেষ চৈত্রের এই কয়টা দিন গ্রামে জন-মজুর মিলে না, তথাপি তাহার অনুগত ভক্ত প্রজারা আঙ্গিনার চারিদিকে শক্ত করিয়া বাঁশের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছে এবং জীর্ণ কুটীরের কিছু কিছু সংস্কার করিয়া তাহারই গায়ে একখানি ছোট চালা রাঁধিবার জন্য তৈরি করিয়া দিয়াছে। পুরাতন অর্গল নূতন হইয়াছে, এবং দেওয়ালের গায়ে ফাটা ও গর্ত্ত যত ছিল, বুজাইয়া নিকিয়া মুছিয়া ঘরটিকে অনেকটা বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। তালা খুলিয়া ষোড়শী এই ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং আলো জ্বালিয়া সেইখানেই মাটির উপর বসিয়া পড়িল। প্রতিদিনের ন্যায় আজিও তাহার অনেক কাজ বাকী ছিল। রাত্রে রান্নার হাঙ্গামা তাহার ছিল না বটে, দেবীর প্রসাদ যাহা-কিছু আঁচলে বাঁধিয়া সঙ্গে আনিত, তাহাতেই চলিয়া যাইত, কিন্তু আহ্নিক প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মগুলি সে সর্ব্বসমক্ষে মন্দিরে না করিয়া নির্জ্জন গৃহের মধ্যেই সম্পন্ন করিত, তাহার পরে অনেক রাত্রি জাগিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিত।

ঐ-সকল তাহার প্রতিদিনের নিয়ম ; তাই প্রতিদিনের মত আজও তাহার মনের মধ্যে অসমাপ্ত কর্ম্মের তাগিদ উঠিতে লাগিল, কিন্তু পা দুটা কোনমতেই আজ খাড়া হইতে চাহিল না ; এবং যে দরজা উন্মুক্ত রহিল, উঠি উঠি করিয়াও তাহাকে সে বন্ধ না করিয়া তেমনি জড়ের মত স্থির হইয়া প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া রহিল।

সে সাগরের কথা ভাবিতেছিল। মন্দিরের অনতিদূরবর্ত্তী ভূমিজ পল্লীস্থ এই দুঃস্থ ও দুরন্ত লোকগুলিকে সে শিশুকাল হইতেই ভালবাসিত এবং বড় হইয়া ইহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার চিহ্ন যতই বেশি করিয়া তাহার চোখে পড়িতে লাগিল ততই স্নেহ তাহার সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহের ন্যায় দৃঢ় ও গভীর হইয়া উঠিতে লাগিল। সে দেখিল, চণ্ডীগড়ের ইহারাই একপ্রকার আদিম অধিবাসী, এবং একদিন সকলেই ইহারা গৃহস্থ কৃষক ছিল ; কিন্তু এখন অধিকাংশই ভূমিহীন—পরের ক্ষেতে মজুরী করিয়া বহু দুঃখে দিনপাত করে। সমস্ত জমিজমা হয় জনার্দ্দন, না হয় জমিদারের কর্ম্মচারী স্বনামে বেনামে গিলিয়া খাইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ভৈরবীদের আমলে অনেক জমি মন্দিরের নিজ জোতে ছিল, তাঁহাদের যথেচ্ছামত সেগুলি প্রতি বৎসর ভাগে বিলি হইত, এবং এই উপলক্ষ্যে প্রজায় প্রজায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবধি থাকিত না। অথচ লাভ কিছুই ছিল না ; তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্তের অভাবে প্রাপ্য অংশের কিছু-বা প্রজারা লুটিয়া খাইত, এবং অবশিষ্ট আদায় যদি বা হইত অপব্যয়েই নিঃশেষ হইত। এই সকল ভূমিই সে ভূমিহীন ভূমিজ প্রজাদিগকে বছর ছয়-সাত পূর্ব্বে, ফকির-সাহেবের নির্দ্দেশমত নির্দ্দিষ্ট হারে বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। জনার্দ্দন রায় ও এককড়ি নন্দীর সহিত তাহার বিবাদের সূত্রপাতও তখন হইতে। এবং সেই কলহই পরবর্ত্তী-কালে নানা অজুহাতে নানা তুচ্ছ কাজে আজ এই আকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাগর ও হরিহর সর্দ্দার তখন জেল খাটিতেছিল। খালাস পাইয়া তাহারা মন্দিরে ষোড়শীর কাছে আসিয়া একদিন হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। কহিল, মা, আমরা খুড়ো-ভাইপোয়েই কি কেবল কূল্-কিনারা পাবো না, শুধু ভেসে ভেসে বেড়াব ?

ষোড়শী রাগ করিয়া কহিল, তোরা ভাসতে যাবি কেন হরিহর—জেলের অমন সব বাড়িঘর হয়েচে তবে কিসের জন্যে ?

সাগর নিঃশব্দে মুখ ফিরাইয়া মাথা উঁচু করিয়া রহিল ; কিন্তু বুড়ো হরিহর তেমনি জোড়-হাতে কহিল, মা, আমরা তোমার কুপুত্র বলে তুমিও কি কুমাতা হবে ? আমাদেরও একটা পথ করে দাও।

ষোড়শী একটু নরম হইয়া কহিল, তোমার কথাগুলি ত ভাল হরিহর, তা ছাড়া তুমি বুড়ো হয়েও গেছ, কিন্তু তোমার ভাইপোটি ত অহঙ্কারে মুখ ফিরিয়ে রইল, দোষটুকু পর্য্যন্ত স্বীকার করলে না—ও কি কখনো শান্ত হতে পারবে ?

হরিহর নিজের সর্ব্বাঙ্গে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বুড়ো হয়ে গেছি, না মা? চুলগুলোও সব পেকে গেছে, বলিয়া সে মুচকাইয়া একটুকু হাসিতেই সাগরের সমস্ত মুখ শান্ত হাসিতে দীপ্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে খুড়ো-ভাইপোর চোখে চোখে নিঃশব্দে বোধ হয় এই কথাই হইয়া গেল যে, এই ভাল। তোমার এই প্রাচীন বাহু দুটির শক্তির কোন সংবাদ যে রাখে না, তাহার কাছে এমন সহাস্যে সবিনয়ে স্বীকার করাই সবচেয়ে শোভন।

বুড়ো কহিল, অহঙ্কার নয় মা, অভিমান। ওটুকু ও পারে করতে—সাগর কখনো ডাকাতি করে না।

ষোড়শী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, ও কি তবে বিনা দোষে শাস্তিভোগ করলে? যা সবাই জানে, তা সত্য নয়—এই কি আমাকে তুমি বোঝাতে চাও হরিহর?

তাহার অবিশ্বাসের কণ্ঠস্বর অকারণে অত্যন্ত কঠোর হইয়া বাজিল, তথাপি বুড়া হরিহর কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভাইপো সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে বাধা দিল। কহিল, কি হবে মা, তোমার সে কথা শুনে? তোমরা ভদ্রলোকেরা যখন আমাদের ছোটলোকের কথা বিশ্বাস করতে পারবে না! ভদ্রলোকেরা যখন আমাদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে, সেও সত্যি পাওনার দাবিতে, আবার যখন জেলে দিলে, সেও তেমনি সত্যি সাক্ষীর জোরে। জজ-সাহেবের আদালত থেকে মা চণ্ডীর মন্দির পর্য্যন্ত ছোটলোকের কথা বিশ্বাস করবার ত কেউ নেই মা! চল ছোটখুড়ো; আমরা ঘরে যাই। বলিয়া সে চট্ করিয়া হেঁট হইয়া ভৈরবীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া প্রস্থান করিল। হরিহর নিজেও প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিয়া সলজ্জ-কণ্ঠে কহিল, রাগ ক'রো না মা, ব্যাটা ঐ রকম গোঁয়ার, ও কথা কারু সইতে পারে না। বলিয়া সেও ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুগমন করিল।

হোক ইহারা অন্ত্যজ, হোক ইহারা দস্যু; যতক্ষণ দেখা গেল ষোড়শী স্তব্ধবিস্ময়ে এই হীনবীর্য, অবমানিত, অধঃপতিত বাঙলাদেশের এ দুটি সুস্থ, নির্ভীক ও পরম শক্তিমান পুরুষের প্রতি চাহিয়া রহিল।

পরদিন প্রভাতেই ষোড়শী সাগরকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিল, তোদের কাছে বাবা, কাল আমি অন্যায় করেচি। বিঘে দশ-পনের জমি আমার এখনো আছে, তোরা খুড়ো-ভাইপোতে তাই ভাগ করে নে। মায়ের খাজনা তোরা যা খুশি দিস্, কিন্তু অসৎ-পথে আর কখনো পা দিবিনে এই আমার সর্ত্ত।

সেই অবধি সাগর ও হরিহর তাহার ক্রীতদাস। তাঁহার সকল কর্ম্মে সকল সম্পদে তাহারা ছায়ার মত অনুসরণ করিয়াছে, সকল বিপদে বুক দিয়া রক্ষা করিয়াছে। এই যে ভাঙা কুটীর, এই যে সঙ্গীবিহীন বিপদাপন্ন জীবন, তবু যে কেহ

তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিবার দুঃসাহস করে না, সে যে কিসের ভয়ে এ-কথা ও তাহার অবিদিত নাই। তথাপি সেই সাগরের যে মূর্ত্তি আজ সে চোখে দেখিয়া আসিল তাহাতে ভরসা করিবার, বিশ্বাস করিবার আর তাহার কিছুই রহিল না। সে ডাকাতি করে কিনা বলা কঠিন; কিন্তু প্রয়োজন বোধ করিলে ইহার অসাধ্য কিছু নাই—তাহার সমস্ত আয়োজন ও উপকরণ আজও সজীব আছে, এবং মুহূর্ত্তের আহ্বানে তাহারা আজও তেমনি সাজিয়া দাঁড়াইতে পারে, এ সংশয় আর ত ঠেকাইয়া রাখা যায় না।

ছেঁড়া একখানা কাগজের টুকরা একপাশে পড়িয়া ছিল, অন্যমনস্কভাবে হাতে তুলিয়া লইতেই তাহার প্রদীপের আলোকে চোখে পড়িল, হৈমর চিঠির জবাবে সেদিন যে চিঠিখানা সে লিখিয়াও ভাল হইল না ভাবিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আর একখানা লিখিয়া পাঠাইয়াছিল ইহা তাহারই অংশ। অনেক রাত্রি জাগিয়া দীর্ঘ পত্র যখন শেষ হয়, তখন একবার যেন সন্দেহ হইয়াছিল এত কথা না লিখিলেই হইত—পরের কাছে আপনাকে এমন করিয়া ব্যক্ত করা হয়ত কিছুতেই ঠিক হইল না, কিন্তু নিদ্রাহীন সেই গভীর রাত্রে ঠিক করিবার ধৈর্য্যও আর তাহার ছিল না। কিন্তু পরদিন ডাকে ফেলিয়া দিতে যখন পাঠাইল, তখন না পড়িয়াই পাঠাইয়া দিল। তাহার ভয় হইল পাছে ইহাও সে ছিঁড়িয়া ফেলে—পাছে আজও তাহার হৈমকে উত্তর দেওয়া ঘটিয়া না ওঠে। এ-কয়দিন যাহা ভুলিয়াছিল, আজও একে একে সেই চিঠির কথাগুলাই মনে পড়িয়া তাহার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল,—ভয় হইতে লাগিল পাছে তাহার নির্য্যাতনের কাহিনীটুকু কেহ ভুল বুঝিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই হৈম ও তাহার স্বামীকে মনে পড়িলেই মন যেন তাহার কেমন বিবশ হইয়া আসিত। ইহাদের শৃঙ্খলিত জীবন-যাত্রার ধারার সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় নাই, তবুও কেমন করিয়া যে স্বপ্ন রচিয়া উঠিত, কেমন করিয়া যে কাজের চিন্তা তাহার এলোমেলো কল্পনায় পর্য্যবশিত হইত, কখনো হৈম, কখনো নির্ম্মলের সূত্র ধরিয়া কি করিয়া যে ইহাই একসময়ে সমস্ত সংযমের বেড়া ভাঙিয়া অকস্মাৎ লজ্জায় ফাটিয়া পড়িত, তাহা যে নিজেই ভাবিয়া পাইত না। অথচ নিজের মনের এই মোহাবিষ্ট লক্ষ্যহীন গতিকে সে চিনিত, ভয় করিত, লজ্জা করিত, এবং সকল শক্তি দিয়া বর্জ্জন করিতে চাহিত। সেই উতলা আবেগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পত্রখণ্ড খান খান করিয়া ফেলিয়া দিয়া শক্ত হইয়া বসিল। মনে মনে দৃঢ়বলে কহিল, কিসের জন্য হৈমদের এত কথা আমি বলিতে গেলাম? কোন্ সাহায্য তাহাদের কাছে আমি ভিক্ষা করিয়া লইব? কিসের জন্য লইব? দেবীর ভৈরবীপদের মধ্যে কি আছে যে, এমন করিয়া আঁকড়াইয়া থাকিব? যে কেহ নিক না, কি আমার আসিয়া যায়? ইহারা সবাই ত চোর-ডাকাত। যাহার

যত শক্তি সে তত বড়ই দস্যু। সুবিধা ও সামর্থ্য মত অপরের গলা টিপিয়া কাড়িয়া লওয়াই ইহাদের কাজ। এই ত সংসার, এই ত সমাজ, এই ত মানুষের ব্যবসা! পীড়িত ও পীড়কের মাঝখানে ব্যবধান কতটুকু যে অহর্নিশি এমন ভয়ে ভয়ে আছি! কিসের জন্য আমার এতবড় মাথা-ব্যথা! কিসের জন্য এতবড় বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছি! এই ভৈরবীর আসন ত্যাগ করা কিসের জন্য এতবড় কঠিন! মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইল এ কাজ তাহার পক্ষে একেবারেই কঠিন নয়, কাল সকালেই সে এককড়ি ও জনার্দ্দন রায়কে লিখিয়া পাঠাইয়া ভৈরবীর সকল দায়িত্ব স্বচ্ছন্দে ফিরাইয়া দিতে পারে, কোথাও কোন টান, কোন ব্যথা তাহার বাজিবে না।

ষোড়শী উঠিয়া দাঁড়াইল। পাশের কুলুঙ্গিতে তাহার কালি কলম ও কাগজ থাকিত; পাড়িয়া লইয়া এই চিঠিখানা তখনই লিখিয়া ফেলিতে প্রস্তুত হইল। তাড়াতাড়ি কয়েক ছত্র লিখিয়া সহসা তাহার লেখনী রুদ্ধ হইল। দরিহর সর্দ্দার ও সাগরকে মনে পড়িল—পৃথিবী-জোড়া কাড়াকাড়ি ও দস্যুপনার মাঝখানে কেবল এই দুটি দস্যুই আজও তাহাকে ত্যাগ করে নাই। সহসা নিজের কথা মনে পড়িয়া মনে হইল, তার পরে? দাঁড়াইবার কোথাও স্থান নাই—সবাই ত্যাগ করিয়াছে। কাল যাহারা তাহাকে ঘেরিয়াছিল, আজ তাহারা শাসনের ভয়ে, জমিদারের গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তাহারই বিরুদ্ধে পঞ্চায়েতি করিয়া আসিয়াছে। অথচ সে বেশিদিনের কথা নয়, ইহাদিগকেই—কিন্তু থাক্ সে কথা। এই অত্যন্ত ছোটদের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ নাই। এককড়ি, জনার্দ্দন, শিরোমণি, তাহার পিতা তারাদাস, আর এই জমিদার—পুরানো ও নূতন অনেক কথা—কিন্তু সেও থাক; এ আলোচনাতেও আজ আর কাজ নাই। তাহার ফকিরসাহেবকে মনে পড়িল। তিনি যে কি ভাবিয়া এমন করিয়া অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন তাহার জানা নাই। কাহাকেও তিনি কোন হেতু, কাহারও বিরুদ্ধে কোন অনুযোগ করিয়া যান নাই। ইতিপূর্ব্বেও তিনি নীরবে চলিয়া গেছেন; স্নেহ দিয়া, ভক্তি দিয়া, সসম্ভ্রমে বিদায় দিবার কোন অবসর কাহাকেও দেন নাই, হয়ত ইহাই তাঁহার প্রস্থানের পদ্ধতি। তবুও কেমন করিয়া যেন ষোড়শীর মনের মধ্যে ব্যথা একটা বিঁধিয়াই ছিল, তাঁহার এই যাওয়াটাকে কোনক্রমেই সে তাঁহার অভ্যাস বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতেছিল না। তিনি মাঝে মাঝে তাহার কথার প্রত্যুত্তরে বলিতেন, মা, আমি নিজের সঙ্গেই সম্বন্ধ ছেদ করতে চাই, লোকের সঙ্গে নয়। তাই লোকালয়ের মায়া কাটাতে পারিনে—মানুষের মাঝখানে বাস করতেই ভালবাসি। তুমিও তোমার দেহটাকে যখন দেবতাকেই দিয়েচ, তখন সেই কথাটাই সকলের আগে মনে রেখো। কোন ছলে নিজের বলে যেন ভুল না হয়। দেবতার সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে আত্মবঞ্চনার চেয়ে বরঞ্চ দেবতাকে ছাড়াও ভাল। আজ এই বঞ্চনাই ত তাহাকে

জলের মত জড়াইয়া ধরিয়াছে। আজ যদি তিনি থাকিতেন! একবার যদি সে তাঁহার পায়ের কাছে গিয়া বসিতে পারিত! বহুপূর্ব্বে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, মা, যখন আমাকে তোমার যথার্থ প্রয়োজন হবে, সত্যি ডাকবে, যেখানেই থাকি আমি তখনি এসে দাঁড়াব। আজ ত তার সেই প্রয়োজন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই বাহির হইতে ডাক আসিল, একবার ভিতরে আসতে পারি কি?

ষোড়শীর বিক্ষিপ্ত উদভ্রান্ত চিত্ত চক্ষের পলকে সচেতন হইয়া পরক্ষণেই আবার যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এতবড় অলৌকিক বিস্ময় সহসা যেন সে সহিতে পারিল না।

আমি আসতে পারি কি?

আসুন, বলিয়া ষোড়শী উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মুদ্রিত-চক্ষে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আগন্তুকের পদতলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া কম্পিত-পদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রদীপের আলোকে চাহিয়া দেখিল—ফকিরসাহেব নহেন, জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী। চক্ষে আর পলক পড়িল না—চোখের পাতা দুটো পর্য্যন্ত যেন পাষাণ হইয়া গেল। গৃহের দীপশিখা স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এমন করিয়া যে-মানুষ এক নিমিষে পাথর হইয়া গেল, তাহাকে চিনিবার মত আলো ছিল। সুতরাং এই অদ্ভুত ও অকারণ উচ্ছ্বসিত ভক্তির উপলক্ষ্য যে সত্যই সে নয়, আর কেহ, তাহা অনুভব করিয়া জীবানন্দের ভয় ভাঙিল। গম্ভীরমুখে কহিল, এরূপ পদভক্তি কলিকালে দুর্লভ। আমার পাদ্য-অর্ঘ্য, আসনাদি কই?

ষোড়শী স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার এই হতভাগ্য জীবনে সে অনেককে দেখিয়াছে। সে জনার্দ্দনকে দেখিয়াছে, সে এককড়ি নন্দীকে দেখিয়াছে, সে তাহার আপনার পিতাকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠরূপে দেখিয়াছে, কিন্তু মানুষের পাষণ্ডতা যে এতদূরে উঠিতে পারে, এ-কথা উপলব্ধি করিয়া তাহার ধাক্কা সামলাইতে সময় লাগিল। জীবানন্দ এদিক-ওদিক চাহিয়া বাঁশের আলনা হইতে কম্বলের আসন-খানি পাড়িয়া লইল, পাতিতে গিয়া খোলা দরজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, খিলটা একেবারে দিয়েই বসিনে কেন? তোমার সাগর চাঁদটি শুনেচি নাকি আমাকে তেমন ভালবাসে না, কাছাকাছি কোথাও আছেন নিশ্চয়—এসে পড়লে হয়ত বা কিছু মনেই করবে। ছোটলোক বই ত নয়। বলিয়া সে এইবার একটু হাসিল।

ষোড়শীর গা কাঁপিতে লাগিল। সে নিশ্চয় বুঝিল লোকটা একাকী আসে নাই, তাহার লোকজন নিকটেই লুকাইয়া আছে এবং সম্ভবতঃ এই সুযোগই সে প্রত্যহ প্রতীক্ষা করিতেছিল। আজ ভীষণ কিছু একটা করিতে পারে—হত্যা করাও অসম্ভব

নয়। এবং এই উদ্বেগ কণ্ঠস্বরে সে সম্পূর্ণ গোপন করিতে না পারিয়া কহিল, আপনি এখানে এসেচেন কেন?

জীবানন্দ কহিল, তোমাকে দেখতে। একটু ভয় পেয়েচ বোধ হচ্চে—পাবারই কথা। কিন্তু তাই বলে চেঁচিও না। সঙ্গে গাদা-পিস্তল আছে, তোমার ডাকাতের দল শুধু মারাই পড়বে, আর বিশেষ কিছু করতে পারবে না। বলিয়া সে পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া পুনশ্চ পকেটেই রাখিয়া দিয়া কহিল, কিন্তু দোরটা বন্ধ করে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হওয়াই যাক না, এই বলিয়া সে ষোড়শীর মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিল এবং অগ্রসর হইয়া দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়া দিল, যাহার গৃহ তাহার অনুমতির অপেক্ষামাত্র করিল না।

ষোড়শীর মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। একবার কথা কহিতে গিয়া তাহার কণ্ঠে বাধিল, তার পরে স্বর যখন ফুটিল, তখন সেই স্বর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, কহিল, সাগর নেই—

জীবানন্দ বলিল, নেই? ব্যাটা গেল কোথায়?

ষোড়শী কহিল, আপনারা জানেন বলেই ত—

জীবানন্দ কহিল, জানি বলে? কিন্তু আপনারা কারা? আমি ত বাস্তবিক জানতাম না।

ষোড়শী বলিল, নিরাশ্রয় বলেই ক লোক নিয়ে আমাকে মারতে এসেচেন। কিন্তু আপনার কি করেচি আমি?

জীবানন্দ কহিল, লোক নিয়ে মারতে এসেচি! তোমাকে? মাইরি না। বরঞ্চ মন কেমন করছিল বলে দেখতে এসেচি।

ষোড়শী আর কথা কহিল না। তাহার চোখে জল আসিতেছিল, এই কদর্য উপহাসে তাহা একেবারে শুকাইয়া গেল। এবং সেই জল চক্ষু ভূমিতলে নিবদ্ধ করিয়া সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল; এবং অদূরে বসিয়া আর একজন তাহারই আনত মুখের প্রতি লুব্ধ তৃষিত দৃষ্টি স্থির করিয়া তাহারই মত চুপ করিয়া রহিল।

অলকা ?

বলুন ।

তোমার এখানে তামাক-টামাকের ব্যবস্থা নাই বুঝি ?

ষোড়শী একবার মুখ তুলিয়াই আবার অধোমুখেই স্থির হইয়া রহিল ।

জবাব না পাইয়া জীবানন্দ সজোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, রত্নেশ্বরের কপাল ভাল ছিল। দেবী-রাণী তাকে ধরে আনিয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু অম্বুরী তামাক খাইয়েছিলেন, এবং ভোজনান্তে দক্ষিণা দিয়েছিলেন। বিদায়ের পালাটা আর শুনলে না, সলি, বঙ্কিমবাবুর বইখানা পড়েছ কি ?

ষোড়শী স্থির করিয়াছিল, এই পাষণ্ড আজ তাহাকে যত অপমানই করুক সে নিরুত্তরে সহ্য করিবে, কিন্তু জীবানন্দের কণ্ঠস্বরের শেষ দিকটায় হঠাৎ কেমন যেন তাহার সঙ্কল্প ভাঙিয়া দিল, বলিয়া ফেলিল, আপনাকে ধরে আনলে সেইমত ব্যবস্থাও থাকত—অনুযোগ করতে হ'তো না।

জীবানন্দ হাসিল, কহিল, তা বটে ! দানা-হেঁচড়া দড়ি-দড়ার বাঁধা-বাঁধিই মানুষের নজরে পড়ে। ভোজপুরী পেয়াদা পাঠিয়ে ধরে আনাটাই পাড়াসুদ্ধ সকলে দেখে ; কিন্তু যে পেয়াদাটিকে চোখে দেখা যায় না—হাঁ অলকা, তোমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁকে কি বলে ? অতনু, না ? বেশ তিনি !

ষোড়শী আরক্ত অধোমুখে নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

জীবানন্দ কহিল, যৎসামান্য অনুরোধ ছিল, কিন্তু আজ উঠি। তোমার অনুচরগুলো সন্ধান পেলে ঠিক জামাই-আদর করবে না, এমন কি শ্বশুরবাড়ি এসেচি বলে হয়ত বিশ্বাস করতেই চাইবে না—ভাববে প্রাণের দায়ে বুঝি মিথ্যে বলচি।

ষোড়শী কোন কথাই কহিল না, এই কদর্য পরিহাসে অন্তরে সে যে কিরূপ লজ্জা বোধ করিল, মুখ তুলিয়া তাহা জানিতেও দিল না।

জবাব না পাইয়া জীবানন্দ মুহূর্ত্ত-কয়েক তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া সত্যই উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, অম্বুরী তামাকের ধুঁয়া আপাততঃ পেটে না গেলেও চলত ; কিন্তু ধুঁয়া নয়, এখন কিছু একটা পেটে না গেলে আর ত দাঁড়াতে পারিনে। বাস্তবিক নেই কিছু অলকা ?

ষোড়শী চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু তাহার নাম ধরিয়া শেষ প্রশ্নটা তাহাকে মৌন থাকিতে দিল না, মুখ তুলিয়া বলিল, কিছু কি ? মদ ?

জীবানন্দ হাসিয়া মাথা নাড়িল। কহিল, এবার ভুল হ'লো। ওর জন্যে অন্য

লোক আছে, সে তুমি নয়। তোমাকে বুঝতে পারার যথেষ্ট সুবিধে দিয়েচ—আর যা অপবাদ দিই, অস্পষ্টতার অপবাদ দিতে পারব না। অতএব তোমার কাছে যদি চাইতেই হয় ত চাই এমন কিছু যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, মরণের দিকে ঠেলে দেয় না। ডাল-ভাত, মেঠাই-মণ্ডা, চিঁড়ে-মুড়ি যা হোক দাও, আমি খেয়ে বাঁচি। নেই ?

ষোড়শী স্থিরচক্ষে চাহিয়া রহিল, জীবানন্দ বলিতে লাগিল, আজ সকালে মন ভাল ছিল না। শরীরের কথা তোলা বিড়ম্বনা, কারণ সুস্থ দেহ যে কি, আমি জানিনে। সকালে হঠাৎ নদীর তীরে বেরিয়ে পড়লাম—ধারে ধারে কতদূর যে হাঁটলাম বলতে পারিনে—ফিরতে ইচ্ছে হলো না—সূর্যদেব অস্ত গেলেন, একলা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি যে ভাল লাগল বলতে পারিনে। কেবল তোমাকে মনে পড়তে লাগলো। ফেরবার পথে নাই বোধ হয় আর বাড়ি গেলাম না, ক্ষিদে-তেষ্টা নিয়েই এসে দাঁড়ালাম ওই মনসা-গাছটার পেছনে। দেখি দোর খোলা, আলো জ্বলছে। পিস্তল ছাড়া আমি এক পা বাড়াইনে—ওটা পকেটেই ছিল, তবু গা ছম্ ছম্ করতে লাগল। জানি ত বাবাজীবনরা আড়ালে-আবডালে কোথাও আছেন নিশ্চয়। হঠাৎ পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি তেমনি একলা তুমি চুপ করে বসে। আপনাকে আর সামলাতে পারলাম না। খাবার কি নেই কিছু ?

ষোড়শী একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কেন বাড়ি গিয়ে ত অনায়াসে খেতে পারবেন।

জীবানন্দ কহিল, অর্থাৎ আমার বাড়ির খবর আমার চেয়ে তুমি বেশী জানো। বলিয়া সে একটু হাসিল। কিন্তু সে হাসি না মিলাইতেই ষোড়শী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আপনি সারাদিন খাননি, অথচ বাড়িতে আপনার খাবার ব্যবস্থা নেই, এ কি কখনো হতে পারে ?

একজনের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার আভাস গোপন রহিল না, কিন্তু আর একজন নিতান্ত ভালমানুষটির মত শান্তভাবে বলিল, পারে বই কি। আমি খাইনে বলে আর একজন উপোস করে থালা সাজিয়ে পথ চেয়ে থাকবে, এ ব্যবস্থা ত করে রাখিনি। আর খামকা রাগ করলে চলবে কেন অলকা! বলিয়া সে তেমনি একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, আজ আসি। কিন্তু সত্যি সত্যিই থাকতে না পেরে যদি আর কোনদিন এসে পড়ি ত রাগ করতে পাবে না বলে যাচ্ছি।

এই লোকটির একান্ত বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রার যে চেহারা একদিন ষোড়শী নিজের চোখে দেখিয়াছিল তাহা মনে হইল। মনে হইল, কদাচারী, মদোন্মত্ত, নিষ্ঠুর মানুষ এ নয়, যে জমিদার মিথ্যা দিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সে আর কেহ। সে আর কেহ যে সেদিন মন্দির হইতে বিদায় দিতে তাহাকে অসঙ্কোচে

হুকুম দিয়াছিল। তবু একবার দ্বিধা করিল, কিন্তু পরক্ষণেই অস্ফুটে কহিল, দেবীর প্রসাদ সামান্য আছে, কিন্তু সে কি আপনি খেতে পারবেন?

পারব না? তাই বল। এই বলিয়া সে আসনে ফিরিয়া গিয়া চাপিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, প্রসাদ খেতে পারব না? শীগ্‌গির নিয়ে এসো, ঠাকুর দেবতার প্রতি আমার কিরূপ অচলা ভক্তি একবার দেখিয়ে দিই।

তাহার সুমুখের স্থানটুকু ষোড়শী জল-হাত দিয়া মুছিয়া লইল, এবং রান্নাঘরে গিয়া শালপাতায় করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ যাহা কিছু ছিল বহিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, দেখুন যদি খেতে পারেন।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে দেখতে হবে না, কিন্তু এ ত তোমার জন্যে?

ষোড়শী কহিল, অর্থাৎ আপনার জন্যে আলাদা করে এনে রেখেছিলাম কি না তাই জিজ্ঞাসা করচেন?

জীবানন্দ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না গো না, জিজ্ঞাসা করিনি, আমি জিজ্ঞেস করচি, আর নেই ত?

ষোড়শী কহিল, না।

তা হলে এ যে পরের মুখের গ্রাস একরকম কেড়ে খাওয়া অলকা?

ষোড়শী কহিল, পরের মুখের গ্রাস কেড়ে খেলে কি আপনার হজম হয় না?

এ কথার উত্তর জীবানন্দ আর হাসিমুখে দিতে পারিল না। কহিল, কি জানি নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না অলকা। কিন্তু সে যাক, তুমি খাবে কি? বরঞ্চ অর্দ্ধেকটা রেখে দাও।

ষোড়শী কহিল, তাতে আমারও হবে না, আপনারও পেট ভরবে না।

জীবানন্দ জিদ করিয়া কহিল, না ভরুক, কিন্তু তোমাকে ত সারারাত্রি অনাহারে থাকতে হবে না।

আজ খাবার কথা ষোড়শীর মনেও ছিল না—জীবানন্দ না আসিলে ও সকল পড়িয়াই থাকিত, সে হয়ত স্পর্শও করিত না। কিন্তু সে কথা না বলিয়া কহিল, ভৈরবীদের অনাহারে অভ্যাস করতে হয়। তা ছাড়া আমার একটা রাত্রির কষ্টের ভাবনা ভেবে আপনি কষ্ট নাই পেলেন। বরঞ্চ মিথ্যে দেরি না করে বসে যান, ঠাকুর-দেবতার প্রতি অচলা ভক্তির সাফাই প্রমাণ দিন।

তা দিচ্চি, কিন্তু তোমাকে বঞ্চিত করচি জেনে সে উৎসাহ আর নেই—

বেশ, কম উৎসাহ নিয়েই শুরু করুন। বলিয়া ষোড়শী একটু হাসিয়া কহিল, আমাকে বঞ্চনা করায় নতুন অপরাধ আর আপনার হবে না। কিন্তু যা নিয়ে তর্ক চালিয়েচেন, তাতে আমারি লজ্জা করচে। এবার থামুন।

জীবানন্দ আর কথা না কহিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। মিনিট-দুই পরে হঠাৎ মুখ তুলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, প্রায় পোনের বছর হ'লো, না? আজ একটা বড়লোক হ'তে পারতাম।

ষোড়শী নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। প্রায় বছর-পোনের পূর্ব্বের ইঙ্গিতটা সে বুঝিল, কিন্তু শেষের কথাটা বুঝিল না।

জীবানন্দ কহিতে লাগিল, আর সমস্ত ছেড়ে দিয়ে মদের কথাটাই ধরি। মরতে বসেচি—সে ত নিজের চোখেই দেখে এসেচ, কিন্তু, এমন একটি শক্ত লোক কেউ নেই যে আমাকে মুক্ত করে দেয়। হয়ত আজও সময় আছে, হয়ত এখনো বাঁচতে পারি—নেবে আমার ভার অলকা?

ষোড়শী অন্তরে কাঁপিয়া উঠিয়া চোখ বুজিল। সেখানে হৈম, তাহার স্বামী, তাহার ছেলে, তাহার দাস-দাসী, তাহার সংসারযাত্রার অসংখ্য বিচিত্র ছবি ছায়াবাজির মত খেলিয়া গেল।

জীবানন্দ কহিল, আমার সমস্ত ভার তুমি নাও অলকা।

আত্মসমর্পণের এই আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বর ষোড়শীকে চমকাইয়া দিল। এ-জীবনে এমন করিয়া কেহ তাহাকে ডাকে নাই, ইহা একবারে নূতন; কিন্তু ভৈরবী-জীবনের সংযমের কঠোরতা তাহাকে আত্মবিস্মৃত হইতে দিল না। সে একমুহূর্ত্ত থামিয়া কহিল, অর্থাৎ আমার যে কলঙ্কের বিচার করেচেন, আমাকে দিয়ে তাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়ে নিতে চান। আমার মাকে ঠকাতে পেরেছিলেন, কিন্তু আমাকে পারবেন না।

কিন্তু সে চেষ্টা ত আমি করিনি। না জেনে আমি তোমার প্রতি দুর্ব্ব্যবহারই করেচি, তা সত্যি! তোমার বিচার করেচি, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। কেবল মনে হয়েচে, এতবড় কঠিন মেয়েমানুষটিকে যে অভিভূত করেচে, সে মানুষটি কে?

ষোড়শী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তারা আপনার কাছে তার নাম বলেনি?

জীবানন্দ কহিল, না। আমি বার বার জিজ্ঞাসা করেচি, তারা বার বার চুপ করে গেছে।

আপনি খান, বলিয়া ষোড়শী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

দুই-চারি গ্রাস আহারের পর জীবানন্দ মুখ তুলিয়া বলিল, আমি বেশী খেতে পারিনে—

বেশী খেতে আপনাকে বলিনে। সাধারণ লোকে যা খায় তাই খান।

আমি তাও পারিনে। খাওয়া আমার শেষ হয়ে গেছে।

ষোড়শী কহিল, না, হয়নি। প্রসাদের ওপর অভক্তি দেখালে বাবাজীবনদের ডেকে দেব।

জীবানন্দ হাসিয়া বলিল, সে তুমি পারবে না। তোমার জোর আমি জানি।

পুলিশের দল থেকে মায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবটি পর্যন্ত একদিন তার নমুনা জেনে গেছেন। তোমার মা যে একদিন আমার হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে গেছেন, এ অস্বীকার করবার সাধ্য তোমার নেই।

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল। জীবানন্দ হাত-মুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল, কহিল, আমি যখন একলা থাকি, সে-রাত্রের কথা মনে মনে আলোচনা করে কোথা দিয়ে যে সময় কাটে বলতে পারিনে। বিশেষ করে চাকরদের ঘরে পাঠানোর ভয়ে তোমার সেই হাতজোড় করে কান্না। ভোলনি বোধ হয়?

ষোড়শী কহিল, না।

জীবানন্দ বলিল, তার পরে সেই শূল-ব্যথা। একলা ঘরে তুমি আর আমি। শেষে তোমার কোলে মাথা রেখে আমার রাত কাটল। তারপরের ঘটনাগুলো আর ভাবতে ভাল লাগে না। তোমাকে ঘুষ দিতে যাবার কথা মনে হলে আমার পর্যন্ত যেন লজ্জায় গা শিউরে উঠে। এই সেদিন পুরীতে যখন মর মর হলাম, প্রফুল্ল বললে, দাদা, অলকাকে একবার আনিয়ে নিন। আমি বললাম, সে আসবে কেন? প্রফুল্ল বললে, গায়ের জোরে। আমি বললাম, গায়ের জোরে ধরে এনে লাভ হবে কি? সে উত্তর দিলে, ঠাকরুণ একবার আসুন ত, তার পরে এর লাভ-লোকসানের হিসাব হবে। তাকে তুমি জানো না, কিন্তু এতবড় ভক্ত তোমার আর কেউ নেই।

এই ভক্ত লোকটির পরিচয় জানিতে ষোড়শীর কৌতূহল হইল, কিন্তু সে ইচ্ছা সে দমন করিয়া রাখিল।

জীবানন্দ কহিল, রাত অনেক হ'লো, তোমাকে আর বসিয়ে রাখতে পারিনে। এবার আমি যাই, কি বল?

ষোড়শী কহিল, আপনার কি একটা যে কাজের কথা ছিল।

কাজের কথা? কিন্তু বিশেষ কি কথা ছিল আমার আর মনে পড়চে না। এখন কেবল একটা কথাই মনে পড়চে, তোমার সঙ্গে কথা কহাই আমার কাজ। বড্ড খোসামোদের মত শোনাল, না? কিন্তু এরকম খোসামোদ করতেও যে পারি, এর আগে তাও জানতাম না। হাঁ অলকা, তোমার কি সত্যি আবার বিয়ে হয়েছিল?

ষোড়শী মুখ তুলিয়া কহিল, আবার কি-রকম? সত্যি বিয়ে আমার একবার মাত্রই হয়েচে।

জীবানন্দ বলিল, আর তোমার মা যে তোমাকে আমাকে দিয়েছিলেন, সেটাই কি সত্য নয়?

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ অসঙ্কোচে কহিল, না, সে সত্যি নয়। মা আমার সঙ্গে যে টাকাটা দিয়েছিলেন, আপনি তাই শুধু নিয়েছিলেন, আমাকে নেননি। ঠকানো ছাড়া তার মধ্যে লেশমাত্র সত্যও কোথাও ছিল না।

জীবানন্দ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, কোনপ্রকার উত্তর দিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না। মিনিট-পাঁচেক যখন এইভাবে কাটিয়া গেল, তখন ষোড়শী মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং ম্লান দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া দিবার অবসরে চাহিয়া দেখিল, সে যেন হঠাৎ ধ্যানে বসিয়া গেছে। এই ধ্যান ভাঙিতে তাহার দ্বিধা বোধ হইল, কিন্তু ক্ষণেক পরে সে নিজেই যখন কথা কহিল, তখন মনে হইল কে যেন কতদূর হইতে কথা কহিতেছে।

অলকা, এ-কথা তোমার সত্য নয়।

কোন কথা?

জীবানন্দ কহিল, তুমি যা জেনে রেখেচ। ভেবেছিলাম সে-কাহিনী কখনও কাউকে বলব না, কিন্তু সেই কাউকের মধ্যে আজ তোমাকে ফেলতে পারচিনে। তোমার মাকে ঠকিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাকে ঠকাবার সুযোগ ভগবান আমাকে দেননি। আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

বলুন।

জীবানন্দ কহিল, আমি সত্যবাদী নই, কিন্তু আজকের কথা আমার তুমি বিশ্বাস কর। তোমার মাকে জানতাম, তাঁর মেয়েকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করবার মতলব আমার ছিল না—ছিল কেবল তাঁর টাকাটাই লক্ষ্য, কিন্তু সে-রাত্রে হাতে-হাতে তোমায় যখন পেলাম, তখন, না বলে ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছেও আর হলো না।

তবে কি ইচ্ছে হ'লো?

জীবানন্দ কহিল, থাক, সে তুমি আর শুনতে চেয়ো না। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত শুনলে আপনিই বুঝবে, এবং সে বোঝায় ক্ষতি বই লাভ আমার হবে না, কিন্তু এরা তোমাকে যা বুঝিয়েছিল তা তাই নয়, আমি তোমাকে ফেলে পালাইনি।

ষোড়শী এই ইঙ্গিত বুঝিল, এবং ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া কহিল, আপনার না-পালানোর ইতিবৃত্ত এখন ব্যক্ত করুন।

তাহার কঠোর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া জীবানন্দ মুচকিয়া হাসিল। কহিল, অলকা, আমি নির্ব্বোধ নই। যদি বা কিছু করি, তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করব। তোমার মায়ের এতবড় ভয়ানক প্রস্তাবেও কেন রাজি হয়েছিলাম জানো? একজন স্ত্রীলোকের হার আমি চুরি করি; ভেবেছিলাম টাকা দিয়ে তাকে শান্ত করব। সে শান্ত হ'লো, কিন্তু পুলিশের ওয়ারেণ্ট তাতে শান্ত হ'লো না। ছ'মাস জেলে গেলাম—সেই যে শেষ রাত্রে বার হয়েছিলাম, আর ফেরবার অবকাশ পেলাম না।

ষোড়শী নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কহিল, তার পরে?

জীবানন্দ তেমনি মৃদু হাসিয়া বলিল, তার পরেও মন্দ নয়। জীবানন্দবাবুর নামে আরও একটা ওয়ারেণ্ট ছিল। মাস-কয়েক পূর্ব্বে রেলগাড়িতে একজন বন্ধু

সহযাত্রীর ব্যাগ নিয়ে তিনি অন্তর্দ্ধান হ'ন। ফলে আরও দেড় বৎসর। একুনে এই বছর-দুই নিরুদ্দেশের পর বীজগাঁয়ের ভাবী জমিদারবাবু আবার যখন রঙ্গমঞ্চে পুনঃপ্রবেশ করলেন, তখন কোথায় বা অলকা, আর কোথায় বা তার মা!

জীবানন্দের আত্মকাহিনীর এক অধ্যায় শেষ হইল। তার পরে দু'জনেই নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

রাত কত?

বোধ হয় আর বেশী বাকী নেই।

তা হলে অন্ধকারে বাড়ি গিয়ে আর কাজ নেই।

কাজ নেই? তার মানে?

ষোড়শী কহিল, কম্বলটা পেতে দিই, আপনি বিশ্রাম করুন।

জীবানন্দের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, বিশ্রাম করব? এখানে?

ষোড়শী কহিল, ক্ষতি কি?

কিন্তু বড়লোক জমিদারের যে এখানে কষ্ট হবে অলকা?

ষোড়শী বলিল, হলেও থাকতে হবে। গরীবের দুঃখটা আজ একটুখানি জেনে যান।

জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখের কোণে জল আসিতেছিল, ইচ্ছা হইল বলে, আমি জানি সব, কিন্তু বুঝিবার মানুষটা যে মরিয়াছে। কিন্তু এ-কথা না বলিয়া কহিল, যদি ঘুমিয়ে পড়ি অলকা?

অলকা শান্তভাবে জবাব দিল, সে সম্ভাবনা ত রইলই।

১৯

জীবানন্দের উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র ও ভুক্তাবশেষ প্রভৃতি ফেলিয়া দিতে এবং রান্নাঘরের কিছু কিছু কাজ সারিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া আসিতে ষোড়শী বাহিরে চলিয়া গেলে, তাহার সেই চিঠির ছেঁড়া টুকরাখানা জীবানন্দের চোখে পড়িল। হাতে তুলিয়া লইয়া সেই মুক্তার মত সাজানো অক্ষরগুলির প্রতি মুগ্ধ-চক্ষে চাহিয়া সে প্রদীপের আলোকে রাখিয়া সমস্ত লেখাটুকু একনিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল। অনেক কথাই বাদ গিয়াছে, তথাপি এই টুকু বুঝা গেল, লেখিকার বিপদের অবধি নাই, এবং সাহায্য না হোক, সহানুভূতি কামনা করিয়া এ পত্র যাহাকে লিখিয়াছে, সে নিজে যদিও নারী, কিন্তু অক্ষরের আড়ালে দাঁড়াইয়া আর এক ব্যক্তিকে ঝাপসা দেখা যাইতেছে যাহাকে কোনমতেই স্ত্রীলোক বলিয়া ভ্রম হয় না। এই পত্র তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। একবার,

দুইবার, শেষ করিয়া যখন সে আর একবার পড়িতে শুরু করিয়াছে, তখন ষোড়শীর পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া কহিল, সবটুকু থাকলে পড়ে বড় আনন্দ পেতাম। যেমন অক্ষর তেমনি ভাষা—ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

ষোড়শী তাহার কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন সহজে লক্ষ্য করিয়াও কহিল, একবার উঠুন, কম্বলটা পেতে দিই।

জীবানন্দ কান দিল না, বলিল, নর-পিশাচটি যে কে তা সামান্য বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, কিন্তু তাকে নিধন করতে যে দেবতার আবাহন হয়েচে তিনি কে? নামটি তাঁর শুনতে পাইনে?

এবারেও ষোড়শী আপনাকে বিচলিত হইতে দিল না। শীতের দিনে আকস্মিক একটা দখিনা বাতাসের মত তাহার মনের ভিতরটা আজও অজানা পদধ্বনির আশায় যেন উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সেখানে জীবানন্দের বিদ্রূপ বেশ স্পষ্ট হইয়া পৌঁছিল না, সে তখনি সহজভাবে কহিল, সে হবে। এখন আপনি একটু উঠে দাঁড়ান, আমি এটা পেতে দিই।

জীবানন্দ আর কথা কহিল না, একপাশে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া তাহার কাজ করা দেখিতে লাগিল। ষোড়শী ঝাঁটা দিয়া প্রথমে সমস্ত ঘরখানি পরিষ্কার করিল, পরে কম্বলখানি দু'পুরু করিয়া বিছাইয়া চাদরের অভাবে নিজের একখানি কাচা কাপড় সযত্নে পাতিয়া দিয়া কহিল, বসুন। আমার কিন্তু বালিশ নেই—

দরকার হলেই পাবো গো—অভাব থাকবে না। এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া কাপড়খানি তুলিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেই ষোড়শী মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া আরক্ত-মুখে কহিল, কিন্তু ওটা তুলে ফেললেন কেন, শুধু কম্বল ফুটবে যে?

জীবানন্দ উপবেশন করিয়া কহিল, তা জানি, কিন্তু আতিশয্যটা আবার বেশি ফুটবে। যত্ন জিনিসটায় মিষ্টি আছে সত্যি, কিন্তু তার ভান করাটায় না আছে মধু, না আছে স্বাদ। ওটা বরঞ্চ আর কাউকে দিয়ো।

কথা শুনিয়া ষোড়শী বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। তাহার মুখের উপর চোখের পলকে কে যেন ছাই মাখাইয়া দিল।

জীবানন্দ কহিল, তাঁর নামটি?

ষোড়শী কয়েক মুহূর্ত্ত কথা কহিতে পারিল না, তাহার পরে বলিল, কার নামটি?

জীবানন্দ হাতের পত্রখণ্ডের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া বলিল, যিনি দৈত্যবধের জন্য শীঘ্র অবতীর্ণ হবেন? যিনি দ্রৌপদীর সখা, যিনি—আর বলব?

এই ব্যঙ্গের সে জবাব দিল না, কিন্তু চোখের উপর হইতে তাহার মোহের যবনিকা থান্ থান্ হইয়া ছিঁড়িয়া গেল। ধর্ম্মলেশহীন, সর্ব্বদোষাশ্রিত সেই পাষণ্ডের

আশ্চর্য্য অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া কেমন করিয়া যে তাহার মনে ক্ষণকালের নিমিত্ত ক্ষমামিশ্রিত করুণার উদয় হইয়াছিল ইহা সে সহসা ভাবিয়া পাইল না। এবং চিত্তের এই ক্ষণিক বিহ্বলতায় সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার অনুশোচনায় তিক্ত, সতর্ক ও কঠোর হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল পরে জীবানন্দ পুনশ্চ যখন সেই এক প্রশ্নই করিল, তখন ষোড়শী কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া কহিল, তাঁর নামে আপনার প্রয়োজন?

জীবানন্দ কহিল, প্রয়োজন আছে বই কি? আগে থেকে জানতে পারলে হয়ত আত্মরক্ষার একটা উপায় করতেও পারি।

ষোড়শী তাহার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আর আত্মরক্ষায় কি শুধু আমারই অধিকার নেই?

জীবানন্দ বলিয়া ফেলিল, আছে বই কি।

ষোড়শী কহিল, তা হলে সে নাম আপনি পেতে পারেন না। আমার ও আপনার একই সঙ্গে রক্ষা পাবার উপায় নেই।

জীবানন্দ একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিল, তাই যদি হয়, রক্ষা পাওয়া আমারই দরকার এবং তাতে লেশমাত্র ত্রুটি হবে না জেনো।

ষোড়শীর মুখে আসিল বলে, তা জানি, একদিন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কে সাহেবের কাছে এ-প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছিল। সেদিন নিরপরাধা নারীর স্কন্ধে অপরাধের বোঝা চাপাইয়া তোমার প্রাণ বাঁচিয়াছিল, এবং তোমার আজিকার বাঁচিয়া থাকিবার দামটাও হয়ত ততবড়ই আর একজনকে দিতে হইবে। কিন্তু সে কোন কথাই কহিল না। তাহার মনে হইল এতবড় নর-পশুর কাছে অতবড় দানের উল্লেখ করার মত ব্যর্থতা আর ত কিছু হইতেই পারে না।

জীবানন্দের হুঁস হইল। তাহার এতবড় ঔদ্ধত্যের যে জবাব দিল না, তাহার কাছে গলাবাজির নিষ্ফলতা তাহার নিজের মনেই বাজিল। তাহার উত্তেজনা কমিল, কিন্তু ক্রোধ বাড়িয়া গেল। কহিল, অলকা, তোমার এই বীরপুরুষটির নাম যে আমি জানিনে তা নয়।

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ কহিল, জানবেন বই কি, নইলে তাঁর উদ্দেশে ঝগড়া করবেন কেন? তা ছাড়া, পৃথিবীর বীরপুরুষদের মধ্যে পরিচয় থাকবারই ত কথা।

জীবানন্দ শক্ত হইয়া কহিল, সে ঠিক। কিন্তু এই কাপুরুষকে বার বার অপমান করার ভারটা তোমার বীরপুরুষটি সইতে পারলে হয়। যাক, এ চিঠি ছিঁড়লে কেন?

ষোড়শী বলিল, আর একখানা পাঠিয়েছিলাম বলে।

কিন্তু সোজা তাঁকে না লিখে তাঁর স্ত্রীকে লেখা কেন? এইসব শব্দভেদী বাণ কি সেই বীরপুরুষের শিক্ষা নাকি?

ষোড়শী কহিল, তার পরে?

জীবানন্দ বলিল, তার পরে, আজ আমার সন্দেহ গেল। বন্ধুর সংবাদ আমি পরের কাছে শুনেচি, কিন্তু রায়মশাইকে যতই প্রশ্ন করেচি ততই তিনি চুপ করে গেছেন। আজ বোঝা গেল তাঁর আক্রোশটাই সবচেয়ে কেন বেশী।

ষোড়শী চমকিয়া গেল। কলঙ্কের ঘূর্ণি-হাওয়ার মাঝখানে পড়িয়া তাহার দেহের কোথাও দাগ লাগিতে আর বাকি ছিল না, কিন্তু ইহার বাহিরে দাঁড়াইয়াও যে আর একজন অব্যাহতি পাইবেন না, ইহা সে ভাবে নাই। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর সম্বন্ধে আপনি কি শুনেচেন?

জীবানন্দ কহিল, সমস্তই। একটু থামিয়া বলিল, তোমার চমক আর গলার মিঠে আওয়াজে আমার হাসি পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হাসতে পারলাম না—আমার আনন্দ করবার কথা এ নয়। সেই ঝড়-জলের রাত্রির কথা মনে পড়ে? তার সাক্ষী আছে। সাক্ষী বেটারা যে কোথায় লুকিয়ে থাকে আগে থেকে কিছুই বলবার জো নেই। আমি যখন গাড়ি থেকে ব্যাগ নিয়ে পালাই, ভেবেছিলাম কেউ দেখেনি।

ষোড়শী কহিল, যদি সত্যই তাই হয়ে থাকে সে কি এতবড় দোষের?

জীবানন্দ বলিল, কিন্তু তাকে গোপন করাটা? ওই চিঠির টুকরোটা? নিজেই একবার পড়ে দেখ ত কি মনে হয়? এ আমি সঙ্গে নিয়ে চললাম, আবশ্যক হয় ত যথাস্থানে পৌঁছে দেব। আমার মত ইনিও তোমার একবার বিচার করতে বসেছিলেন না? দেখচি তোমার বিচার করবার বিপদ আছে। এই বলিয়া সে মুচকি হাসিল।

ষোড়শী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। বিপদের বার্ত্তা জানাইয়া বাস্তবিক সে যে একজনকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া আর একজনকে পত্র লিখিয়াছে, একজনের নাম করিয়া আর একজনকে আসিতে ডাকিয়াছে—সেই ডাকটা যখন এই ছেঁড়া চিঠির টুকরা হইতে এই লোকটাকে পর্য্যন্ত ফাঁকি দিতে পারিল না, তখন সম্পূর্ণ পত্রটা কি হৈমর চক্ষুকেই ঠকাইতে পারিবে? এবং ঠিক সেইদিকে কেহ যদি অঙ্গুল তুলিয়া হৈমর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহে ত লজ্জার কিছু আর বাকি থাকিবে না।

তাহার চক্ষের পলকে হৈমর ঘর-সংসারের চিত্র—তাহার স্বামী, তাহার ছেলে, তাহার বহু দাস দাসী, তাহার ঐশ্বর্য্য, তাহার স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রার ধারা—যে ছবি সে দিনের পর দিন কল্পনায় দেখিয়াছে—সমস্ত একনিমিষে কলুষের বাষ্পে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে মনে করিয়া সে নিজের কাছেই যেন মুখ দেখাইতে পারিল না। আর এই যে পাপিষ্ঠ তাহারই ঘরে বসিয়া তাহাকে ভয় দেখাইতেছে, যাহার কুকার্য্যের অবধি নাই, যে মিথ্যার জাল বুনিয়া অপরিচিত নিরপরাধ একজন রমণীর সর্ব্বনাশ

করিতে কোন কুণ্ঠা মানিবে না, ষোড়শীর মনে হইল এ-জীবনে এতবড় ঘৃণা সে আর কখনো কাহাকেও করে নাই, এবং এ বিষ যে হৃদয় মথিত করিয়া উঠিল, তাহার সমস্ত গর্ভতল সেই দহনে যেন অনলকুণ্ডের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

নির্মল আসিবেই। তাহার যত অসুবিধাই হোক, এই দুঃখের আহ্বান সে যে উপেক্ষা করিতে পারিবে না—নিজের মনের স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের জ্বালায় সে যেন পুড়িতে লাগিল। তখন তাহারই কলঙ্ককে কেন্দ্র করিয়া শ্বশুর ও জামাতায়, পিতা ও কন্যায়, জমিদার ও প্রজায় সমস্ত গ্রাম ব্যাপিয়া যে লড়াইয়ের আবর্ত উঠিবে, তাহার বীভৎসতার কালো ছায়া তাহার সাংসারিক দুঃখ-কষ্টকে কোথায় যে ঢাকিয়া ফেলিবে সে কল্পনাও করিতে পারিল না।

বোধ করি মিনিট পাঁচ-ছয় নিস্তব্ধতার পরে ঠিক এইসময়ে জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কেমন, অনেক কথাই জানি, না?

ষোড়শী অভিভূতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, হাঁ?

এ-সব তবে সত্যি বল?

ষোড়শী তেমনি অসঙ্কোচে কহিল, হাঁ, সত্যি।

জীবানন্দ অবাক হইয়া গেল! এই অপ্রত্যাশিত সংক্ষিপ্ত উত্তরের পরে তাহার নিজের মুখেও সহসা কথা যোগাইল না। শুধু কহিল,—ওঃ—সত্যি! তাহার পরে হাত বাড়াইয়া স্তিমিত দীপশিখাটা উজ্জ্বল করিয়া দিতে দিতে ক্ষণে ক্ষণে তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, এখন তাহলে তুমি কি করবে মনে কর?

কি আমাকে আপনি করতে বলেন?

তোমাকে? বলিয়া জীবানন্দ স্তব্ধ নতমুখে বসিয়া বসিয়া তৈলাধার প্রদীপের বাতিটা অকারণে শুধু কেবল উস্কাইতে লাগিল। খানিক পরে যখন সে কথা কহিল, তখনও তাহার চক্ষু সেই দীপশিখার প্রতি। কহিল, তা হলে এঁরা সকলে তোমাকে অসতী বলে—

এতক্ষণ পরে সে কথার মাঝখানে বাধা দিল, কহিল, সে কথা এখানে কেন? তাঁদের বিরুদ্ধে আপনার কাছে ত আমি নালিশ জানাইনি। আমাকে কি করতে হবে তাই বলুন। কোন কারণ দেখাবার দরকার নেই!

জীবানন্দ বলিল, তা বটে। কিন্তু সবাই মিথ্যে কথা বলে, আর তুমি একাই সত্যবাদী, এই কি আমাকে তুমি বোঝাতে চাও অলকা?

প্রত্যুত্তরে ষোড়শী তাহার প্রতি চাহিয়া কি একটা বলিতে গিয়াও হঠাৎ চুপ করিয়া গেল দেখিয়া জীবানন্দ আপনাকে আর একবার অপমানিত জ্ঞান করিল। বলিল, একটা উত্তর দিতেও চাও না?

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

জীবানন্দ কহিল, অর্থাৎ আমার কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার চেয়ে দুর্নামও ভাল। বেশ! কিন্তু সমস্ত স্পষ্টই বোঝা গেছে। এই বলিয়া সে ব্যঙ্গ করিয়া হাসিল।

কিন্তু ইহাতেও ষোড়শীর কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতা নষ্ট হইল না, কহিল, স্পষ্ট বোঝা যাবার পরে কি করতে হবে বলুন?

তাহার প্রশ্ন ও অচঞ্চল কণ্ঠস্বরের গোপন আঘাতে জীবানন্দের ক্রোধ ও অধৈর্য্য শতগুণ বাড়িয়া গেল, কহিল, তোমাকে কি করতে হবে সে তুমি জানো, কিন্তু আমাকে মন্দিরের পবিত্রতা বাঁচাতেই হবে। সত্যকারের অভিভাবক তুমি নও, আমি। পূর্ব্বে কি হ'তো আমি জানিনে, কিন্তু এখন থেকে ভৈরবীকে ভৈরবীর মতই থাকতে হবে, না হয় তাকে যেতে হবে। এরকম চিঠি আর লেখা চলবে না। এই বলিয়া সে মুখ তুলিতেই তাহার ঈর্ষার ক্রূরদৃষ্টি ষোড়শীর চোখে পড়িতে তাহার নিজের দৃষ্টি একমুহূর্তে যেমন যোজন-বিস্তৃত হইয়া গেল, তেমনি লালসার তপ্ত নিশ্বাস নিজের সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিয়া বিশ্ব-সংসারে যেন অরুচি ধরিয়া গেল। মনে হইল হৈম, তাহার সংসার, এই দেবমন্দির, তাহার অসহায় প্রজাদের দুঃখ, তাহার নিজের ভবিষ্যৎ কিছুতেই আর তাহার কাজ নাই—সকল সম্বন্ধ হইতে অব্যাহতি পাইয়া অজানা কোথাও গিয়া লুকাইতে পারিলে যেন বাঁচে। সকলের চেয়ে বেশি মনে হইল নির্ম্মল যেন না আসে। অনেকক্ষণ নীরবে স্থির থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিল, বেশ তাই হবে। যথার্থ অভিভাবক কে, সে নিয়ে আমি ঝগড়া করব না, আপনারা যদি মনে করেন আমি গেলে মন্দিরের ভাল হবে, আমি যাবো।

ইহাকে বিদ্রূপ মনে করিয়া জীবানন্দ জ্বালার সহিত কহিল, তুমি যে যাবে সে ঠিক। কারণ যাতে যাও তা আমি দেখব।

ষোড়শী তেমনি নম্রকণ্ঠে বলিল, আমি যখন যেতে চাচ্ছি, তখন কেন আপনি রাগ করচেন? কিন্তু আপনার উপর এই ভার রইল, যেন মন্দিরের সত্যিই ভাল হয়।

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কবে যাবে?

ষোড়শী উত্তর দিল, আপনারা যখনই আদেশ করবেন। কাল, আজ, এখনি—যখনি বলবেন।

জীবানন্দের ক্রোধ বাড়িল বই কমিল না, কহিল, কিন্তু নির্ম্মলবাবু? জামাই-সাহেব?

ষোড়শী কাতর হইয়া বলিল, তাঁর নাম আর করবেন না।

জীবানন্দ কহিল, আমার মুখে তাঁর নামটা পর্য্যন্ত সহ্য হয় না? ভাল। কিন্তু তোমাকে কি দিতে হবে?

আমাকে কিছুই দিতে হবে না।

জীবানন্দ কহিল, এ ঘরখানা পর্য্যন্ত ছাড়তে হবে জানো?

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া সবিনয়ে কহিল, জানি। যদি পারি ত কালই ছেড়ে দেব।

কালই? ভাল, কোথায় থাকবে ঠিক করেচ?

ষোড়শী কহিল, এখানে থাকব না, এর বেশি কিছুই ঠিক করিনি। একদিন কিছু না জেনেই ভৈরবী হয়েছিলাম, আজ বিদায় নেবার সময়েও আমি এর বেশি কিছুই চিন্তা করব না।

জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল এতক্ষণ কোথায় যেন তাহার ভুল হইতেছিল।

ষোড়শী বলিল, আপনি দেশের জমিদার, চণ্ডীগড়ের ভালমন্দের বোঝা আপনার উপর রেখে যেতে শেষ সময়ে আর আমি দুশ্চিন্তা করব না কিন্তু আমার বাবা বড় দুর্ব্বল, তাঁর উপর ভার দিয়ে আপনি যেন নিশ্চিন্ত হবেন না।

তাহার কণ্ঠস্বর ও কথায় বিচলিত হইয়া জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি সত্যসত্যই চলে যেতে চাও নাকি?

ষোড়শী তাহার পূর্ব্ব-কথার অনুবৃত্তি স্বরূপে কহিতে লাগিল, আর আমার দুঃখী, দরিদ্র ভূমিজ প্রজারা—এদের সুখ-দুঃখের ভারও আমি আপনাকে দিয়ে চললুম।

জীবানন্দ তাড়াতাড়ি কহিল, আচ্ছা তা হবে। কি তারা চায় বল ত?

ষোড়শী কহিল, সে তারাই আপনাকে জানাবে। কেবল আমি শুধু আপনার কথাটাই যাবার আগে তাদের জানিয়ে যাবো। হঠাৎ সে বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া কহিল, কিন্তু এখন আমি চললাম—আমার স্নান করতে যাবার সময় হ'লো। এই বলিয়া সে তাহার কাপড় ও গামছা আলনা হইতে তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল।

জীবানন্দ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া কহিল, স্নানের সময়? এই রাত্রে?

রাত্রি আর নেই। আপনি এবার বাড়ি যান। বলিতে বলিতেই ষোড়শী ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার এ অকারণ আকস্মিক ব্যগ্রতায় জীবানন্দ নিজেও ব্যগ্র হইয়া উঠিল; কহিল, কিন্তু আমার সকল কথাই যে বাকি রয়ে গেল অলকা?

ষোড়শী কহিল, আপনি বাড়ি যান।

জীবানন্দ জিদ করিয়া কহিল, না। কথা আমার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি এইখানেই তোমার প্রতীক্ষা করে রইলাম।

প্রত্যুত্তরে ষোড়শী থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না, আপনার পায়ে পড়ি, আমার জন্যে আর আপনি অপেক্ষা করবেন না। বলিয়া সে বামদিকে বনপথ ধরিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

২০

সেদিন প্রাতঃকালটা হঠাৎ একটা ঘন কুয়াশায় সমস্ত অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। রায় মহাশয় সেইমাত্র শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন; একজন ভদ্রব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কহিলেন, কে ও?

আমি নির্ম্মল, বলিয়া জামাতা কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। এই আকস্মিক আগমনে তিনি কোনরূপ বিস্ময় বা হর্ষ প্রকাশ করিলেন না। চাকরদের ডাকিয়া বলিলেন, কে আছিস্ রে, নির্ম্মলের জিনিসপত্রগুলো সব হৈমর ঘরে রেখে আয়। তা গাড়িতে কষ্ট হয়নি ত বাবা? খোকা, হৈম, এরা সব ভাল আছে ত?

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সকলে ভাল আছে।

রায় মহাশয় কহিলেন, কিন্তু একা এলে কেন নির্ম্মল, মেয়েটাকে সঙ্গে আনলে ত আর একবার দেখা হ'তো।

নির্ম্মল বলিল, দু'-চারদিনের জন্যে আবার—

রায় মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিলেন,; বলিলেন, এ কি দু-চারদিনের ব্যাপার বাবা, দু-চার মাসের দরকার। যাও, ভেতরে যাও—মুখ-হাত ধোও গে।

নির্ম্মল ভিতরে আসিয়া দেখিল এখানেও সেই একই ভাব। যে-প্রকারেই হোক হাত-ধোয়া, কাপড়-ছাড়া প্রভৃতি সমাধা হইলে গরম চা এবং কিছু জলখাবার শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী স্বহস্তে আনিয়া জামাতাকে নিজে খাওয়াইতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হৈম কি আসতে চাইলে না?

নির্ম্মল কহিল, না।

তারা জানে তুমি কেন আসছ?

নির্ম্মল মাথা নাড়িয়া বলিল, জানে বই কি, সমস্তই জানে।

তবু মানা করলে না?

তাঁহার প্রশ্ন ও কণ্ঠস্বরে নির্ম্মল পীড়া অনুভব করিয়া বলিল, মানা কেন করবে মা? সে ত জানে আমি অন্যায় কাজে কোনদিনই হাত দিইনে।

আর তার বাপই কেবল অন্যায় কাজে হাত দিয়ে বেড়ায়, এই কি সে জানে নির্ম্মল? এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল নতমুখে স্থির থাকিয়া অকস্মাৎ আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, তা সে যাই কেন না জানুক বাছা, এ তুমি করতে পারবে না—এ-কাজে তোমাকে আমি কোনমতেই নামতে দিতে পারব না। শ্বশুর-জামাইয়ে

লড়াই করবে, গাঁয়ের লোক তামাসা দেখবে, তার আগে আমি জলে ডুব দিয়ে মরব, তোমাকে বলে রাখলাম বাবা।

নির্ম্মল আস্তে আস্তে বলিল, কিন্তু যে পীড়িত, যে অসহায়, তাকে রক্ষা করাই ত আমাদের ব্যবসা মা।

শাশুড়ী কহিলেন, কিন্তু ব্যবসাই ত মানুষের সমস্ত নয় বাছা। উকিল-ব্যারিস্টারেরও মা-বোন আছে, স্ত্রী আছে, শ্বশুর-শাশুড়ী আছে—গুরুজনের মান-মর্য্যাদা রাখার ব্যবস্থা সংসারে তাদের জন্যেও তৈরি হয়েচে।

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হয়েচে বই কি মা, নিশ্চয় হয়েচে। তাহার পরে সমস্ত ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে একটু হাসিয়া বলিল, আর শেষ পর্য্যন্ত হয়ত লড়াই-ঝগড়া কিছুই না হতে পারে।

গৃহিণীর মুখ তাহাতে প্রসন্ন হইল না, কহিলেন, পারে, কিন্তু সে শুধু তোমার শ্বশুরের সর্ব্বরকমে হার হলেই পারে। কিন্তু তার পরে আর তাঁর রায়মশাই হয়ে এ-গ্রামে বাস করা চলবে না। তা ছাড়া ষোড়শী দুর্ব্বলও নয়, অসহায়ও নয়। তার হ্যাঙাড়ে ডাকাতের দল আছে, তাকে জমিদার ভয় করে। তার একখানা চিঠির জোরে মানুষ পাঁচশ ক্রোশ দূর থেকে ঘর-দোর ছেলে-পুলে ফেলে চলে আসে, আমরা যা একশ'খান চিঠিতে পারিনে। তারা ব'লো ভৈরবী, তুক-তাক, মন্ত্র-তন্ত্র কত কি জানে। তা সে থাক্ ভাল, যাক ভাল, আমার ক্ষতি নেই—তার পাপের ভরা সে-ই বইবে, কিন্তু চোখের ওপর আমার নিজের মেয়ের সর্ব্বনাশ হতে আমি দেব না নির্ম্মল, তা লোকে যাই বলুক আর যাই করুক।

নির্ম্মল স্তব্ধ হইয়া রহিল। যে-ভাবেই হোক, এ-দিকে জানাজানি হইতেও কিছু বাকী নাই, এবং ষড়যন্ত্রেরও কোন ত্রুটি ঘটে নাই। তাহার শ্বশুর সকল আট-ঘাট বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, ছিদ্র বাহির করিবার জো নাই। তাহার চুপচাপ প্রকৃতির শাশুড়ী-ঠাকুরাণী যে এমন মজবুত করিয়া কথা কহিতে জানেন, ইহা সে মনে করে নাই, এবং যাহা কিছু কহিলেন, সে যে তাঁহার নিজের কথা তাহাও সে মনে করিল না, কিন্তু জবাব দিবারও কিছু খুঁজিয়া পাইল না। এই আর্জ্জি যিনি মুসাবিদা করিয়া আর একজনের মুখে গুঁজিয়া দিয়াছেন, তিনি সকল দিক চিন্তা করিয়াই দিয়াছেন, এবং ইহাও তাঁহার অবিদিত নাই যে, নিছক পরোপকার-মানসেই সে যে পশ্চিমের একপ্রান্ত হইতে স্ত্রী-পুত্র ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এ উত্তর সে কোনমতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিবে না।

ঘণ্টা-দুই বিশ্রাম করার পরে নির্ম্মল যখন বাটির বাহির হইল, তখন কর্ত্তা সদরে বসিয়াছিলেন। তিনি কোথায় কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি নিরর্থক প্রশ্নে সময় নষ্ট করিলেন না, শুধু একটু সকাল সকাল ফিরিবার অনুরোধ করিয়া বলিয়া

দিলেন যে, এই শ্রান্ত-দেহে অধিক বেলায় স্নানাহার করিলে অসুখ করিতে পারে।

শিরোমণি মহাশয় পাশে বসিয়া কি বলিতেছিলেন, উঁকি মারিয়া দেখিয়া কহিলেন, বাবাজী—না?

রায় মহাশয় বলিলেন, হাঁ।

শিরোমণি ভাবিয়া আলাপ করিবার উদ্যম করিতেই জনার্দ্দন বাধা দিয়া বলিলেন, নির্ম্মল পারছে না, তোমার কথাটা শেষ কর, আমাকে উঠতে হবে।

নির্ম্মল নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল। তাহার শ্বশুর যে তাহাকে অতি-কৌতূহলি প্রতিবেশীর অপ্রিয় জেরার দায় হইতে দয়া করিয়া অব্যাহতি দিলেন, ইহা অনুভব করিয়া তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

ষোড়শীর সহিত সে দেখা করিতে চলিয়াছিল। দিন-দুই পূর্ব্বে যে উৎসাহ লইয়া মনের ভিত্তিগাত্রে যে ছবি আঁকিয়া লইয়া সে তাহার প্রবাস-গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল, সে আর ছিল না। যে স্বপ্ন সুদীর্ঘ যাত্রাপথের সকল দুঃখ তাহার হরণ করিয়াছিল, শ্বশুর ও শাশুড়ীর অব্যক্ত ও ব্যক্ত অভিযোগের আক্রমণে এইমাত্র তাহা লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছিল। সমবেত ও প্রবল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহার একক পৌরুষ নিরাশ্রয়ের অবলম্বন, দুর্ব্বল, পরিত্যক্ত, নির্জ্জিত নারীর নিঃস্বার্থ বন্ধুরূপে এই গ্রামে পদার্পণ করিতে চাহিয়াছিল। তাহার কত না বল, কত না শোভা, কিন্তু আসিয়া দেখিল তাহার সকল কার্য্যেরই ইতিমধ্যে একটা কারণ প্রকাশ হইয়া গেছে। তাহা যেমন কদর্য্য, তেমনি কালো। কালিতে লেপিয়া একাকার হইতে আর বাকী কিছু নাই। শ্বশুরকে সে কোনদিন আদর্শপুরুষ মনে করে নাই, তিনি পল্লীগ্রামের বিষয়ী লোক, সামান্য অবস্থা হইতে যথেষ্ট সঞ্চয় করিয়াছেন, অতএব পরলোকের খরচের পাতাটাও সাদা পড়িয়া থাকিবার কথা নয়, ইহা সে বেশ জানিত, এবং মনে মনে ক্ষমাও করিত, কিন্তু আজ যখন সে মন্দিরের প্রাচীর ঘুরিয়া পায়ে-হাঁটা সেই সরু পথ ধরিয়া ষোড়শীর কুটির অভিমুখে পা বাড়াইল, তখন সংক্ষুব্ধ চিত্ততলে তাহার একদিকে শ্বশুরের বিরুদ্ধে যেমন বিদ্বেষ ও ঘৃণা নিবিড় হইয়া দেখা দিল, তেমনি অন্য দিকে বিশেষ কিছু না জানিয়াও ষোড়শীর প্রতি অভিমান ও বিরক্তিতে মন তিক্ত হইয়া উঠিল। মনে মনে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, যে স্ত্রীলোক অনাত্মীয় অপরিচিতপ্রায় পুরুষের কৃপাভিক্ষা করিয়া পত্রদ্বারা আহ্বান করিবার সঙ্কোচ অনুভব করে না, এবং সে-কথা নির্লজ্জ দাম্ভিকার ন্যায় পথে-ঘাটে প্রচার করিয়া বেড়ায়, তাহাকে আর যাহাই হোক সম্মানের উচ্চ আসনে বসানো চলে না। কিন্তু অকস্মাৎ চিন্তা তাহার এইখানে বাধা পাইয়া থামিল। পত্রবহুল মনসা-গাছের বাঁক ফিরিতেই তাহার উৎসুক দৃষ্টি সন্নিকটবর্ত্তিনী ষোড়শীর আনত মুখের

উপরে গিয়া পড়িল। সে প্রাঙ্গণের বাহিরে দাঁড়াইয়া একমনে বেড়ার দড়ি বাঁধিতে-ছিল, আগন্তুকের পদশব্দ শুনিতে পাইল না, এবং ক্ষণকালের জন্য নির্ম্মল না পারিল নড়িতে, না পারিল চোখ ফিরাইতে। এই ত সেদিন, তবুও তাহার মনে হইল এ সে ভৈরবী নয়। অথচ পরিবর্ত্তন যে কোনখানে তাহাও ধরিতে পারিল না। সেই রাঙা-পাড়ের গৈরিক শাড়িপরা, তেমনি রুক্ষ এলো চুল, গলায় তেমনি রুদ্রাক্ষের মালা, তেমনি মুখের উপরে উপবাসের একটি শীর্ণ ছায়া—সিঁদুর-মাখানো ত্রিশূলটি পর্য্যন্ত তেমনি হাতের কাছে ঠেস্ দিয়া রাখা—কিছু বদলায় নাই, তবুও অপরিচিত, অজানা মোহে তাহাকে মুহূর্ত্ত-কয়েকের নিমিত্ত স্তম্ভিত করিয়া দিল। দড়ির গ্রন্থি টানিয়া দিয়া ষোড়শী মুখ তুলিয়াই একটু চমকিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই দড়ি ছাড়িয়া দিয়া স্নিগ্ধ-মধুর হাসিয়া সুমুখে আসিয়া কহিল, আসুন, আমার ঘরে আসুন।

নির্ম্মল অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, কিন্তু আপনার কাজে যে বাধা দিলাম।

ষোড়শী সকৌতুকে মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, বেড়া বাঁধা বুঝি আমার কাজ? আর হ'লোই বা কাজ, কুটুম্বকে খাতির করাটা বুঝি কাজ নয়? শ্বশুরবাড়িতে জামাইয়ের আদর হয়নি, কিন্তু শালীর কুঁড়ে-ঘর থেকে ভগিনীপতিকে অনাদরে ফিরতে দেব না। আসুন, ঘরে গিয়ে বসবেন চলুন। খোকা, হৈম, চাকর-বাকর সব ভাল আছে? আপনি নিজে ভাল আছেন?

নির্ম্মল কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সবাই ভাল আছে, কিন্তু আজ আর বসব না।

ষোড়শী কহিল, কেন শুনি? তার পরে কণ্ঠস্বর নত করিয়া আরও একটু কাছে আসিয়া বলিল, একদিন হাত ধরে অন্ধকারে পার করে এনেছিলাম মনে পড়ে? দিনের বেলায় শুতে আর কাজ নেই, কিন্তু চলুন বলচি। যে এত দূর থেকে টেনে আনতে পারে, সে এটুকুও টেনে নিয়ে যেতে পারবে।

নির্ম্মল লজ্জা বোধ করিল, আঘাত পাইল। এই আচরণ, এই কথা ষোড়শীর মুখে কেবল অপ্রত্যাশিত নয়, অচিন্তনীয়। বিদুষী সন্ন্যাসিনী ভৈরবীকে সে শান্ত, সমাহিত, দৃঢ়, এমন কি কঠোর বলিয়া জানিত। সংসারে রমণীর পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া কল্পনা করিতে যেন তাহার বাধিত। তাহাকে অনেক ভাবিয়াছে—কর্ম্মের মধ্যে, বিশ্রামের মধ্যে এই ষোড়শীকে সে চিন্তা করিয়াছে—সমস্ত অন্তর রসে ভরিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু কখনও চিন্তাকে সে পদ্ধতি দিবার, শৃঙ্খলিত করিবার সাহস পর্য্যন্ত করে নাই। কিন্তু সেই ষোড়শী আজ যখন অপ্রত্যাশিত আত্মীয়তার অতি-ঘনিষ্ঠতায় অকস্মাৎ নিজেকে ছোট করিয়া, মানবী করিয়া সাধারণ মানবের কামনার আয়ত্তাধীন করিয়া দিল, নির্ম্মল অন্তরের একপ্রান্তে যেমন বেদনা বোধ করিল,

তেমনি আর একপ্রান্ত তাহার কি একপ্রকার বলুষিত আনন্দে একনিমিষে পরিপ্লুত হইয়া গেল।

নির্ম্মলকে ঘরে আনিয়া ষোড়শী কম্বল পাতিয়া বসিতে দিল, জিজ্ঞাসা করিল, পথে কষ্ট হয়নি?

নির্ম্মল বলিল, না। কিন্তু মন্দিরে আজ আপনার কাজ নেই?

ষোড়শী কহিল, অর্থাৎ আজ মন্দিরের রবিবার কি-না! তাহার পরে বলিল, কাজ আছে, সকালে একদফা করেও এসেচি। যেটুকু বাকি আছে, সেটুকু বেলাতে করলেও হবে। হাসিয়া কহিল, জামাইবাবু, এ আপনাদের কোর্ট-কাছারি নয়, মন্দির। ঠাকুর-দেবতারা তাদের দাস-দাসীদের কখনো মুহূর্ত্তের ছুটি দেন না, কানে ধরে চব্বিশ ঘণ্টা সেবা করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়েন।

কিন্তু এ চাকরি ত আপনি ইচ্ছে করেই নিয়েচেন!

ইচ্ছে করে? তা হবে! বলিয়া ষোড়শী সহসা একটুখানি হাসিয়া কহিল, আচ্ছা, আসার আগে একটু খবর দিলেন না কেন?

নির্ম্মল কহিল, সময় ছিল না। কিন্তু তার শাস্তিস্বরূপ শ্বশুরবাড়িতে যে খাতির পাইনি, অন্ততঃ তাঁরা যে আমাকে দেখে খুশী হননি, এ-কথা আপনি জানলেন কি করে? এবং আমার আসার সংবাদ আসার পূর্ব্বেই কে প্রচার করে দিল বলতে পারেন?

ষোড়শী কহিল, বলতে পারিনে, কিন্তু আন্দাজ করতে পারি।

নির্ম্মল বলিল, আন্দাজ করতে ত আমিও পারি, কিন্তু সত্যি কে করেচে এবং কোথায় সে খবর পেলে, জানেন ত আমাকে বলুন। আশা করি আপনার দ্বারা এ-কথা প্রকাশ হয়নি?

ষোড়শী হাসিল, কহিল, কোন আশা করতেই আমি কাউকে নিষেধ করিনে। কিন্তু জেনে আপনার লাভ কি? আপনি এসেচেন এ-খবরও সত্যি, আমারই জন্যে এসেচেন এ-কথাও ঠিক। তার চেয়ে বরঞ্চ বলুন, আসা সার্থক হবে কি না। আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন কি-না।

নির্ম্মল কহিল, প্রাণপণে চেষ্টা করব বইকি।

যদি কষ্ট হয় তবুও?

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, যদি কষ্ট হয় তবুও।

ষোড়শী হাসিয়া ফেলিল। নির্ম্মল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া নিজেও একটু হাসিয়া বলিল, হাসলেন যে?

ষোড়শী কহিল, হাসচি—আগের দিনের ভৈরবীরা বিদেশী মানুষদের ভেড়া বানিয়ে রাখত। আচ্ছা, ভেড়া নিয়ে তারা কি করত? চরিয়ে বেড়াত, না লড়াই

বাধিয়ে দিয়ে তামাসা দেখত? বলিতে বলিতেই সে একেবারে ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিতে লাগিল।

নির্ম্মলের দেহ-মন পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিল। এই কঠিন আবরণের নীচে যে রহস্যপ্রিয় কৌতুকময়ী চঞ্চল নারী-প্রকৃতি চাপা দেওয়া আছে, তাহার অপর্য্যাপ্ত হাসির প্রস্রবণ যে ব্রতোপবাসের সহস্রবিধ কৃচ্ছ্র-সাধনায় আজও শুকায় নাই—ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সে তেমনি জীবন্ত—এই কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বশরীরে তাহার কাঁটা দিল। পরিহাসে নিজেও যোগ দিয়া হাসিয়া কহিল, হয়ত বা মাঝে মাঝে মায়ের স্থানে বলি দিয়ে খেতো। অর্থাৎ আমার শ্বশুর কিংবা শাশুড়ীঠাকরুণ ইতিমধ্যে আপনার কাছে এসেছিলেন, এবং অনেক অপ্রিয় অসত্য শুনিয়ে গেছেন।

ষোড়শী কহিল, না, তাঁরা কেউ আসেননি। আমি যে মন্ত্রে-তন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছি এটা অসত্য হতে পারে, কিন্তু অপ্রিয় হবে কেন নির্ম্মলবাবু? তা ছাড়া, আপনার আসার ধরণ দেখে নিজেরই সন্দেহ হচ্ছে হয়ত বা নিতান্ত মিথ্যা না হতেও পারে। তাহার মুখে হাসির আভাস লাগিয়াই রহিল, কিন্তু গলার শব্দ বদলাইয়া গেল। ওষ্ঠপ্রান্তে ও কণ্ঠস্বরে সহসা যেন আর সঙ্গীত রহিল না।

নির্ম্মল আশ্চর্য্য, অবাক্ হইয়া রহিল। ইহার কতটুকু পরিহাস এবং কতখানি তিরস্কার, এবং কিসের জন্য তাহা সে কিছুতে ভাবিয়া পাইল না।

ষোড়শী নিজেও আর কিছু কহিল না, কিন্তু তাহার আনত মুখের 'পরে যে অপ্রত্যাশিত লজ্জার আরক্ত আভা পলকের নিমিত্ত ছায়া ফেলিয়া গেল, ইহা তাহার চোখে পড়িল। কিন্তু সে ঐ পলকের জন্যই। ষোড়শী আপনাকে সামলাইয়া লইয়া মুখ তুলিয়া হাসিমুখে কহিল, কুটুমের অভ্যর্থনা ত হ'লো। অবশ্য হাসি-খুশী দিয়ে যতটুকু পারি ততটুকুই—তার বেশি ত সম্বল নেই ভাই—এখন আসুন, বরঞ্চ কাজের কথা কওয়া যাক।

তাহার ঘনিষ্ঠ সম্ভাষণকে এবার সে সংশয়ের সহিত গ্রহণ করিতে চাহিল, তবুও তাহার মন ভিতরে ভিতরে উল্লসিত হইয়া উঠিল। কহিল, বলুন।

ষোড়শী কহিল, দুটি লোক দেবতাকে বঞ্চিত করতে চায়। একটি রায়মহাশয় আর একটি জমিদার—

নির্ম্মল বলিল, আর একটি আপনার বাবা। এঁরাই ত আপনাকেও বঞ্চিত করতে চান।

বাবা? হ্যাঁ, তিনিও বটে। এই বলিয়া ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল।

নির্ম্মল বলিল, আমার শ্বশুরের কথা বুঝি, আপনার বাবার কথাও কতক বুঝতে পারি, কিন্তু পারিনে এই জমিদার প্রভুটিকে বুঝতে। তিনি কিসের জন্য আপনার এত শত্রুতা করেন?

ষোড়শী বলিল, দেবীর অনেকখানি জমি তিনি নিজের বলে বিক্রি করে ফেলতে চান, কিন্তু আমি থাকতে সে কোনমতেই হবার জো নাই।

নির্ম্মল সহাস্যে কহিল, সে আমি সামলাতে পারব। এই বলিয়া সে কটাক্ষে ভৈরবীর মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিল ষোড়শী নীরব হইয়া আছে, কিন্তু তাহার মুখের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। খানিক পরে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু আরও অনেক জিনিস আছে, যা আপনিও হয়ত সামলাতে পারবেন না।

কি সে-সব? একটা ত আপনার মিথ্যে দুর্নাম?

ষোড়শী কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ করিল না; শান্ত-স্বরে বলিল, সে আমি ভাবিনে। দুর্নাম সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, তাই নিয়েই ত ভৈরবীর জীবন নির্ম্মল-বাবু! আমি এই কথাটাই তাঁদের বলতে চাই।

নির্ম্মল বিস্মিত হইয়া কহিল, এই কথা নিজের মুখে বলতে চান? সে যে স্বীকার করার সমান হবে!

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল।

নির্ম্মল সসঙ্কোচে কহিল, ওরা যে বলে—

কারা বলে?

অনেকেই বলে সে-সময়ে আপনি—

কোন্ সময়ে?

নির্ম্মল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচ সবলে দমন করিয়া বলিল, সেই ম্যাজিস্ট্রেট আসার দিনে। তখন আপনার কোলের উপরেই নাকি—

ষোড়শী একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তারা কি দেখেছিল না-কি? তা হবে, আমার ঠিক মনে নাই—যদি দেখে থাকে, তা সত্যি, জমিদারের মাথা আমিই কোলে করে বসেছিলাম।

নির্ম্মল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কহিল, তার পরে?

ষোড়শী শান্ত মুখখানি হাসির অভাসে একটু উজ্জ্বল করিয়া বলিল, তার পরে দিন কেটে যাচ্চে। কিন্তু কিছুতেই আর মন বসাতে পারিনে। সবই যেন মিথ্যে বলে ঠেকে!

কি মিথ্যে?

সব। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ব্রত, উপবাস, দেব-সেবা, এতদিনের যা কিছু সমস্তই—

তবু ভৈরবীর আসন চাই?

চাই বই কি। আর আপনি যদি বলেন, চাই না—

না, না, আমি কিছুই বলিনে। এই বলিয়া নির্ম্মল তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বেলা হয়ে যাচ্চে—এখন আমি চললাম!

ষোড়শীও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আমারও মন্দিরের কাজ আছে। কিন্তু আবার কখন দেখা হবে?

নির্ম্মল অনিশ্চিত অস্ফুটকণ্ঠে কি একটা কহিল, ভাল শোনা গেল না। ষোড়শী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ভাল কথা, সন্ধ্যার পর আজই ত আমাকে নিয়ে মন্দিরে একটা হাঙ্গামা আছে, আসবেন?

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বাহির হইয়া গেল। ষোড়শী মুচকিয়া একটু হাসিল, তারপরে কুটীরের দ্বারে শিকল তুলিয়া দিয়া মন্দিরের অভিমুখে বহির্গত হইল।

২১

শ্বশুর-জামাতা একত্রে আহারে বসিয়াছিলেন। শাশুড়ীঠাকুরাণী দধি ও মিষ্টান্ন আনিতে স্থানান্তরে গেলে রায় মহাশয় কহিলেন, ষোড়শীর সঙ্গে তোমার দেখা হ'লো নির্ম্মল?

নির্ম্মল মুখ না তুলিয়াই কহিল, আজ্ঞে হাঁ।

কি বলে সে?

এরূপ একটা সাধারণ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিসের সম্বন্ধে?

মন্দিরের সম্বন্ধে। বেটি ভৈরবীগিরি ছাড়বে, না চণ্ডীগড়ের নাম পর্য্যন্ত ডোবাবে? দেশের লোক ত আর বাইরের দশজনের কাছে মুখ দেখাতে পারে না এমনি হয়ে উঠেচে!

নির্ম্মল চুপ করিয়া রহিল। চণ্ডীগড়ের ভৈরবীদিগের বিরুদ্ধে এ অপবাদ আবহমান কাল প্রচলিত আছে, এবং সে-জন্যে গ্রামের কেহ কোনদিন লজ্জায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে বলিয়া প্রবাদ নাই। স্বয়ং চণ্ডীমাতাও কখনো আপত্তি করিয়াছেন বলিয়া লোকে জানে না। ইহাদের রীতি-নীতি, আচার-অনাচার সমস্তই সে শুনিয়া গিয়াছিল বলিয়া এ-সম্বন্ধে মন তাহার নিরপেক্ষভাবেই ছিল। বিশেষতঃ ষোড়শীর অপবাদ সে বিশ্বাস করে নাই, সুতরাং ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হইলেই সে খুশী হইত; কিন্তু এই প্রমাণকেই তাহার ভৈরবী-পদের একমাত্র দাবি বলিয়া সে একদিনও গ্রাহ্য করে নাই। তাহার শ্বশুরের ইঙ্গিত নূতনও নয়, ভীষণও নয়, অথচ এই কয়টা

কথাতেই অকস্মাৎ আজ তাহার মন যখন চমকিয়া সজাগ হইয়া উঠিল, তখন নিজের মনের বিক্ষিপ্ততা অনুভব করিয়া সে যথার্থই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া রায় মহাশয় পুনশ্চ কহিলেন, কি বল হে?

নির্ভুল ও সময়োপযোগী উত্তর দিবার সময় ও অবস্থা নির্ম্মলের ছিল না, সে শুধু পূর্ব্ব কথারই পুনরুক্তি করিয়া কহিল, ভৈরবীদের দুর্নাম ত চিরদিনই আছে।

রায় মহাশয় অস্বীকার করিলেন না, বলিলেন, আছে। কিন্তু দুর্নাম জিনিসটা ত মন্দ, চিরকালের দোহাই দিয়েও মন্দটাকে চিরকাল চালানো চলে না। কি বল?

কিন্তু সে যে মন্দ এ কি নিশ্চিত প্রমাণিত হয়ে গেছে?

রায় মহাশয় অসংশয়ে কহিলেন, গেছে।

নির্ম্মল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কি করে গেল! নিশ্চয় প্রমাণ কে দিলে?

রায় মহাশয় বলিলেন, যে দিয়েচে সে আজও দেবে। সন্ধ্যার পরে মন্দিরে যেয়ো, তার পরে বোধ হয় শ্বশুর-জামাই দু'জনকে দু'দিকে দাঁড়িয়ে আর সমস্ত গ্রামের হাসি-তামাসা কুড়োতে হবে না। এই ত তোমার ব্যবসা, অতএব নিশ্চয়-প্রমাণ যে কাকে বলে সে আমাকে আর তোমাকে বলে দিতে হবে না।

গৃহিণী পাথরের থালে মিষ্টান্ন ও বাটিতে দধি লইয়া প্রবেশ করিলেন, কহিলেন, কই বাবা, খাচ্চো না যে?

এই যে খাচ্চি, বলিয়া নির্ম্মল আহারে মনোনিবেশ করিল।

কর্ত্তা কহিলেন, নির্ম্মলকে দিয়ে আমার জন্যে একটু দুধ এনে দাও, শরীরটা ভালো নেই, দই আর খাবো না।

গৃহিণী প্রস্থান করিলে রায় মহাশয় বলিলেন, অন্ধকার দুর্য্যোগের রাত্রে সে তোমাকে হাত ধরে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল, তার জন্যে শুধু তুমি কেন বাবা, আমরা পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞ; যে উপকার করে, তার অপকার করতে মন চায় না, কিন্তু এ ত আমাদের নিজেদের কথা নয় নির্ম্মল, এ গ্রামের কথা, সমাজের কথা, দেব-দেবতার কথা, সুতরাং যা বড় কর্ত্তব্য তা আমাকে করতেই হবে।

সে রাত্রের ঘটনা যে অপ্রকাশ নাই তাহা সে শুনিয়াছিল, অথচ নিজে গোপন করিয়াছিল বলিয়া লজ্জিত-মুখে চুপ করিয়া রহিল।

কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন, দেব-দেবীরা ত কথা ক'ন না, কিন্তু তাঁরা শোধ নেন। গ্রামের ভালো যে কখনো হয়নি, উত্তরোত্তর অবনতি হয়েই আসচে, মনে হয় এও তার একটা কারণ। প্রমাণের কথা বলেছিলে, কিন্তু তুমি যে আসচো এই বা আমরা জানলাম কি করে? তুমি সন্তানতুল্য, তোমার কাছে সব কথা খুলে বলতে আমার বাধে, কিন্তু না বললেও নয়। জমিদারবাবু সে-রাত্রে বোধ করি খেয়ে যাবার

ফুরসৎ পাননি, ষোড়শী খাবার আনতে ঘরের বাইরে যেতে তাঁর চোখ পড়ল একটা চিঠির টুকরোর 'পরে। বোধ হয় তোমাকে লিখে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে শেষে হৈমকেই লিখেছিল। সেখানাও আজ দেখতে পাবে, তিনি সকালবেলা আসবার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

নির্ম্মল ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, মিথ্যে কথা। সে নির্লজ্জ, নিজে অপরাধী, সেই মাতাল পাজী বদমাইসটার কথা আপনারা বিশ্বাস করেন? হ'তেই পারে না।

রায় মহাশয় শুধু একটু মৃদু হাসিলেন। অবিচলিত-স্বরে কহিলেন, হতে পারে, এবং হয়েছে। জমিদার লোকটা যে নির্লজ্জ, মাতাল, পাজী, বদমাইস, তাও জানি; বোধ হয় আরও ঢের বেশী, নইলে তার কলঙ্কের কথাটা মুখে আনতেও পারত না। ওর নিষ্ঠুরতার অবধি নেই। গ্রামের মঙ্গলের জন্য ও এ-কাজে হাত দেয়নি, ঠাকুর-দেবতা ও মানে না। জোর করে মন্দিরে খাসি বলি দিয়ে খেয়েছিল। আবশ্যক হলে ও-পারও মুরগী, শূয়োর, এমন কি গো-বধ করেও খেতে পারে।

তবুও তাঁকে আপনি সাহায্য করতে চান?

না, আমি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাই।

নির্ম্মল অনেকক্ষণ স্থির থাকিয়া কহিল, আপনার কাঁটা উঠবে কি না জানিনে, কিন্তু সে নিষ্কণ্টক হবে। দেবীর যে সম্পত্তিটা সে বিক্রি করতে চায়, ষোড়শী ভৈরবী থাকতে তার সুবিধে হবে না।

রায় মহাশয় কহিলেন, সে গেলেও সুবিধে হবে না—আমি আছি।

তিনি আছেন এতবড় ঘটনাটা নির্ম্মল বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহার তৎক্ষণাৎ মনে হইল, জমিদারের সুবিধা না হইতে পারে, কিন্তু দেবীরও সুবিধা হইবে না। তবে সে সুবিধাটা যে কাহার হইবে তাহাও মুখ দিয়া বাহির করিল না।

রায় মহাশয় স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, বাবা নির্ম্মল, তুমি বড় আইন-ব্যবসায়ী, অনেক বোঝ, কিন্তু সংসারে এসে খালি-হাতে আমাকে যখন লড়াই শুরু করতে হয়েছিল, তখন শুধু কেবল বিষয়-সম্পত্তি জমা করেই কাটাইনি, মাথার ভেতরেও কিছু কিছু সঞ্চয় করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তোমাকে লোকে বলচে ওই জমিটুকুর ওপরেই জমিদারের লোভ—ষোড়শী কড়া মেয়ে, ও থাকতে কিছু হবার নয়, তাই নিজেদের কলঙ্কটা রটিয়ে তাকে তাড়াতে চায়। আচ্ছা বাবাজী, বীজগাঁর জমিদারের কাছে ওটুকু কতটুকু সম্পত্তি? তার টাকার দরকার, একটা না হলে আর একটা বিক্রি করবে, আটকাবে না; কিন্তু যেখানে তার সত্যিকার আটকেচে, সে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। এই জঙ্গলের মাঝে মাসের পর মাস সে থাকতে পারে না, সহরের মানুষ সহরে যেতে চায়। নির্ম্মল, হৈমর মত তুমিও আমার ছেলে, তোমাকে বলতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু ওই ছুঁড়িটার ভালই যদি করতে চাও ত বলে দিয়ো, তার জন্য

নেই। চণ্ডীগড়ের ভৈরবীগিরির মুনাফা বেশী নয়—যা তার যাবে, জমিদার তার চতুর্গুণ পুষিয়ে দেবে, এ আমি শপথ করে বলতে পারি। সে তাকে কষ্ট দিতেও চায় না—কষ্ট দেবেও না, দু-নৌকায় পা দিয়ে থাকবার অসম্ভব লোভটা যদি সে একবার ত্যাগ করে।

নির্মল নিরুত্তরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শ্বশুরকে সে অনেকটা জানিত,—এতটা জানিত না। এই শ্বশুর ষোড়শীর কল্যাণের পথ যাহা নির্দেশ করিয়া দিলেন, তাহাতে তর্ক করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত আর তাহার রহিল না।

শাশুড়ীর দুধ গরম করিয়া আনিতে বিলম্ব হইল, তিনি ঘরে ঢুকিয়া স্বামীর পাতের কাছে বাটি নামাইয়া রাখিয়া আহারের স্বল্পতার জন্য জামাতাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন, এবং এই ত্রুটি সংশোধন করিবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া অদূরে উপবেশন করিলেন।

কর্তা দুধের বাটি হইতে মুখ নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, কিন্তু মেয়েটার একটা প্রশংসা না করে পারা যায় না—বেটি বিদ্যের যেন সরস্বতী। জানে না এমন শাস্ত্রই নেই।

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কহিলেন, তা আর বলতে। দেখেচ ত কাজ-কর্ম্মে সে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার শিরোমণিঠাকুর ভয়ে যেন কেঁচো হয়ে যান। চলে গেলে বুড়োর মুখ সহস্রধারে ফোটে, কিন্তু সুমুখে নিন্দে করবার ভরসা পান না।

কর্তা কহিলেন, না না, নিন্দে করবেন কেন, তিনি বরঞ্চ সুখ্যাতিই করেন।

গৃহিণী নাকের মস্ত নথে একটা নাড়া দিয়া ততখানিই প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন, হাঁ, বুড়ো সেই পাত্র কি না! হিংসেয় ফেটে মরেন, আবার সুখ্যাতি করবেন! মনে নেই, সেই অম্বর বোনের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিয়ে কি কাণ্ডই না দিন-কতক করে বেড়ালেন! তা ছাড়া, ছুঁড়ি এদিকে যাই করে থাক্‌, শোকে, দুঃখে, আপদে-বিপদে, গরীব-দুঃখীর এমন মা-বাপও গ্রামে কেউ নেই। যখনি যে কাজেই ডাকো, মুখে হাসিটি যেন লেগে আছে, না বলতে জানে না।

কর্তা খুশী হইলেন না, বলিলেন, হুঁ, সব ভৈরবীই ও-সব করে থাকে।

গৃহিণী বলিলেন, সব? কেন, মাতঙ্গিনীঠাকরুণকে কি আমি চোখে দেখিনি না-কি?

দেখে থাকলেও ভুলে গেছো।

গৃহিণী রাগ করিয়া জবাব দিলেন, ভুলিনি কিছুই। আজও তাঁর কাছে একশ টাকা পাই—না বলে উড়িয়ে দিলেন। ষোড়শী কখনো কাউকে ঠকিয়ে খায়নি, মিছে কথাও বলেনি।

কর্ত্তা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া কহিলেন, না—যুধিষ্ঠির। এই বলিয়া তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহিণী জামাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি ত ভাবি এর কল্যাণেই নাতির মুখ আমরা দেখতে পেলাম। না বাবা, যে যাই বলুক, ঠক্-জোচ্চর সে মেয়ে নয়। তাইতে যখন শুনতে পেলাম ঠাকুরের পূজো করাটি সে ছেড়ে দিয়েচে তখনি সন্দেহ হ'লো এ আবার কি! নইলে কারও কথায় আমি সহজে বিশ্বাস করিনি।

কর্ত্তা চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইয়াছিলেন, কান খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, বলি তার কল্যাণে ত নাতি পেলে, কিন্তু নাতির কল্যাণে মানস পূজোটি তিনি কেন অস্বীকার করলেন একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারো না? এই বলিয়া তিনি প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

নির্ম্মলের খাওয়া শেষ হইয়াছিল, সেও উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, ষোড়শীর ওপর থেকে দেখচি মায়ের ভক্তি আজও একবারে যায়নি।

না বাবা, মিছে কথা কেন বলব, তার মুখখানি মনে হলেই আমার যেন কান্না পায়। এরা সকলে মিলে কেন যে তার বিপক্ষে এত লেগেচেন আমি ভেবে পাইনে।

নির্ম্মল একটুখানি মৃদু হাসিয়া কর্ত্তার খোঁচার অনুসরণ করিয়া কহিল, কিন্তু মা, তার মন্ত্র-তন্ত্রের বিত্তের কথাটাও একটু ভেবো—

শাশুড়ী কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, দাসী আসিয়া দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া কহিল, কে একজন জামাইবাবুকে ডাকতে এসেচে—বাবু খবর দিতে বললেন।

নির্ম্মল হাত-মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল ইতিমধ্যে গ্রামের অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং সন্ধ্যার পরে মন্দিরে যে বৈঠক বসিবে তাহারই আলোচনা শুরু হইয়া গেছে। শিরোমণি মহাশয়ের আজ অমাবস্যার উপবাস, তিনি নির্ম্মলকে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং বাবাজীকে হঠাৎ চিনিতে পারেন নাই বলিয়া নিজের বৃদ্ধত্বের প্রতি দোষারোপ করিলেন। যে লোকটা থামের পাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে নমস্কার করিয়া জানাইল যে, ভৈরবীঠাকরুণ অপেক্ষা করিয়া আছেন, তাঁহার সহিত বিশেষ কথা আছে।

নির্ম্মলের হঠাৎ অত্যন্ত লজ্জা করিয়া উঠিল। সে পিছনে না চাহিয়াও স্পষ্ট অনুভব করিল, সকলে উৎসুক কৌতুকে তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইহার অভ্যন্তরে যে গোপন বিদ্রূপ আছে, তাহা তাহাকে অপমানিত করিল, অন্য সময় হয়ত সে ইহাকে অত্যন্ত সহজে অবহেলা করিতে পারিত, কিন্তু

আজ সে নিজের মধ্যে জোর খুঁজিয়া পাইল না, কিছুতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না, চল, আমি যাচ্ছি। বরঞ্চ, যেন লজ্জিত হইয়াই লোকটাকে বলিয়া ফেলিল, বল গে, আমার এখন যাবার সুবিধে হবে না।

শিরোমণি গায়ে পড়িয়া কহিলেন, ওকে জিরোবার একটু সময় দাও তোমরা—কি বল হে? এই বলিয়া তিনি চোখের একটা ইসারা করিয়া অকারণে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কেহ-বা সে হাসিতে প্রকাশ্যে যোগ দিল, কেহ-বা শুধু একটু মুচকিয়া হাসিল।

নির্ম্মল সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া ভিতরে যাইতেছিল, শিরোমণি ডাকিয়া কহিলেন, বলি, বাবাজীকে কি ও বেটি কৌঁসুলি খাড়া করেচে না কি?

নির্ম্মল উদ্দীপ্ত ক্রোধ দমন করিয়া শান্তভাবে কহিল, মোকদ্দমা বাধলে সে কাজ করতে হবে বোধ হয়।

শিরোমণি এ উত্তরের আশা করেন নাই, একটু থতমত খাইয়া বলিলেন, তা যেন করলে, কিন্তু বলে রাখি বাবাজী, এ পুঁটি মাছের প্রাণ নয়, বাঘ-ভালুকের সঙ্গে লড়াই—মোকদ্দমা হাইকোর্টে না গড়িয়ে থামবে না, তা নিশ্চয় জেনো।

নির্ম্মল কহিল, মামলা-মোকদ্দমা কোথায় গিয়ে থামে এ ত আমার জানবার কথা শিরোমণিমশায়।

শিরোমণি কহিলেন, সে ত বটেই, এ হ'লো তোমার ব্যবসা, তুমি আর জানবে না! কিন্তু তারও ত ঢের খরচপত্র আছে, সে দেবে কে? এই বলিয়া তিনি মুখ টিপিয়া হাসিলেন; কিন্তু এ হাসিতে এবার কেহ যোগ দিল না।

নির্ম্মল কহিল, অভাব হ'লে আমি দেব।

তাহার জবাব শুনিয়া শুধু শিরোমণি নয়, উপস্থিত সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন। রায় মহাশয় নিজেও ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না; রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন, তোমাদের ঠাট্টা-তামাসার সম্পর্ক নয় নির্ম্মল, বিশেষতঃ শিরোমণিমশাই প্রাচীন এবং সম্মানিত ব্যক্তি—উপহাস করা তোমার সাজে না।

নির্ম্মল চুপ করিয়া রহিল; শিরোমণি সামলাইয়া লইয়া একটু হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিলেন, টাকা ত দেবে, কিন্তু দেবার গরজটা কি একটু শুনতে পাইনে?

নির্ম্মল বলিল, আমার গরজ শুধু আপনাদের অন্যায় অত্যাচার। আমি যেখানে থাকি সেখানে যদি একবার খোঁজ নেন ত শুনতে পাবেন জীবনে অনেক গরজই আমি মাথায় তুলে নিয়েচি।

যে লোকটা ডাকিতে আসিয়াছিল, সে তখনও যায় নাই; কহিল, আপনার কখন যাবার সুবিধে হবে তাঁকে জানাবো?

আমায় সংবাদ দিলে আমি দেখা করব ব'লো। এই বলিয়া সে বাটীর ভিতর প্রস্থান করিল।

সায়াহ্নবেলায় জনার্দন রায় প্রস্তুত হইয়া আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিয়া কহিলেন, মন্দিরে সকলে উপস্থিত হয়েচেন, তোমাকে তাঁরা ডাকতে পাঠিয়েচেন, যদি যাও ত আর বিলম্ব ক'রো না।

নির্ম্মল বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার যাওয়া কি আপনি প্রয়োজন মনে করেন?

জনার্দন কহিলেন, যাঁরা ডাকতে পাঠিয়েচেন, তাঁরা নিশ্চয়ই করেন, এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

সন্ধ্যায় অব্যবহিত পরেই দেবীর আরতি শুরু হইল। মাতার বহুবিধ গৌরবের বস্তুই কালক্রমে বিরল হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাঁহার শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, ঢাক, ঢোল, সানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রীর সংখ্যা প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি তেমনি বজায় আছে। সেই সম্মিলিত তুমুল বাদ্যনিনাদ নির্ম্মল ঘরে বসিয়াই শুনিতে পাইল। কথা ছিল, আরতি শেষ হইলে পঞ্চায়েত বসিবে, অতএব সেই সুপবিত্র ধ্বনি থামিবার পর সে গৃহ হইতে যাত্রা করিল। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিল আলোর বন্দোবস্ত বিশেষ কিছু নাই, প্রাঙ্গণ-মধ্যস্থিত নাট-মন্দিরে গোটা দুই লণ্ঠন মাঝখানে রাখিয়া একটা কোলাহল উঠিয়াছে এবং তাহাই বহুলোক ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে। সেই অন্ধকারে নির্ম্মলকে কেহ চিনিল না, সে জন-দুই লোকের কাঁধের উপর উঁকি মারিয়া দেখিল তথায় কে একজন বাবু-গোছের ভদ্রলোক হাত-মুখ নাড়িয়া কি-সব বলিতেছেন। কিছুই শোনা গেল না, কিন্তু মানুষের আগ্রহ দেখিয়া এ-কথা বুঝা গেল তিনি অত্যন্ত শ্রুতিমধুর কাহারও নিন্দা ও গ্লানি করিতেছেন। এই ব্যক্তিই যে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী তাহা সে আন্দাজ করিল, অতএব বক্তব্য বস্তু যে ষোড়শীর জীবন-চরিত তাহাতেও সন্দেহ রহিল না। ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতে যদিচ তাহার প্রবৃত্তি হইল না, কিন্তু দুই আঙুলে ভর দিয়া উদ্গ্রীব হইয়া দাঁড়াইল। কয়েক মুহূর্ত্তেই মনে লাগিয়া গেল, তখনও জীবানন্দ চৌধুরী আসল বস্তুতে অবতীর্ণ হন নাই, ষোড়শীর মায়ের ইতিবৃত্তেরই আখ্যান চলিতেছিল, অবশ্য সমস্তই শোনা কথা। সাক্ষী তারাদাস অদূরে বসিয়া—এইসকল অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোকদিগের সংস্রবে কিরূপে পীঠস্থান ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অপবিত্র হইয়া উঠিতেছে এবং সমস্ত দেশের কল্যাণ তিরোহিত হইতেছে—

পিছনে পিঠের উপর একটু চাপ পড়িতে ফিরিয়া দেখিল কে একজন অন্ধকারে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে তাহাকে বাহিরের দিকে ইসারা করিল এবং তাহাকেই অনুসরণ

করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইতে নির্ম্মল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল এই সুগঠিত দীর্ঘ ঋজু দেহ ষোড়শী ভিন্ন আর কাহারও নহে! সে দ্বারের বাহিরে আসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং ঈষৎ একটু হাসিয়া অনুযোগের কণ্ঠে কহিল, কি দাঁড়িয়ে যা তা শুনচেন! কতকগুলো কাপুরুষ মিলে দু'জন অসহায় স্ত্রীলোকের কুৎসা রটনা করচে—তাও আবার একজন মৃত, আর একজন অনুপস্থিত। চলুন আমার ঘরে, সেখানে ফকির সাহেব বসে আছেন, আপনাকে পরিচিত ক'রে দিই গে।

তিনি কবে এলেন?

কি জানি! বিকেলবেলা ফিরে গিয়ে দেখি আমার ঘরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। আনন্দ আর রাখতে পারলাম না, প্রণাম করে নিয়ে গিয়ে আমার ঘরে বসালাম, সমস্ত ইতিহাস মন দিয়ে শুনলেন।

শুনে কি বললেন?

শুধু একটু হাসলেন। বোধ হলো যেন সমস্তই জানতেন। কিন্তু হাঁ নির্ম্মল-বাবু, আপনি না কি বলেচেন আমার মামলা-মোকদ্দমার সমস্ত ভার নেবেন? একি সত্যি?

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ সত্যি।

কিন্তু কেন নেবেন?

নির্ম্মল একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বোধ করি আপনার প্রতি অন্যায়-অত্যাচার হচ্চে বলেই।

কিন্তু আর কিছু বোধ করেন না ত? বলিয়াই ষোড়শী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, থাক্ সব কথার যে জবাব দিতেই হবে এমন কিছু শাস্ত্রের অনুশাসন নেই। বিশেষ করে কূট-কচালে শাস্ত্রের—না? আসুন, আমার ঘরে আসুন।

তাহার কুটিরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ফকিরসাহেব নাই। কহিল, কোথায় গেছেন, বোধ হয় এখনি ফিরে আসবেন। প্রদীপ স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল, উজ্জ্বল করিয়া দিয়া পাতা আসনখানি দেখাইয়া দিয়া কহিল, বসুন। হাঙ্গমা, হৈ-চৈ, গণ্ড-গোলের মাঝে এমন সময় পাইনে যে, বসে দু'দণ্ড গল্প করি। আচ্ছা, মোকদ্দমার যেন সকল ভারই নিলেন, কিন্তু যদি হারি, তখন ভার কে নেবে? তখন পেছবেন না ত?

নির্ম্মল জবাব দিতে পারিল না, তাহার কান পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ পরে কহিল, হারবার কোন সম্ভাবনা আমাদের নেই।

তা বটে। বলিয়া একবার একটুখানি যেন ষোড়শী বিমনা হইয়া পড়িল, কিন্তু পলকমাত্র। সহসা চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ছেলে কেমন আছে নির্ম্মলবাবু? কি করে তাকে ছেড়ে এলেন বলুন ত? আমি ত পারিনে।

অকস্মাৎ এই অসংলগ্ন প্রশ্নে নির্ম্মল আশ্চর্য্য হইল। ষোড়শী একবার এ-দিকে

একবার ও-দিকে বার দুই-তিন মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে বলিল, আমি কিন্তু হৈম হলে এই সমস্ত পরোপকার করা আপনার ঘুচিয়ে দিতাম। অত ভালমানুষ নই—আমার কাছে ফাঁকি চলত না—রাত্রি-দিন চোখে চোখে রাখতাম।

ইঙ্গিত এত সুস্পষ্ট যে নির্ম্মলের বুকের মধ্যেটা বিস্ময়ে, ভয়ে ও আনন্দে একই সঙ্গে ও একই কালে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। এবং সেই অসংবৃত অবসরে মুখ দিয়া তাহার বাহির হইয়া গেল, চোখে চোখে রাখলেই কি রাখা যায় ষোড়শী? এর বাঁধন যেখানে শুরু হয়, চোখের দৃষ্টি যে সেখানে পৌঁছায় না, এ-কথা কি আজও জানতে তুমি পারোনি?

পেরেচি বই কি, বলিয়া ষোড়শী হাসিল। বাহিরে হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, এই যে ইনি এসেচেন।

কে? ফকিরসাহেব?

না, জমিদারবাবু। বলে পাঠিয়েছিলাম সভা ভাঙলে যাবার পথে আমার কুঁড়েতে একবার একটু পদধূলি দিতে। তাই দিতেই বোধ হয় আসচেন। সঙ্গে লোকজন বিস্তর, স্ত্রীলোকের ঘরে একাকী আসতে বোধ করি সাধুপুরুষের ভরসায় কুলোয়নি। পাছে দুর্নাম হয়। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ব্যাপারটা নির্ম্মলের একেবারে ভাল লাগিল না। সে বিরক্ত ও সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া বলিল, এ-কথা আমাকে আপনি বলেননি কেন?

বেশ! একবার তুমি একবার আপনি? বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, ভয় নেই, উনি ভারি ভদ্রলোক, লড়াই করেন না। তা ছাড়া, আপনাদের ত পরিচয় নেই—সেটাও একটা লাভ। বলিয়া সে দ্বারের বাহিরে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, আসুন—আমার কুঁড়ে আর একবার পবিত্র ক'রে।

জীবানন্দ চৌকাঠে পা দিয়া থমকিয়া দাঁড়াই। ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, ইনি? নির্ম্মলবাবু বোধ হয়?

ষোড়শী হাসিমুখে জবাব দিল, হাঁ, আপনার বন্ধু বলে পরিচয় দিলে খুব সম্ভব অতিশয়োক্তি হবে না।

অনুমান যে ভুল নয়, লোকটি যে সত্য-সত্যই নির্ম্মল বসু তাহা বুঝিতে পারিয়া জীবানন্দ প্রথমে চমকিত হইল, কিন্তু যে কোন অবস্থায় নিজেকে মুহূর্ত্তে সামলাইয়া লইবার শক্তি তাহার অদ্ভুত। সে সামান্য একটু হাসিয়া বলিল, বিলক্ষণ! বন্ধু নয় ত কি? ওঁদের কৃপাতেই ত টিকে আছি, নইলে আমার জমিদারী পাওয়া পর্য্যন্ত যে সব কীর্ত্তি করা গেছে, তাতে চণ্ডীগড়ের শান্তিকুঞ্জের বদলে ত এতদিন আন্দামানের শ্রীঘরে গিয়ে বসবাস করতে হ'তো।

নির্ম্মলের গোড়া হইতেই ভাল লাগে নাই, কিন্তু নিজের দুষ্কৃতির এই লজ্জাহীন অনাবৃত রসিকতার চেষ্টায় তাহার গা জ্বলিয়া গেল। মুখ লাল করিয়া কি একটা বলিতেও চাহিল, কিন্তু বলিতে হইল না। ষোড়শী জবাব দিল, কহিল, চৌধুরীমশায়, উকিল-ব্যারিস্টার বড়লোক বলে বাহবাটা কি একা ওরাই পাবেন? আন্দামান প্রভৃতি বড় ব্যাপার না হোক, কিন্তু ছোট বলে এ দেশের শ্রীঘরগুলোও ত মনোরম স্থান নয়—দুঃখী বলে ভৈরবীরা কি একটু ধন্যবাদ পেতে পারে না?

জীবানন্দ অপ্রস্তুত হইয়া হঠাৎ যাহা মুখে আসিল কহিল। বলিল, ধন্যবাদ পাবার সময় হলেই পাবে।

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, এঁ যেমন মন্দিরে দাঁড়িয়ে এইমাত্র এক-দফা দিয়ে এলেন।

জীবানন্দ ইহার কোন জবাব দিল না। নির্ম্মলের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনার শ্বশুরমশায়ের মুখে শুনলাম আপনি আসছেন—আশা করেছিলাম মন্দিরে আলাপ হবে।

ষোড়শী বলিল, সে আমার দোষ চৌধুরীমশায়। উনি এসেওছিলেন এবং সদালাপে যোগ না দিন, ভিড়ের বাইরে দাড়িয়ে গলা বাড়িয়ে শোনবার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু আমি দেখতে পেয়ে হাত-ধরে টেনে নিয়ে এলাম। বললাম, চলুন নির্ম্মলবাবু, ঘরে বসে বরঞ্চ দুটো গল্প-সল্প করা যাক।

জীবানন্দ মনের উত্তাপ চাপিয়া কতকটা সহজগলাতেই কহিল, তা হলে আমি এসে পড়ে ত ব্যাঘাত দিলাম।

ষোড়শী বলিল, দিয়ে থাকলেও আপনার দোষ নেই—আমিই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

জীবানন্দ কহিল, কিন্তু কেন? গল্প করতে নয় বোধ হয়?

ষোড়শী হাসিয়া ফেলিল, না গো মশায়, না—বরং ঠিক তার উল্টো।

আজ আপনাকে আমি ভারি বকবো। তাহার কণ্ঠস্বর ও কথা কহিবার ভঙ্গি দেখিয়া নির্ম্মল ও জীবানন্দ উভয়েই আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ষোড়শী হঠাৎ একটুখানি গম্ভীর হইয়া বলিল, ছি ছি, ওখানে আজ অত কি করছিলেন বলুন ত? একটা সভার আড়ম্বর করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'জন অসহায় স্ত্রীলোকের কি কুৎসাই রটনা করছিলেন! এর মধ্যে একজন আবার বেঁচে নেই। এ কি কোন পুরুষের পক্ষেই সাজে? তা ছাড়া, কি প্রয়োজন ছিল বলুন ত? সেদিন এই ঘরে বসেই ত আপনাকে বলেছিলাম, আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন আমি পালন করব। আপনিও আপনার হুকুম স্পষ্ট করে জানিয়াছিলেন, আমিও আমার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিনি। এই নিন মন্দিরের চাবি, এবং এই নিন হিসাবের খাতা। এই বলিয়া সে অঞ্চল হইতে চাবির গোছা খুলিয়া এবং তাকের উপর হইতে একখানা খেরো-বাঁধানো মোটা খাতা পাড়িয়া জীবানন্দর পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া কহিল, মায়ের যা কিছু অলঙ্কার, যত কিছু দলিল-পত্র সিন্দুকের ভিতরই পাবেন, এবং আরও এক-খানা কাগজ পাবেন যাতে ভৈরবীর সকল দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ত্যাগ করে আমি সই করে দিয়েচি।

জীবানন্দ বোধ করি ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, কহিল, বল কি। কিন্তু ত্যাগ করলে কার কাছে?

ষোড়শী বলিল, তাতেই লেখা আছে দেখতে পাবেন।

তাই যদি হয় ত, এই চাবিগুলো তাঁকেই দিলে না কেন?

তাঁকেই যে দিলাম। বলিয়া ষোড়শী মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। কিন্তু সেই হাসি দেখিয়া এইবার জীবানন্দের মুখ মলিন হইয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু এ ত আমি নিতে পারিনে। খাতায় লেখা নামগুলোর সঙ্গে যে সিন্দুকে রাখা জিনিসগুলোও এক হবে, সে আমি কি করে বিশ্বাস করব? তোমার আবশ্যক থাকে তুমি পাঁচজনের কাছে বুঝিয়ে দিয়ো।

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমার সে আবশ্যক নেই। কিন্তু চৌধুরীমশায়, আপনার এ অজুহাতও অচল। একদিন চোখ বুজে যার হাত থেকে বিষ নিয়ে খাবার ভরসা হয়েছিল, তার হাত থেকে আজ এটুকু চোখ বুজে নেবার সাহস হওয়া আপনার উচিত। অপরকে বিশ্বাস করবার শক্তি আপনার সত্যসত্যই এত কম, এ কথা আমি কোনমতে স্বীকার করতে পারিনে। নিন ধরুন, বলিয়া সে খাতা এবং চাবির গোছা মাটি হইতে তুলিয়া একরকল জোর করিয়া জীবানন্দের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, আজ আমি বাঁচলাম। আমার কোন ভারই ত কোনদিন নেননি, এইটুকু না নিলে যে ধর্ম্মে পতিত হবেন! তা ছাড়া, পরকালে জবাব দেবেন কি? বলিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, পরকালের চিন্তায় ত আপনার ঘুম হয় না,

সে আমি জানি, কিন্তু যা হয়ে গেছে, তা গেছে, ভবিষ্যতে ত কিছু কিছু চিন্তা করতে হবে, তা বলে দিচ্চি। তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও কণ্ঠস্বর যেন ইহার শেষ দিকে কোমলতায় বিগলিত হইয়া উঠিল। কহিল, আর একটি মাত্র ভার আপনাকে দিয়ে যাবো, সে আমার গরীব দুঃখী প্রজাদের ভার। আমি শত ইচ্ছে করেও তাদের ভাল করতে পারিনি, কিন্তু আপনি অনায়াসে পারবেন। নির্ম্মলের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমার কথাবার্ত্তা শুনে আপনি আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন, না নির্ম্মলবাবু?

নির্ম্মল মাথা নাড়িয়া বলিল, শুধু আশ্চর্য্য নয়, আমি প্রায় অভিভূত হয়ে পড়েচি। ভৈরবীর আসন ত্যাগ করে যে আপনি ইতিমধ্যে ছাড়পত্র পর্য্যন্ত সই ক'রে রেখেচেন, এ খবর ত আমাকে ঘুণাগ্রে জানাননি?

ষোড়শী হাসিমুখে কহিল, আমার অনেক কথাই আপনাকে জানানো হয়নি, কিন্তু একদিন হয়ত সমস্তই জানতে পাববেন। কেবল একটিমাত্র মানুষ সংসারে আছেন যাঁকে সকল কথাই জানিয়েচি, সে আমার ফকিরসাহেব।

এ-সকল পরামর্শ বোধ করি তিনিই দিয়েচেন?

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, না, তিনি আজ সকাল পর্য্যন্ত কিছুই জানতেন না, এবং ওই যাকে ছাড়পত্র বলচেন সে আমার কাল রাত্রের রচনা। যিনি এ-কাজে আমাকে প্রবৃত্তি দিয়েচেন, শুধু তাঁর নামটিই আমি সংসারে সকলের কাছে গোপন রাখবো।

জীবানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, মনে হচ্ছে যেন বাড়িতে ডেকে এনে আমার সঙ্গে কি একটা প্রকাণ্ড তামাসা করচ ষোড়শী। এ বিশ্বাস করা যেন সেই মরফিয়া খাওয়ার চেযে শক্ত ঠেকচে।

এতক্ষণ পরে নির্ম্মল তাহার পানে চাহিয়া একটু হাসিল, কহিল, আপনি ত তবু এই কয়েক পা মাত্র হেঁটে এসে তামাসা দেখচেন, কিন্তু আমাকে কাজকর্ম্ম বাড়ি-ঘর ফেলে রেখে এই তামাসা দেখতে আটশ মাইল ছুটে আসতে হয়েচে। এ যদি সত্য হয়, আপনি যা চেয়েছিলেন অন্ততঃ সেটা পেয়ে গেলেন, কিন্তু আমার ভাগ্যে ষোলআনাই লোকসান। একে তামাসা বলব কি উপহাস বলব ভেবেই পাচ্চিনে। বলিয়া সে লোকটার মুখের প্রতি আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়াই দেখিতে পাইল, তাহার দুই চক্ষু আকস্মিক বেদনার ভারে যেন ভারাক্রান্ত। সে জবাব কিছুই দিল না, শুধু একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল।

নির্ম্মল ষোড়শীকে প্রশ্ন করিল, এ-সকল ত আপনার পরিহাস নয়?

ষোড়শী বলিল, না নির্ম্মলবাবু, আমার এবং আমার মায়ের কুৎসায় দেশ ছেয়ে গেল, এই কি আমার হাসি-তামাসার সময়? আমি সত্য সত্যই অবসর নিলাম।

নির্ম্মল কহিল, তা হলে বড় দুঃখে পড়েই এ-কাজ আপনাকে করতে হ'লো।

ষোড়শী উত্তর দিল না। নির্ম্মল নিজেও একটু স্থির থাকিয়া বলিল, আমি আপনাকে বাঁচাতে এসেছিলাম, বাঁচাতেও হয়ত পারতাম, তবু কেন যে হ'তে দিলেন না তা আমি বুঝেচি। বিষয় রক্ষা হ'তো, কিন্তু কুৎসার ঢেউ তাতে তেমনি উত্তাল হয়ে উঠত, এবং সে থামাবার সাধ্য আমার ছিল না। বলিয়া সে যে কাহাকে কটাক্ষ করিল তাহা উপস্থিত সকলেই বুঝিল। কিন্তু জীবানন্দ নীরব হইয়া রহিল, এবং ষোড়শী নিজেও ইহার কোন প্রতিবাদ করিল না।

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, এখন তা হলে কি করবেন স্থির করেচেন ?

ষোড়শী বলিল, সে আপনাকে আমি পরে জানাবো।

কোথায় থাকবেন ?

এ সংবাদও আপনাকে আমি পরে দেবো।

বাহির হইতে সাড়া আসিল, মা! ষোড়শী গলা বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, ভূতনাথ ? আয় বাবা, ঘরে নিয়ে আয়। মন্দিরের ভৃত্য আজ একটা বড় ঝুড়ি ভরিয়া দেবীর প্রসাদ, নানাবিধ ফলমূল ও মিষ্টান্ন আনিয়াছিল। ষোড়শী হাতে লইয়া জীবানন্দের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্নিগ্ধ হাসিমুখে কহিল, সেদিন আপনাকে পেট-ভরে খেতে দিতে পারিনি, কিন্তু আজ সে ত্রুটি সংশোধন করে তবে ছাড়ব। নির্ম্মলের প্রতি চাহিয়া বলিল, আর আপনি ত ভগিনীপতি, কুটুম্ব—আপনাকে শুধু শুধু যেতে দিলে ত অন্যায় হবে। অনেক তিক্ত-কটু আলোচনা হয়ে গেছে, এখন বসুন দিকি দু'জনে খেতে। মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছেড়ে দিলে আমার ক্ষোভের সীমা থাকবে না।

নির্ম্মল কহিল, দিন। কিন্তু জীবানন্দ অস্বীকার করিয়া বলিল, আমি খেতে পারব না।

পারবেন না ? কিন্তু পারতেই যে হবে।

জীবানন্দ তথাপি মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, মিথ্যে মাথা নাড়া চৌধুরীমশায়। যে সুযোগ জীবনে আর কখনো পাবো না, তা যদি হাতে পেয়ে ছেড়ে দিই ত মিছেই এতকাল ভৈরবী-গিরি করে এলাম। বলিয়া সে জল-হাতে উভয়েরই সম্মুখের স্থানটা মুছিয়া লইয়া শালপাতা পাতিয়া মিষ্টান্ন পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে বসিল।

মিষ্টান্ন যে আজ যথার্থ-ই জীবানন্দের গলায় বাধিতেছিল, ইহা লক্ষ্য করিতে ষোড়শীর বিলম্ব হইল না। সে গলা খাটো করিয়া কহিল, তবে থাক, এগুলো আর আপনার খেয়ে কাজ নেই, আপনি শুধু দুটো ফল খান। বলিয়া নিজেই হাত বাড়াইয়া তাঁহার পাতার একধারে উচ্ছিষ্ট খাবারগুলা সরাইয়া দিয়া বলিল, কি হ'লো আজ ? সত্যিই খিদে নেই না-কি ? না থাকে ত জোর করে খাবার দরকার

নেই। দেহের মধ্যে যে অসুখের সৃষ্টি করে রেখেচেন, সে মনে হলেও আমার ভয় হয়।

নির্ম্মল একমনে খাইতেছিল, সে মুখ তুলিয়া চাহিল। এই কণ্ঠস্বরের অনির্ব্বচনীয়ত' খট্ করিয়া তাহার কানে বাজিয়া অকারণে বহুদূরবর্ত্তী হৈমকে তাহার স্মরণ করাইয়া দিল। দু'জনের অনেক হাস্য-পরিহাসের বিনিময় হইয়া গেছে, আজ সকালেও এই যোড়শীর কথায় ও ইঙ্গিতে সর্ব্বশরীরে তাহার পুলকের বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেছে কিন্তু এ গলা ত সে নয়! মাধুর্য্যের এরূপ নিবিড় রসধারা ত তাহাতে ঝরে নাই! মিষ্টান্নের মিষ্ট তাহার মুখে বিস্বাদ এবং ফলের রস তিতা লাগিয়া আহারের সমস্ত আনন্দ যেন মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইয়া গেল। খানিক পর লক্ষ্য করিয়া যোড়শী সবিস্ময়ে কহিল, আপনারও যে ওই দশা হলো নির্ম্মলবাবু, খেলেন কই?

নির্ম্মল বলিল, যা খেতে পারি তা আপনার বলবার আগেই খেয়েচি, অনুরোধের অপেক্ষা করিনি।

-খাবারগুলো আজ বুঝি তা হলে ভাল দেয়নি?

তা হবে। অন্যদিন কেমন দেয় সে ত জানি নে। বলিয়া সে হাত ধুইবার উপক্রম করিল। এ-বিষয়ে তাহার কৌতূহলের একান্ত অভাব শুধু যোড়শীর নয়, জীবানন্দেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; কিন্তু এ লইয়া কেহ আর আলোচনা তুলিল না। বাহিরে আসিয়া যোড়শী মুখ-হাত ধুইবার জল দিয়া এবং সাজা পান হাতে দিয়া তাহা ঠিক আছে কিনা দেখিয়া লইতে অনুরোধ করিল, কিন্তু নিজের বা তাহার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিল না।

নির্ম্মল কহিল, আমি এখন তা হলে যাই—

আপনি বাড়ি ফিরবেন কবে?

আমার আর ত কোন প্রয়োজন নেই, হয়ত কালই ফিরতে পারি।

ছেলেকে, হৈমকে আমার আশীর্ব্বাদ দেবেন।

নির্ম্মল একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমাকে আর বোধ হয় কোন আবশ্যক নেই?

যোড়শী নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, এতবড় অহঙ্কারের কথা কি আমি বলতে পারি নির্ম্মলবাবু? তবে মন্দির নিয়ে আর বোধ হয় আমার কখনো আপনাকে দুঃখ দেবার আবশ্যক হবে না।

নির্ম্মল ম্লান-মুখে হাসির প্রয়াস করিয়া কহিল, আমাদের শীঘ্র ভুলে যাবেন না আশা করি?

যোড়শী মাথা নাড়িয়া শুধু কহিল, না।

নির্ম্মল নমস্কার করিয়া কহিল, আমি চললাম। যদি সকালের গাড়িতে যাওয়া

হয় ত, আর বোধ হয় দেখা করবার সময় পাবো না। হৈম আপনাকে বড় ভালবাসে, যদি অবকাশ পান মাঝে মাঝে একটা খবর দেবেন। বলিয়া সে আর কোন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল। প্রবঞ্চিতের লজ্জা ও জ্বালা অত্যন্ত সঙ্গোপনে তাহার বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, এবং বিফল-মনোরথ মাতাল যেমন করিয়া তাহার মদের দোকানের রুদ্ধ দুয়ার হইতে ফিরিবার পথে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে থাকে, তেমনি করিয়া সে সমস্ত পথটা মনে মনে বলিতে লাগিল, আমি বাঁচিয়া গেলাম। স্বেচ্ছাচারিণীর মোহের বেষ্টন হইতে বাহির হইতে পারিয়া আমার হৈমকে আবার ফিরিয়া পাইলাম। কথাগুলো কেবলমাত্র বারংবার আবৃত্তি করিয়াই সে তাহার পীড়িত, আহত হৃদয়ের কাছে যেন সপ্রমাণ করিতে চাহিল যে, এ ভালই হইল যে ষোড়শীর গৃহের দ্বার তাহার মুখের উপর চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া গেল।

মিনিট দুই-তিন পরে জীবানন্দ বাহিরে আসিয়া দেখিল, অন্ধকারে একটা খুঁটি ঠেস দিয়া ষোড়শী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, নির্মলবাবু কি চলে গেলেন?

এ-প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন ছিল না, ষোড়শী তেমনি চুপ করিয়াই রহিল।

জীবানন্দ কহিল, ভদ্রলোকটিকে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ষোড়শী পথের দিকে চাহিয়া ছিল, সেইদিকেই চক্ষু রাখিয়া বলিল, তাতে আপনার ক্ষতি কি?

আমার ক্ষতি? না, তা বোধ করি কিছু নেই, কিন্তু তোমার ত থাকতে পারে? তুমি কি তাঁকে বুঝতে পেরেচ?

ষোড়শী কহিল, আমার যতটুকু দরকার তা পেরেচি বই কি?

তা হলে ভাল। বলিয়া সে ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া যেন নিজের মনেই কহিল, তাঁকে মনে রাখবার জন্যে কি-রকম ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়ে গেলেন, দরখাস্ত মঞ্জুর করলে ত? বলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে সেই অন্ধকারেও দু'জনের চোখে চোখ মিলিল।

ষোড়শী দৃষ্টি অবনত করিল না, বলিল, আমি তাঁকে যতখানি জানি, তার অর্দ্ধেকও যদি আমাকে জানবার তাঁর সময় হ'তো, এতবড় বাহুল্য আবেদন আমার কাছে তিনি মুখে উচ্চারণ করতেও পারতেন না। আমার যা-কিছু কল্পনা, যত-কিছু আনন্দের ভাবনা, সে ত কেবল তাঁদের নিয়েই। তাঁদের দেখেই ত আমি সে-ষোড়শী আর নেই। এই যে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী-পদ, যা ভাগ করে নেবার লোভে আপনাদের ছেঁড়া-ছিঁড়ির অবধি নেই, যে জন্যে কলঙ্কে দেশ আপনারা ছেয়ে দিলেন, সে যে আজ জীর্ণবস্ত্রের মত ত্যাগ করে যাচ্চি, সে শিক্ষা কোথায় পেয়েচি জানেন?

সে ওইখানে। মেয়েমানুষের কাছে এ যে কত ফাঁকি, কত মিথ্যা, সে-কথা ওঁদের দেখেই বুঝতে পেরেচি। অথচ এর বাষ্পও তিনি জানেন না, কোনদিন হয়ত জানতেও পারবেন না।

জীবানন্দ অবাক্ হইয়া চাহিয়া ছিল, সহসা সেইদিকে দৃষ্টি পড়ায় ষোড়শী নিজের উচ্ছ্বসিত আবেগে লজ্জিত হইয়া নীরব হইল। কিছুক্ষণ উভয়ের মৌন থাকার পরে জীবানন্দ ধীরে ধীরে কথা কহিল। বলিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার ভারি লজ্জা করে, কিন্তু যদি পারতাম, তুমি কি তার সত্যি জবাব দিতে পারতে অলকা?

জীবানন্দের মুখে এই অলকা নামটা ষোড়শীর সবচেয়ে বড় দুর্ব্বলতা। তিন অক্ষরের এই ছোট্ট কথাটি তাহার কোন্‌খানে যে গিয়া আঘাত করিত, সে ভাবিয়া পাইত না। বিশেষ করিয়া তাহার প্রশ্ন করার এই কৌতুককর ভঙ্গিতে ষোড়শীর হাসি পাইল; কহিল, আপনি যদি কোন একটা আশ্চর্য্য কাজ করতে পারতেন, তার পরে আমি আর কোন একটা তেমনি অদ্ভুত কাজ করতে পারতাম কিনা, এতবড় সত্য করবার শক্তি আমার নেই। কিন্তু সে কাজ করবার আপনার আবশ্যক নেই—আমি বুঝেচি। অপবাদ আপনারা দিয়েছেন বলেই তাকে সত্যি করে তুলতে হবে, তার অর্থ নেই। আমি কিছুর জন্যেই কখনো কারও আশ্রয় গ্রহণ করব না। আমার স্বামী আছেন, কোন লোভেই সে কথাটা আমি ভুলে যেতে পারব না। এই ভয়নক প্রশ্নটাই না আপনাকে লজ্জা দিচ্ছিল চৌধুরীমশায়?

তুমি আমাকে চৌধুরীমশায় বল কেন?

তবে কি বলব? হুজুর?

না, অনেকে যা বলে ডাকে—জীবানন্দবাবু।

ষোড়শী বলিল, বেশ ভবিষ্যতে তাই হবে।

জীবানন্দ কহিল, ভবিষ্যতে কেন, আজই বল না?

ষোড়শী ইহার কোন উত্তর দিল না। ভিতরে প্রদীপ স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল। সে ঘরে আসিয়া তাহা উজ্জ্বল করিয়া দিল। জীবানন্দ ফিরিয়া আসিয়া বসিতেই ষোড়শী বিস্মিত হইয়া কহিল, রাত্রি হয়ে যাচ্চে, আপনি বাড়ি গেলেন না? আপনার লোকজন কই?

আমি তাদের পাঠিয়ে দিয়েচি।

একলা বাড়ি যেতে আপনার ভয় করবে না?

না, আমার পিস্তল সঙ্গে আছে।

তবে তাই নিয়ে বাড়ি যান, আমার ঢের কাজ আছে।

জীবানন্দ কহিল, তোমার থাকতে পারে, কিন্তু আমার নেই। আমি এখন যাবো না।

ষোড়শীর চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, কিন্তু শান্তভাবে বলিল, রাত হয়েচে, আমি লোক ডেকে আপনার সঙ্গে দিচ্চি, তারা বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।

জীবানন্দ বুঝিল কথাটা তাহার ভাল হয় নাই, অপ্রতিভ হইয়া কহিল, ডাকতে কাউকে হবে না, আমি আপনিই যাচ্চি। যেতে আমার ইচ্ছে হয় না, তাই শুধু আমি বলছিলাম। তুমি কি সত্যই চণ্ডীগড় ছেড়ে চলে যাবে অলকা?

আবার সেই নাম? জীবানন্দের মুখের পানে চাহিয়া তাহার ক্লেশ বোধ হইল, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সত্যই সে চলিয়া যাইবে।

কবে যাবে?

কি জানি, হয়ত কালই যেতে পারি।

কাল? কালই যেতে পারো? বলিয়া জীবানন্দ একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিল। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আশ্চর্য্য! মানুষের নিজের মন বুঝতে কি ভুল হয়! যাতে তুমি যাও, সেই চেষ্টাই প্রাণপণে করেচি, অথচ তুমি চলে যাবে শুনে চোখের সামনে সমস্ত দুনিয়াটা যেন শুকনো হয়ে গেল। নির্ম্মলবাবু মস্ত লোক, মস্ত বড় ব্যারিস্টার, তিনি আছেন তোমার পক্ষ নিয়ে—হাঙ্গামা বাধবে, লড়াই শুরু হবে—আমরা জিতবো, ওই যে জমিটা দেনার দায়ে বিক্রি করেচি, ও নিয়ে আর কোন গোলমাল হবে না—কতকগুলো নগদ টাকাও হাতে এসে পড়বে, আর তোমাকে ত যা বলব তাই করতে হবে, ওই দিকটাই কেবল দেখতে পেয়েচি, কিন্তু আর যে একটা দিক আছে—তুমি নিজেই সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে বিদায় নিলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে, তামাসাটা কোথায় গিয়ে গড়াবে, তা আমার স্বপ্নেও মনে হয়নি—আচ্ছা অলকা, এমন ত হতে পারে, আমার মত তোমারও ভুল হচ্চে—তুমিও নিজের মনের ঠিক খবরটি পাওনি?

কথাগুলি এত চমৎকার এবং এমন নূতন যে, হঠাৎ বিস্ময় লাগে, ইহা জীবানন্দের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। জবাব দিতে ষোড়শীকে একটু থামিতে হইল। শেষে সায় দিয়া বলিল, হতে পারে বই কি। শুধু এই খবরটা নিশ্চয় জানি, যা আমি স্থির করেচি, সে আর অস্থির হবে না।

জীবানন্দ বলিয়া উঠিল, বাপ্‌রে বাপ্! তোমার পুরুষমানুষ, আর আমার মেয়েমানুষ হওয়া উচিত ছিল; আচ্ছা, সেখানেই বা তোমার চলবে কি করে?

ষোড়শী পূর্ব্বের মতই সহজ গলায় উত্তর দিল, এ আলোচনা আমি আপনার সঙ্গে কোনমতে করতে পারিনে।

জীবানন্দ রাগ করিয়া বলিল, তুমি কিছুই পারো না, তুমি পাথর। চুলে আমার পাক ধরে এলো, আমি বুড়ো হয়ে গেলাম—তোমার কাছে কি এখন আমি হাত-জোড় করে কাঁদতে পারি তুমি ভেবেচ?

ষোড়শী কহিল, দেখুন অনেক রাত্রি হ'লো, এখনো আমার আহ্নিক পর্য্যন্ত সারা হয়নি—

পুরোহিতের কাশি এবং পায়ের শব্দ বাহিরে শোনা গেল ; সে দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, মা, সকলের সম্মুখে মন্দিরের দোর বন্ধ করে চাবিটা আমি তারাদাস ঠাকুরের হাতেই দিলাম। রায়মশায়, শিরোমণি—এরা দাঁড়িয়েছিলেন।

ষোড়শী কহিল, ঠিকই হয়েছে। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি সাগরের ওখানে একবার যাবো, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

জীবানন্দ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, এগুলোও তা হলে তুমি রায়মশায়ের কাছেই পঠিয়ে দিয়ো।

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, সিন্দুকের চাবি আর কারও হাতে দিয়েই আমার বিশ্বাস হবে না।

শুধু আমাকেই হবে ?

ষোড়শী ইহার কোন উত্তর না দিয়া ঘরের তালাটা হাতে লইয়া বাইরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং জীবানন্দ বাহিরে আসিতেই কপাট বন্ধ করিয়া তাহার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া পুরোহিতের পিছনে পিছনে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। শুধু একাকী জীবানন্দ সেই অন্ধকার বারান্দায় ভূতের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

২৩

ব্যারিস্টার সাহেব চলিয়া গেছেন, ষোড়শী চলিয়া যাইতেছে—মন্দিরের চাবি-তালা-সরঞ্জাম প্রভৃতি যাহা-কিছু মূল্যবান সমস্ত আদায় হইয়া গেছে, ইত্যাদি সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িতে কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটিল না। শিরোমণি আনন্দের আবেগে মুক্ত-কচ্ছ আলুথালু বেশে রায়মহাশয়ের সদরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নির্ম্মলের যাবার সময়ে বিদায়ের পালাটা বিশেষ প্রীতিকর হয় নাই। মনে মনে বোধ করি এইসকল আলোচনাতেই জনার্দ্দনের মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া-ছিল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবস্থা শিরোমণির ছিল না, তিনি আশীর্ব্বাদের ভঙ্গিতে ডান হাত তুলিয়া গদগদ-কণ্ঠে কহিলেন; দীর্ঘজীবী হও ভায়া, সংসারে এসে বুদ্ধি ধরেছিলে বটে !

জনার্দ্দন মুখ তুলিয়া কহিলেন, ব্যাপার কি ?

শিরোমণি বলিলেন, ব্যাপার কি! দশখানা গাঁয়ে রাষ্ট্র হতে বাকি আছে নাকি? বেটি চাবি-পত্র যা-কিছু সমস্ত দিয়ে চলে যাচ্ছে যে! বলি, শোন নি নাকি?

যে ভদ্রলোক সকাল হইতে বসিয়া এ-মাসের সুদের কিছু টাকা মাপ করিতে অনুনয়-বিনয় করিতেছিল, সে কহিল, বেশ! যজ্ঞেশ্বর জানলেন না, আর খবর পেলেন ঘেঁটু-মনসা? এ-সব করলে কে শিরোমণিখুড়ো, সমস্তই ত রায়মশায়ই।

শিরোমণি আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, কিন্তু আসল চাবিটা শুনচি নাকি গিয়ে পড়েচে জমিদারের হাতে? ব্যাটা পাঁড় মাতাল—দেখো ভায়া, শেষকালে মায়ের সিন্দুকের সোনা-রূপো না ঢুকে যায় শুঁড়ির সিন্দুকে। পাপের আর অবধি থাকবে না।

ক্রমশঃ একে একে গ্রামের অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থির হইল জমিদারের হাত হইতে চাবিটা অবিলম্বে উদ্ধার করা চাই। বেলা তৃতীয় প্রহরে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া হুজুর যখন মদ খাইতে আরম্ভ করিবেন, তাঁহার মাতাল হইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই সেটা হস্তগত করা প্রয়োজন। সেটা তাঁহার হাতে যাওয়ার সম্বন্ধে জনার্দ্দন নিজের সামান্য একটু ত্রুটি ও অবিবেচনা স্বীকার করিয়া লইয়াই কহিলেন, সমস্তই স্থির করে রেখেছিলাম, হঠাৎ উনি যে মাঝ থেকে চাবি হাত করবেন, সেটা আর খেয়াল করিনি। এখন সহজে দিলে হয়। দশ দিন পরে হয়ত বলে বসবে, কই কিছুই ত সিন্দুকে ছিল না! কিন্তু আমরা সবাই জানি, ভায়া, ষোড়শী আর যাই কেন না করুক, মায়ের সম্পত্তি অপহরণ করবে না—একটি পাই-পয়সা না।

সকলে এ কথা স্বীকার করিল। অনেকের এমনও মনে হইল, ইহার চেয়ে বরঞ্চ সেই-ই ছিল ভাল।

এই দল যথাসময়ে এবং যথোচিত সমারোহে যখন জমিদারের শান্তিকুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল, জমিদার তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া। মদের বোতল ও গ্লাসের পরিবর্ত্তে জমিদারীর মোটা মোটা খাতা-পত্র তাঁহার সম্মুখে। এক ধারে বসিয়া তাঁহার সহচর প্রফুল্লচন্দ্র খবরের কাগজ পড়িতেছিল, সে-ই সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

শিরোমণি সকলের অগ্রে কথা কহেন, এবং সকলের শেষে অনুতাপ করেন। এ ক্ষেত্রেও তিনিই কথা কহিলেন; বলিলেন, হুজুরের পাছে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, তাই একটু বিলম্ব করেই আমরা সকলে—

জীবানন্দ খাতা-পত্র এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া সহাস্যে কহিলেন, বিলম্ব না করে এলেও হুজুরের নিদ্রার ব্যাঘাত হতো না শিরোমণিমশাই, কারণ দিনের বেলা তিনি নিদ্রা যান না।

কিন্তু আমরা যে শুনি হুজুর—

শোনেন? তা আপনারা অনেক কথা শোনেন যা সত্যি নয়, এবং অনেক কথা বলেন যা মিথ্যে। এই যেমন আমার সম্বন্ধে ভৈরবীর কথাটা—বলিয়া বক্তা হাস্য করিলেন, কিন্তু শ্রোতার দল থতমত খাইয়া একেবারে মুষড়িয়া গেল। জীবানন্দ কহিলেন, কিন্তু যে জন্যে ত্বরা করে আসতে চেয়েছিলেন তার হেতুটা শুনি?

জনার্দ্দন রায় নিজেকে কথঞ্চিৎ সামলাইয়া লইলেন, মনে মনে কহিলেন, এত ভয়ই বা কিসের? প্রকাশ্যে বলিলেন, মন্দির-সংক্রান্ত গোলযোগ যে এত সহজে নিষ্পত্তি করতে পারা যাবে তা আশা ছিল না। নির্ম্মল যে-রকম বেঁকে দাঁড়িয়েছিল—

জীবানন্দ কহিলেন, তিনি সোজা হলেন কি করে?

এই ব্যঙ্গ জনার্দ্দন অনুভব করিলেন, কিন্তু শিরোমণি তাহার ধার দিয়াও গেলেন না, খুশী হইয়া সদর্পে কহিলেন, সমস্তই মায়ের ইচ্ছা হুজুর, সোজা যে হতেই হবে। পাপের ভার তিনি আর সইতে পারছিলেন না।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তাই হবে। তার পরে?

শিরোমণি বলিলেন, কিন্তু পাপ ত দূর হলো, এখন,—বল না জনার্দ্দন, হুজুরকে সমস্ত বুঝিয়ে বল না? এই বলিয়া তিনি রায়মশায়কে হাত দিয়া ঠেলিলেন।

জনার্দ্দন চকিত হইয়া কহিলেন, মন্দিরের চাবি ত আমরা দাঁড়িয়ে থেকেই তারাদাস ঠাকুরকে দিইয়েছি। আজ তিনিই সকালে মায়ের দোর খুলেচেন, কিন্তু সিন্দুকের চাবিটা শুনতে পেলাম ষোড়শী হুজুরের হাতে সমর্পন করেচে।

জীবানন্দ সায় দিয়া কহিলেন, তা করেচে। জমাখরচের খাতাও একখানা দিয়েচে।

শিরোমণি বলিলেন, বেটি এখনও আছে, কিন্তু কখন যে কোথায় চলে যায় সে ত বলা যায় না।

জীবানন্দ মুহূর্ত্তকাল বৃদ্ধের মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু সে জন্যে আপনাদের এত উদ্বেগ কেন?

উত্তরের জন্য তিনি জনার্দ্দনের প্রতি চাহিলেন। জনার্দ্দন সাহস পাইয়া কহিলেন, দলিলপত্র, মূল্যবান তৈজসাদি, দেবীর অলঙ্কার প্রভৃতি যা-কিছু আছে গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিরা সমস্তই জানেন। শিরোমণিমশায় বলচেন যে, ষোড়শী থাকতেই সেগুলো সব মিলিয়ে দেখলে ভাল হয়। হয়ত—

হয়ত নেই? এই না? কিন্তু না থাকলেই বা আপনারা আদায় করবেন কি করে?

জনার্দ্দন সহসা জবাব খুঁজিয়া পাইলেন না, শেষে বলিলেন, তবু ত জানা যাবে হুজুর!

কিন্তু আজ আমার সময় নাই রায়মশাই।

জনার্দ্দন মনে মনে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, প্রায় এইপ্রকার ফন্দি করিয়াই

তাঁহারা আসিয়াছিলেন! শিরোমণি ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, চাবিটা জনার্দ্দন ভায়ার হাতে দিলে আজই সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা সমস্ত মিলিয়ে দেখতে পারি। হুজুরেরও আর কোন দায়িত্ব থাকে না—কি আছে না-আছে সে পালাবার আগেই সব জানা যায়। কি বল ভায়া? কি বল হে তোমরা? ঠিক না?

সকলেই এ-প্রস্তাবে সম্মতি দিল, দিল না কেবল যাহার হাতে চাবি। সে শুধু একটু ঈষৎ হাসিয়া কহিল, ব্যস্ত কি শিরোমণিমশায়, যদি কিছু নষ্ট হয়েই থাকে ত, ভিখিরীর কাছে থেকে আর আদায় হবে না। আপনারা আজ আসুন, আমার যেদিন অবসর হবে মিলিয়ে দেখতে আপনাদের সকলকেই আমি সংবাদ দেব।

ফন্দি খাটিল না দেখিয়া সবাই মনে মনে রাগ করিল। রায়মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কিন্তু দায়িত্ব একটা—

জীবানন্দ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কহিলেন, সে ত ঠিক কথা রায়মশায়। দায়িত্ব একটা আমার রইল বইকি।

দ্বারের বাহির হইয়াই শিরোমণি জনার্দ্দনের গা টিপিয়া কহিলেন, দেখলে ভায়া, ব্যাটা মাতালের ভাব বোঝাই ভার। গুয়োটা কথা কয় যেন হেঁয়ালী। মদে চুর হয়ে আছে। বাঁচবে না বেশিদিন।

জনার্দ্দন শুধু বলিলেন, হুঁ। যা ভয় করা গেল, তাই হ'লো দেখচি!

শিরোমণি কহিলেন, এবারে গেল সব শুঁড়ির দোকানে। বেটি যাবার সময় আচ্ছা জব্দ করে গেল।

একজন কহিল, হুজুর চাবি আর দিচ্চেন না।

শিরোমণি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, আবার! এবার চাইতে গেলে গলা টিপে মদ খাইয়ে দিয়ে তবে ছাড়বে। কথাটা উচ্চারণ করিয়াই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ঘরের মধ্যে জীবানন্দ খোলা দ্বারের দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন; প্রফুল্ল কহিল, দাদা, আবার একটা নূতন হাঙ্গামা জড়ালেন কেন, চাবিটা ওঁদের দিলেই ত হ'তো।

জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চক্ষু ফিরাইয়া কহিল, হ'তো না প্রফুল্ল, হলে দিতাম। পাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলেই সে কাল রাতে আমার হাতে চাবি দিয়েচে।

প্রফুল্ল মনে মনে বোধ হয় ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, সিন্দুকে আছে কি?

জীবানন্দ একটু হাসিয়া কহিল, কি আছে? আজ সকালে তাই আমি খাতাখানা

পড়ে দেখছিলাম। আছে মোহর, টাকা, হীরে, পান্না, মুক্তোর মালা, মুকুট, নানারকম জড়োয়া গয়না, কিছু দলিল-পত্র, তা ছাড়া সোনা-রূপোর বাসন-কোসনও কম নয়। কতকাল ধরে জমা হয়ে এই ছোট্ট চণ্ডীগড়ের ঠাকুরের যে এত সম্পত্তি সঞ্চিত আছে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। চুরি-ডাকাতির ভয়ে ভৈরবীরা বোধ করি কাউকে জানতেও দিত না।

প্রফুল্ল সভয়ে কহিল, বলেন কি! তার চাবি আপনার কাছে? একমাত্র পুত্র সমর্পণ ডাইনির হাতে?

জীবানন্দ রাগ করিল না, কহিল, নিতান্ত মিথ্যা বলনি ভায়া, এত টাকা দিয়ে আমি নিজেকেও বিশ্বাস করতে পারতাম না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, অথচ, এ আমি চাইনি প্রফুল্ল। আমি যতই তাকে পীড়াপীড়ি করলাম জনার্দ্দন রায়কে দিতে, ততই সে অস্বীকার করে আমার হাতে গুঁজে দিলে।

প্রফুল্ল নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এর কারণ?

জীবানন্দ কহিল, বোধ হয় সে ভেবেছিল, এ দুর্নামের ওপর আবার চুরির কলঙ্ক চাপালে তার আর সইবে না। এদের সে চিনেছিল।

প্রফুল্ল বলিল, কিন্তু আপনাকে সে চিনতে পারেনি।

জীবানন্দ হাসিল, কিন্তু সে হাসিতে আনন্দ ছিল না; কহিল, সে দোষ তার, আমার নয়। তার সম্বন্ধে অপরাধ আমার আর যত দিকেই থাক্, আমাকে চিনতে না পারার অপরাধ গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমি একটা দিনের তরেও করিনি; কিন্তু আশ্চর্য্য এই পৃথিবী, এবং তার চেয়েও আশ্চর্য্য এই মানুষের মন! এ যে কি থেকে কি ঠিক করে নেয়, কিছুই বলবার জো নেই। এর যুক্তিটা কি জানো ভায়া, সেই যে তার হাত থেকে মরফিয়া নিয়ে চোখ বুজে খাওয়ার গল্পটা তোমার কাছে করেছিলাম, সেই হ'লো তার সকল তর্কের শেষ তর্ক, সকল বিশ্বাসের বড় বিশ্বাস। কিন্তু সে-রাত্রে আর যে কোন উপায় ছিল না, এদিকেও মরি, ওদিকেও মরি, সে ছাড়া আর কারও পানে চাইবার পথ ছিল না—এ সমস্ত ষোড়শী একদম ভুলে বসে আছে, শুধু একটি কথা তার মনে জেগে রয়েছে, যে নিজের প্রাণটা নিঃসংশয়ে তার হাতে দিতে পেরেছিল, তাকে আবার অবিশ্বাস করা যায় কি করে? ব্যাস্, যা-কিছু ছিল সমস্ত দিলে চোখ বুজে আমার হাতে তুলে। প্রফুল্ল, দুনিয়ার ভয়ানক চালাক লোকও মাঝে মাঝে মারাত্মক ভুল করে বসে, নইলে সংসার একেবারে মরুভূমি হয়ে দাঁড়াত, কোথাও রসের বাষ্পটুকুও জমবার ঠাঁই পেত না।

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, অতিশয় খাঁটি কথা দাদা। অতএব অবিলম্বে খাতাখানা পুড়িয়ে ফেলে তারাদাস ঠাকুরকে ডেকে ধমক দিন—জমানো মোহরগুলোয়

যদি সলোমন সাহেবের দেনাটা শোধ যায় ত, শুধু রসের বাষ্প কেন, মুষলধারে বর্ষণ শুরু হতে পারবে।

জীবানন্দ কহিল, প্রফুল্ল, এইজন্যেই তোমাকে এত পছন্দ করি।

প্রফুল্ল হাতজোড় করিয়া বলিল, এই পছন্দটা এইবার একটু খাটো করতে হবে দাদা। রসের উৎস আপনার অফুরন্ত হোক, কিন্তু মোসাহেবী করে এ অধীনের গলার চুঙ্গি পর্য্যন্ত কাঠ হয়ে গেল। এইবার একবার বাইরে গিয়ে দুটো ডাল-ভাতের যোগাড় করতে হবে। কাল-পরশু আমি বিদায় নিলাম।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিল, একেবারে নিলে? কিন্তু এইবার নিয়ে ক'বার নেওয়া হ'লো প্রফুল্ল?

বার-চারেক। এই বলিয়া সে নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, ভগবান মুখটা দিয়েছিলেন, তা বড়লোকের প্রসাদ খেয়েই দিন গেল; দুটো বড় কথাও যদি না মাঝে মাঝে বার করতে পারি ত নিতান্তই এর জাত যায়। নেহাৎ অপরাধও নেই দাদা। বহুকাল ধরে আপনাদের জলকে কখনো উঁচু কখনো নীচু বলে এ দেহটায় মেদ-মাংসই কেবল শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেচে, সত্যিকারের রক্ত বলতে বোধকরি ছিটে-ফোঁটাও আর বাকি নেই। আজ ভাবচি এক কাজ করব। সন্ধ্যার আবছায়ায় গা-ঢাকা দিয়ে গিয়ে খপ্ করে ভৈরবী ঠাকরুণের এক খামচা পায়ের ধূলো নিয়ে গিলে ফেলব। আপনার অনেক ভাল-মন্দ দ্রব্যই ত আজ পর্য্যন্ত উদরস্থ করেচি, এ নইলে সেগুলো আর হজম হবে না, পেটে লোহার মত ফুটবে।

জীবানন্দ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আজ উচ্ছ্বাসের কিছু বাড়াবাড়ি হচ্ছে প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল পুনশ্চ হাতজোড় করিয়া কহিল, তা হলে বসুন দাদ, এটা শেষ করি। মোসাহেবীর পেন্সন বলে সেদিন যে উইলখানায় হাজার-পাচেক টাকা লিখে রেখেচেন, সেটার ওপরে দয়া করে একটা কলমের আঁচড় দিয়ে রাখবেন—চণ্ডীর টাকাটা হাতে এলে মোসাহেবের অভাব হবে না, কিন্তু আমাকে দান করে অতগুলো টাকার আর দুর্গতি করবেন না!

জীবানন্দ কহিল, তা হলে এবার আমাকে তুমি সত্যি সত্যিই ছাড়লে?

প্রফুল্ল তেমনি করজোড়ে কহিল, আশীর্ব্বাদ করুন, এই সুমতিটুকু শেষ পর্য্যন্ত যেন বজায় থাকে।

জীবানন্দ মৌন হইয়া রহিল।

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, কবে যাচ্ছেন তিনি?

জানিনে।

কোথায় যাচ্ছেন তিনি?

তাও জানিনে।

প্রফুল্ল কহিল, জেনেও কোন লাভ নেই দাদা। সহসা তাহার মুখের চেহারা বদলাইয়া গেল, কহিল, বাপরে! মেয়েমানুষ ত নয়, যেন পুরুষের বাবা। মন্দিরে দাঁড়িয়ে সেদিন অনেকক্ষণ চেয়েছিলাম, মনে হলো যেন পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একেবারে পাথরে গড়া। ঘা মেরে গুঁড়ো করা যাবে, কিন্তু আগুনে গলিয়ে যে ইচ্ছামত ছাঁচে ঢেলে গড়বেন, সে বস্তুই নয়। পাবেন ত ও মতলবটা পরিত্যাগ করবেন।

জীবানন্দ কতকটা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, তা হলে প্রফুল্ল এবার নিতান্তই যাচ্চো?

প্রফুল্ল সবিনয়ে জবাব দিল, গুরুজনের আশীর্ব্বাদের জোর থাকে ত মনস্কামনা সিদ্ধ হবে বই কি।

জীবানন্দ কহিল, তা হতে পারে। কিন্তু কি করবে স্থির করেচ?

প্রফুল্ল বলিল, অভিলাষ ত আপনার কাছে ব্যক্ত করেচি। প্রথমে চারটি ডাল-ভাতের জোগাড়ের চেষ্টা করব।

জীবানন্দ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া প্রশ্ন করিল, ষোড়শী সত্যই চলে যাবে তোমার মনে হয়?

প্রফুল্ল কহিল, হয়। তার কারণ, সংসারে সবাই প্রফুল্ল নয়। ভাল কথা দাদা, একটা খবর আপনাকে দিতে ভুলেছিলাম। কাল রাত্রে নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি সেই ফকিরসাহেব। আপনাকে যিনি একদিন তাঁর বটগাছে ঘুঘু শিকার করতে দেননি—বন্দুক কেড়ে নিয়েছিলেন—তিনি। কুর্নিশ করে কুশল প্রশ্ন করলাম, ইচ্ছে ছিল মুখরোচক দুটো খোসামোদ-টোসামোদ করে যদি একটা কোন ভাল রকমের ওষুধ-টষুধ বার করে নিতে পারি ত আপনাকে ধরে পেটেণ্ট নিয়ে বেচে দু'পয়সা রোজগার করব। কিন্তু ব্যাটা ভারি চালাক, সে দিক দিয়েই গেল না। কথায় কথায় শুনলাম তাঁর ভৈরবী মাকে দেখতে এসেছিলেন, এখন, চলে যাচ্ছেন। ভৈরবী যে সমস্ত ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন, তাঁর কাছেই শুনতে পেলাম।

জীবানন্দ কৌতূহলী হইয়া উঠিল, কহিল, এঁর সদুপদেশেই বোধ করি তিনি চলে যাচ্চেন।

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। বরঞ্চ এঁর উপদেশের বিরুদ্ধেই তিনি চলে যাচ্চেন।

জীবানন্দ উপহাস করিয়া কহিল, বল কি প্রফুল্ল, ফকিরসাহেব শুনি যে তাঁর গুরু। গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন?

প্রফুল্ল কহিল, এ ক্ষেত্রে তাই বটে।

কিন্তু এত বড় বিরাগের হেতু?

প্রফুল্ল কহিল, বিরাগের হেতু আপনি। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কি জানি এ-কথা আপনাকে শোনানো ভাল হবে কি না, কিন্তু ফকিরের বিশ্বাস আপনাকে তিনি মনে মনে অত্যন্ত ভয় করেন—পাছে কলহ-বিবাদের মধ্যে দিয়েও আপনার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যায়, এই তাঁর সকলের চেয়ে বড় ভয়। নইলে দেশের লোককে তিনি ভয় করেননি।

জীবানন্দ বিস্ফারিত চক্ষে তাহার প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

প্রফুল্ল একটুখানি হাসিয়া কহিল, দাদা, ভগবান আপনাকেও বুদ্ধি বড় কম দেননি, কিন্তু সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে কাল তিনিই মারাত্মক ভুল করলেন, কি হাত পেতে নিয়ে আপনিই মারাত্মক ভুল করলেন, সে মীমাংসা আজ বাকী রয়ে গেল, যদি বেঁচে থাকি ত একদিন দেখতে পাবো আশা হয়।

জীবানন্দ এ কথারও কোনও উত্তর দিল না, তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যা হয় হয়, বেহারা পাত্র ভরিয়া মদ আনিয়া উপস্থিত করিল; জীবানন্দ হাত নাড়িয়া কহিল, নিয়ে যা—দরকার নেই।

ভৃত্য বুঝিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে প্রফুল্ল কহিল, কখন দরকার সেইটা বলে দিন না?

জীবানন্দ সহসা কখন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, প্রফুল্লর প্রশ্নে চোখ তুলিয়া কহিল, এখন ত নিয়ে যা—দরকার হলে ডেকে পাঠাবো। সে চলিয়া যাইতেছিল, জীবানন্দ ডাকিয়া কহিল, হাঁ রে, তোদের চা আছে?

প্রফুল্ল কহিল, শোন কথা? চা নেই ত আমি বেঁচে আছি কি করে?

তবে, তাই এক বাটি নিয়ে আয়।

বেহারা প্রস্থান করিলে প্রফুল্ল প্রশ্ন করিল, অকস্মাৎ অমৃতে অরুচি যে?

জীবানন্দ বলিল, অরুচি নয় —কিন্তু আর খাবো না।

প্রফুল্ল হাসিল, এবং ক্ষণেক পূর্ব্বে তাহারই প্রতি প্রযুক্ত বিদ্রূপ ফিরাইয়া দিয়া কহিল, এই নিয়ে ক'বার হ'লো দাদা?

জীবানন্দ রাগ করিল না, সেও হাসিয়া তাহারই অনুসরণ করিয়া কহিল, এ মীমাংসাটাও আজ না হয় বাকী থাক্ প্রফুল্ল, যদি বেঁচে থাকো ত একদিন দেখতে পাবে আশা করি।

প্রফুল্ল মুখ টিপিয়া শুধু একটু হাসিল, প্রত্যুত্তর করিল না।

চাকর আলো দিয়া গেল। ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার যখন বাহিরে গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, জীবানন্দ হঠাৎ দাঁড়াইয়া কহিল, যাই একটু ঘুরে আসি—

প্রফুল্ল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কই, কাপড় ছাড়লেন না?

থাক্‌গে।

আপনার সহচর? গাদাপিস্তলটি?

সেও থাক! আজ একলাই ঘুরতে চললাম।

প্রফুল্ল ভয়ানক আপত্তি করিয়া বলল, না, না, সে হয় না দাদা। অন্ধকার রাত, পথে-ঘাটে আপনার অনেক শত্রু? এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি দেরাজ হইতে পিস্তল বাহির করিয়া হাতে গুঁজিয়া দিতে গেল।

জীবানন্দ দুই পা পিছাইয়া গিয়া কহিল, ওকে আর আমি ছুঁচ্চিনে প্রফুল্ল—

প্রফুল্ল বিস্ময়ে অবাক হইয়া কহিল, হঠাৎ হ'লো কি দাদা? না হয় পাইকদের ডেকে দিই, তাদের কেউ সঙ্গে যাক।

জীবানন্দ মাথা নাড়িয়া কহিল, না, তাও না। আজ থেকে আমি এমনি একলা বার হবো, যেন কোথায় কোন শত্রু নেই আমার। আর আমার থেকে কারও কোন ভয় না হোক; তার পরে যা হয় তা আমার ঘটুক—আমি কারুর কাছে নালিশ করব না। এই বলিয়া সে অন্ধকারে ধীরে ধীরে একাকী বাহির হইয়া গেল।

১৪

পরিপূর্ণ সুরাপাত্র অসম্মানে ফিরিয়া গেল দেখিয়া প্রফুল্ল ব্যঙ্গ করিয়াছে। করিবারই কথা। লিভারের দুঃসহ যাতনায় ও চিকিৎসকের তাড়নায় শয্যাগত জীবানন্দের জীবনে এ অভিনয় আরও হইয়া গেছে; কিন্তু স্বেচ্ছায়, সুস্থদেহে মদের বদলে চা খাইয়া বাটীর বাহির হওয়া খুব সম্ভব এই প্রথম। সমস্ত জগৎটা তাহার বিস্বাদ ঠেকিল, এবং শান্তি-কুঞ্জের ঘনছায়ায় ঘেরা পথের মধ্যে যেদিকে চাহিল, সেইদিক হইতেই একটা অস্ফুট কান্নার সুর আসিয়া যেন তাহার কানে বাজিতে লাগিল। তাহার অভ্যস্ত জীবনের নীচে তাহারই যে আরও একটা সত্যিকার জীবন আজও বাঁচিয়া আছে এ-খবর সে জানিত না। গেট পার হইয়া যখন মাঠের পথে বাহির হইয়া আসিল, তখন সন্ধ্যার ধূসর আকাশ ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকারে পরিণত হইতেছিল। একদিকে শীর্ণ নদীর বালুকাময় শুষ্ক সৈকত আঁকিয়া বাঁকিয়া দিগন্তে অদৃশ্য হইয়াছে, আর একদিকে বৈশাখের শষ্প শস্যহীন বিস্তৃত ক্ষেত্র চণ্ডীগড়ের পাদমূলে গিয়া মিশিয়াছে। পথে পথিক নাই, মাঠে কৃষকদের আর দেখা যায় না, রাখাল বালকেরা গোচারণের কাজ আজিকার মত শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেছে—সান্ধ্য আকাশতলে জনহীন ভূখণ্ডের এই স্তব্ধ বিষণ্ণ মূর্ত্তি আজ তাহার কাছে অত্যন্ত করুণ ও অদ্ভুত মনে হইল। এই পথে, এমনি নির্জ্জন সন্ধ্যায়

সে আরও কতবার যাতায়াত করিয়াছে; কিন্তু এতদিন ধরিত্রী যেন এই তাঁহার শান্ত দুঃখের ছবিখানি মাতালের রক্তচক্ষু হইতে একান্ত সঙ্কোচে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ওপারের রৌদ্র-দগ্ধ প্রান্তর বাহিয়া উষ্ণ বায়ু আসিয়া মাঝে মাঝে তাহার গায়ে লাগিতেছিল; কিছুই নতুন নয়—সেইদিকে চাহিয়া অকস্মাৎ রুদ্ধ অভিমানের কান্নায় যেন আজ তাহার বুক ভরিয়া উঠিল! মনে মনে বলিতে লাগিল, মা পৃথিবী, তোমার দুঃখের তপ্ত নিশ্বাসটুকু কি লজ্জায় এতদিন চেপে রেখেছিলে, পাষণ্ড বলে জানতে দাওনি? সংসারে আপনার বলতে আমার কেউ নেই, নিজের ছাড়া কারও সুখ-দুঃখের কখনও ভাগ পাইনি—সেও কি মা আমার দোষ? আজ আছি, কাল যদি না থাকি, দুনিয়ার কারও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, এ-কথা কি তুমিই কোনদিন ভেবেচ মা?

এ অভিযোগ যে সে কাহার কাছে করিল, মা বলিয়া যে সে বিশেষ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিল, বোধ হয় সে নিজেই ঠিকমত উপলব্ধি করে নাই; তথাপি গিরিগাত্র-স্খলিত উপলখণ্ডসকল যেমন নির্ঝরের পথ ধরিয়া আপনার ভারবেগে আপনিই গড়াইয়া চলে, তেমনি করিয়াই তাহার সদ্য উৎসারিত আকস্মিক বেদনার অনুভূতি চোখের জলের পথ ধরিয়া কথায় মালা গাঁথিয়া গাঁথিয়া নিরন্তর বহিয়া চলিতে লাগিল। মাঠের জলনিকাশের জন্য চাষারা একবার এই পথের উপর দিয়া নালা কাটিয়া দিয়াছিল। নন্দী মহাশয়ের আদেশ অর্জ্জন করিবার মত প্রচুর দক্ষিণা যখন তাহারা কোনমতেই সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তখনই শুধু সর্ব্বনাশ হইতে আত্মরক্ষা করিতে এই কাজ করিয়াছিল; কিন্তু দরিদ্রের এই দুঃসহ স্পর্দ্ধা এককড়ি হুজুরের গোচর করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, নিরুপায়ের অশ্রুজলে ভ্রূক্ষেপমাত্র করেন নাই। স্থানটা তখন পর্য্যন্ত অসমতল অবস্থাতেই ছিল। দরিদ্র-পীড়নের এই উৎকট চিহ্ন এই পথে কতবারই ত তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু আজ ইহাই চোখে পড়িয়া দুই চোখে অশ্রু প্লাবিত হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিল, আহা! কত ক্ষতিই না-জানি হয়েচে! কত ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে হয়ত পেট-ভরে দু'বেলা খেতেও পারে না। কেনই বা মানুষে এ-সব করে! জায়গাটা অন্ধকারেই ক্ষণকাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, হাতে টাকা থাকলে কালই মিস্ত্রি লাগিয়ে এটা বাঁধিয়ে দিতাম, প্রতি বৎসর এ নিয়ে আর তাঁদের দুঃখ পেতে হ'তো না। আচ্ছা কত টাকা লাগে? সে পথ ছাড়িয়া মাঠে নামিয়া গেল, এবং সমস্তটা মন দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। এ-সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাহার ছিল না, কত ইট, কত চুন-বালি, কত কাঠ, কি কি আবশ্যক কিছুই সে জানিত না, কিন্তু কথাটা তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। সেইখানে ভূতের মত অন্ধকারে একাকী দাঁড়াইয়া সে কেবলই মনে মনে হিসাব করিতে লাগিল, এই ব্যয় তাহার সাধ্যাতীত কি না।

পথের ওধার দিয়া কি একটা ছুটিয়া গেল? হয়ত কুকুর কিংবা শিয়াল হইবে, কিন্তু তাহার চমক ভাঙ্গিল। পরের জন্য দুঃখ বোধ করা এমনই অভ্যাসবিরুদ্ধ যে, চমক ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সমস্ত তামাসাটা একমুহূর্ত্তে ধরা পড়িয়া তাহার ভারি হাসি পাইল। তাড়াতাড়ি রাস্তায় উঠিয়া আসিয়া শুধু বলিল, বাঃ, বেশ ত কাণ্ড! কেউ যদি দেখে ত কি ভাববে! জীবানন্দ আজ মদ না খাইয়াই বাহির হইয়াছিল, তাহার আজিকার এই মনের দুর্ব্বলতার হেতু সে বুঝিল, অবসাদগ্রস্ত চিত্তের মাঝে কেন যে আজ অকারণে কেবল কান্নার সুরই বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছে, ইহারও কারণ বুঝিতে তাহার আর বিলম্ব ঘটিল না। আরও একটা জিনিস, নিজের সম্বন্ধে আজ তাহার প্রথম সন্দেহ হইল যে, দীর্ঘদিনের অভ্যাস আজ তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া একেবারে স্বভাবে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনাকে আপন বলিয়া দাবী করিবার দাবী হয়ত তাহার চিরদিনের মত হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কিসের জন্য বাটীর বাহির হইয়াছিল ঠিক স্মরণ করিতে পারিল না, ঝোঁকের মাথায় জোর করিয়া যখন ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিল, তখন স্থির-সংকল্প হয়ত কিছুই ছিল না, হয়ত অগোচরে অস্পষ্টরূপে অনেক কথাই ছিল—যাহা এখন একেবারে লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। গৃহত্যাগের কোন উদ্দেশ্যই মনে পড়িল না। কিন্তু গৃহে ফিরিতেও ইচ্ছা করিল না। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাস্তা ছাড়িয়া পায়ে-হাঁটা যে পথটা মাঠের উপর দিয়ে কোণাকুণি চণ্ডীগড়ের দক্ষিণ ঘুরিয়া গিয়াছে অন্ধকারে সেই পথেই সে পা বাড়াইল। পথটা দীর্ঘ এবং বন্ধুর, প্রতি পদক্ষেপেই বাধা পাইতে লাগিল, কিন্তু ধাক্কা খাইয়া, হোঁচট খাইয়া পথ চলিতে চলিতে বিক্ষিপ্ত চিত্ত-তল তাহার কখন যে ইঁট, কাঠ, চুন এবং সুরকির চিন্তায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে জানিতে পারিল না।

জিনিসটা কিছুই নয়, ছোট একটা সাঁকো, বীজগ্রামের জমিদারের কাছে তাহার চেয়ে তুচ্ছ বস্তু আর ত কিছু হইতেই পারে না! সেটা তৈরি করার মধ্যে না আছে শিল্প, না আছে সৌন্দর্য্য; তবুও এই শিল্পসৌন্দর্য্যহীন সামান্য বস্তুটাই যেন কত দুঃখীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশিয়া তাহার মনের মধ্যে আজ এক নতুন রসে ভরিয়া অসামান্য হইয়া দেখা দিল। তাহাকে কতপ্রকারে ভাঙিয়া কতরকমে গড়িয়া সে যেন আর শেষ হইতেই চাহিল না। অথচ এ সকল যে শুধু তাহার অবসন্ন মনের ক্ষণস্থায়ী খেয়াল, সত্যবস্তু নয়, কাল দিনের-বেলা ইহার চিহ্নমাত্র রহিবে না, এ-কথাও সে বিস্মৃত হইল না, উৎসবের মাঝে গোপন শোকের মত কোথায় যেন বিঁধিয়াই রহিল। অথচ আজ রাত্রির মত এই ছেলেমানুষিটাকে সে কোনমতেই ছাড়িতে পারিল না, প্রশ্রয় দিয়া দিয়া কল্পনার পরে কল্পনার যোজনা করিয়া অবিশ্রাম চলিতে লাগিল।

সহসা কালো আকাশপটে চণ্ডী-মন্দিরের চূড়া দেখা দিল। এতদূর আসিয়াছে তাহার হুঁস ছিল না; আরও কাছে আসিয়া মন্দিরের ছোট দরজাটা তখনও খোলা আছে দেখিতে পাইয়া নিঃশব্দে ভিতরে প্রবেশ করিল। দেবীর আরতি অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গেছে, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ, সমস্ত প্রাঙ্গণে ঘোর অন্ধকার, শুধু নাট-মন্দিরের একধারে মিট মিট করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। জীবানন্দ নিকটে গিয়া দেখিল জন-চার-পাঁচ লোক মশার ভয়ে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে, শুধু কে একজন থামের আড়ালে চুপ করিয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছে। জীবানন্দ আরও একটু কাছে গিয়া লোকটিকে দেখিবার চেষ্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি?

লোকটি জীবানন্দের ধপ্‌ধপে শাদা পরিচ্ছদ অন্ধকারেও অনুভব করিয়া তাঁহাকে ভদ্র ব্যক্তি বলিয়া বুঝিল, কহিল, আমি একজন যাত্রী বাবু।

ওঃ—যাত্রী! কোথায় যাবে?

আজ্ঞে, আমি যাবো শ্রীশ্রীপুরীধামে।

কোথা থেকে আসচ? এরা বুঝি তোমার সঙ্গী? এই বলিয়া জীবানন্দ ঘুমন্ত লোকগুলিকে দেখাইয়া দিল।

লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে না, আমি একাই আসছি মানভূম জেলা থেকে। এদের কারও বাড়ি মেদিনীপুর, কারও বাড়ি আর কোথাও—কোথায় যাবে তাও জানিনে। দুজন ত কেবল আজ দুপুরবেলাতে এসেচে।

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, কত লোক এখানে রোজ আসে? যারা থাকে তারা দুবেলা খেতে পায়, না?

লোকটা বিব্রত হইয়া পড়িল। লজ্জিতভাবে কহিল, কেবল খাবার জন্যেই সবাই থাকে না বাবু। পায়ে হাঁটা আমার অভ্যাস ছিল না। তাই ফেটে গিয়ে ঘায়ের মত হ'ল। মা ভৈরবী নিজের চোখে দেখে হুকুম দিলেন, যতদিন না সারে এখানে থাকো।

জীবানন্দ কহিল, বেশ ত, থাকো না। জায়গার ত আর অভাব নেই হে!

কিন্তু মা ভৈরবী ত আর নেই শুনতে পেলাম।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিল, এরই মধ্যে শুনতে পেয়েচ? তা না-ই তিনি থাকলেন, তাঁর হুকুম ত আছে। তোমাকে যেতে বলে সাধ্য কার? তোমার যত দিন না পা সারে, তুমি থাকো।—এই বলিয়া জীবানন্দ তাহার কাছে আসিয়া বসিল।

লোকটা প্রথমে একটু ভয় ও সঙ্কোচ অনুভব করিল, কিন্তু সে ভাব রহিল না। এবং দেখিতে দেখিতে অন্ধকারে এই নির্জ্জন নিস্তব্ধ দেবায়তনের একান্তে পরাক্রান্ত এক ভূস্বামী ও দীন গৃহহীন আর এক ভিক্ষুকের সুখদুঃখের আলোচনা একেবারে ঘনিষ্ট হইয়া উঠিল। লোকটার নাম উমাচরণ, জাতিতে কৈবর্ত্ত, বাটী আগে ছিল

মানভূম জেলার বংশীবট গ্রামে। গ্রামে অন্ন নাই, জল নাই, চিকিৎসক নাই—এ যাঁহার ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি, তিনি পশ্চিমের কোন এক সহরে ওকালতি করেন। রাজায় প্রজায় প্রীতি নাই, সম্বন্ধ নাই, আছে শুধু শোষণ করিবার বংশগত অধিকার। এই ফাল্গুনের শেষে বিসূচিকা রোগে তাহার স্ত্রী মরিয়াছে, উপযুক্ত দুই পুত্র একে একে চোখের উপর বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সে কোন উপায় করিতে পারে নাই; অবশেষে জীর্ণ ঘরখানি সে তাহার বিধবা ভ্রাতুষ্কন্যাকে দান করিয়া চিরদিনের মত গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এ জীবনে আর তাহার ফিরিবার আশা নাই, ইচ্ছা নাই; এই বলিয়া সে ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। জীবানন্দের চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। পরের কান্না তাহার কাছে নতুন বস্তু নয়, এ সে জীবনে অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু কোনদিন মনে এতটুকু দাগ পর্য্যন্ত ফেলিতে পারে নাই, আজও সে ছাড়া আর কেহ জানিতেও পারিল না, কিন্তু অন্ধকারে জামার খুঁট দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল কোথাও ছুটিয়া গিয়া, যে স্ত্রী তাহার মরে নাই, যে ছেলে তাহার জন্মে নাই; যে গৃহ তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিতে হয় নাই, তাহাদের জন্য এই অপরিচিত লোকটার মতই ডাক ছাড়িয়া কাঁদে। খানিক পরে সে কতকটা আত্ম-সংবরণ করিয়া কহিল, বাবু, আমার মত দুঃখী আর সংসারে নেই।

জীবানন্দ কহিল, ওরে ভাই, সংসারটা ঢের বড় জায়গা, এর কোথায় কি কিভাবে আছে বলবার জো নেই।

ইহার তাৎপর্য্য সম্যক উপলব্ধি করিবার মত শিক্ষা বা শক্তি এই সামান্য লোকটার ছিল না, জীবানন্দ নিজেও তাহা আশা করিল না, কিন্তু থামিতেও পারিল না। তাহার অশ্রুসিক্ত কণ্ঠস্বরের অপূর্ব্বতা তাহার কানে এমন অমৃত সিঞ্চন করিল যে, সে-লোভ সে সামলাইতে পারিল না। বলিতে লাগিল, দুঃখীদেরও কোন আলাদা জাত নেই দাদা, দুঃখেরও কোন বাঁধানো রাস্তা নেই। তা হলে সবাই তাকে এড়িয়ে চলতে পারত। হুড়মুড় করে যখন ঘাড়ে এসে পড়ে তখনই মানুষ তাকে টের পায়। কিন্তু কোন্ পথে যে তার আনাগোনা আজও কেউ তার খোঁজ পেলে না। আমার সব কথা তুমি বুঝবে না ভাই, কিন্তু সংসারে তুমি একলা নও—অন্ততঃ একজন সাথী তোমার কাছেই আছে, তুমি চিনতে পারনি।

লোকটি চুপ করিয়া রহিল। কথাও বুঝিল না, সাথী যে কে আছে তাহাও জানিল না।

জীবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি মায়ের নাম করছিলে ভাই, আমি বাধা দিলাম। আবার শুরু কর, আমি চললাম, কাল এমনি সময়ে হয়ত আবার দেখা হবে।

লোকটি কহিল, আর ত দেখা হবে না বাবু, আমি পাঁচদিন আছি, কাল সকালেই চলে যেতে হবে।

চলে যেতে হবে? কিন্তু এই যে বললে তোমার পা সারেনি, তুমি হাঁটতে পারো না।

সে কহিল, মায়ের মন্দির এখন রাজাবাবুর। হুজুরের হুকুম, তিনদিনের বেশি আর কেউ থাকতে পারবে না।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিল, ভৈরবী এখনও যায়নি, এরই মধ্যে হুজুরের হুকুম জারি হয়ে গেছে! মা চণ্ডীর কপাল ভাল! এই বলিয়া হঠাৎ তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আজ অতিথিদের সেবা হ'লো কিরকম? কি খেলে ভাই?

সে কহিল, যারা তিনদিন আসেনি তারা সবাই মায়ের প্রসাদ পেলে।

আর তুমি? তোমার ত তিনদিনের বেশি হয়ে গেছে?

লোকটি ভালমানুষ, সহসা কাহারও নিন্দা করা স্বভাব নয়, বলিল, ঠাকুরমশাই কি করবেন, রাজাবাবুর হুকুম নেই কি-না।

তাই হবে! বলিয়া জীবানন্দ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল, খুব সম্ভব অনাহূত যাত্রীদের সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই এমনি একটা নিয়ম ছিল, কিন্তু ষোড়শী তাহা মানিয়া চলিতে পারিত না। এখন তারাদাস এবং এককড়ি নন্দী উভয়ে মিলিয়া জমিদারের নাম করিয়া সে ব্যবস্থা অক্ষরে অক্ষরে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই যদি হয়, অভিযোগ করিবার খুব বেশি হেতু নাই, কিন্তু মন তাহার কোনমতেই এ-কথা স্বীকার করতে চাহিল না। অন্তর হইতে সে বার বার কহিতে লাগিল, এমন হইতেই পারে না! এমন হইতেই পারে না! বুভুক্ষুকে আহার দিবার, আবার বিধি-ব্যবস্থা কি! ওই যে ক্ষুধার্ত্ত অতিথি ওইখানে অনাহারে বসিয়া রহিল, ক্ষুধাকে তাহার বাঁধিয়া রাখিবে ইহার কোন্ আইন-কানুনে? কহিল, ওহে ভাই, কাল আবার আমি আসব, কিন্তু চুপি চুপি চলে যেতে পারবে না, তা বলে যাচ্চি।

কিন্তু ঠাকুরমশাই যদি কিছু বলেন?

জীবানন্দ কহিল, বললেই বা। এত দুঃখ সইতে পারলে আর বামুনের একটা কথা সইতে পারবে না? ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ মন্দিরের বারান্দার থামের আড়ালে মানুষের চাপা-গলা শুনিয়া বিস্মিত হইল। প্রথমে মনে করিল, নিভৃতে কেহ আরাধনা করিতে আসিয়াছে, কিন্তু কথাটা তাহার কানে গেল। কে একজন বলিতেছে, আমাদের মায়ের সর্ব্বনাশ যে করেচে তার সর্ব্বনাশ না করে আমরা কিছুতে ছাড়ব না বলে দিচ্চি।

অপরজন জবাব দিল, মায়ের চৌকাঠ ছুঁয়ে দিব্যি করলাম খুড়ো—ফাঁসি যেতে হয় তাও যাবো।

আর একজন বলিল, হঃ—আমাদের আবার জেল! আমাদের আবার ফাঁসি! মা চলে যেতে চাচ্ছে, আগে যাক্—

অন্ধকারে না চিনিল মানুষ, না চিনিল গলা, তবু মনে হইল একজনের গভীর কণ্ঠস্বর সে কোথাও যেন শুনিয়াছে, একেবারে অপরিচিত নয়। চেষ্টা করিলে হয়ত মনে করিতে পারিত। কিন্তু আজ তাহার সে-দিকে মনই গেল না। সে ত অনেকের অনেক সর্ব্বনাশ করিয়াছে—অতএব নিজেই ত সে ইহার লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্তু আজ তাহা নির্ণয় করিবার ইচ্ছাই হইল না। মনে মনে হাসিয়া কহিল, বাস্তবিক, ঠাকুর-দেবতার মত এমন সহৃদয় শ্রোতা আর নেই। হোক না মিথ্যা দম্ভ, তবু তার দাম আছে। দুর্ব্বলের ব্যর্থ পৌরুষ তবু একটু গৌরবের স্বাদ পায়। আহা!

অলক্ষ্যে নিঃশব্দে যখন বাহির হইয়া আসিল তখন রাত্রি বোধ হয় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। নির্ম্মল কালো আকাশ তারায় তারায় ঠাসা। সেই অসংখ্য নক্ষত্রলোক হইতে ঝরিয়া অদৃশ্য আলোকের আভাস অন্ধকার পথের মাটিকে ধূসর করিয়া দিয়াছে। তাহারই মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কঠিন মাটির স্তূপ পথশ্রান্ত পথিকের মত কতকাল ধরিয়া যেন নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহার ইতিহাস নাই; তাহারই একটি পাশে গিয়া সে ঠিক তেমনি করিয়াই ধূলার উপর বসিয়া পড়িল।

সুমুখে কতকটা পতিত জমির একধারে ষোড়শীর কুটীর, গাছের আড়ালে বেশ স্পষ্ট দেখা না গেলেও তাহার মনে হইল অনেকগুলি মানুষ যেন সার বাঁধিয়া বাহির হইয়া আসিল, এবং অনতিদূর দিয়া যখন চলিয়া গেল, তখন ইহাদের কথাবার্ত্তা হইতে জীবানন্দ এইটুকু সংগ্রহ করিল যে, ষোড়শীর গো-যান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং কাল প্রত্যুষেই সে চণ্ডীগড় ত্যাগ করিয়া যাইবে। ভক্ত প্রজার দল তাহার পদধূলি লইয়া ঘরে ফিরি:তছে। ষোড়শীকে নিষেধ করিবার পথ নাই, নিষেধ করিলে সে শুনিবে না, এই কয়দিনে এতটুকু তাহাকে সে চিনিয়াছে—কিন্তু মন তাহার ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে ইহার বিরুদ্ধে যত অন্যায় করিয়াছে, একটি একটি করিয়া এতকাল পরে তাহার তালিকা করা অসম্ভব, কিন্তু সেইসকল অগণিত অত্যাচারের সমষ্টি আজ তাহার চোখের উপর স্তূপাকার হইয়া উঠিল। ইহাকে সরাইয়া রাখিবার স্থান সংসারে সে কোথাও দেখিল না। স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতে যাহাকে লজ্জাবোধ করিয়াছে, গণিকা বলিয়া তাহাকেই কামনা করিবার শয়তানী সে যে কোথায় পাইয়াছিল ভাবিয়া পাইল না। আজ সমস্ত হৃদয় তাহার ষোড়শীকে একান্ত-মনে চাহিতেছে, এ তাহার অধিকারের দাবী,

অথচ চিরদিন ইহাকেই উপেক্ষা করিয়া, অপমান করিয়া, মিথ্যার প'রে মিথ্যা জমা করিয়া, সে যে প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে, আজ তাহাকে লঙ্ঘন করিবার পথ তাহার কই ?

হঠাৎ সম্মুখেই দেখিতে পাইল কে একজন দ্রুতপদে চলিয়াছে। তাহাকে অন্ধকারে চিনিতে বিলম্ব হইল না, ডাকিল, অলকা ?

ষোড়শী চমকিয়া দাঁড়াইল। এ যে জীবানন্দ তাহা সে ডাক শুনিয়াই বুঝিয়াছিল। একটু সরিয়া আসিয়া তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখানে কেন ?

জীবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কি জানি, এমনিই বসে ছিলাম। তুমি যাত্রার আগে ঠাকুর-প্রণাম করতে যাচ্চো, না ? চল, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

এই একটা বেলার মধ্যে তাহার কণ্ঠস্বরে কি যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ষোড়শী বিস্ময়ে মৌন হইয়া রহিল। ক্ষণেক পরে কহিল, আমার সঙ্গে যাবার বিপদ আছে, সে ত আপনি জানেন।

জীবানন্দ বলিল, জানি। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে একেবারে নেই। আজ আমি একা এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র—একগাছা লাঠিও সঙ্গে নেই।

ষোড়শী কহিল, শুনেচি। প্রফুল্লবাবু আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, তাঁর কাছে খবর পেলাম আজ আপনি নিরস্ত্র, বাড়ি থেকে একলা বেরিয়ে গেছেন, এবং—

এবং ঝোঁকের উপর মদ না খেয়ে বার হয়ে গেছি, না ?

ষোড়শী কহিল, হাঁ। কিন্তু চণ্ডীগড়ে এ-কাজ আর আপনি ভবিষ্যতে করবেন না।

জীবানন্দ কহিল, এ-কাজ আমি প্রত্যহ করব এবং যতদিন বাঁচব—করব। প্রফুল্ল তোমাকে এত কথা বলেচে, এ-কথা বলেনি যে, এ-জীবনে আর যাই কেন না স্বীকার করি পৃথিবীতে আমার শত্রু আছে এ আমি একদিনও আর স্বীকার করব না ?

ষোড়শী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইহার যুক্তি লইয়াও তর্ক করিল না, এ-কথার স্থায়িত্ব লইয়াও প্রশ্ন করিল না। জীবানন্দের মুখের চেহারা অন্ধকারে সে দেখিতে পাইল না, কিন্তু এই তাহার অদ্ভুত কণ্ঠস্বর নিশীথে এই নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে তাহার দুই কান ভরিয়া এক আশ্চর্য্য সুরে বাজিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, আমার সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে কি হবে ?

জীবানন্দ কহিল, কিছুই না। শুধু যতক্ষণ আছ, সঙ্গে থাকব, তার পরে যখন যাবার সময় হবে তোমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আমি বাড়ি চলে যাবো।

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিল না। জীবানন্দ কহিল, যাবার দিনে আজ আর আমাকে অবিশ্বাস ক'রো না অলকা। আমার জীবনের দাম তুমি ত জানো,

আর হয়ত দেখাও হবে না। আমাকে যে তুমি কতরকমে দয়া করে গেছ, আমার শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি সেই-সব কথাই স্মরণ করব।

ষোড়শী কহিল, আচ্ছা আসুন—এই বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

মিনিট-দুই নিঃশব্দে চলার পরে জীবানন্দ কহিল, লোকে বলে, ও দয়ার যোগ্য নয়। আচ্ছা অলকা, দয়ার আবার যোগ্যতা অযোগ্যতা কি? দয়া যে করে সে ত নিজের গরজেই করে। নইলে, দয়া পাবার যোগ্যতা আমার ছিল এত বড় দোষারোপ করতে ত শুধু অতি বড় শত্রু নয়, তুমি পর্য্যন্ত পারবে না।

ষোড়শী মৃদুস্বরে বলিল, আমার চেয়ে আপনার বড় শত্রু সংসারে বুঝি আর কেউ নেই?

জীবানন্দ বলিল, না।

মন্দিরে প্রবেশ করার পরে জীবানন্দ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, মজা দেখ অলকা, যাদের নিজের অন্ন নেই, সংসারে তারাই অপরের অন্নে সবচেয়ে বড় বাধা। ষোড়শী জিজ্ঞাসু-মুখে ফিরিয়া চাহিতে কহিল, আজ আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত এই মন্দিরেই বসে ছিলাম; ভৈরবী নেই, এখন জমিদার কর্ত্তা। হুজুরের নাম করে তাই এরই মধ্যে যাত্রীদের উপর তেরাত্রির আইন জারি হয়ে গেছে। তোমার সেই যে খোঁড়া অতিথিটি, পা না সারা পর্য্যন্ত যাকে তুমি থাকতে অনুমতি দিয়েচ, তার মুখেই শুনতে পেলাম, হুজুরের কড়া হুকুমে আজ তার অন্ন বন্ধ। সে-বেচারা অভুক্ত বসে চণ্ডী-নাম জপ করছিল—হুজুরের কল্যাণ হোক, কাল সকালেই নাকি আবার তাকে চলে যেতে হবে, পা দুটো তার থাক আর যাক।

ষোড়শী কহিল, আমার বাবা বুঝি হুকুম দিয়েচেন?

জীবানন্দ বলিল, শুধু তোমার বাবা কেন, গরীব-দুঃখীর প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করতে অনেক বাবাই এ গ্রামে আছেন, আর হুজুরের সুনামে ত স্বর্গ-মর্ত্ত্য ছেয়ে গেল। লোকটার কাছে বসে বসে তাই ভাবছিলাম অলকা, তোমার যাবার পরে সন্ন্যাসিনীর আসনে বসে এই সব বাবার দল যে তাণ্ডবকাণ্ড বাধাবে তাকে আমি সামলাবো কি করে?

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল।

জীবানন্দ নিজেও বহুক্ষণ অবধি মৌন থাকিয়া মনে মনে কত কি যেন ভাবিতে লাগিল, অকস্মাৎ একসময়ে বলিয়া উঠিল, তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন অলকা। দুটো দিনও কি আর তোমার থাকা চলে না?

ষোড়শী শান্ত-কণ্ঠে শুধু কহিল, না। তার পরে সে উঠিয়া গিয়া রুদ্ধ মন্দিরের দ্বারে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিয়া যখন ফিরিয়া আসিল, জীবানন্দ কহিল, আর একটা দিন?

ষোড়শী বলিল, না।

তবে সকল অপরাধ আমার এইখানে দাঁড়িয়ে ক্ষমা করে যাও।

কিন্তু তাতে কি আপনার খুব বেশি প্রয়োজন আছে?

জীবানন্দ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, এর উত্তর আজ দেবার আমার শক্তি নেই। এখন কেবল এই কথাই সমস্ত মন ছেয়ে আছে অলকা, কি করলে তোমাকে একটা দিনও ধরে রাখতে পারি। উঃ—নিজের মন যার পরের হাতে চলে যায়, সংসারে তার চেয়ে নিরুপায় বুঝি আর কেউ নেই। আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ, লোকে জানবে আমি তোমাকেই শাস্তি দিয়েচি, তুমি সহ্য করেচ, আর নিঃশব্দে চলে গেছ। তুমি যাবার আগে তোমার মা-চণ্ডীকে জানিয়ে যাও যে, এর চেয়ে মিথ্যে আর নেই।

ষোড়শী কোন উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিবার মুখে সহসা জীবানন্দ দুই হাত প্রসারিত করিয়া কহিল, তোমার ঠাকুরের সুমুখে দাঁড়িয়ে আজ এই কথাটি আমাকে বলে দাও, কি করলে তোমাকে আমি কেবল একটি দিন কাছে রাখতে পারি। তার পরে তুমি—

ষোড়শী পিছাইয়া গিয়া কহিল, চৌধুরীমশায়, আপনার পাইক-পিয়াদারা কি কেউ নেই যে এত অনুনয়-বিনয়? আপনি ত জানেন, আমি কারও কাছে নালিশ করব না।

জীবানন্দ পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রাগ করিল না, প্রতিঘাত করিল না, সবিনয়ে ধীরে ধীরে কহিল, তুমি যাও, অসম্ভবের লোভে আর তোমাকে পীড়ন করব না। পাইক-পিয়াদা সবাই আছে অলকা, কিন্তু যে নিজে ধরা দেবে না, জোর করে ধরে রেখে তার বোঝা বয়ে বেড়াবার জোর আমার গায়ে নেই।

ষোড়শী পথ ছাড়া পাইয়াও পা বাড়াইল না, কহিল আমি কোথায় যাচ্চি সে কৌতূহল বোধ করি আপনার নেই?

জীবানন্দ কহিল, কৌতূহল? বোধ হয় তার সীমা নেই—কিন্তু তাতেও আর জ্বালা আর নেই অলকা। আমি কেবল এই কামনা করি, সেখানে কষ্ট যেন তোমাকে কেউ না দেয়। তোমার প্রতি যারা বিরূপ তারা যেন তোমাকে সম্পূর্ণ ভুলে থাকতে পারে। হঠাৎ গলাটা যেন তাহার ধরিয়া আসিল, কিন্তু নিজের দুর্ব্বলতাকে আর সে প্রশ্রয় দিল না, মুহূর্ত্তে সামলাইয়া ফেলিয়া কহিল, আমি জানি, যে লোক স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে যায়, তার সঙ্গে লড়াই চলে না। যেদিন আমাদের হাতে তোমার চাবি ফেলে দিলে সেইদিন তোমার কাছে আমাদের একসঙ্গে সকলের হার হলো। তোমার জোরের আজ অবধি নেই—তবু ত মানুষের মন বোঝে না। যতদিন বেঁচে থাকব, এ আশঙ্কা আমার কোনদিন ঘুচবে না।

ষোড়শী সেইখানে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া জীবানন্দের পায়ের ধুলো মাথায় তুলিয়া লইয়া কহিল, আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ—

কি অনুরোধ অলকা ?

ষোড়শী মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া কহিল, সে আপনি জানেন।

জীবানন্দ একটুখানি ভাবিয়া বলিল, হয়ত জানি, হয়ত ভেবে দেখলে জানতেও পারব—কিন্তু সেই যে একদিন বলেছিলে সাবধানে থাকতে—কি জানি, সে বোধ হয় আর পেরে উঠব না। আজই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এই মন্দিরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কে দুজন দেবতার চৌকাঠ ছুঁয়ে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে শপথ করে গেল, তাদের মায়ের যে সর্ব্বনাশ করেচে তার সর্ব্বনাশ না করে তারা বিশ্রাম করবে না—আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের কানেই ত সমস্ত শুনলাম—দু'দিন আগে হলে হয়ত মনে হ'তো সে বুঝি আমি—দুশ্চিন্তার সীমা থাকত না, কিন্তু আজ কিছু মনেই হ'লো না—কি অলকা ?

না, কিছু নয়, বলিয়া ষোড়শী জোর করিয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে জীবানন্দ দেখিতে পাইল না, সহসা তাহার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। কহিল, চলুন, আমার ঘরে গিয়ে একটুখানি আজ বসতে হবে। আমাকে গাড়িতে তুলে না দিয়ে বাড়ি যেতে আপনাকে দেব না।—আসুন—

২৫

গরুর গাড়ির নীচে চাদর মুড়ি দিয়া গাড়োয়ান শুইয়াছিল, সে ষোড়শীর পায়ের শব্দ অনুভবে বুঝিয়া কহিল, মা, শৈবাল দীঘি ত দশ-বারো কোশের পথ, একটু রাত থাকতে বার না হলে পৌঁছতে কাল প্রহর বেলা উৎরে যাবে।

ষোড়শী বলিল, আচ্ছা, তাই হবে। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, কোথায় যাচ্চি বোধ করি শুনতে পেলেন ?

জীবানন্দ কহিল, পেলাম বই কি।

ষোড়শী কহিল, বেশি দূর নয়। আপনার আক্রোশ এ পথটুকু অনায়াসে খুঁজে বার করতে পারবে।

কিন্তু তোমার ওপর আক্রোশ ত আমার নেই।

ঘর খুলিয়া ষোড়শী প্রবেশ করিল। কহিল, আমার একটি মাত্র কম্বল গাড়িতে পাতা। আপনাকে বসতে দিই এমন কিছু নেই। নির্ম্মলবাবু হলে আঁচল বিছিয়ে দিতাম, কিন্তু আপনাকে ত তা মানাবে না। এই বলিয়া সে মুচকিয়া একটু হাসিয়া

ঘরের কোণ হইতে একখানি কুশাসন গ্রহণ করিয়া মেঝের উপর পাতিয়া দিয়া বলিল, যদি অপরাধ না নেন ত—

জীবানন্দ নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

এতবড় স্নেহের উত্তর না পাইয়া ষোড়শী মনে মনে বিস্মিত হইল। প্রদীপের আলো অতিশয় ক্ষীণ, হইয়া আসিতেছিল, ষোড়শী উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সেটা হাতে করিয়া জীবানন্দের মুখের কাছে আনিয়া মুহূর্ত্তকাল স্থিরভাবে থাকিয়া কহিল, কি ভাবচেন বলুন ত?

আমার ভাবনার কি অন্ত আছে?

অন্ত না থাকে আদি-ত আছে, তাই বলুন।

জীবানন্দ মাথা নাড়িয়া কহিল, না, তাও নেই। যার অন্ত নেই তার আদিও থাকে না।

ষোড়শীর মুখে আসিয়া পড়িল, বলে, ও-সকল কেবল দর্শনশাস্ত্রের বুলি—শুধু বাক্য—ও লইয়া সংসার চলে না, কিন্তু জীবানন্দের মুখ দেখিয়া তাহার নিজের মুখে স্বর বাহির হইল না। মনে মনে সে সত্যই বিস্ময়াপন্ন হইয়া অনুভব করিল, একট কেবল সুচতুর উত্তর দিবার জন্যই এ-কথা আজ সে বলে নাই, এ লইয়া আর বাদানুবাদ করিতে সে চাহে না। যাহাকে একান্তই নিষ্ফল বলিয়া বুঝিয়াছে সে লইয়া আর তর্ক কেন?

সেইখানে চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ষোড়শী উঠিয়া গিয়া প্রদীপ রাখিয়া হাত ধুইল, কহিল, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

কি?

এই ঘরে একদিন আমার কাছে আপনি চেয়ে খেয়েছিলেন, আজ তেমনি আমার চাওয়ায় আপনাকে খেতে হবে।

দাও। ক্ষিদেও পেয়েচে।

সে জানি। আমরা পুরুষমানুষের মুখের পানে চাইলেই টের পাই। বলিয়া ষোড়শী জল-হাতে মুছিয়া লইয়া সামনেই ঠাঁই করিয়া দিল। দেবীর প্রসাদ আজ ছিল না, কিন্তু প্রজারা আজ তাহাকে অনেক-কিছু দিয়া গিয়াছিল, তাহাই পাতায় করিয়া সাজাইয়া আনিতে ষোড়শী রান্নাঘরে চলিয়া গেলে একাকী চারিদিকে চাহিয়া সেদিনের সেই দোয়াত ও কলমটা কুলঙ্গির উপরে তাহার চোখে পড়িল। মিনিট দুই চিন্তা করিয়া সে তাহা পাড়িয়া আনিল। পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া তাহার শাদা অংশটা ছিঁড়িয়া লইয়া প্রদীপের সুমুখে সে পত্র লিখিতে বসিল। বোধ হয় তিন-চারি ছত্রের বেশি নয়, শেষ করিয়া ভাঁজ করিল, এবং উপরে ষোড়শীর নাম লিখিয়া তাহা পকেটে রাখিয়া দিল। খানিক পরে খাবার

লইয়া ষোড়শী প্রবেশ করিল। শালপাতায় জলে ভিজানো সরু ধানের চিড়া, শালপাতার ঠোঙায় দধি, আর একটা পাতায় কিছু ফল-মূল ও চিনি, এবং ঘটিতে করিয়া জল আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া একটুখানি মলিন হাসিয়া বলিল, সেদিন ধনীর দেওয়া ঠাকুরের প্রসাদ ছিল, আর আজ গরীবের ঘরের চিড়ে দই আর একটু চিনি। এ কি আপনার মুখে রুচবে?

জীবানন্দ হাত-মুখ ধুইয়া খাইতে বসিয়া বলিল, তুমি খেতে দিলে মুখের জন্যে ভাবিনে অলকা, কিন্তু পেটে সহ্য হলে হয়; আমার আবার সেই কলিকের ব্যথায়—

কথা শেষ না হতেই ষোড়শী চক্ষের পলকে পাতাটা টানিয়া লইল। ব্যাকুল ম্লান-মুখে কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, আমার পোড়াকপাল, তাই ভুলেছিলাম! কিন্তু এ ত আপনাকে আমি প্রাণান্তে খেতে দিতে পারব না।

জীবানন্দ নিজের কথায় লজ্জাবোধ করিয়া কহিল, বেশি না খেলে বোধ হয় ক্ষতি হবে না।

ষোড়শী বলিল, বোধ হয়! বোধ হয় নিয়ে আপনাদের চলে, কিন্তু আমাদের চলে না।

কিন্তু এর জন্যে ত তোমার দুঃখ হবে।

ষোড়শী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, দুঃখ হবে কি গো? যাবার সময় তোমার মুখের খাবার কেড়ে নিয়েচি, কিছু দিতে পারিনি—আমি তো কেঁদেই মরে যাবো। একটু মৌন থাকিয়া হঠাৎ ভারি একটা অনুনয়ের স্বরে বলিয়া উঠিল, ওবেলা নানা ঝঞ্ঝাটে রাঁধতে পারিনি, এবেলা সন্ধ্যার পর রেঁধেচি। ভাত, মাছের ঝোল—

মাছের ঝোল কি রকম?

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, কেন, আমি বিধবা নাকি? আমি ত সব খাই।

এতক্ষণ পরে জীবানন্দ হাসিল, বলিল, তাহলে সেগুলি সব নিজের জন্যে রেখে আমাকে দয়া করে ফলার খাওয়াতে গেলে কেন?

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ কহিল, আমার দোষ হয়েচে, অপরাধ হয়েচে—একশ'বার ঘাট স্বীকার করচি। যদি বলেন ত আপনার কাছে আমি দশ হাত মেপে নাকে খৎ দিতে পারি। এই বলিয়া সে ভিজা চিড়ার পাতাটা তুলিয়া ভাত ও মাছের ঝোল আনিতে হাসিমুখে উঠিয়া গেল।

ষোড়শীর প্রশ্নের উত্তরে জীবানন্দ যখন বলিয়াছিল, তাহার ভাবনার আদি-অন্ত নাই, তখন সে মিথ্যা বলে নাই, বোধ করি বাড়াইয়াও বলে নাই। এ-জীবনে নিজের জীবনকে সে কখনও আলোচনার বিষয় করে নাই, এবং কোনদিন কোন প্রয়োজনই তাহার মুহূর্তের প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। তাই,

তাহার ক্ষণকালের রুমালের প্রয়োজন ক্ষণপরেই ঢাকাই চাদরের চেয়ে ঢের বড়; তাই আস্তরণের অভাবে শয্যায় তাহার বহুমূল্য শাল পাতা, এইজন্যই সে হাতের কাছে এ্যাশট্রে না পাইলে সোনার ঘড়ির ডালার উপর জ্বলন্ত চুরুট রাখিতে লেশমাত্র ইতস্ততঃ করে না। ভবিষ্যৎ তাহার কাছে সত্যবস্তু নয়, যে আসে নাই, সেই অনাগতের প্রতি সে ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না। নারীর যে দেহটা সে চোখে দেখিতে পায়, তাহারই প্রতি তাহার আসক্তি, কিন্তু চোখ মেলিয়া যাহাকে দেখা যায় না, সেই তাহার দেহের অতিরিক্ত যে নারীত্ব—তাহার প্রতি তাহার কোন লোভই ছিল না। কিন্তু গ্রহবশে যৌবনের একান্তে আসিয়া আজ যে গহনে সে পথ ভুলিয়াছে, ইহার কোন সন্ধানই সে জানিত না। কিসের জন্য যে অলকার আশে-পাশে মন তাহার অহর্নিশি ঘুরিয়া মরিতেছে, নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধনায় যৌবন যাহার রুদ্ধ, নিপীড়িত, রূপ যাহার কঠিন ও ক্লান্তিহীন, তাহাকে অনুক্ষণ কামনা করিয়া সংসার যখন তাহার এমন বিস্বাদ হইয়া গেল, তখন কারণাতীত এই মোহের কৈফিয়ৎ সে নিজের কাছেই খুঁজিয়া পাইত না। কোন্ অবিদ্যমানে এই রমণী যে তাহার কোন অপূর্ণতা সম্পূর্ণ করিয়া দিবে, কি তাহার প্রয়োজন, এই অপরিচিত চিন্তার সে কূল পাইত না।

ভাত খাইতে বসিয়া একসময়ে সে বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল। সম্মুখে খোলা দোরের দিকে পিঠ করিয়া যোড়শী বসিয়াছিল, এই একটা সাধারণ প্রশ্নের ঠিকমত জবাব না পাইয়া সে বলিয়া উঠিল, আপনি কি ভাবচেন, আমার উত্তর দিচ্ছেন না?

জীবানন্দ মুখ তুলিয়া কহিল, কিসের?

যোড়শী বলিল, এইবারে ত আপনার চণ্ডীগড় ছেড়ে বাড়ি যাওয়া উচিত? আর ত এখানে আপনার কাজ নেই।

জীবানন্দ বোধ হয় অন্যমনস্কতার জন্যেই বুঝিতে পারিল না, কহিল, কাজ নেই?

যোড়শী বলিল, কই, আমি ত আর দেখতে পাইনে। এ গ্রাম আপনার, একে নিষ্পাপ করবার জন্যই আপনি এসেছিলেন। আমার মত অসতীকে নির্বাসিত করার পরে আর এখানে আপনার কি আবশ্যক আছে আমি ত দেখতে পাইনে।

কিন্তু তুমি ত অসতী নও। এই বলিয়া জীবানন্দ চোখ মেলিয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল মাত্র তাহাদের চোখে চোখে মিলিল, তাহা পরে যোড়শী মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু এতক্ষণ এত কথাবার্তার মধ্যে যে বস্তুটা সে লক্ষ্য করে নাই, এই ক্ষণিকের দৃষ্টিতে এই প্রথম দেখিতে পাইয়া সে যথার্থই বিস্মিত হইল। জীবানন্দের চোখে বুদ্ধির সেই অতিতীক্ষ্ণতা ছিল না, মুখের কথার মত চাহনি তাহার স্পষ্ট, সরল এবং স্থূল। তাহার বক্রোক্তি ও অভিমান যে এই লোকটির কাছে

নিষ্ফল হইয়াছে তাহা সে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইল। একটু চুপ করিয়া কহিল, কিন্তু এ-কথা ত এতদিন আমার চেয়ে আপনিই বেশি জানতেন।

জীবানন্দ বলিল, কিন্তু নির্ম্মল তোমাকে ভালবাসে এ ত সত্য।

প্রত্যুত্তরে ষোড়শী তাহার আরক্ত মুখ অপরের দৃষ্টির আড়ালে রাখিয়া কহিল, সে কি আমার দোষ? আর কেউ যদি ভালবাসার কদর্য্যতায় জীবন আমার দুর্ব্বহ করে তোলে, সেও কি আমার অপরাধ? কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে তাহার মুখ দেখিয়া অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া তাড়াতাড়ি কহিল, কিন্তু আমার দোষের জন্যে ত আর এরা দায়ী নয়! এই বলিয়া সে সম্মুখের অন্ন-পাত্রটা দেখাইয়া বলিল, খাওয়া বন্ধ হ'লো কেন? সবই যে পড়ে রইল?

না, এই ত খাচ্চি, বলিয়া সে আহারে মন দিল।

গাড়োয়ান হাঁকিয়া কহিল, মা, আর কি বেশি দেরি হবে?

না, বাবা, আর বেশি দেরি হবে না। গলা খাটো করিয়া কহিল, চণ্ডীগড় থেকে আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে, তা বলে দিচ্চি।

জীবানন্দ কহিল, কোথায় যাবো বল?

কেন, আপনার নিজের বাড়িতে, বীজগাঁয়ে।

বেশ, তাই যাবো।

কিন্তু কালকেই যেতে হবে।

জীবানন্দ মুখ তুলিয়া বলিল, কালই? কিন্তু কাজ আছে যে। মাঠের জল-নিকেশের একটা সাঁকো করা দরকার। এদের জমিগুলো সব ফিরিয়ে দিতে হবে, সে ত তোমারই হুকুম। তা ছাড়া, মন্দিরের একটা ভালো বিলি-ব্যবস্থা হওয়া চাই—অথিতি-অভ্যাগত যারা আসে তাদের উপর না অত্যাচার হয়—এ সব না করেই কি তুমি চলে যেতে বলচ?

ষোড়শী মুস্কিলে পড়িল। কিন্তু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ-সব সাধু সঙ্কল্প কি কাল সকাল পর্য্যন্ত থাকবে?

জীবানন্দ এই পরিহাসে যোগ দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

ষোড়শী বলিল, কিন্তু আবশ্যকের চেয়ে একটা দিনও বেশি থাকবেন না আমাকে কথা দিন। এবং সে ক'টা দিন আগেকার মত সাবধানে থাকবেন বলুন?

এ কথারও সে জবাব দিল না, নিঃশব্দে বসিয়া আহার করিতে লাগিল। ষোড়শী জিদ করিল না, কিন্তু কথার চেয়ে নীরবতা জীবানন্দের ভিতরের পরিবর্ত্তন তাহার কাছে অধিকতর সুব্যক্ত করিল।

খাওয়া শেষ হইলে বাহিরে আসিয়া ষোড়শী তাহার হাতে জল ঢালিয়া দিল; একমাত্র গামছাটা পুঁটুলির কাজে নিযুক্ত হইয়া আগে হইতেই গাড়ির মধ্যে স্থান

লাভ করিয়াছিল, নিজের অঞ্চলটা সে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া শুধু কহিল, এই নিন!

জীবানন্দ হাত-মুখ মুছিয়া হঠাৎ বলিল, এ কিন্তু তুমি আর কাউকে দিতে পারতে না অলকা।

ষোড়শী আঁচলটা তাহার টানিয়া লইয়া আনত-মুখে শুধু কহিল, ঘরে এসে আর একটু বসুন, গুছিয়ে নিয়ে বার হয়ে পড়তে আর বেশি দেরি হবে না। আমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে তবে আপনি যেতে পাবেন।

জীবানন্দ কহিল, অর্থাৎ তোমাকে নির্ব্বাসিত করার কাজটা নিঃশেষ করেই যেতে পারি। ভালো, আমি তাই করে যাবো, কিন্তু তোমারও একটা কাজ রইল। আমার কৃত-কর্ম্মের ফল আমি ভোগ করব না ত কে করবে—সে অভিযোগ আমি একটিবারও কারো কাছে করিনি—কিন্তু যাবার সময় তোমার কাছে শুধু এইটুকু মাত্র দাবি করব, আমি তার বেশি আর দুঃখ না পাই। এই বলিয়া সে ঘরে আসিয়া পকেট হইতে চিঠি বাহির করিয়া ষোড়শীর হাতে দিয়া কহিল, সারাদিন তোমার খাওয়া হয়নি, এইবার কিছু মুখে দাও আমি ততক্ষণ অন্ধকারে খানিক ঘুরে আসি। ঠিক সময়ে উপস্থিত হবো। এই বলিয়া সে বাহির হইবার উপক্রম করিতেই চক্ষের পলকে ষোড়শী দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল। এত কথার মধ্যেও যে এই পরদুঃখ-বিমুখ আত্মসর্ব্বস্ব লোকটি তাহার খাইবার অতি তুচ্ছ ব্যাপারটি মনে রাখিয়াছে, এই কথা মনে করিয়া তাহার বুকে স্‌চ ফুটিল, হাতের চিঠিখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ ত আমাকেই লেখা, আপনার সুমুখেই কি এ পত্র আমি পড়তে পারিনে?

জীবানন্দ কহিল, পারো, কিন্তু অনাবশ্যক, এর জবাব দেবার ত প্রয়োজন হবে না। আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাবার জন্য তার ঢের বেশি দুঃখ তুমি নিজে নিয়েচ। নইলে এমন করে হয়ত তোমাকে যেতেও হ'তো না। আমার শেষ অনুরোধ এতেই লেখা আছে, তা যদি রাখতে পারো, তার চেয়ে আনন্দ আমার নেই।

ষোড়শী কহিল, তা হলে পড়ি?

জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। ষোড়শী কাগজখানি হাতের পর মেলিয়া ধরিয়া হেঁট হইয়া সেই ছত্র-কয়েকের লিখনটুকু এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়া নির্ব্বাক্ ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে তাহার নাম লিখা থাকিলেও, বস্তুত এ পত্র তাহার নয়। ভিতরে ছিল—

ফকিরসাহেব,

ষোড়শীর আসল নাম অলকা। সে আমার স্ত্রী। আপনার কুষ্ঠাশ্রমের কল্যাণ...

কামনা করি, কিন্তু তাহাকে দিয়া কোন ছোট কাজ করাইবেন না। আশ্রম যেখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সে আমার নয়, কিন্তু তাহার সংলগ্ন শৈবাল-দীঘি আমার। এই গ্রামের মুনাফা পাঁচ-ছয় হাজার টাকা। আপনাকে জানি। কিন্তু আপনার অবর্ত্তমানে পাছে কেহ তাহাকে নিরুপায় মনে করিয়া অমর্য্যাদা করে এই ভয়ে আশ্রমের জন্যই গ্রামখানি তাহাকে দিলাম। আপনি নিজে একদিন আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন, এই দান পাকা করিয়া লইতে যাহা-কিছু প্রয়োজন করিবেন, সে খরচ আমি দিব। কাগজ-পত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলে আমি সহি করিয়া রেজিস্টারী করিয়া দিব।

শ্রীজীবানন্দ চৌধুরী

ষোড়শী বাহিরে গিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি এত খবর কোথায় পেলে? আমি যে কুষ্ঠাশ্রমের দাসী হয়ে যাচ্চি এই বা তুমি জানলে কি করে?

জীবানন্দ কহিল, কুষ্ঠাশ্রমেব কথা অনেকেই জানে। আর তোমার কথা? আজই দেবতার স্থানে দাঁড়িয়ে যারা শপথ করে গেল, নিজের কানে শুনেও অন্ধকারে আমি যাদের চিনতে পারিনি, তুমি তাদের চিনলে কি করে?

ষোড়শী ইহার ঠিক জবাবটা দিতে না পারিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, তোমার কি সংসারে আর মন নেই? সমস্ত বিলিয়ে নষ্ট করে দিয়ে কি তুমি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে চাও নাকি?

প্রশ্নটা দুজনের কানেই অদ্ভুত ঠেকিল। জীবানন্দ প্রথমে জবাব দিতে পারিল না, কিন্তু দেখিতে দেখিতে সে কি-রকম উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল, আমি সন্ন্যাসী? মিছে কথা। সংসারে আর আমি কিছুই নষ্ট করতে পারব না। এখানে আমি বাঁচতে চাই—মানুষের মাঝখানে মানুষের মত বাঁচতে চাই। বাড়ি চাই, ঘর চাই, স্ত্রী চাই, ছেলেপুলে চাই—আর মরণ যেদিন আটকাতে পারব না, সেদিন তাদের চোখের উপর দিয়েই চলে যেতে চাই। আমার অনেক গেছে, কত যে গেছে শুনলে তুমি চমকে যাবে—কিন্তু আর আমি লোকসান করতে পারব না।

ষোড়শী সভয়ে আস্তে আস্তে বলিল, কিন্তু আমি ত সন্ন্যাসিনী। পৃথিবীতে স্ত্রী-লোকের অভাব নেই—কিন্তু এর মধ্যে আমাকে তুমি জড়াতে চাইচ কেন?

জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের অভাব আছে কি নাই, এ-কথা তাহাকে বলিবার স্পর্দ্ধা যাহার হইল তাহাকে সে আর কি বলিবে?

গাড়োয়ান প্রাঙ্গণ হইতে তাড়া দিয়া বলিল, মা, রাত পোহাতে যে আর দেরি নেই।

চল বাবা, যাচ্চি। এই বলিয়া ষোড়শী তেলটুকু প্রদীপের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া ক্ষীণ দীপশিখা সমুজ্জ্বল করিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল। ঘরে তালা বন্ধ করিবার আবশ্যক ছিল না, জীর্ণদ্বারে শুধু শিলকটি তুলিয়া দিয়া, গলায় অঞ্চল দিয়া জীবানন্দের পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া কহিল, আমি চললাম।

জীবানন্দ কহিল, খাবার সময়টুকুও হ'ল না।

না। প্রজারা জানে না আমি ভোরবেলায় যাত্রা করব, তারা এসে পড়বার পূর্ব্বেই আমার বিদায় হওয়া চাই। একটু হাসিয়া কহিল, এক-আধ দিন না খেলে আমাদের মরণ হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জীবানন্দ তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিল। গাড়ি ছাড়িয়া দিলে তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, অলকা, তোমার মা একদিন তোমাকে আমার হাতে দিয়েছিলেন, তবু তোমাকে পেলাম না, কিন্তু, সেদিন আমাকে যদি কেউ তোমার হাতে সঁপে দিতেন, আজ বোধ হয় তুমি অন্ধকারে আমাকে এমন করে ফেলে যেতে পারতে না।

ইহার জবাব ষোড়শী খুঁজিয়া পাইল না। শুধু কথাগুলোর একটা অব্যক্ত, অপরিসীম ব্যাকুলধ্বনি তাহার দুই কান আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। গাড়ি মোড় ফিরিবার পূর্ব্বেও সে মুখ বাড়াইয়া দেখিল শেষ-নিশার প্রগাঢ় অন্ধকারে ঠিক সেইখানেই সে তেমনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

রাত্রি প্রভাত হইতে তখন খুব বেশি বিলম্ব ছিল না, জীবানন্দ মাঠের পথ ধরিয়া তাহার গৃহে ফিরিল। কিছুক্ষণ হইতে অস্ফুট কোলাহল তাহার কানে যাইতে ছিল, কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সুমুখের আকাশে ঊষার আরক্ত আভার মত রাঙা আলো তাহার চোখে পড়িল, এবং চলার সঙ্গে সঙ্গেই এই শব্দ ও আলোক উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতে লাগিল। অবশেষে কাছাকাছি আসিয়া দেখিতে পাইল বহুলোকের ব্যর্থ চীৎকার ও ছুটাছুটির মধ্যে বীজগ্রামের জমিদার-গোষ্ঠীর প্রমোদ-ভবন, তাহার মাতামহের অত্যন্ত সাধের শান্তিকুঞ্জ অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইতে আর বিলম্ব নাই।

২৬

সকাল হইতে না-হইতে চণ্ডীগড়ের সমস্ত ইতর-ভদ্র হাহাকার করিয়া আসিয়া পড়িল। শিরোমণি আসিলেন, রায়মহাশয় আসিলেন, তারাদাস আসিলেন, এবং আরও অনেক ভদ্র ব্যক্তি—পোড়া শান্তিকুঞ্জের সব পুড়িল না, দৈবাৎ কিছু রক্ষা পাইল; এবং যাহা পুড়িল তাহার দাম কত, এবং যাহা বাঁচিল তাহা সামান্য এবং অকিঞ্চিৎকর কি না, ইত্যাদি তথ্য সবিস্তারে ও নিশ্চয় করিয়া আহরণ করিতে ছুটিয়া আসিলেন। এবং ইহা কেমন করিয়া হইল ও কে করিল? সকলের মাঝখানে এককড়ি নন্দী তুমুল কাণ্ড করিতে লাগিল। সর্ব্বনাশ যেন তাহারই হইয়া গেছে। সে সর্ব্বসমক্ষে ডাক ছাড়িয়া প্রকাশ করিল যে, এ-কাজ সাগর সর্দ্দারের। সে ও তাহার জন-দুই সঙ্গীকে কেহ কেহ কাল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে। থানায় এত্তেলা পাঠানো হইয়াছে, পুলিশ আসিল বলিয়া। সমস্ত ভূমিজ-গোষ্ঠীকে যদি না সে এই ব্যাপারে আন্দামানে পাঠাইতে পারে ত তাহার নাম এককড়ি নন্দী নয়—বৃথাই সে এতকাল হুজুরের সরকারে গোলামী করিয়া মরিল!

নির্ব্বাপিতপ্রায় অগ্নুত্তাপ হইতে একটু দূরে একটা বটবৃক্ষছায়াতলে সভা বসিয়াছিল। জীবানন্দ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার মুখের উপর শ্রান্তির অবসন্নতা ছাড়া উদ্বেগ বা উত্তেজনা কিছুই ছিল না, একটু হাসিয়া কহিলেন, তা হ'লে তোমাকেও ত এদের সঙ্গে যেতে হয় এককড়ি। জমিদারের গোমস্তাগিরি কাজে তুমি যাদের ঘরে আগুন দিয়েচ, সে-খবর ত আমি জানি। আগুন লাগাতে কেউ তাদের চোখে দেখেনি, মিথ্যে সন্দেহের উপর পুলিশ যদি তাদের উপর অত্যাচার করে, সত্যি কাজের জন্য তোমাকেও তার ভাগ নিতে হবে।

তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইল। এককড়ি প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল, পরে ইহাকে পরিহাসের আকৃতি দিতে শুষ্ক-হাস্যের সহিত বলিল, হুজুর মা-বাপ। আমাদের সাতপুরুষ হ'লো হুজুরের গোলাম। হুজুরের আদেশে শুধু জেল কেন, ফাঁসি যাওয়াও আমাদের অহঙ্কার।

জীবানন্দ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, আমাকে না জানিয়ে পুলিশে খবর দেওয়া তোমার উচিত হয়নি। যা পুড়েছে সে আর ফিরবে না. কিন্তু এর উপর যদি পুলিশের সঙ্গে জুটে নতুন হাঙ্গামা বাধিয়ে দু'পয়সা উপরি রোজগারের চেষ্টা কর, তা হলে লোকসানের মাত্রা ঢের বেড়ে যাবে।

অনেকেই মুখ টিপিয়া হাসিল। এককড়ি জবাব দিতে পারিল না—ক্রোধে মুখ

কালো করিয়া শুধু মনে মনে তাহার বংশলোপ কামনা করিল। নদীর দিকের চাকরদের ঘরগুলা বাঁচিয়াছিল, তাহারই দ্বিতলের গোটা-দুই ঘরে উপস্থিত মত বাস করিবার সংকল্প জানাইয়া, জীবানন্দ অভ্যাগত হিতাকাঙ্খীর দলটিকে বিদায় দিয়া কেবল তারাদাস ঠাকুরকেই কাল সকালে একবার দেখা করিতে আদেশ করিলেন।

তারাদাস কহিল, কাল রাত্রে ষোড়শী চলে গেছে—

আমি খবর পেয়েচি।

গোটা-কয়েক থালা-ঘটি-বাটি পাওয়া যাচ্চে না—

তাহলে সেগুলো আবার কিনে নিতে হবে।

এই অগ্নিদাহের সম্বন্ধে অচিরকাল মধ্যে মুখে মুখে নানা কথা প্রচারিত হইয়া গেল। জমিদার সে-রাত্রে গৃহে ছিলেন না, ইহা লইয়া অধিক আলোচনা অনেকের কাছেই নিষ্প্রয়োজন মনে হইল, কিন্তু ষোড়শী ভৈরবীর যাওয়ার সহিত যে ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, এবং এ কাজ যাহারা করিযাছে জানিয়া-বুঝিয়াও যে জমিদার তাহাকে অব্যাহতি দিলেন এই কথা লইয়া অনুমান ও সংশয়-প্রকাশের অবধি রহিল না। রায়মহাশয় বিষয়ী লোক, এককড়ির ফাঁদের মধ্যে জীবানন্দ পা দিল না দেখিয়া ইহার বিষয়-বুদ্ধির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িল, কিন্তু নিজের জন্য তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ষোড়শীকে তাড়ানোর কাজে তিনিও একজন পাণ্ডা, এবং জমিদারের গৃহ যাহারা ভস্মীভূত করিয়া দিল তাহারা আশে-পাশেই কোথাও অবস্থিতি করিতেছে, এই কথা স্মরণ করিয়া বিছানায় মধ্যে তাঁহার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া উঠিল। পাহারার জন্য চারিদিকে লোক মোতায়েন করিয়াও তিনি সারারাত্রি বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আর শুধু কি কেবল বাড়ি? তাহার অনেক ধানের গোলা, অনেক খড়ের মাড়, শস্য-সঞ্চয়ের বিপুল ব্যবস্থা—এই সকল রক্ষা করিতে তাঁহাকে অনুক্ষণ সতর্ক থাকিতে হইবে। ভয়ে ভয়ে দিন কাটিতে লাগিল—তবুও দিনগুলো যা হোক করিয়া কাটিয়াছে, কিন্তু ইতিমধ্যে এমন একটা কাণ্ড ঘটিল যাহাতে ভাবিয়া পার পাইবার আর পথ রহিল না। আদালতের পরওয়ানা আসিয়া পৌছিল, ভূমিজ ও অন্যান্য প্রজারা একযোগে জমিদার ও তাঁহার নামে নালিশ রুজু করিয়াছে। যে জমিটা তাঁহারা একত্রে আখের চাষ ও গুড়ের কারখানা করিতে মাদ্রাজী সাহেবকে বিক্রি করিয়াছিলেন, তাহাই বাতিল ও নাকচ করিবার আবেদন। খবর আসিয়াছে, কোর্টের প্রস্তাবে ও ইঙ্গিতে কালেক্টর সাহেব স্বয়ং সরজমিনে আসিয়া তদন্ত করিয়া যাইবেন। অনেক টাকার ব্যাপার, অতএব এককড়ির সহযোগে অনেক ঢেরা-সই করিয়াছেন, অনেক বন্ধকী তমসুক ও কর্জ্জার খত প্রস্তুত করিয়াছেন—একের বিষয় অপরকে বিক্রয় করিবার যত প্রকার গলি-ঘুঁজি আছে অতিক্রম করিয়াছেন—

সেই-সব মনশ্চক্ষে উপলব্ধি করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন; কিন্তু ইহার চেয়েও একটা বড় কথা এই যে, এইসকল হীন, মূর্খ, মৃতকল্প চাষীর দল এতবড় সাহস পাইল কি করিয়া যে, গ্রামের মধ্যে বাস করিয়াও এই দুর্দ্দান্ত জীবানন্দ চৌধুরী ও জনার্দ্দন রায়ের নামে নালিশ করিয়া বসিল! জীবনের অধিকাংশ কাল যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, শীতের রাত্রে যাহারা বসিয়া কাটায়, মারীর দিনে যাহারা কুকুর-বেড়ালের মত মরে, আবাদের দিনে এক-মুষ্টি বীজের জন্য যাহারা ওই দরজার বাহিরে পড়িয়া হত্যা দেয়, তাহারা আদালতে দাঁড়াইবার টাকা পাইল কাহার কাছে? এ দুর্ম্মতি তাহাদের কে দিল? সে কি এই সোজা কথাটা ইহাদের বলিয়া দিতে পারিল না যে, কেবল জেলা-আদালতেই নয়, হাইকোর্ট বলিয়াও একটা ব্যাপার আছে, সেখানে জীবানন্দ-জনার্দ্দনকে ডিঙাইয়া সাগর সর্দ্দার কখনও জয়ী হইতে পারে না। ইংরেজের বিচারালয় ধনীর জন্য তৈরি, দরিদ্রের জন্য নয়—তাঁহার অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, ব্যারিস্টার জামাই আছে, বিশ্বস্ত উকিল মোক্তার আছে, এবং আরও কত কি সুবিধা-সুযোগ আছে—এই-সকল আপনাকে আপনি বলিয়া জনার্দ্দন শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সুবিধা বিশেষ হইল না। কারণ, এ ত শুধু টাকা-কড়ি, জমি-জমা, কেনা-বেচাই নয়, এতদুপলক্ষে যে-সকল অসামান্য কার্য্যগুলা সম্পন্ন করাইয়াছেন, তাহার ফলস্বরূপ ফৌজদারী দণ্ডবিধির কেতাবের পাতায় পাতায় যে-সকল কঠিন বাক্য লিপিবদ্ধ করা আছে, তাহাদের নিষ্ঠুর চেহারা আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহাকে অত্যন্ত ভয় দেখাইতে লাগিল।

এ-কথা রাষ্ট্র হইতে যে অবশিষ্ট নাই, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় রায়মহাশয় তাহা জানিতেন, তাই দিনের বেলাটা কোনমতে কাটাইয়া রাত্রের অন্ধকারে এককড়িকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং জমিদার-সরকার হইতে ইহার কিরূপ বিহিত হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলেন।

এককড়ি কহিল, হুজুরের কাছে ত এখনও পেশ করা হয়নি।

জনার্দ্দন রাগ করিয়া কহিলেন, করনি ত কর গে। বুড়ো বয়সে কি শেষে ফাটক খাটবো নাকি?

তাঁহার শঙ্কা ও ব্যাকুলতায় এককড়ি হাসিয়া বলিল, ভয় কি রায়মশাই, ফাটক খাটতে হয় ত আমিই খাটবো, আপনাদের যেতে দেব না। কিন্তু গরীবের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন, ভুলবেন না।

জনার্দ্দন খুশী হইয়া কহিলেন, সে ত জানি এককড়ি, তুমি থাকতে ভয় নেই, তুমি যা বোঝো উকিলের বাবাও তা বোঝে না, কিন্তু জানো ত সব? কে সাহেব নাকি নিজে তদারকে আসচে—ব্যাটা মহা বদমাইস। কিন্তু ভেতরের খবর কিছু

জানো? কে ব্যাটাদের বুদ্ধি দিলে বল ত? টাকা কে যোগালে?

এককড়ি অসঙ্কোচে ষোড়শীর নাম করিয়া বলিল, টাকা যোগালেন মা চণ্ডী, আর কে? তাতেই ত তাড়াতাড়ি আড়ালে সরে গেল।

ছুঁড়ি আছে কোথায় বল ত?

এককড়ি কহিল, কাছাকাছি কোথাও লুকিয়েচে—জানতে একদিন পারবই।

জনার্দ্দন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, খবরটা নিয়ো। হাঙ্গামাটা কেটে যাক, তার পরে।

এককড়ি নন্দী সেদিন এইখানে আহারাদি করিয়া অনেক রাত্রে বাড়ি গেল। অভিমান করিয়া বলিল, সেদিন সাগর সর্দ্দারের প্রসঙ্গে আপনারা সবাই তার মন যুগিয়ে মুখ টিপে হাসলেন, কিন্তু পুলিশের কাছে সেদিন খবরটি দিয়ে রাখলে আজ এ বিপদ আপনাদের ঘটতো না।

জনার্দ্দন সলজ্জে ত্রুটি স্বীকার করিলেন, এককড়ি তখন প্রভুর সম্বন্ধে বিশেষ একটি সংবাদ তাঁহার গোচর করিয়া কহিল, মদ খেয়ে বরঞ্চ ছিল ভাল, এখন কথা বলাই তার! কলিক্ লেগেই আছে—এতকালের অভ্যাস, হয়ত আর বেশীদিন নয়।

জনার্দ্দন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কহিলেন, সত্যি-সত্যিই খায় না নাকি?

এককড়ি মাথা নাড়িয়া বলিল, এটা সত্যি যে খায় না। সূর্য্যদেব পশ্চিমে ওঠাও সহজ—কিন্তু কি জানেন রায়মশাই, ভয়ানক একগুঁয়ে লোক—সেদিন সারাদিনের যন্ত্রণায় রাত্রে হাত-পা প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এলো, ডাক্তারবাবু ভয় পেয়ে বললেন, আমার কথা রেখে অন্ততঃ এক-চামচ খান—হার্ট ফেল্ করতে পারে—বাবুর কিন্তু ভয়ই হ'লো না। একটু হেসে বললেন, এতকালের মধ্যে ও-বেচারা কখ্খনো ফেল করেনি, সমানে চলেছে, আজ যদি একদিন করেই ফেলে ত আর দোষ দেব না, কিন্তু আমি জীবন-ভোরই ফেল করে আসচি, আজ অন্ততঃ একটা দিনও আমাকে পাশ করতে দিন। কেউ খাওয়াতে পারলে না।

বল কি!

এককড়ি কহিল, খেয়াল চেপেছে বাড়ি মেরামত থাক্, ওই টাকায় মাঠের মাঝখানে এক সাঁকো, আর রূপসী বিলের উত্তরধারে একটা মস্ত বাঁধ তুলতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারবাবু এসেছিলেন, হিসেব ক'রে বললেন, ও টাকায় দশখানা বাড়ি মেরামত হতে পারে। তার একভাগ এদিকে দিয়ে বাড়িটা রক্ষা করুন. কিন্তু কিছুতেই না। দেওয়ানজী বাপের বয়সী বুড়োমানুষ, বললেন, জমিদারী বাঁধা পড়বে যে? বাবু বললেন, প্রজারা সব বছর বছর খাজনা যোগাচ্চে আর মরচে। তাদের জান বাঁচাবার জন্যে যদি জমিদারী বাঁধা পড়ে পড়ুক না। ও শোধা যাবে।

রায়মহাশয় চুপ করিয়া শেষে বলিলেন, মাথা খারাপ-টারাপ হয়নি ত?

ইহার দিন-দুই পরে খবর লইয়া যখন জনার্দ্দন জানিতে পারিলেন এককড়ি আজও সে-কথা হুজুরে পেশ করে নাই, তখন তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অপদার্থ ও ভীতু বলিয়া মনে মনে তাহাকে তিরস্কার করিলেন, এবং রাত্রে সুনিদ্রা হইল না। সাহেব হঠাৎ যদি একদিন এত্তেলা পাঠাইয়া সরজমিনে আসিয়া পড়ে ত বিপদের অবধি থাকিবে না। সকলদিকে প্রস্তুত না থাকিলে যে কি ঘটিতে পারে বলা যায় না।- স্থির করিলেন, পরদিন দেখা করিয়া নিজেই সকল কথা নিবেদন করিবেন—পরের উপর নির্ভর করিয়া সময় নষ্ট করিলে মরিতে হইবে।

সকালে এক শত আটবার দুর্গানাম জপ করিলেন, শ্রীশ্রী৺চণ্ডীমাতার নাম লাল কালি দিয়া কাগজের উপর লিখিয়া কাজটা পাকা করিয়া লইলেন, এবং হাঁচি, টিকটিকি, শূন্যকুম্ভ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিপত্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া মোটা দেখিয়া জন-চারেক লোক সঙ্গে করিয়া জমিদারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইল না, জন পাঁচ-ছয় লোক ছুটিয়া আসিয়া যে খবর দিল, তাহা যেমন অপ্রীতিকর তেমনি অপ্রত্যাশিত। বেশী নয়, কাঠা-দশেক পরিমাণ বড় রাস্তার উপরেই একটা জায়গা কিছুকাল হইতে রায়মহাশয় দখল করিয়া ঘিরিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, দোকান-ঘরটা এইখানে সরাইয়া আনিবেন। সম্পত্তি চণ্ডীর এবং এই লইয়া ষোড়শীর সহিত তাঁহার বাদানুবাদও হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরাক্রান্ত জনার্দ্দন রায়কে সে বাধা দিতে পারে নাই। এ-সম্বন্ধে তাঁহার কি একটা দলিলও ছিল, কিন্তু গ্রামের লোকেরা তাহা বিশ্বাস করিত না। আজ সকালে এইটাই তাহার বে-দখল করা হইয়াছে। জনার্দ্দন ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অনেকেই হাজির আছেন। শিরোমণি, তারাদাস, গগন চক্রবর্ত্তী এবং আরও কয়েকজন তাহার দলভুক্ত ভদ্রব্যক্তিদের সমক্ষে জীবানন্দ চৌধুরী নিজে হুকুম দিয়া এবং নিজের লোক দিয়া তাঁহার বেড়া ভাঙাইয়া মন্দির-সংলগ্ন ভূখণ্ডের অন্তর্গত করিয়া দিয়াছেন। কেহই প্রতিবাদ করিতে ভরসা করে নাই।

জনার্দ্দন দুঃসহ ক্রোধ দমন করিয়া সবিনয়ে কহিলেন, এ-সব করার আগে হুজুর ত আমাকে একটা খবর পাঠাতে পারতেন?

জীবানন্দ হাসিয়া কহিলেন, তাতে অনর্থক দেরী হ'তো বই ত নয়, খবর আপনার কাছে পৌঁছবেই জানি।

জনার্দ্দন বলিলেন, খবর পৌঁছেচে, কিন্তু একটা দিন আগে পৌঁছলে মামলা-মকদ্দমটা হয়ত বাধত না।

জীবানন্দ তেমনি হাসিমুখে বলিলেন, এতেও ত বাধা উচিত নয় রায়মশাই। ভৈরবীদের হাতে দেবীর অনেক সম্পত্তিই বে-হাত হয়ে গেছে, আবার সেগুলো হাত-বদল হওয়া দরকার।

জনার্দ্দন কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিলেন, তাঁর চেয়ে আর সুখের কথা কি আছে হুজুর। শুনতে পাই, সমস্ত গ্রামখানিই নাকি একদিন মা চণ্ডীর ছিল, এখন কিন্তু—

খোঁচাটা সকলেই উপভোগ করিলেন। শিরোমণি ঠাকুর ত জনার্দ্দন রায়ের বুদ্ধি ও বাক্-চাতুর্য্যে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন।

জীবানন্দের মুখের চেহারায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। বলিলেন, তার ত্রুটি হবে না রায়মশাই। মা চণ্ডীর সমস্ত দলিল-পত্র, নকশা, ম্যাপ প্রভৃতি যা-কিছু ছিল আমি কলকাতায় এটর্নির বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েচি। কিন্তু আপনারা আমার সহায় থাকবেন।

শিরোমণি জয়ধ্বনি করিলেন; কিন্তু কথাটা সত্য হইলে কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়িবে চিন্তা করিয়া ক্রোধে ও শঙ্কায় জনার্দ্দনের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার চেয়েও ঢের বড় বিপদ তাঁহার মাথার 'পরে ঝুলিতেছে স্মরণ করিয়া আজিকার মত তিনি আত্মসংবরণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। যে উদ্দেশ্যে বাটীর বাহির হইয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইল। পথে চলিতে চলিতে তাঁহার মনে হইল, আমার না হয় দু-একশ' বিঘা টান ধরিতে পারে, কিন্তু নিজে যে সমস্ত চণ্ডীগড় গিলিয়া বসিয়াছেন তাহার কি? সুতরাং কথাটা যে নেহাৎ বাজে, নিছক ধোঁকা দিবার জন্যই বলা এ-বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। বাড়ি ঢুকিয়া তামাকের জন্য একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া বসিবার ঘরে পা দিয়াই কিন্তু তিনি চমকিয়া গেলেন। একধারে লুকাইয়া বসিয়া এককড়ি; তাহার মুখ শুষ্ক, চেহারা ম্লান—কি হে, তুমি যে হঠাৎ এখানে? তোমার পাগলা মনিব ত ওদিকে লাঠালাঠি বাধিয়েচেন।

এককড়ি কহিল, জানি। আর সেই পাগলের কাছেই এখনি একবার আমাদের ছুটতে হবে।

জনার্দ্দন ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন বল ত?

এককড়ি কহিল, ছোটলোক ব্যাটাদের বুদ্ধি এবং টাকা কে যুগিয়েচে জানতে পারলাম না; কিন্তু এটুকু জানতে পারলাম তারা সাক্ষী মানলে হুজুর গোপন কিছুই করবেন না। দলিল তৈরির কথা পর্য্যন্ত না।

জনার্দ্দনের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। লোকটার একগুঁয়েমির যে ভয়ানক ইতিহাস সেদিন শুনিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল। তাঁহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—এ কি লঙ্কাকাণ্ড করবে না কি শেষে!

সাজা তামাক তাঁহার পুড়িতে লাগিল, স্নানের জল ঠাণ্ডা হইতে লাগিল, জনার্দ্দন

ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। জীবানন্দ তখন মন্দিরের একটা ভাঙা খিলান পরীক্ষা করিতেছিলেন, এবং তারাদাস অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রশ্নের জবাব দিতেছিল, জনার্দ্দন একেবারে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হুজুর! সমস্ত ব্যাপার একবার মনে করে দেখুন।

জীবানন্দ প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না কিসের ব্যাপার, কিন্তু তাহার অস্বাভাবিক ব্যাকুলতা এবং প্রাঙ্গণের একধারে এককড়ি নন্দীকে দেখিতে পাইয়া কাল রাত্রের কথা স্মরণ হইল। বলিলেন, কিন্তু উপায় কি রায়মশাই! সাহেব জমি ছাড়তে চায় না, সে সস্তায় কিনেচে—তাছাড়া তার বিস্তর ক্ষতিও হবে। সুতরাং মকদ্দমা জেতা ছাড়া প্রজাদের আর ত পথ দেখিনে।

জনার্দ্দন আকুল হইয়া কহিলেন, কিন্তু আমাদের পথ ?

জীবানন্দ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, সে ঠিক ; আমাদের পথও খুব দুর্গম মনে হয়।

তাঁহার শান্ত কণ্ঠ ও নির্ব্বিকার মুখের ভাব দেখিয়া জনার্দ্দন নিজেকে আর সামলাইতে পারিলেন না। মরিয়া হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হুজুর, পথ শুধু দুর্গম নয়—জেল খাটতে হবে, এবং আমার একা নয়, আপনিও হয়ত বাদ যাবেন না।

জীবানন্দ একটুখানি হাসিলেন, বলিলেন, তাই বা কি করা যাবে রায়মশাই। সখ করে যখন গাছ পোঁতা গেছে, তখন ফল খেতে হবে বই কি!

জনার্দ্দন আর জবাব দিলেন না। ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেলেন। এককড়ি সব কথা বোধ হয় শুনিতে পায় নাই; সে দ্রুতপদে কাছে আসিতেই তাহাকে চীৎকার করিয়া বলিলেন, এ আমাদের সর্ব্বনাশ করবে এককড়ি, আমার নির্ম্মলকে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দাও—সে একবার এসে পড়ুক।

২৭

চণ্ডীগড় হইতে নির্ম্মল অনেক দুঃখ পাইয়াই গিয়াছিল। ইহার ভালমন্দ এবং সকল সংস্রব হইতে নিজেকে সে চিরকালের মত বিমুক্ত করিয়া যাইতেছে, যাইবার সময়ে ইহাই ছিল তাহার একান্ত অভিলাষ। ভগবানের কাছে কায়মনে প্রার্থনা করিয়াছিল, যাহা গত হইয়াছে তাহা আর যেন না ফিরিয়া আসে, ইহার কোন সংযোগ-সূত্রই আর যেন না জীবনে তাহার কোথাও অবশিষ্ট রহিয়া যায়। সে সোজা মানুষ। বিলাস ও সাহেবিয়ানার মধ্যে দিয়াও সে সংসারের সোজা পথটি ধরিয়াই চলিতে চাহিত। হৈমই ছিল তাহার একমাত্র—তাহার গৃহিণী, তাহার প্রিয়তমা,

তাহার সন্তানের জননী—সৌন্দর্য্যে, স্নেহে, নিষ্ঠায়, বুদ্ধিতে ইহার বড় যে কোন মানুষই কোনদিন কামনা করিতে পারে তাহা সে ভাবিতেও পারিত না, অথচ এত বড় সম্পদ তুচ্ছ করিয়াও মন তাহার একদিন উদ্‌ভ্রান্ত হইতে চাহিয়াছিল, ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত এই বিড়ম্বনা যখনই মনে হইত তখনই দুইটা কথা তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিত। প্রথম এই যে, এই দুর্ম্মতির ইতিহাস তাহাকে হৈমর কাছ হইতে চিরদিন গোপন করিয়া রাখিতে হইবে; এবং দ্বিতীয়, ষোড়শীর চরিত্র। ইহার সম্বন্ধে বস্তুতঃ কিছুই সে জানে না; তবুও যে কেন একদিন মন তাহার আসক্ত হইয়াছিল, নিজের চিত্তকে এই প্রশ্নই বারংবার করিয়া কেবল একটা উত্তরই নির্ম্মল নিঃসংশয়ে পাইতেছিল, ষোড়শী চরিত্রহীনা। অসম্ভব বস্তুতে মন তাহার প্রলুব্ধ হয় নাই, হইতেই পারে না। সে পাওয়ার বাহিরে নয়, ইহা বুঝিয়াছিল বলিয়াই মন তাহার অমন করিয়া উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। এই কথা স্মরণ করিয়া সে একপ্রকার সান্ত্বনা লাভ করিত, এবং মনে মনে বলিত, ও-পথে আর কখনও নয়। হৈমর বাপের বাড়ি, ইচ্ছা হয় সে যাক, নিজে সে চণ্ডীগড়ের নাম কখনও মুখে আনিবে না।

সেদিন আদালত হইতে ফিরিয়া হৈমর কাছে শুনিল মায়ের চিঠি আসিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, রাত্রে লুকাইয়া ষোড়শী কোথায় যে চলিয়া গেছে কেহই জানে না।

নির্ম্মল পরিহাসের চেষ্টায় জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, কেউ জানে না কোথায় গেছে? সাগর সর্দ্দারও না, এমনকি জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী পর্য্যন্ত না?

হৈম রাগ করিয়া কহিল, তোমার এক কথা। সাগর জানলেও জানতে পারে, কিন্তু জমিদার জানবে কি করে? মেয়েদের নামে একটা দুর্নাম দিতে পারলে যেন তোমরা বাঁচো!

তা বটে। বলিয়া নির্ম্মল বাহিরে যাইতেছিল, হৈম ডাকিয়া কহিল, আরও একটা কাণ্ড হয়েচে। সেই রাত্রে জমিদারের শান্তিকুঞ্জ কে একদম পুড়িয়ে দিয়েচে।

বল কি?

হাঁ। লোকের সন্দেহ, রাগ করে সাগর পুড়িয়েচে। কিন্তু জমিদারের নামের সঙ্গে জড়িয়ে যে মিথ্যে দুর্নামটা তাঁর গ্রামের সকলে মিলে দিলে, তা সত্যি হ'লে কি কখনো জমিদারেরই বাড়ি পুড়ত? তুমিই বল?

নির্ম্মল চুপ করিয়া রহিল। হৈম কহিল, যে যাই কেন না বলুক, আমি কিন্তু নিশ্চয় জানি তিনি নির্দ্দোষী। চণ্ডীর এমন ভৈরবী আর কখনও ছিল না। তাঁর দয়াতেই ছেলের মুখ দেখতে পেয়েচ, তা জানো?

এ-কথারও নির্ম্মল কোন উত্তর দিল না। সকল ঘটনা জানিতে, চিঠি লিখিয়া সকল সংবাদ সবিস্তারে আহরণ করিতে তাহার কৌতূহলের সীমা ছিল না, কিন্তু এ ইচ্ছাকে সে দমন করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ষোড়শীর সকল সম্পর্ক হইতে আপনাকে

সে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবেই, এই ছিল তাহার পণ। কিন্তু পরদিন সকাল না হইতেই যখন শ্বশুরের জরুরি তার আসিয়া পড়িল এবং সন্ধ্যার মেলে শাশুড়ীর চিঠিও আসিল, পত্র পাওয়া মাত্র জামাই না আসিয়া পৌঁছিলে তাহার বৃদ্ধ শ্বশুরকে এ-যাত্রা কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না · জেল তাঁহাকে খাটিতে হইবে, তখন হৈম কাঁদিতে লাগিল, এবং আর একবার তোরঙ্গ ও বিছানাপত্র বাঁধিবার হুকুম দিয়া নির্ম্মলকে তাহার কাজের বন্দোবস্ত করিতে বাটী হইতে বাহির হইতে হইল।

দিন-দুই পরে হৈমকে সঙ্গে করিয়া নির্ম্মল চণ্ডীগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল একটা ভয়ের মধ্যে সকলেরই দিন কাটিতেছে। কে যে কখন আগুন ধরাইয়া দিবে তাহার ঠিক নাই। চারিদিকে লোক নিযুক্ত হইয়াছে, কর্ত্তা শুকাইয়া যেন অর্দ্ধেক হইয়া গেছেন, কোথাও বাহির হন না এতবড় প্রতাপান্বিত ব্যক্তির নিজের গ্রামের মধ্যেই এতবড় দুর্গতি দেখিয়া নির্ম্মল বিস্মিত হইল। এখান হইতে বেশী দিন সে যায় নাই, কিন্তু কি পরিবর্ত্তন! খবর যাহা পাইল তাহা অত্যন্ত উল্টাপাল্টা রকমের, বিশেষ কিছু বুঝা গেল না; কেবল একটা সংবাদে সকলেরই মিল হইল যে, জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর মাথা খারাপ হইয়া গেছে। সে মদ ছাড়িয়াছে, প্রজাদের দিয়া নিজের বিরুদ্ধে নালিশ করাইয়া দিয়াছে, যে টাকায় পোড়া বাড়ি মেরামত করা উচিত ছিল, তাহা দিয়া মাঠের সাঁকো তৈরি করাইতেছে—এমনি কত কি গল্প, কিন্তু হঠাৎ কিসের জন্য সে এরূপ হইল, তাহা কেহই জানে না। এই লোকটিকে নির্ম্মল অতিশয় ঘৃণা করিত, ইহারই কাছে দরবার করিতে যাইতে হইবে মনে করিয়া সে অতিশয় সঙ্কুচিত হইল। অথচ ব্যাপার যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আর যে কি পথ আছে তাহাও চোখে পড়িল না। ভূমিজ প্রজারা অত্যন্ত বিরুদ্ধে। একে ত তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এবং তাহা সম্পাদন করিতে কোন চেষ্টারই ত্রুটি হয় নাই, তাহাতে তাহাদের একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষিণী ভৈরবী মাতার প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহাতে ক্রোধের তাহাদের সীমা নাই। তাহারা কোন কথা শুনিবে না। এদিকে মাদ্রাজী সাহেবের বিস্তর ক্ষতি, তাঁহার কল-কব্জা আসিয়া পড়িয়াছে, সে ক্ষতিপূরণ করা একপ্রকার অসাধ্য ব্যাপার। জমির দখল তাঁহার চাই-ই। বিশেষতঃ নিজে অনুপস্থিত থাকিয়া যে এটর্নির দ্বারা তিনি কাজ চালাইতেছেন, তিনি যেমন রুক্ষ, তেমনি অভদ্র, তাহার কাছে কোন সুবিধারই আশা নাই। একমাত্র ভরসা নিজেদের মধ্যে এক হওয়া। যেহেতু, আর যাহাই হোক, পিনাল কোডের সেই দুরন্ত ধারাগুলো তাহাতে বাঁচিবার সম্ভাবনা। নিজেদের মধ্যে কবুল জবাব দিলে আর রাস্তা নাই, অথচ সেই পাগল লোকটা শাসাইয়া রাখিয়াছে হাকিমের কাছে সে কোন কথাই লুকাইবে না। এই

কথা নির্ম্মল হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিত, কিন্তু আসিয়া অবধি সে যে-সকল গল্প শুনিল, বিশেষ করিয়া সেই মদ ছাড়ার কাহিনী—হার্টফেলের ভয় দেখাইয়াও ডাক্তার যাহাকে এক ফোঁটা মদ গিলাইতে পারে নাই, সেই ভীষণ একগুঁয়ে লোকটার মাথায় হঠাৎ কি খেয়াল চাপিয়াছে কে তাহার কৈফিয়ৎ দিবে? অথচ, সে আসিয়াছে এই দুর্ম্মদ একান্ত অবোধ ব্যক্তিকে সুবুদ্ধি দিতে। তাহাকে বুঝাইতে হইবে, ভয় দেখাইতে হইবে, অনুনয়-বিনয় করিতে হইবে—কি যে করিতে হইবে সে কিছুই জানে না। এই অত্যন্ত অপ্রীতিকর কার্য্যের বিরুদ্ধে নির্ম্মলের সমস্ত চিত্ত যেন বিদ্রোহ করিতে লাগিল, কিন্তু উপায় কি? দুষ্কৃতকারী যে হৈমর পিতা। তাঁহাকে যে বাঁচাইতেই হইবে। হৈম কাঁদিতে লাগিল, শাশুড়ী কাঁদিতে লাগিলেন, এককড়ি চোরের মত আনাগোনা করিতে লাগিল, শ্বশুর না খাইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন—অথচ মাঝে কেবল একটি দিন বাকী, পরশু দিন আসিবেন হাকিম তদন্ত করিতে।

অপরাহ্নের কাছাকাছি জীবানন্দের সহিত দেখা হইল তাহার মাঠের মাঝখানে। এতকাল জল-নিকাশের পথ ছিল না, সাঁকো তৈরি হইতেছিল। প্রশান্ত হাস্যে দুই হাত বাড়াইয়া আসিয়া জীবানন্দ তাহাকে গ্রহণ করিয়া কহিল, আপনার আসার খবর আমি কালই পেয়েচি। ভাল আছেন আপনি? বাড়ির সব ভাল। তাহার কথায় আচরণে গরিমা নাই, কৃত্রিমতা নাই—যেমন সহজ, তেমনি খোলা—তাহাকে সন্দেহ করিবার অবকাশমাত্র নাই। এতখানির জন্য নির্ম্মল প্রস্তুত ছিল না; তাহার আপনাকে আপনি যেন ছোট মনে হইল। মাথা যদি ইঁহার খারাপ হইয়াও থাকে ত লজ্জা পাইবার নয়। জীবানন্দের কুশল প্রশ্নের উত্তর নির্ম্মল শুধু মাথা নাড়িয়াই দিল এবং প্রতি-প্রশ্ন করিবার কথা হঠাৎ তাহার মনে হইল না।

জীবানন্দ কহিল, আপনি কুটুম্ব মানুষ, সমস্ত গ্রামের আদরের বস্তু, কিন্তু ইচ্ছে ক'রে এমন জায়গায় এসে দেখা করলেন যে—সহসা মিস্ত্রী ও মজুরদের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় কহিল, বাবারা, আজ আমাদের একটু রাত্রি পর্য্যন্ত খাটতে হবে। সপ্তাহ ধরে মেঘ করেচে, আজকালের মধ্যেই হয়ত জল হবে। কিন্তু তা হলে ত কোনমতেই চলবে না। আমরা এমন কাজ করে যাবো যে, আমাদের নাতি-পুতিদের পর্য্যন্ত ঘাড় নেড়ে বলতে হবে যে, হাঁ সাঁকো যারা করেছিল, তারা সত্যিকারের দরদ দিয়েই করেছিল। সেই ত আমাদের মেহন্নতয়ানা।

লোকগুলা গলিয়া গেল। বীজগাঁয়ের ভয়ঙ্কর জমিদার একসঙ্গে খাটিতেছেন, তাঁহার মুখের এই কথা; তাহারা সমস্বরে প্রতিজ্ঞা করিয়া জানাইল যে, তাহাদেরও সেই ইচ্ছা। জ্যোৎস্না যদি না মেঘে ঢাকে ত তাহারা রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কাজ করিবে।

নির্ম্মল কহিল, আপনার সঙ্গে আমার একটু কাজ আছে।

জীবানন্দ বলিল, আর একদিন হলে হয় না?

না, আমার বিশেষ প্রয়োজন।

জীবানন্দ হাসিল; কহিল, তা বটে। অকাজের বোঝা বহাতে যাঁরা এতদূরে টেনে এনেচেন, তাঁরা কি আপনাকে সহজে ছেড়ে দেবেন!

খোঁচাটা নির্ম্মলের গায়ে বাজিল। সে কহিল, সে ত ঠিক কথা। অকাজ মানুষে ক'রে বলেই ত সংসারে আমাদের প্রয়োজন চৌধুরীমশায়। না হলে আপনাকেই বা এই মাঠের মাঝখানে বিরক্ত করবার আমার প্রয়োজন হবে কেন?

জীবানন্দ কিছুমাত্র রাগ করিল না, তেমনি প্রসন্নমুখে বলিল, আমি কিছুমাত্র বিরক্ত হইনি নির্ম্মলবাবু। যে জন্যে আপনি এসেচেন, সে যে আপনার কর্ত্তব্য, এ-বিষয়েও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, না হ'লে আপনিই বা আসবেন কেন? কিন্তু কর্ত্তব্যের ধারণা ত সকলের এক নয়। রায়মশায়ের আমি অকল্যাণ কামনা করিনে; আপনার আসার উদ্দেশ্য সফল হ'লে আমি বাস্তবিক খুশী হবো, কিন্তু আমার কর্ত্তব্যও আমি ঠিক করে ফেলেচি, তা থেকে নড়চড় করা সম্ভব হবে না।

নির্ম্মলের মুখ ম্লান হইল। সে একটু ভাবিয়া কহিল, দেখুন, ভালই হ'লো যে, অপ্রিয় আলোচনার ভূমিকার অংশটা আপনি দয়া করে আমাকে উত্তীর্ণ করে দিয়ে গেলেন। এসে অবধি আপনার সম্বন্ধে আমি অনেক কথাই শুনেচি—

জীবানন্দ সহাস্যে বলিল, একটা এই যে আমার মাথার ঠিক নেই, সত্য কি না বলুন?

নির্ম্মল কহিল, সংসারে সাধারণ মানুষের বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে অকস্মাৎ কারও কর্ত্তব্যের ধারণা যদি অত্যন্ত প্রভেদ হয়ে যায় ত দুর্নাম একটা রটেই। এ কথা কি সত্য যে আপনি সমস্তই স্বীকার করবেন?

জীবানন্দ কহিল, সত্য বই কি। তাহার কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য্য নাই, ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা, তথাপি নির্ম্মল নিঃসংশয়ে বুঝিল ইহা ফাঁকি নয়। বলিল, এমন ত হ'তে পারে আপনার কবুল জবাবে আপনিই শাস্তি পাবেন, কিন্তু আর সকলে বেঁচে যাবেন।

জীবানন্দ কহিল, নির্ম্মলবাবু, আপনার কথাটা হ'লো ঠিক সেই পাঠশালার গোবিন্দের মত। পণ্ডিতমশাই! মুকুন্দও যে আম চুরি করছিল! অর্থাৎ, বেতটা চারিয়ে না পড়লে তার পিঠের জ্বালা কমবে না? এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। তাহার সকৌতুক হাসির ছটায় নির্ম্মলের মুখ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল দেখিয়া সে জোর করিয়া তাহা নিবারণ করিয়া কহিল, রক্ষে করুন আপনি, এ আমি স্বপ্নেও চাইনে। আমার কৃতকর্ম্মের ফল আমি ভোগ করলেই যথেষ্ট। নইলে, রায়মশাই নিস্তার লাভ ক'রে সুস্থ-দেহে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে থাকুন, এবং আমার এককড়ি

নন্দীমশাইও আর কোথাও গোমস্তাগিরি কর্ম্মে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে থাকুন, কারও প্রতি আমার কোন আক্রোশ নাই।

নির্ম্মল আইন ব্যবসায়ী, সহজে হাল ছাড়িবার পাত্র নয়, কহিল, এমন ত হতে পারে, কারও কোন শাস্তি ভোগ করারই আবশ্যক হবে না, অথচ ক্ষতিও কাউকে স্বীকার করতে হবে না।

জীবানন্দ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, বেশ ত, পারেন ভালই। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করে দেখেচি সে হবার নয়। কৃষকেরা তাদের জমি ছাড়বে না। কারণ, এ শুধু তাদের অন্ন-বস্ত্রের কথা নয়, তাদের সাত-পুরুষের চাষ-আবাদের মাঠ, এর সঙ্গে তাদের নাড়ীর সম্পর্ক। এ তাদের দিতেই হবে। একটু চুপ করিয়া কহিল, আপনি ভালই জানেন, অন্য পক্ষ অত্যন্ত প্রবল, তার উপর জোর-জুলুম চলবে না। চলতে পারে কেবল চাষীদের উপর, কিন্তু চিরদিন তাদের প্রতিই অত্যাচার হয়ে আসচে, আর হতে আমি দেব না।

নির্ম্মল মনে মনে প্রমাদ গনিয়া কহিল, আপনার বিস্তীর্ণ জমিদারী, এই ক'টা চাষার কি আর তাতে স্থান হবে না? কোথাও না কোথাও—

না না, আর কোথাও না—এই চণ্ডীগড়ে। এইখানে আমি জোর করে তাদের কাছে ছ'হাজার টাকা আদায় করেচি—আর সে টাকা যুগিয়েছেন জনার্দ্দন রায়—সে শোধ করতেই হবে। কিন্তু অপ্রীতিকর আলোচনায় আর কাজ নেই নির্ম্মলবাবু, আমি মনস্থির করেচি।

এই ছ'হাজার টাকার ইঙ্গিত নির্ম্মল বুঝিল না, কিন্তু এটা বুঝিল যে, তাহার শ্বশুর মহাশয় অনেক পাকে আপনাকে জড়াইয়াছেন যাহা মুক্ত করা সহজ নয়। সে শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, আত্মরক্ষায় সকলেরই ত অধিকার আছে, অতএব শ্বশুর মহাশয়কেও করতে হবে। আপনি নিজে জমিদার, আপনার কাছে মামলা-মকদ্দমার বিবরণ দিতে যাওয়া বাহুল্য—শেষ পর্য্যন্ত হয়ত বা বিষ দিয়েই বিষের চিকিৎসা করতে হবে।

জীবানন্দ মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, চিকিৎসক কি ভাল করার বিষে খুন করার ব্যবস্থা দেবেন?

নির্ম্মলের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কহিল, জানেন ত, অনেক সময়ে ওষুধের নাম করলে আর খাটে না! সে যাই হোক, আপনি জমিদার, ব্রাহ্মণ, বয়সে বড়, আপনাকে শক্ত কথা বলবার ইচ্ছে আমার নাই। কিংবা হঠাৎ কি কারণে আপনার ধর্ম্ম-জ্ঞান এরূপ প্রচণ্ড হয়ে উঠল তাও জানবার কৌতূহল নেই, কিন্তু একটা কথা বলে যাই যে, এ জিনিস আপনার স্বাভাবিক নয়। গভর্নমেণ্ট যদি প্রসিকিউট করে ত জেলের মধ্যে একদিন তা উপলব্ধি করবেন। আপনি সর্পকে রজ্জু বলে ভ্রম করেছেন!

জীবানন্দ কহিল, এ-কথা আপনার সত্য, কিন্তু ভ্রম যতক্ষণ আছে ততক্ষণ রজ্জুটাই ত আমার সত্য!

নির্ম্মল বলিল, কিন্তু তাতে আব মরণ আটকাবে না। আরও একটা সত্য কথা আপনাকে বলে যাই। এইসব নোংরা কাজ করা আমার ব্যবসা নয়। আপনাকে আমি অতিশয় ঘৃণা করি, এবং এক পাপিষ্ঠের জন্য আব এক পাপিষ্ঠকে অনুরোধ করতে আমি লজ্জা বোধ করি; কিন্তু সে আপনি বুঝবেন না—সে সাধ্যই আপনার নেই।

জীবানন্দেব মুখেব উপব কোন পবিবর্ত্তন দেখা গেল না। লেশমাত্র উত্তেজনা নাই, তেমনি সৌম্য শান্তকণ্ঠে কহিল, কিন্তু আপনাকে আমি ঘৃণা করিনে নির্ম্মলবাবু, শ্রদ্ধা করি, এ বোঝাবাব সাধ্যও ত আপনার নেই।

তাহার নির্ব্বিকাব স্বচ্ছন্দতায় নির্ম্মল জ্বলিতে লাগিল, এবং প্রত্যুত্তরকে কদর্য্য উপহাস কল্পনা করিয়া তিক্ত-কণ্ঠে বলিল, চোর-ডাকাতদের মধ্যেও বিশ্বাস বলে একটা বস্তু আছে, নিজেদেব মধ্যে তারাও তা ভাঙে না। বিশ্বাসঘাতককে তারা ঘৃণা করে। কিন্তু জীবনব্যাপী দুরাচাবে বুদ্ধি যার বিকৃত, তার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করে লাভ নেই—আমি চললাম। এই বলিয়া সে চক্ষের পলকে পিছন ফিরিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। জীবানন্দ চাহিয়া দেখিল অনেকেই হাতের কাজ বন্ধ করিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া আছে। সে ম্লানমুখে শুধু একটু হাসিয়া বলিল, সময় যেটুকু নষ্ট করলি বাবারা, সেটুকু কিন্তু পুষিয়ে দিস্।

কথাটা নির্ম্মলের কানে গেল।

দিন-চারেকের মধ্যেই কৃষককুলেব চিরদিনের দুঃখ দূর করিয়া জল-নিকাশের সাঁকো তৈরি শেষ হইল, গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে ভিড় করিয়া লোক দেখিতে আসিল, কিন্তু যে ইহা নির্ম্মাণ করিল, সেই জীবানন্দ শয্যাগত হইয়া পড়িল। এ পরিশ্রম সে সহ্য করিতে পারিল না। এই অজুহাতে সাহেবের সহিত দেখা করিয়া নানা কৌশলে নির্ম্মল তদন্তের দিন এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিতে পারিয়াছিল, কিন্তু সে-দিনও সমাগতপ্রায়। কেবল দুটো দিন বাকি। বাঁচিবার একমাত্র পথ ছিল, এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া জনার্দ্দন তারাদাসকে দিয়া চণ্ডীমাতার বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করাইলেন, এবং নিজে মন্দিরের একান্তে বসিয়া সকাল-সন্ধ্যায় কায়মনে ডাকিতে লাগিলেন, মায়ের কৃপায় যেন এ-যাত্রা জীবানন্দ আর না উঠে। সাহেব সরজমিনে আসার পূর্ব্বেই যেন কিছু একটা হইয়া যায়। মেয়েকে লইয়া ষোড়শীর হাতে-পায়ে গিয়া পড়ার কথাও মনে হইয়াছিল, কারণ ছোটলোকদের যদি কেহ ঠেকাইতে পারে ত কেবল সে-ই পারে, কিন্তু কোথায় সে? যে গাড়োয়ান তাহাকে লইয়া

গিয়াছিল বহু চেষ্টাতেও তাহার সন্ধান মিলে নাই। সাতদিন সময় পাইয়া হৈমর নিশ্চিত ভরসা হইয়াছিল ছেলেকে সঙ্গে করিয়া গিয়া একবার কাঁদিয়া পড়িতে পারিলে সে কিছুতেই না বলিতে পারিবে না ; কিন্তু সে আশা বৃথা হইতে বসিল।

এই কয়দিন প্রায় প্রত্যহই নির্ম্মলকে সদরে যাইতে হইতেছিল। এই যে বিশ্রী মামলাটা বাধিবে, তাহার সকল ছিদ্রপথই যে আগে হইতে বন্ধ করা আবশ্যক। সেদিন দুপুরবেলা সে রেজেষ্ট্রি অফিসের বারান্দার একধারে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া কতকগুলা প্রয়োজনীয় দলিলপত্রের নকল লইয়া নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিল, হঠাৎ সুমুখেই ডাক শুনিল, জামাইবাবু, সেলাম। ভাল আছেন ?

নির্ম্মল চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, ফকিরসাহেব। তাঁহারও হাতে একতাড়া কাগজ। তাড়াতাড়ি উঠিয়া অভিবাদন করিয়া তাঁহার দুই হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া কহিল, শুনেছিলাম আপনাকে ডাকলেই আপনার দেখা মেলে। এ-কয়দিন মনে মনে আমি প্রাণপণে ডাকছিলাম।

ফকির হাসিলেন, কহিলেন, কেন বলুন ত ?

ষোড়শীকে আমার বড় প্রয়োজন। তিনি কোথায় আছেন ? আমাকে দেখা করতেই হবে।

ফকির বিস্মিত হইলেন না, আনন্দ প্রকাশ করিলেন না, বলিলেন, দেখা না হওয়াই ত ভাল।

নির্ম্মল অত্যন্ত লজ্জিত হইল। কহিল, আপনি হয়ত সর্ব্বজ্ঞ। তা যদি হয়, জানেন ত আমাদের কত প্রয়োজন।

ফকির কহিলেন, না, আমি সর্ব্বজ্ঞ নয়, কিন্তু মা ষোড়শী কোন কথাই আমাকে গোপন করেন না। একটু থামিয়া বলিলেন, দেখা হওয়া না-হওয়ার কথা তিনিই জানেন, আমি জানিনে, কিন্তু তাঁর সমস্ত ব্যাপার আপনাকে জানাতে আমার বাধা নেই। কারণ, একদিন যখন সবাই তাঁর সর্ব্বনাশে উদ্যত হয়েছিল, তখন আপনিই একাকী তাঁকে রক্ষা করতে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তাঁর মুখেই এ-কথা শুনেচি।

নির্ম্মল কহিল, আর আজ সেইটি উল্টে দাঁড়িয়েচে ফকিরসাহেব। এখন কেউ যদি তাঁদের বাঁচাতে পারে ত তিনিই পারেন।

ফকিরের মুখ অপ্রসন্ন হইল। ইহার বিস্তৃত বিবরণের জন্য তিনি কৌতূহল প্রকাশ না করিয়া কেবল কহিলেন, চণ্ডীগড়ের খবর জানিনে। কিন্তু আমি বলি, তাঁদের ভাল করার ভার ভগবানের উপর আপনি ছেড়ে দিন। আমার মাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন না নির্ম্মলবাবু।

বিগত দিনের সমস্ত দুঃখের ইতিহাস নির্ম্মলের মনে পড়িল। ইহার জবাব দেওয়া কঠিন, সে শুধু কুণ্ঠার সহিত প্রশ্ন করিল, এখন তিনি কোথায় আছেন ?

জায়গাটাকে শৈবাল-দীঘি বলে।

সেখানে সুখে আছেন?

এইবার ফকির মৃদু হাসিয়া কহিলেন, এই নিন। মেয়েমানুষের সুখে থাকার খবর দেবতারা জানেন না। আমি ত আবার সন্ন্যাসী মানুষ। তবে মা আমার শান্তিতে আছেন এইটুকু অনুমান করতে পারি।

নির্ম্মল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আদালতে আপনি কোথায় এসেছিলেন?

ফকির কহিলেন, তা বটে! সন্ন্যাসী ফকিরের এ স্থান নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু সংসারের মোহ ত মানুষকে সহজে ছাড়ে না বাবা, তাই শেষ বয়সে আবার বিষয়ী হয়ে উঠেচি। ভাল কথা, বিনা পয়সায় আপনার মত আইনজ্ঞ ব্যক্তিও আর পাব না, এবং আপনাকেই কেবল বলা যায়। আমার এই কাগজগুলি যদি দয়া ক'রে একবার দেখে দেন।

নির্ম্মল হাত বাড়াইয়া কহিল; এ কিসের কাগজ?

একটা দান-পত্রের খসড়া। বলিয়া ফকির তাহার কাগজের বাণ্ডিল নির্ম্মলের হাতে তুলিয়া দিলেন। পরের কাজ করিবার মত সময় ও প্রবৃত্তি নির্ম্মলের ছিল না; সে নিস্পৃহের মত তাহা গ্রহণ করিল, এবং ধীরে ধীরে তাহার পাক খুলিয়া পাঠে নিযুক্ত হইল; কিন্তু কয়েক ছত্র পরেই অকস্মাৎ তাহার চোখের দৃষ্টি তীব্র, মুখ গম্ভীর এবং কপাল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। এই দানের সম্পত্তি অকিঞ্চিৎকর নয়, কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া তাহার বিবরণ, সেইগুলির উপর কোনমতে চোখ বুলাইয়া লইয়া অবশেষে শেষ পাতায় আসিয়া যখন তাহার জীবানন্দের সেই চিঠিখানার প্রতি দৃষ্টি পড়িল, তখন লাইন-কয়েকের সেই লিখনটুকু এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়া নির্ম্মল স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ফকির তার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন, বলিলেন, সংসারে কত বিস্ময়ই না আছে!

নির্ম্মলের মুখ দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, সে ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, হাঁ।

ফকির কহিল, খসড়াটা ঠিক ত?

নির্ম্মল কহিল, ঠিক। কিন্তু এ যে সত্য তার প্রমাণ কি?

ফকির বলিলেন, নইলে দান ষোড়শী নিতেন না। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হবে নির্ম্মলবাবু? এই বলিয়া তিনি উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু জবাব পাইলেন না। নির্ম্মলের চোখের দৃষ্টি ঝাপ্সা এবং কপাল কুঞ্চিত হইয়াই রহিল, মন যে তাহার কোথায় গিয়াছিল, ফকির বোধ করি তাহা অনুমান করিতে পারিলেন না।

২৮

অকস্মাৎ দিন-কয়েক অবিশ্রান্ত বারিপাতে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম এমন অচল হইয়া গেল যে, অপ্রতিহত-গতি জেলার ম্যাজিস্ট্রেটও তাঁহার তদন্তের চাকাটাকে ঠেলিয়া আনিতে পারিলেন না। তবে তাঁহার হুকুম ছিল, বর্ষণ কমিলেই তিনি চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করিবেন, এবং সেই হুকুম তামিলের দিন পড়িয়াছে আজ। খবর পৌঁছিয়াছে গ্রামের বাহিরে বারুইয়ের তীরে তাঁহার তাঁবু খাটানো হইতেছে, মুর্গী, আণ্ডা, দুধ, ঘি প্রভৃতি যোগান দেওয়ার কাজে এককড়ি প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে এবং খুব সম্ভব দ্বিপ্রহরের এইদিকেই চণ্ডীগড়ে তাঁহার ঘোড়ার পদধূলি পড়িবে।

শেষ রাত্রি হইতেই বর্ষণ থামিয়াছে, কিন্তু আকাশের চেহারা বদলায় নাই। এ মূর্ত্তি দেখিয়া জোর করিয়া বলিবার জো নাই দুর্যোগ থামিল, কিংবা আবার চারিদিক আকুল করিয়া আসিবে। বাড়ি পোড়ার পরে, বাহিরের দিকে যে দ্বিতল ঘর দুইখানিতে জীবানন্দ আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারই একটি ক্ষুদ্র বারান্দায় ক্যাম্প-খাট পাতিয়া সে সকালবেলায় বারুইয়ের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া-ছিল। পাহাড়ের ঘোলা জল নামিয়া নদীর সেই শীর্ণ দেহ আর নাই; উদ্দাম স্রোত তটপ্রান্তে সবেগে আঘাত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—জীবানন্দ কত কি যে ভাবিতে-ছিল তাহার ঠিকানা নাই। জ্বর এবং তাহার আজন্ম-সহচর বক্ষশূল কমিয়াছিল, কিন্তু সারে নাই। আজও সে শয্যাশায়ী, উঠিতে হাঁটিতে পারে না। ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের পৌঁছানোর খবর পাইলে সে পালকিতে করিয়া নিজে গিয়া দেখা করিবে। মিথ্যা কিছুই বলিবে না তাহা সে স্থির করিয়াছে—যেমন করিয়া মদ ছাড়া সে স্থির করিয়াছিল, ঠিক তেমনি করিয়া; যেমন করিয়া সে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিল, এ-জীবনে দুঃখ কাহাকেও আর দিবে না, ঠিক তেমনি করিয়াই ইহাও সে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু আজ যথার্থই তাহার কাহারও বিরুদ্ধেও কোন বিদ্বেষ, কোন নালিশ ছিল না, সে মনে মনে এই বলিয়া তর্ক করিতেছিল যে, অপরাধ ত মানুষেই করে, অন্যায় ত মানুষের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং তাহার সাক্ষ্যে সে ছাড়া আর কেহ শাস্তি পাইবে চিন্তা করিয়া সে বাস্তবিক বেদনা বোধ করিতেছিল। কি করিয়া বলিবে যে, কাহারও কোন ক্ষতি হয় না, এই কথাই যে কতরূপে সে আলোচনা করিতে-ছিল, তাহার নির্দ্দেশ নাই, কিন্তু কোন বিষয়ই সুশৃঙ্খলায় শেষ পর্য্যন্ত ভাবিবার মত অবস্থা তাহার ছিল না, তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল একই সমস্যা একই মীমাংসা লইয়া বার বার তাহার সুমুখে আসিতেছিল, এই লইয়া সে যখন প্রায় হয়রাণ

হইয়া উঠিয়াছিল, এমনি সময়ে সম্পূর্ণ একটা নূতন জিনিসের উপর গিয়া তাহার মন এবং দৃষ্টি একই সময়ে স্থিতিলাভ করিল। একখানা ছোট নৌকা স্রোতের অনুকূলে অত্যন্ত দ্রুতবেগে আসিতেছিল, এবং তাহার বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র মাঝি ডাঙার উপরে নোঙর ছুড়িয়া ফেলিয়া তাহার গতিরোধ করিল। এ নদীতে নৌকা চলাচল অত্যন্ত বিরল। বৎসরের অধিকাংশ দিন যথেষ্ট জল থাকে না বলিয়াই শুধু নয়, বর্ষাকালেও একটানা খরস্রোতে যাতায়াতের সুবিধা বড় হয় না। বিশেষতঃ তাহারই বাটীর সম্মুখে আসিয়া যখন এমন করিয়া থামিল, তখন কৌতূহলে সে বালিস ঠেস দিয়া উঁচু হইয়া বসিয়া দেখিল জন-দুই পুরুষ এবং তিনজন রমণী নামিয়া আসিতেছেন। ঘন-পল্লব গাছের অন্তরালে ইহাদের স্পষ্ট দেখা না গেলেও একজনকে জীবানন্দ নিশ্চয় চিনিতে পারিল, তিনি জনার্দন রায়। প্রৌঢ় স্ত্রীলোকটি খুব সম্ভব তাঁহার পত্নী এবং অপরটি তাঁহার কন্যা, হয়ত কোথাও গিয়াছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট আসার সংবাদ পাইয়া ত্বরা করিয়া ফিরিয়াছেন। শুধু একটা কথা সে বুঝিতে পারিল না, নিজেদের ঘাট ছাড়িয়া এতদূরে আসিয়া নৌকা বাঁধিবার হেতু কি। হয়ত সুবিধা ছিল না, হয়ত ভুল হইয়াছে, হয়ত-বা ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টিপথে পড়া তাঁহার ইচ্ছা নয়, কিন্তু সে যাই হোক, লোকটা যখন রায়মহাশয়, ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা, তখন কষ্ট করিয়া বসিয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া জীবানন্দ আবার শুইয়া পড়িল। চোখ বুজিয়া সে মনে মনে হাসিয়া কহিল, অপরাধের সাজা দিবার মালিক কি একা আদালত? এই মানুষটিকে ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব হয়ত কখনো দেখেও নাই, দেখিলেও হয়ত চিনিত না। তবুও ইহার শঙ্কা ও সতর্কতার অবধি নাই। স্ত্রী ও কন্যার কাছে এই যে ভীরুতার লজ্জা, দণ্ডের পরিমাণে ইহাই কি সামান্য?

সহসা কে একজন আসিয়া তাহার শিয়রের দিকে বসিয়া পড়ার চাপে তুচ্ছ ক্যাম্পখাটখানা মচ করিয়া উঠিল। জীবানন্দ চমকিয়া চাহিয়া কহিল, কে? বারান্দায় প্রবেশ করিবার পদশব্দও সে কাহারও পায় নাই, যে বসিয়াছিল সে তাহার কপালের উপর একটা হাত রাখিয়া কহিল, আমি।

জীবানন্দ হাত বাড়াইয়া সেইখানি নিজের দুর্ব্বল হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর আস্তে আস্তে বলিল, এই নৌকাতে তুমি এলে?

হ্যাঁ।

রায়মশায় তোমাকে ধরে নিয়ে এলেন, তাঁকে বাঁচাতে হবে?

হ্যাঁ, কিন্তু সে হৈমর বাবাকে, জনার্দ্দন রায়কে নয়।

বুঝেচি। কিন্তু প্রজারা মকদ্দমা ছাড়বে কেন, সাগর স্বীকার করবে কেন?

আমার কাছে তারা স্বীকার করেচে।

করেচে? আশ্চর্য্য! বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

ষোড়শী কহিল, না, আশ্চর্য্য নয়। তারা আমাকে মা বলে।

আমি তা জানি। জীবানন্দের হাতের মুঠা শিথিল হইয়া আসিল। সে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, ভালই হয়েছে। আজ সকাল থেকেই আমি ভাবছিলাম অলকা, এই ভয়ানক শক্ত কাজ আমি করব কি করে? আমি বাঁচলাম, আর কিছুই করবার রইল না। তুমি সমস্তই করে দিয়েচ।

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া কহিল, তোমার করবার আর কিছু না থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাজ এখনো বাকী রয়ে গেছে। এই বলিয়া সে জীবানন্দের যে হাতটা স্খলিত হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিল, তাহা নিজের মুঠোর মধ্যে গ্রহণ করিয়া তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, নৌকো আমার প্রস্তুত, কোনমতে তোমাকে নিয়ে পালাতে পারলেই আমার এই সকল কাজের বড় কাজটা সারা হয়। চল। এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া মাথাটা তাহার জীবানন্দের বুকের উপর রাখিয়া স্থির হইয়া রহিল। বহুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না, কেবল একজনের প্রবল বক্ষস্পন্দন আর একজন নিঃশব্দে অনুভব করিতে লাগিল।

জীবানন্দ কহিল, কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে?

ষোড়শী কহিল, যেখানে আমার দু'চোখ যাবে।

কখন যেতে হবে?

এখনই। সাহেব এসে পড়ার আগেই।

জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু আমার প্রজারা? তাদের কাছে আমাদের পুরুষানুক্রমে জমা করা ঋণ?

ষোড়শী তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া চুপি চুপি বলিল, পুরুষানুক্রমে আমাদের তা শোধ দিতে হবে।

জীবানন্দ খুশী হইয়া বলিল, ঠিক কথা অলকা। কিন্তু দেরি করলে ত চলবে না। এখন থেকে ত আমাদের দু'জনকে এ ভার মাথায় নিতে হবে।

ষোড়শী সহসা দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, হুজুর, দাসীকে এইটুকু শুধু ভিক্ষে দেবেন, প্রজাদের ভার নেবার চেষ্টা করে আর ভারি করে তুলবেন না। সমস্ত জীবন ধরেই ত নানাবিধ ভার বয়ে এসেচেন, এখন অসুস্থ দেহে একটু বিশ্রাম করলে কেউ নিন্দে করবে না। কিন্তু কে সাহেব এসে পড়তে পারে, চলুন।

প্রত্যুত্তরে জীবানন্দ শুধু একটুখানি হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, এমন করে আমার সমস্ত ক্ষমতা তুমি কেড়ে নিয়ো না অলকা—আমাকে দুঃখীর কাজে লাগিয়ে দেখো কখ্খনো ঠকবে না।

কথা শুনিয়া অলকার দু'চক্ষু সহসা ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, এবং এমন একান্ত আত্মসমর্পণের দ্বারা যে তাহার সর্ব্বস্ব জয় করিয়া লইয়াছে, তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া তাহার পদতলের মাটিটা পর্য্যন্ত যেন অকস্মাৎ কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল, কিন্তু আপনাকে সে তৎক্ষণাৎ সংবরণ করিয়া লইয়া হাতের উপরে একটু চাপ দিয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, চল ত এখন। নৌকোতে বসে তখন ধীরে-সুস্থে ভেবে দেখবো কি কি ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া যেতে পারবে এবং কি কি একেবারেই দেওয়া চলবে না।

সেই ভালো! বলিয়া জীবানন্দ ষোড়শীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল।

পরিণীতা

পরিণীতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

শক্তিশেল বুকে পড়িবার সময় লক্ষ্মণের মুখের ভাব নিশ্চয় খারাপ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু গুরুচরণের চেহারাটা বোধ করি তার চেয়েও মন্দ দেখাইল—যখন প্রত্যূষেই অন্তঃপুর হইতে সংবাদ পৌঁছিল, গৃহিণী এইমাত্র নির্বিঘ্নে পঞ্চম কন্যার জন্মদান করিয়াছেন।

গুরুচরণ ষাট টাকা বেতনের ব্যাঙ্কের কেরানী। সুতরাং দেহটিও যেমন ঠিকা-গাড়ির ঘোড়ার মত শুষ্ক শীর্ণ, চোখেমুখেও তেমনি তাহাদেরি মত একটা নিষ্কাম নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাব। তথাপি এই ভয়ঙ্কর শুভ-সংবাদে আজ তাঁহার হাতের হুঁকাটা হাতেই রহিল, তিনি জীর্ণ পৈতৃক তাকিয়াটা ঠেস দিয়া বসিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিবারও আর তাঁহার জোর রহিল না।

শুভ-সংবাদ বহিয়া আনিয়াছিল তাঁহার তৃতীয়া কন্যা দশমবর্ষীয়া আন্নাকালী। সে বলিল, বাবা, চল না দেখবে।

গুরুচরণ মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, মা, এক গেলাস জল আন্ ত খাই।

মেয়ে জল আনিতে গেল। সে চলিয়া গেলে, গুরুচরণের সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িল সূতিকা-গৃহের রকমারি খরচের কথা। তার পরে, ভিড়ের দিনে স্টেশনে গাড়ি আসিলে দোর খোলা পাইলে থার্ড ক্লাসের যাত্রীর দল পোঁটলা-পোঁটলি লইয়া পাগলের মত যেভাবে লোকজনকে দলিত পিষ্ট করিয়া ঝাঁপাইয়া আসিতে থাকে, তেমনি মার মার শব্দ করিয়া তাঁহার মগজের মধ্যে দুশ্চিন্তারাশি হু হু করিয়া ঢুকিতে লাগিল। মনে পড়িল, গত বৎসর তাঁহার দ্বিতীয় কন্যার শুভ-বিবাহে বৌবাজারের এই দ্বিতল ভদ্রাসনটুকু বাঁধা পড়িয়াছে এবং তাহারও ছয় মাসের সুদ বাকী। দুর্গা-পূজার আর মাসখানেক মাত্র বিলম্ব আছে—মেজমেয়ের ওখানে তত্ত্ব পাঠাইতে হইবে। আফিসে কাল রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত ডেবিট ক্রেডিট মিলে নাই, আজ বেলা বারোটার মধ্যে বিলাতে হিসাব পাঠাইতেই হইবে। কাল বড় সাহেব হুকুম জারি করিয়াছেন, ময়লা বস্ত্র পরিয়া কেহ আফিসে ঢুকিতে পারিবে না, ফাইন্ হইবে অথচ গত সপ্তাহ হইতে রজকের সন্ধান মিলিতেছে না, সংসারের অর্দ্ধেক কাপড়-

চোপড় লইয়া সে বোধ করি নিরুদ্দেশ। গুরুচরণ আর ঠেস দিয়া থাকিতেও পারিলেন না, হুঁকাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া এলাইয়া পড়িলেন। মনে মনে বলিলেন, ভগবান, এই কলিকাতা শহরে প্রতিদিন কত লোক গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়িয়া অপঘাতে মরে, তারা কি আমার চেয়েও তোমার পায়ে বেশী অপরাধী! দয়াময়! তোমার দয়ায় একটা ভারী মোটরগাড়ি যদি বুকের উপর দিয়া চলিয়া যায়!

আন্নাকালী জল আনিয়া বলিল, বাবা ওঠ, জল এনেচি।

গুরুচরণ উঠিয়া সমস্তটুকু এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আঃ, যা মা, গেলাসটা নিয়ে যা।

সে চলিয়া গেলে গুরুচরণ আবার শুইয়া পড়িলেন।

ললিতা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, মামা, চা এনেচি ওঠ।

চায়ের নামে গুরুচরণ আর একবার উঠিয়া বসিলেন। ললিতার মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার অর্দ্ধেক জ্বালা যেন নিভিয়া গেল, বলিলেন, সারারাত জেগে আছিস মা, আয় আমার কাছে এসে একবার বোস।

ললিতা সলজ্জহাস্যে কাছে বসিয়া বলিল, আমি রাত্তিরে জাগিনি মামা।

এই জীর্ণ শীর্ণ গুরুভারগ্রস্ত অকালবৃদ্ধ-মাতুলের হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন সুগভীর ব্যথাটা তার চেয়ে বেশি এ সংসারে আর কেহ অনুভব করিত না।

গুরুচরণ বলিলেন, তা হোক আয়, আমার কাছে আয়।

ললিতা কাছে আসিয়া বসিতেই গুরুচরণ তাহার মাথায় হাত দিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, আমার এই মা'টিকে যদি রাজার ঘরে দিতে পারতুম, তবেই জানতুম একটা কাজ কল্লুম।

ললিতা মাথা হেঁট করিয়া চা ঢালিতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, হাঁ মা, তোর দুঃখী মামার ঘরে এসে দিনরাত্রি খাটতে হয়, না?

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, দিবারাত্রি খাটতে হবে কেন মামা? সবাই কাজ করে, আমিও করি।

এইবার গুরুচরণ হাসিলেন। চা খাইতে খাইতে বলিলেন, হাঁ ললিতা, আজ তবে রান্না-বান্নার কি হবে মা?

ললিতা মুখ তুলিয়া বলিল, কেন মামা, আমি রাঁধব যে?

গুরুচরণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই রাঁধবি কি মা, রাঁধতে কি তুই জানিস্?

জানি মামা। আমি মামিমার কাছে সব শিখে নিয়েচি।

গুরুচরণ চায়ের বাটিটা নামাইয়া ধরিয়া বলিলেন, সত্যি?

সত্যি। মামিমা দেখিয়ে দেন, আমি কতদিন রাঁধি যে। বলিয়াই সে মুখ নীচু করিল।

তাহার আনত মাথার উপর হাত রাখিয়া গুরুচরণ নিঃশব্দে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার একটা গুরুতর দুর্ভাবনা দূর হইল।

এই ঘরটি গলির উপরেই। চা পান করিতে করিতে জানালার বাহিরে দৃষ্টি পড়ায় গুরুচরণ চেঁচাইয়া ডাকিয়া উঠিলেন, শেখর না-কি? শোন, শোন।

একজন দীর্ঘায়তন বলিষ্ঠ সুন্দর যুবা ঘরে প্রবেশ করিল।

গুরুচরণ বলিলেন, বসো, আজ সকালে তোমার খুড়িমার কাণ্ডটা শুনেচ বোধ হয়।

শেখর মৃদু হাসিয়া বলিল, কাণ্ড আর কি, মেয়ে হয়েছে তাই?

গুরুচরণ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তুমি ত বললে তাই, কিন্তু তাই যে কি, সে শুধু আমিই জানি যে!

শেখর কহিল, ও-রকম বলবেন না কাকা, খুড়িমা শুনলে বড় কষ্ট পাবেন। তা ছাড়া ভগবান যাকে পাঠিয়েচেন তাকেই আদর-আহ্লাদ করে ডেকে নেওয়া উচিত।

গুরুচরণ মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, আদর-আহ্লাদ করা উচিত, সে আমিও জানি। কিন্তু বাবা, ভগবান ত সুবিচার করেন না। আমি গরীব, আমার ঘরে এত কেন? এই বাড়িটুকু পর্য্যন্ত তোমার বাপের কাছে বাঁধা পড়েচে, তা পড়ুক, সে জন্যে দুঃখ করিনে শেখর, কিন্তু এই হাতে-হাতেই দেখ না বাবা, এই যে আমার ললিতা, মা-বাপ-মরা সোনার পুতুল, একে শুধু রাজার ঘরেই মানায়। কি করে একে প্রাণ ধরে যার তার হাতে তুলে দিই, বল ত? রাজার মুকুটে যে কোহিনুর জ্বলে, তেমনি কোহিনুর রাশীকৃত করে আমার এই মা'টিকে ওজন করলেও দাম হয় না। কিন্তু কে তা বুঝবে! পয়সার অভাবে এমন রত্নকেও আমাকে বিলিয়ে দিতে হবে। বল দেখি বাবা, সে-সময়ে কিরকম শেল বুকে বাজবে? তেরো বছর বয়স হ'লো, কিন্তু হাতে আমার এমন তেরোটা পয়সা নেই যে, একটা সম্বন্ধ পর্য্যন্ত স্থির করি?

গুরুচরণের দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। শেখর চুপ করিয়া রহিল।

গুরুচরণ পুনরায় কহিলেন, শেখরনাথ, দেখো ত বাবা, তোমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যদি এই মেয়েটার কোন গতি করে দিতে পার। আজকাল অনেক ছেলে শুনেচি টাকা-কড়ির দিকে চেয়ে দেখে না, শুধু মেয়ে দেখেই পছন্দ করে। তেমনি যদি দৈবাৎ মিলে যায় শেখর, তা হলে বলচি আমি, আমার আশীর্ব্বাদে তুমি রাজা হবে। আর কি বলব বাবা, এ-পাড়ায় তোমাদের আশ্রয়ে আমি আছি, তোমার বাবা আমাকে ছোট ভাইয়ের মতন দেখেন।

শেখর মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা তা দেখব।

গুরুচরণ বলিলেন, ভুলো না বাবা, দেখো। ললিতা ত আট বছর বয়স থেকে তোমাদের কাছে লেখা-পড়া শিখে মানুষ হচ্ছে, তুমি ত দেখতে পাচ্চ ও কেমন বুদ্ধিমতী, কেমন শিষ্ট শান্ত। এককোঁটা মেয়ে, আজ থেকে ও-ই যে আমাদের রাঁধাবাড়া করবে, দেবে-থোবে, সমস্তই এখন ওর মাথায়।

এই সময়ে ললিতা একটিবার চোখ তুলিয়াই নামাইয়া ফেলিল। তাহার ওষ্ঠাধরের উভয় প্রান্ত ঈষৎ প্রসারিত হইল মাত্র। গুরুচরণ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ওর বাপই কি কম রোজগার করেচে, কিন্তু সমস্তই এমন করে দান করে গেল যে, এই একটা মেয়ের জন্যেও কিছু রেখে গেল না।

শেখর চুপ করিয়া রহিল। গুরুচরণ নিজেই আবার বলিয়া উঠিলেন, আর রেখে গেল না-ই বা বলি কি ক'রে? সে যত লোকের যত দুঃখ ঘুচিয়েচে, তার সমস্ত ফলটুকুই আমার এই মা'টিকে দিয়ে গেছে, তা নইলে কি এতটুকু মেয়ে এমন অন্নপূর্ণা হতে পারে! তুমিই বল না শেখর, সত্য কি না?

সে উঠিবার উপক্রম করিতেই গুরুচরণ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, এমন সকালেই কোথা যাচ্ছ?

শেখর বলিল, ব্যারিস্টারের বাড়ি—একটা কেস্ আছে। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে গুরুচরণ আর একবার স্মরণ করাইয়া বলিলেন, কথাটা একটু মনে রেখো বাবা। ও একটু শ্যামবর্ণ বটে, কিন্তু চোখ-মুখ, এমন হাসি, এত দয়া-মায়া পৃথিবী খুঁজে বেড়ালেও কেউ পাবে না।

শেখর মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে বাহির হইয়া গেল। এই ছেলেটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। এম. এ. পাশ করিয়া এতদিন শিক্ষানবিশি করিতেছিল, গত বৎসর হইতে এটর্নি হইয়াছে। তাহার পিতা নবীন রায় গুড়ের কারবারে লক্ষপতি হইয়া কয়েক বৎসর হইতে ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া ঘরে বসিয়া তেজারতি করিতেছিলেন, বড় ছেলে অবিনাশ উকিল—ছোট ছেলে এই শেখরনাথ। তাঁর প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি পাড়ার মাথায় উঠিয়াছিল এবং ইহার একটা খোলা ছাদের সহিত গুরুচরণদের ছাদটা মিশিয়া থাকায় উভয় পরিবারে অত্যন্ত আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। বাড়ির মেয়েরা এই পথেই যাতায়াত করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্যামবাজারে এক বড়লোকের ঘরে বহুদিন হইতেই শেখরের বিবাহের কথা-বার্ত্তা চলিতেছিল। সেদিন তাঁহারা দেখিতে আসিয়া আগামী মাঘের কোন শুভদিন স্থির করিয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু শেখরের জননী স্বীকার করিলেন না। ঝিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, ছেলে নিজে দেখিয়া পছন্দ করিলে তবে বিবাহ দিব।

নবীন রায়ের চোখ ছিল শুধু টাকার দিকে, তিনি গৃহিণীর এই গোলমেলে কথায় অপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন, এ আবার কি কথা! মেয়ে ত দেখাই আছে। কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে যাক, তার পরে আশীর্ব্বাদ করার দিন ভাল করে দেখলেই হবে।

তথাপি গৃহিণী সম্মত হইলেন না। পাকা কথা কহিতে দিলেন না। নবীন রায় সেদিন রাগ করিয়া অনেক বেলায় আহার করিলেন এবং দিবানিদ্রাটা বাহিরের ঘরেই দিলেন।

শেখরনাথ লোকটা কিছু সৌখীন। সে তেতলায় যে ঘরটিতে থাকে সেটি অতিশয় সুসজ্জিত। দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন অপরাহ্ণবেলায় সে সেই ঘরের বড় আয়নার সম্মুখে দাড়াইয়া মেয়ে দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, ললিতা ঘরে ঢুকিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বৌ দেখতে যাবে না?

শেখর ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, এই যে! কই বেশ করে সাজিয়ে দাও দেখি, বৌ যাতে পছন্দ করে।

ললিতা হাসিল। বলিল, এখন আমার সময় নেই শেখরদা— আমি টাকা নিতে এসেচি, বলিয়া বালিশের তলা হইতে চাবি লইয়া একটা দেরাজ খুলিয়া গনিয়া গনিয়া গুটি-কয়েক টাকা আঁচলে বাঁধিয়া যেন কতকটা নিজের মনেই বলিল, টাকা ত দরকার হলেই নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এ শোধ হবে কি করে?

শেখর চুলের একপাশে বুরুশ দিয়া সযত্নে উপরের দিকে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, শোধ হবে না, হচ্ছে।

ললিতা বুঝিতে পারিল না, চাহিয়া রহিল।

শেখর বলিল, চেয়ে রইলে, বুঝতে পারলে না?

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আরও একটু বড় হও, তখন বুঝতে পারবে, বলিয়া শেখর জুতা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে শেখর একটা কোচের উপর চুপ করিয়া শুইয়াছিল, মা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। মা একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, মেয়ে কি রকম দেখে এলি রে?

শেখর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, বেশ।

শেখরের মায়ের নাম ভুবনেশ্বরী। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু এমনি সুন্দর তাঁহার দেহের বাঁধন যে, দেখিলে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের অধিক মনে হইত না। আবার এই সুন্দর আবরণের মধ্যে যে মাতৃদেহটি ছিল, তাহা আরও নবীন আরও কোমল। তিনি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, পাড়াগাঁয়ে জন্মিয়া সেইখানেই বড় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সহরের মধ্যে তাঁহাকে একদিনের জন্য বে-মানান দেখায় নাই। সহরের চাঞ্চল্যসজীবতা এবং আচার-ব্যবহারও যেমন তিনি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, জন্মভূমির নিবিড় নিস্তব্ধতা ও মাধুর্য্যও তেমনি হারাইয়া ফেলেন নাই। এমন মাটি যে শেখরের কত বড় গর্ব্বের বস্তু ছিল, সে-কথা তাহার মাও জানিতেন না। জগদীশ্বর শেখরকে অনেক বস্তু দিয়াছিলেন। অনন্যসাধারণ স্বাস্থ্য, রূপ, ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধি—কিন্তু এই জননীর সন্তান হইতে পারার ভাগ্যটাকেই সে কায়মনে ভগবানের সবচেয়ে বড় দান বলিয়া মনে করিত।

মা বলিলেন, 'বেশ' বলে চুপ করে রইলি যে রে!

শেখর আবার হাসিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল, যা জিজ্ঞেস করলে তাই ত বললুম।

মাও হাসিলেন। বলিলেন, কই বললি? রঙ কেমন, ফর্সা? কার মত হবে? আমাদের ললিতার মত?

শেখর মুখ তুলিয়া বলিল, ললিতা ত কালো মা, ওর চেয়ে ফর্সা।

মুখ-চোখ কেমন?

তাও মন্দ নয়।

তবে কর্ত্তাকে বলি?

এবার শেখর চুপ করিয়া রহিল।

মা ক্ষণকাল পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, হাঁ রে, লেখাপড়া শিখেচে কেমন ?

শেখর বলিল, সে ত জিজ্ঞেস করিনি মা !

অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া মা বলিলেন, জিজ্ঞেস করিস্‌নি কি রে ! যেটা আজকাল তোদের সবচেয়ে দরকারি জিনিস্ সেইটেই জেনে আসিস্‌নি ?

শেখর হাসিয়া বলিল, না মা, ওকথা আমার মনেই ছিল না।

ছেলের কথা শুনিয়া একবার তিনি অতিশয় বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল তাহার মুখপানে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, তবে ওখানে বিয়ে করবিনে দেখচি !

শেখর কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এই সময় ললিতাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল। ললিতা ধীরে ধীরে ভুবনেশ্বরীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি বাঁ হাত দিয়া তাহাকে সুমুখের দিকে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, কি মা ?

ললিতা চুপি চুপি বলিল, কিচ্ছু না মা।

ললিতা পূর্ব্বে ইঁহাকে মাসিমা বলিত, কিন্তু তিনি নিষেধ করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, তোর আমি ত মাসি হইনে ললিতে, মা হই। তখন হইতে সে মা বলিয়া ডাকিত। ভুবনেশ্বরী তাহাকে বুকের আরো কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিয়া বলিলেন, কিচ্ছু না ? তবে বুঝি আমাকে শুধু একবার দেখতে এসেচিস ?

ললিতা চুপ করিয়া রহিল।

শেখর কহিল, দেখতে এসেচে, রাঁধবে কখন ?

মা বলিলেন, রাঁধবে কেন ?

শেখর আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তবে ওদের রাঁধবে মা ? ওর মামাও ত সেদিন বললেন, ললিতাই রাঁধা-বাড়া সব কাজ করবে।

মা হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ওর মামার কি, যা হোক একটা বললেই হ'লো। ওর বিয়ে হয়নি, ওর হাতে খাবে কে ? আমাদের বামুনঠাকরুণকে পাঠিয়ে দিয়েচি, তিনি রাঁধবেন। বড়বৌমা আমাদের রান্নাবান্না করচেন—আমি দুপুরবেলা ওদের বাড়িতেই আজকাল খাই।

শেখর বুঝিল, মা এই দুঃখী পরিবারের গুরুভার হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। সে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

মাস-খানেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর শেখর নিজের ঘরে কোচের উপর কাত হইয়া একখানি ইংরাজী নভেল পড়িতেছিল। বেশ মন লাগিয়া গিয়াছিল, এমন সময় ললিতা ঘরে ঢুকিয়া বালিশের তলা হইতে চাবি লইয়া শব্দ-সাড়া করিয়া দেরাজ খুলিতে লাগিল। শেখর বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, কি ?

ললিতা বলিল, টাকা নিচ্ছি।

হুঁ, বলিয়া শেখর পড়িতে লাগিল। ললিতা আঁচলে টাকা বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ সাজিয়া-গুজিয়া আসিয়াছিল, তাহার ইচ্ছা শেখর চাহিয়া দেখে। কহিল, দশ টাকা নিলুম শেখরদা।

শেখর 'আচ্ছা' বলিল, কিন্তু চাহিয়া দেখিল না। অগত্যা সে এটা-ওটা নাড়িতে লাগিল, মিছামিছি দেরি করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না, তখন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু গেলেই ত চলে না, আবার তাকে ফিরিয়া আসিয়া দোরগোড়ায় দাঁড়াইতে হইল। আজ তাহারা থিয়েটার দেখিতে যাইবে।

শেখরের বিনা হুকুমে সে যে কোথাও যাইতে পারে না, ইহা সে জানিত। কেহই তাহাকে ইহা বলিয়া দেয় নাই, কিংবা কেন, কি জন্য, এ-সব তর্ক কোনদিন মনে উঠে নাই। কিন্তু জীবমাত্রেরই একটা স্বাভাবিক সহজ বুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধিই তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিল; অপরে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, যেখানে খুশি যাইতে পারে, কিন্তু সে পারে না। সে স্বাধীনও নয় এবং মামা-মামির অনুমতিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সে দ্বারের অন্তরালে দাড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমরা যে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি।

তাহার মৃদু কণ্ঠ শেখরের কানে গেল না—সে জবাব দিল না।

ললিতা তখন আরো একটু গলা চড়াইয়া বলিল, সবাই আমার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েচে যে।

এবার শেখর শুনিতে পাইল, বইখানা একপাশে নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে?

ললিতা একটুখানি রুষ্টভাবে বলিল, এতক্ষণে বুঝি কানে গেল! আমরা থিয়েটারে যাচ্ছি যে।

শেখর বলিল, আমরা কারা?

আমি, আন্নাকালি, চারুবালা, তার মামা।

মামাটি কে?

ললিতা বলিল, তাঁর নাম গিরীনবাবু। পাঁচ-ছদিন হ'লো মুঙ্গেরের বাড়ি থেকে এসেচেন, এখানে বি. এ. পড়বেন—বেশ লোক সে—

বাঃ—নাম, ধাম, পেশা—এ যে দিব্যি আলাপ হয়ে গেছে দেখচি। তাতেই চার-পাঁচ দিন মাথার টিকিটি পর্য্যন্ত দেখতে পাইনি—তাস খেলা হচ্ছিল বোধ করি?

হঠাৎ শেখরের কথা বলার ধরণ দেখিয়া ললিতা ভয় পাইয়া গেল। সে মনেও করে নাই, এরূপ একটা প্রশ্নও উঠিতে পারে। সে চুপ করিয়া রহিল।

শেখর বলিল, এ ক'দিন খুব তাস চলছিল, না?

ললিতা ঢোক গিলিয়া মৃদুস্বরে কহিল, চারু বললে যে।

চারু বললে? কি বললে? বলিয়া শেখর মাথা তুলিয়া একবার চাহিয়া দেখিয়া কহিল, একেবারে কাপড় পরে তৈরি হয়ে আসা হয়েছে,—আচ্ছা যাও।

ললিতা গেল না, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

পাশের বাড়ির চারুবালা তাহার সমবয়সী এবং সই। তাহারা ব্রাহ্ম। শেখর ঐ গিরীনকে ছাড়া আর তাহাদের সকলকেই চিনিত। গিরীন পাঁচ-সাত বৎসর পূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য একবার এদিকে আসিয়াছিল। এতদিন বাঁকিপুরে পড়িত, কলিকাতায় আসিবার প্রয়োজনও হয় নাই, আসে নাই। তাই শেখর তাহাকে চিনিত না। ললিতা তথাপি দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বলিল, মিছে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও। বলিয়া মুখের সুমুখে বই তুলিয়া লইল।

মিনিট-পাঁচেক চুপ করিয়া থাকার পর ললিতা আবার আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, যাব?

যেতেই ত বললুম, ললিতা।

শেখরের ভাব দেখিয়া ললিতার থিয়েটার দেখিবার সাধ লোপ পাইল, কিন্তু তাহার না গেলেও যে নয়।

কথা হইয়াছিল, সে অর্দ্ধেক খরচ দিবে এবং চারুর মামা অর্দ্ধেক দিবে।

চারুদের ওখানে সকলেই তাহার জন্য অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতেছে এবং যত বিলম্ব হইতেছে, তাহাদের অধৈর্য্যও তত বাড়িতেছে, ইহা সে চোখের উপর দেখিতে লাগিল, কিন্তু উপায়ও খুঁজিয়া পাইল না। অনুমতি না পাইয়া যাইবে এত সাহস তাহার ছিল না। আবার মিনিট দু-তিন নিঃশব্দ থাকিয়া বলিল, শুধু আজকের দিনটি—যাব?

শেখর বইটা একপাশে ফেলিয়া দিয়া ধমকাইয়া উঠিল, বিরক্ত ক'রো না ললিতা, যেতে ইচ্ছে হয় যাও, ভাল-মন্দ বোঝবার তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েচে।

ললিতা চমকাইয়া উঠিল। শেখরের কাছে বকুনি খাওয়া তাহার নূতন নহে; অভ্যাস ছিল বটে, কিন্তু দু-তিন বৎসরের মধ্যে এরকমটি শুনে নাই। ওদিকে বন্ধুরা অপেক্ষা করিয়া আছে, সেও কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, ইতিমধ্যে টাকা আনিতে আসিয়া এই বিপত্তি ঘটিয়াছে। এখন তাহাদের কাছেই বা সে কি বলিবে?

কোথাও যাওয়া-আসা সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত তাহার শেখরের তরফ হইতে অবাধ স্বাধীনতা ছিল, সেই জোরেই সে একেবারে কাপড় পরিয়া সাজিয়া আসিয়াছিল, এখন শুধু যে সেই স্বাধীনতাই এমন রূঢ়ভাবে খর্ব্ব হইয়া গেল তাহা নহে, যেজন্য হইল সে কারণটা যে কত বড় লজ্জার, তাহাই আজ তাহার তেরো বছর বয়সে

প্রথম উপলব্ধি করিয়া সে মরমে মরিয়া যাইতে লাগিল। অভিমানে চোখ অশ্রুপূর্ণ করিয়া সে আরো মিনিট-পাঁচেক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। নিজের ঘরে গিয়া ঝিকে দিয়া আন্নাকালীকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার হাতে দশটা টাকা দিয়া কহিল, তোরা আজ যা কালী, আমার বড় অসুখ কচ্চে, সইকে বল গে আমি যেতে পারব না।

কালী জিজ্ঞাসা করিল, কি অসুখ সেজদি?

মাথা ধরেচে, গা বমি বমি কচ্চে—ভারি অসুখ কচ্চে, বলিয়া সে বিছানায় পাশ ফিরিয়া শুইল। তারপর চারু আসিয়া সাধাসাধি করিল, পীড়াপীড়ি করিল, মামিমাকে দিয়া সুপারিশ করাইল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে রাজি করিতে পারিল না। আন্নাকালী হাতে দশটা টাকা পাইয়া যাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছিল। পাছে এই-সব হাঙ্গামায় পড়িয়া যাওয়া না ঘটে, এই ভয়ে সে চারুকে আড়ালে ডাকিয়া টাকা দেখাইয়া বলিল, সেজদির অসুখ কচ্চে সে নাই গেল, চারুদি। আমাকে টাকা দিয়েছে, এই দ্যাখো—আমরা যাই চল। চারু বুঝিল, আন্নাকালী বয়সে ছোট হইলেও বুদ্ধিতে কাহারও অপেক্ষা খাটো নয়? সে সম্মত হইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারুবালার মা মনোরমার তাস খেলার চেয়ে প্রিয় বস্তু আর কিছুই ছিল না। কিন্তু খেলার ঝোঁক যতটা ছিল দক্ষতা ততটা ছিল না। তাঁহার এই ত্রুটি শুধরাইয়া যাইত ললিতাকে পাইলে। সে খুব ভাল খেলিতে পারিত। মনোরমার মামাত ভাই গিরীন আসা পর্য্যন্ত এ-কয়দিন সমস্ত দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে তাসের বিরাট আড্ডা বসিতেছিল? গিরীন পুরুষমানুষ, খেলে ভাল, সুতরাং তার বিপক্ষে বসিতে গেলে মনোরমার ললিতাকে চাই-ই।

থিয়েটার দেখার পরের দিন যথাসময়ে ললিতা উপস্থিত হইল না দেখিয়া মনোরমা ঝিকে পাঠাইয়া দিলেন। ললিতা তখন একটা মোটা খাতায় একখানা ইংরাজী বই হইতে বাঙলা তর্জ্জমা করিতেছিল, গেল না।

তাহার সই আসিয়াও যখন কিছু করিতে পারিল না, তখন মনোরমা নিজে আসিয়া

তাহার খাতাপত্র একদিকে টান মারিয়া সরাইয়া দিয়া বলিলেন, নে ওঠ্। বড় হয়ে তোকে জজিয়তি করতে হবে না, বরং তাস খেলতেই হবে—চল্।

ললিতা মনে মনে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া, কাঁদ কাঁদ হইয়া জানাইল, আজ তাহার কিছুতেই যাইবার জো নাই, বরং কাল যাইবে। মনোরমা কিছুতেই শুনিলেন না, অবশেষে মামীমাকে জানাইয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন; সুতরাং তাহাকে আজও গিয়া গিরীনের বিপক্ষে বসিয়া তাস খেলিতে হইল। কিন্তু খেলা জমিল না। এদিকে সে এতটুকু মন দিতে পারিল না। সমস্ত সময়টা আড় হইয়া রহিল এবং বেলা না পড়িতেই উঠিয়া পড়িল। যাইবার সময় গিরীন বলিল, রাত্রে আপনি টাকা পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু গেলেন না, কাল আবার যাই, চলুন।

ললিতা মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, না, আমার বড় অসুখ করেছিল।

গিরীন হাসিয়া বলিল, এখন ত অসুখ সেরেচে, চলুন, কাল যেতে হবে।

না না, কাল আমার সময় হবে না, বলিয়া ললিতা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আজ শুধু যে শেখরের ভয়ে তাহার খেলায় মন লাগে নাই, তাহা নহে, তাহার নিজেরও ভারী লজ্জা হইতেছিল।

শেখরের বাটীব মত, এই বাটীতেও সে ছেলেবেলা হইতে আসা-যাওয়া করিয়াছে এবং ঘরের লোকের মতই, সকলের সুমুখে বাহির হইয়াছে। তাই চারুর মামার সুমুখেও বাহির হইতে, কথা বলিতে, প্রথম হইতেই তাহার কোন দ্বিধা হয় নাই। কিন্তু আজ গিরীনের সুমুখে বসিয়া সমস্ত খেলার সময়টা, কেমন করিয়া যেন তাহার কেবলি মনে হইতেছিল, এই কয়েকদিনের পরিচয়েই গিরীন তাহাকে একটু বিশেষ প্রীতির চোখে দেখিতেছে। পুরুষের প্রীতির চক্ষু যে এতবড় লজ্জার বস্তু তাহা সে ইতিপূর্ব্বে কল্পনাও করে নাই।

বাড়িতে একবার দেখা দিয়াই সে তাড়াতাড়ি ও-বাড়িতে শেখরের ঘরে গিয়া ঢুকিল এবং একেবারে কাজে লাগিয়া গেল। ছেলেবেলা হইতে এ-ঘরের ছোট-খাটো কাজগুলি তাহাকেই করিতে হইত। বই প্রভৃতি গুছাইয়া তুলিয়া রাখা, টেবিল সাজাইয়া দেওয়া, দোয়াত-কলম ঝাড়িয়া-মুছিয়া ঠিক করিয়া রাখা, এ-সমস্ত সে না করিলে আর কেহ করিত না। ছয়-সাতদিনের অবহেলায় অনেক কাজ জমিয়া গিয়াছিল, সেই সমস্ত ত্রুটি শেখরের ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল।

ললিতা ভুবনেশ্বরীকে মা বলিত, সময় পাইলেই কাছে কাছে থাকিত এবং সে নিজে কাহাকেও পর মনে করিত না বলিয়া এ-বাড়িতে তাহাকেও কেহ পর মনে করিত না। আট বছর বয়সে মা-বাপ হারাইয়া মামার বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন হইতে সে ছোট বোনটির মত শেখরের আশে-পাশে ঘুরিয়া, তাহার কাছে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতেছে।

সে যে শেখরের বিশেষ স্নেহের পাত্রী তাহা সবাই জানিত, শুধু সেই স্নেহ যে এখন কোথায় উঠিয়াছে, তাহাই কেহ জানিত না, ললিতাও না। শিশুকাল হইতে শেখরের কাছে তাহাকে এইভাবে এত অপর্য্যাপ্ত আদর পাইতে সবাই দেখিয়া আসিয়াছে যে, আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন আদরই কাহারো চোখে বিসদৃশ বোধ হয় না, কিংবা কোন ব্যবহারই কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। করে না বলিয়াই সে যে কোনও দিন বধূরূপে এই গৃহে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সে সম্ভাবনাও কাহারও মনে উদয় হয় নাই। ললিতাদের বাড়িতেও হয় নাই, ভুবনেশ্বরীর মনেও হয় নাই।

ললিতা ভাবিয়া রাখিয়াছিল, কাজ শেষ করিয়া শেখর আসিবার পূর্ব্বেই চলিয়া যাইবে; কিন্তু অন্যমনস্ক ছিল বলিয়া ঘড়ির দিকে নজর করে নাই। হঠাৎ দ্বারের বাহিরে জুতোর মস মস শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়াই একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

শেখর ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, এই যে! কাল তা হলে ফিরতে কত রাত হ'লো?

ললিতা জবাব দিল না।

শেখর একটা গদি-আঁটা আরাম-চৌকির উপর হেলান দিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, ফেরা হ'লো কখন? দুটো? তিনটে? মুখে কথা নেই কেন?

ললিতা তেমনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শেখর বিরক্ত হইয়া বলিল, নীচে যাও, মা ডাকচেন।

ভুবনেশ্বরী ভাঁড়ারের সুমুখে বসিয়া জলখাবার সাজাইতেছিল, ললিতা কাছে আসিয়া বলিল, ডাকছিলে মা?

কই ডাকিনি ত, বলিয়া মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, মুখখানি এমন শুকনো কেন ললিতে? কিছু খাস্‌নি বুঝি এখনো?

ললিতা ঘাড় নাড়িল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন, আচ্ছা যা তোর দাদাকে খাবার দিয়ে আমার কাছে আয়।

ললিতা খাবার হাতে করিয়া খানিক পরে উপরে আসিয়া দেখিল, তখনো শেখর তেমনিভাবে চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে, অফিসের পোষাকও ছাড়ে নাই, হাতমুখও ধোয় নাই। কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, খাবার এনেচি।

শেখর চাহিয়া দেখিল না। বলিল, কোথাও রেখে দিয়ে যাও।

ললিতা রাখিয়া দিল না, হাতে করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শেখর না চাহিয়াও বুঝিতেছিল, ললিতা যায় নাই, দাঁড়াইয়া আছে। মিনিট-দুই-তিন নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ললিতা, আমার দেরি আছে, রেখে নীচে যাও।

ললিতা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে রাগিতেছিল; মৃদুস্বরে বলিল, থাক্ গে দেরি, আমারো নীচে কোন কাজ নেই।

শেখর চোখ চাহিয়া হাসিয়া বলিল, এই যে কথা বেরিয়েচে! নীচে কাজ না থাকে ও-বাড়িতে আছে ত? তাও না থাকে, তার পরের বাড়িতেও আছে ত? বাড়ি ত তোমার একটি নয় ললিতে?

নয়ই ত! বলিয়া রাগ করিয়া ললিতা খাবারের থালাটা ক্ষম করিয়া টেবিলে রাখিয়া দিয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শেখর চেঁচাইয়া বলিল, সন্ধ্যের পরে একবার এসো।

একশবার আমি ওপর-নীচে করতে পারিনে, বলিয়া ললিতা চলিয়া গেল।

নীচে আসিবামাত্রই মা বলিলেন, দাদাকে তোর খাবার দিয়ে এলি পান দিয়ে এলিনে যে!

আমার ক্ষিদে পেয়েচে মা, আমি আর পারিনে, আর কেউ দিয়ে আসুক, বলিয়া ললিতা বসিয়া পড়িল।

মা তাহার রুষ্ট মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুই খেতে বোস্, ঝিকে পাঠিয়ে দিচ্চি।

ললিতা প্রত্যুত্তর না করিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

সে থিয়েটার দেখিতে যায় নাই—তবু শেখর তাহাকে বকিয়াছিল, এই রাগে সে চার-পাঁচদিন শেখরকে দেখা দেয় নাই, অথচ সে অফিসে চলিয়া গেলে দুপুরবেলা গিয়া ঘরের কাজ করিয়া দিত। শেখর নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহাকে দু'দিন ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, তথাপি সে যায় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এ-পাড়ায় একজন অতিবৃদ্ধ ভিক্ষুক মাঝে মাঝে ভিক্ষা করিতে আসিত, তাহার উপর ললিতার বড় দয়া ছিল, আসিলেই তাহাকে একটি করিয়া টাকা দিত। টাকাটি হাতে পাইয়া সে যে-সমস্ত অপূর্ব্ব এবং অসম্ভব আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিতে থাকিত, সেইগুলি শুনিতে সে অতিশয় ভালবাসিত। সে বলিত, ললিতা পূর্ব্বজন্মে তাহার আপনার মা ছিল, এবং ইহা সে ললিতাকে দেখিবামাত্রই কেমন করিয়া

চিনিতে পারিয়াছিল। সে বুড়া ছেলেটি তাহার আজ সকালেই দ্বারে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, আমার মা-জননী কোথায় গো?

সন্তানের আহ্বানে ললিতা আজ কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল। এখন শেখর ঘরে আছে, সে টাকা আনিতে যায় কিরূপে? এদিক সেদিক চাহিয়া মামীর কাছে গেল। মামী এইমাত্র ঝির সহিত বকা-বকি করিয়া বিরক্ত-মুখে রাঁধিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে কিছু না বলিতে পারিয়া সে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, ভিক্ষুক দোর-গোড়ায় লাঠিটি ঠেস্ দিয়া রাখিয়া বেশ চাপিয়া বসিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ললিতা কখনও তাহাকে নিরাশ করে নাই, আজ শুধু-হাতে ফিরাইয়া দিতে তাহার মন সরিল না।

ভিক্ষুক আবার ডাক দিল।

আন্নাকালী ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সেজদি, তোমার সেই ছেলে এসেছে।

ললিতা বলিল, কালী, একটা কাজ কর না ভাই। আমার হাত জোড়া, তুই একটিবার ছুটে গিয়ে শেখরদাব কাছ থেকে একটা টাকা নিয়ে আয়।

কালী ছুটিয়া চলিয়া গেল, খানিক পরে তেমনি ছুটিয়া আসিয়া ললিতার হাতে একটা টাকা দিয়া বলিল, এই নাও!

ললিতা জিজ্ঞেস করিল, শেখরদা কি বললে রে?

কিছু না। আমাকে বললে চাপকানের পকেট থেকে নিতে, আমি নিয়ে এলুম।

আর কিছু বললে না?

না, আর কিছু না, বলিয়া আন্নাকালী ঘাড় নাড়িয়া খেলা করিতে চলিয়া গেল।

ললিতা ভিক্ষুক বিদায় করিল, কিন্তু অন্যদিনের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার বাক্যচ্ছটা শুনিতে পারিল না—ভালই লাগিল না।

এ কয়দিন তাহাদের আড্ডা পূর্ণ-তেজে চলিতেছিল। আজ দুপুরবেলা ললিতা গেল না, মাথা ধরিয়াছে বলিয়া শুইয়া রহিল। আজ সত্যসত্যই তাহার ভারি মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল। বিকালবেলা কালীকে কাছে ডাকিয়া বলিল, কালী, তুই পড়া বলে নিতে শেখরদার ঘরে আর যাসনে?

কালী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ যাই ত!

আমার কথা শেখরদা জিজ্ঞেস করে না?

না। হাঁ হাঁ, পরশু করেছিলে—তুমি দুপুরবেলা তাস খেল কি না?

ললিতা উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, তুই কি বললি?

কালী বলিল, তুমি দুপুরবেলা চারুদিদিদের বাড়ি তাস খেলতে যাও, তাই

বললুম। শেখরদা বললে, কে কে খেলে? আমি বললুম, তুমি আর সই-মা, চারুদিদি আর তার মামা। আচ্ছা, তুমি ভাল খেলো, না চারুদিদির মামা ভাল খেলে সেজদি? সই-মা বলে তুমি ভালো খেলো, না?

ললিতা সে-কথার জবাব না দিয়া হঠাৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, তুই অত কথা বলতে গেলি কেন? সব কথায় তোর কথা কওয়া চাই, আর কোনদিন তোকে আমি কিচ্ছু দেব না, বলিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

কালী অবাক হইয়া গেল। তাহার এই আকস্মিক ভাবপরিবর্ত্তনের হেতু সে কিছুই বুঝিল না।

মনোরমার তাস-খেলা দু'দিন বন্ধ হইয়াছে—ললিতা আসে না। তাহাকে দেখিয়া অবধি গিরীন যে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা প্রথম হইতেই মনোরমা সন্দেহ করিয়াছিলেন তাঁহার সেই সন্দেহ আজ সুদৃঢ় হইল।

এই দুইদিন গিরীন কি একরকম উৎসুক ও অন্যমনস্ক হইয়াছিল। অপরাহ্নে বেড়াইতে যাইত না, যখন তখন বাড়ির ভিতরে আসিয়া এঘর-ওঘর করিত, আজ দুপুরবেলা আসিয়া বলিল, দিদি, আজও খেলা হবে না?

মনোরমা বলিলেন, কি করে হবে গিরীন, লোক কৈ? না হয়, আয় আমরা তিনজনেই খেলি।

গিরীন নিরুৎসাহভরে বলিল, তিনজনে কি খেলা হয় দিদি? ও বাড়ির ললিতাকে একবার ডাকতে পাঠাও না।

সে আসবে না।

গিরীন বিমর্ষ হইয়া কহিল, কেন আসবে না, ওদের বাড়িতে মানা ক'রে দিয়েচে বোধ হয়, না?

মনোরমা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, ওর মামা মামী সে-রকম মানুষ নয়—সে নিজেই আসে না।

গিরীন হঠাৎ খুশী হইয়া বলিল, তা হলে তুমি নিজে আজ একবার গেলেই আসবে,—কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে নিজের মনেই ভারি অপ্রতিভ হইয়া গেল।

মনোরমা হাসিয়া ফেলিলেন,—আচ্ছা, তাই যাই, বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং খানিক পরে ললিতাকে ধরিয়া আনিয়া তাস পাড়িয়া বসিলেন।

দু'দিন খেলা হয় নাই, আজ অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ জমিয়া গেল। ললিতারা জিতিতেছিল।

ঘণ্টা-দুই পরে সহসা কালী আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সেজদি, শেখরদা ডাকচেন—জলদি!

ললিতার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, তাস-দেওয়া বন্ধ করিয়া বলিল, শেখরদা অফিসে যাননি?

কি জানি, চলে এসেচেন, বলিয়া সে ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থান করিল।

ললিতা তাস রাখিয়া দিয়া মনোরমার মুখপানে চাহিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, যাই সই-মা।

মনোরমা তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, সে কি রে, আর দু'হাত দেখে যা!

ললিতা ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না সই-মা, ইনি তা হলে বড় রাগ করবেন, বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

গিরীন প্রশ্ন করিল, শেখরদা আবার কে দিদি?

মনোরমা বলিলেন, ঐ যে সুমুখের ফটকওয়ালা বাড়িটা।

গিরীন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ও—ওই বাড়ি! নবীনবাবু ওঁদের আত্মীয় বুঝি?

মনোরমা মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আত্মীয় কেমন! ললিতাদের ঐ ভিটেটুকু পর্য্যন্ত বুড়ো আত্মসাৎ করবার ফিকিরে আছেন।

গিরীন আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল।

মনোরমা তখন গল্প করিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া গত বৎসর টাকার অভাবে গুরুচরণবাবুর মেজ মেয়ের বিবাহ হইতেছিল না, পরে অসম্ভব সুদে নবীন রায় টাকা ধার দিয়া বাড়িখানি বাঁধা রাখিয়াছেন। এ টাকা কোনদিন শোধ হইবে না এবং অবশেষে বাড়িটা নবীন রায়ই গ্রহণ করিবেন।

মনোরমা সমস্ত কথা বলিয়া পরিশেষে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, বুড়োর আন্তরিক ইচ্ছা গুরুচরণবাবুর ভাঙা বাড়িটা ভাঙিয়া ফেলিয়া ঐখানে ছোট ছেলে শেখরের জন্যে একটি বড় রকমের বাড়ি তৈরি করেন—দুই ছেলের দুই আলাদা বাড়ি—মতলব মন্দ নয়।

ইতিহাস শুনিয়া গিরীনের ক্লেশ বোধ হইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দিদি, গুরুচরণবাবুর আরও ত মেয়ে আছে, তাদেরি বা বিয়ে কি করে দেবেন?

মনোরমা বলিলেন, নিজের ত আছেই, তা ছাড়া ললিতা। ওর বাপ-মা নেই, সমস্ত ভার ঐ গরীবের ওপর। বড় হয়ে উঠেচে, এই বছরের মধ্যে বিয়ে না দিলেই নয়। ওদের সমাজে সাহায্য করতে কেউ নেই, জাত নিতে সবাই আছে—আমরা বেশ আছি গিরীন।

গিরীন চুপ করিয়া রহিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, সেদিন ললিতার কথা নিয়েই ওর মামী আমার কাছে কেঁদে ফেল্‌লে—কি করে যে কি হবে তার কিছুই স্থির নেই—ওর ভাবনা ভেবেই গুরুচরণবাবুর পেটে অন্ন-জল যায় না,—হাঁ গিরীন,

মুঙ্গেরে তোদের কোন বন্ধু-বান্ধব এমন নেই যে, শুধু মেয়ে দেখে বিয়ে করে? অমন মেয়ে কিন্তু পাওয়া শক্ত।

গিরীন বিষণ্ণভাবে মৃদু হাসিয়া বলিল, বন্ধু-বান্ধব আর পাবো কোথায় দিদি, তবে টাকা দিয়ে আমি সাহায্য করতে পারি।

গিরীনের পিতা ডাক্তারি করিয়া অনেক টাকা এবং বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সে সমস্তরই এখন সে মালিক।

মনোরমা বলিলেন, টাকা তুই ধার দিবি?

ধার আর কি দেব দিদি—ইচ্ছে হয় উনি শোধ দেবেন, না হয় নাই দেবেন।

মনোরমা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, তোর টাকা দিয়ে লাভ? ওরা আমাদের আত্মীয়ও নয়, সমাজের লোকও নয়—এমনি কে কাকে টাকা দেয়?

গিরীন তাহার বোনের মুখের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল, তার পরে কহিল, সমাজের লোক নাই হলেন, বাঙালী ত? ওঁর একান্ত অভাব, আর আমার বিস্তর রয়েচে—তুমি একবার বলে দেখো না দিদি, উনি যদি নিতে রাজি হন, আমি দিতে পারি। ললিতা তাঁদেরও কেউ নয়, আমাদেরও কেউ নয়—তার বিয়ের সমস্ত খরচ না হয় আমিই দেব।

তাহার কথা শুনিয়া মনোরমা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। ইহাতে তাঁহার নিজের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই বটে, তথাপি এত টাকা একজন আর একজনকে দিতেছে দেখিলে অনেকে স্ত্রীলোকই প্রসন্ন-চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না।

চারু এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, সে মহা খুশী হইয়া লাফাইয়া উঠিল, বলিল, তাই দাও মামা, আমি সই-মাকে বলে আসচি।

তাহার মা ধমক দিয়া বলিলেন, তুই থাম্ চারু, ছেলেমানুষ—এ-সব কথায় থাকিসনে। বলতে হয় আমিই বলব।

গিরীন কহিল, তাই ব'লো দিদি। পরশু রাস্তার উপর দাঁড়িয়েই গুরুচরণবাবুর সঙ্গে একটুখানি আলাপ হয়েছিল, কথায়-বার্তায় মনে হ'লো—বেশ সরল লোক; তুমি কি বল?

মনোরমা বলিলেন, আমিও তাই বলি, সবাই তাই বলে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বড় সাদা-সিদে মানুষ। সেইজন্যেই ত দুঃখ হয় গিরীন, অমন লোকটিকে হয়ত বাড়ি-ঘর ছেড়ে নিরাশ্রয় হতে হবে। তার সাক্ষী দেখলিনে গিরীন, শেখরবাবু ডাকচেন বলতেই ললিতা কি-রকম তাড়াতাড়ি উঠে পালালো, বাড়িশুদ্ধ লোক ওদের কাছে যেন বিক্রি হয়ে আছে। কিন্তু যত খোসামোদই করুক না কেন, নবীন রায়ের হাতে গিয়ে একবার যখন পড়েছে, রেহাই পাবে, এ ভরসা কেউ করে না।

গিরীন জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে বলবে ত দিদি ?

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করব। দিয়ে যদি তুই উপকার করতে পারিস্, ভালই ত। বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা তোরই বা চাড় কেন গিরীন ?

চাড় আর কি দিদি, দুঃখে-কষ্টে পরস্পরের সাহায্য করতেই হয়, বলিয়া সে ঈষৎ সলজ্জ-মুখে প্রস্থান করিল। দ্বারের বাহিরে গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

তাহার দিদি বলিলেন, আবার বসলি যে ?

গিরীন হাসিমুখে বলিল, অত যে কাঁদুনি গাইলে দিদি, হয়ত সব সত্যি নয়।

মনোরমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কেন ?

গিরীন বলিতে লাগিল, ওদের ললিতা যে রকম টাকা খরচ করে, সে ত দুঃখীর মত মোটেই নয় দিদি ! সেদিন আমরা থিয়েটার দেখতে গেলুম, ও নিজে গেল না, তবু দশ টাকা ওর বোনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে। চারুকে জিজ্ঞেস কর না, কি রকম খরচ করে ; মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকার কম ওর নিজের খরচই চলে না যে !

মনোরমা বিশ্বাস করিলেন না।

চারু বলিল, সত্যি মা। ও-সব শেখরবাবুর টাকা, শুধু এখন নয়, ছেলেবেলা থেকে সই ওর শেখরদার আলমারি খুলে টাকা নিয়ে আসে—কেউ কিছু বলে না।

মনোরমা মেয়ের দিকে চাহিয়া সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, টাকা আনে শেখরবাবু জানেন ?

চারু মাথা নাড়িয়া বলিল, জানেন, সুমুখেই চাবি খুলে নিয়ে আসে। গেল মাসে আন্নাকালীর পুতুলের বিয়েতে অত টাকা কে দিলে ? সবই ত সেই দিলে।

মনোরমা ভাবিয়া বলিলেন, কি জানি। কিন্তু এ-কথাও ঠিক বটে, বুড়োর মত ছেলেরা অমন চামার নয়—ওরা সব মায়ের ধাত পেয়েছে—তাই দয়া-ধর্ম্ম আছে। তা ছাড়া, ললিতা মেয়েটি খুব ভাল, ছেলেবেলা থেকে কাছে কাছে থাকে, দাদা বলে ডাকে ; তাই ওকে মায়া-মমতাও সবাই করে। হাঁ চারু, তুই ত যাওয়া-আসা করিস, ওদের শেখরের এই মাঘ মাসে না-কি বিয়ে হবে ? শুনেচি, বুড়ো অনেক টাকা পাবে।

চারু বলিল, হাঁ মা, এই মাঘ মাসেই হবে—সব ঠিক হয়ে গেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গুরুচরণ লোকটি সেই ধাতের মানুষ যাহার সহিত যে-কোনও বয়সের লোক অসঙ্কোচে আলাপ করিতে পারে। দুই-চারিদিনের আলাপে গিরীনের সহিত তাহার একটা স্থায়ী সখ্যতা জন্মিয়া গিয়াছিল। গুরুচরণের চিত্তের বা মনের কিছুমাত্র দৃঢ়তা ছিল না বলিয়া তর্ক করিতেও তিনি যেমন ভালবাসিতেন, তর্কে পরাজিত হইলেও তেমনি কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না।

সন্ধ্যার পর চা খাইবার নিমন্ত্রণ তিনি গিরীনকে করিয়া রাখিয়াছিলেন। আফিস হইতে ফিরিতেই তাঁহার দিবা অবসান হইয়া যাইত। হাত-মুখ ধুইয়াই বলিতেন, ললিতে, চা তৈরি হ'লো মা? কালী, যা যা, তোর গিরীনমামাকে এইবার ডেকে আন্। তারপর উভয়ে চা-খাওয়া এবং তর্ক চলিতে থাকিত।

ললিতা কোন কোনদিন মামার আড়ালে বসিয়া চুপ করিয়া শুনিত। সেদিন গিরীনের যুক্তি-তর্ক শতমুখে উৎসারিত হইতে থাকিত। তর্কটা প্রায়ই আধুনিক সমাজের বিরুদ্ধেই হইত। সমাজের হৃদয়হীনতা, অসঙ্গত উপদ্রব এবং অত্যাচার—এ সমস্তই সত্য কথা।

একে ত সমর্থন না করিবার বাস্তবিক কিছু নাই, তাহাতে গুরুচরণের উৎপীড়িত অশান্ত হৃদয়ের সহিত গিরীনের কথাগুলো বড়ই খাপ খাইত। তিনি শেষকালে ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন, ঠিক কথা গিরীন, কার ইচ্ছে আর না করে, নিজের মেয়েদের যথাসময়ে ভাল জায়গায় বিয়ে দিতে, কিন্তু দিই কি করে? সমাজ বলচেন দাও বিয়ে—মেয়ের বয়স হয়েচে, কিন্তু দেবার বন্দোবস্ত করে ত দিতে পারেন না। যা বলেচ গিরীন, এই আমাকে দিয়েই ছাখ না কেন, বাড়িটুকু পর্য্যন্ত বন্ধক পড়েচে, দুদিন পরে ছেলে-মেয়ের হাত ধরে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—সমাজ তখন ত বলবে না, এসো, আমার বাড়িতে আশ্রয় নাও। কি বল হে?

গিরীন হয়ত চুপ করিয়া থাকিত, গুরুচরণ নিজেই বলিতেন, খুব সত্য কথা। এমন সমাজ থেকে জাত যাওয়াই মঙ্গল। খাই না খাই, শান্তিতে থাকা যায়। যে সমাজ দুঃখীর দুঃখ বোঝে না, বিপদে সাহস দেয় না, শুধু চোখ রাঙায় আর গলা চেপে ধরে, সে সমাজ আমার নয়, আমার মত গরীবেরও নয়—সে সমাজ বড়লোকের জন্যে। ভাল, তারই থাক্, আমাদের কাজ নাই। বলিয়া গুরুচরণ সহসা চুপ করিতেন।

যুক্তিতর্কগুলি ললিতা শুধুই মন দিয়া শুনিত না, রাত্রে বিছানায় শুইয়া যতক্ষণ

ঘুম না আসিত, নিজের মনে বিচার করিয়া দেখিত। প্রতি কথাটি তাহার মনের উপর গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া উঠিতেছিল। সে মনে মনে বলিত, যথার্থই গিরীন-বাবুর কথাগুলি অতিশয় ন্যায়সঙ্গত।

মামাকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত, সেই মামার স্বপক্ষে টানিয়া গিরীন যাহাই কিছু বলিত, সমস্তই তাহার কাছে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে হইত। তাহার মামা বিশেষ করিয়া তাহারি জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে, অন্ন-জল পরিত্যাগ করিতেছে—তাহার নির্ব্বিরোধী দুঃখী মামা তাহাকে আশ্রয় দিয়াই—এত ক্লেশ পাইতেছে। কিন্তু কেন? কেন মামার জাত যাবে? আজ আমার বিয়ে দিয়ে, কাল যদি বিধবা হয়ে ফিরে আসি, তা হলে ত জাত যাবে না। অথচ তফাৎ কিসের? গিরীনের এই সমস্ত কথার প্রতিধ্বনি সে তাহার ভারাতুর হৃদয় হইতে বাহির করিয়া আর একবার তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িত।

তাহার মামার হইয়া, মামার দুঃখ বুঝিয়া, যে কেহ কথা কহিত, তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া, তাহার মতের সহিত মত না মিলাইয়া ললিতার অন্য পথ ছিল না। সে গিরীনকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ গুরুচরণের মত সেও সন্ধ্যার চা-পানের সময়টির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত।

পূর্ব্বে গিরীন ললিতাকে 'আপনি' বলিয়া ডাকিত। গুরুচরণ নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, ওকে আবার 'আপনি' কেন গিরীন, 'তুমি' বলে ডেকো। তখন হইতে সে 'তুমি' বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছিল।

একদিন গিরীন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি চা খাও না ললিতা?

ললিতা মুখ নীচু করিয়া ঘাড় নাড়িলে, গুরুচরণ বলিয়াছিলেন, ওর শেখরদার বারণ আছে। মেয়েমানুষের চা খাওয়া সে ভালবাসে না।

হেতু শুনিয়া যে গিরীন সুখী হইতে পারে নাই, ললিতা সেটুকু বুঝিতে পারিয়াছিল।

আজ শনিবার। অন্যদিনের অপেক্ষা এই দিনটার সভা ভাঙিতে অধিক বিলম্ব হইল।

চা খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, গুরুচরণ আজ আলোচনায় তেমন উৎসাহের সহিত যোগ দিতে পারিতেছিলেন না, মাঝে মাঝে কি একরকম অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন।

গিরীন সহজেই তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল, আজ আপনার দেহটা বোধ করি তেমন ভাল নাই?

গুরুচরণ হুঁকাটা মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া বলিলেন, কেন? দেহ ত বেশ ভালই আছে।

গিরীন সঙ্কোচের সহিত বলিল, তা হলে আফিসে কি কিছু—

না, তাও ত কিছু নয়, বলিয়া গুরুচরণ একটু বিস্ময়ের সহিত গিরীনের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার ভিতরের উদ্বেগ যে বাহিরে প্রকাশ পাইতেছিল, তাহা এই নিতান্ত সরল-প্রকৃতির মানুষটি বুঝিতেই পারেন নাই।

ললিতা পূর্ব্বে একেবারেই চুপ করিয়া থাকিত, কিন্তু আজকাল দু-একটা কথায় মাঝে মাঝে যোগ দিতেছিল। সে বলিল, হাঁ মামা, আজ তোমার হয়ত মন ভাল নেই।

গুরুচরণ হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, ও সেই কথা? হাঁ মা, ঠিক ধরেচিস বটে, আজ আমার সত্যিই মনটা ভাল নেই।

ললিতা ও গিরীন উভয়েই তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

গুরুচরণ বলিলেন, নবীনদা সমস্ত জেনে-শুনে গোটা-কতক শক্ত কথা পথে দাঁড়িয়েই শুনিয়ে দিলেন। আর তাঁরই বা দোষ কি, ছ'মাস হয়ে গেল, একটা পয়সা সুদ দিতে পারলুম না, তা আসল দূরে থাক্।

ব্যাপারটা ললিতা বুঝিয়াই চাপা দিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার কাণ্ডজ্ঞানহীন মামা পাছে ঘরের লজ্জাকর কথাগুলা পরের কাছে ব্যক্ত করিয়া ফেলে, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তুমি ভেবো না মামা, সে-সব পরে হবে।

কিন্তু গুরুচরণ সেদিক দিয়াও গেলেন না। বরং বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিলেন, পরে আর কি হবে মা? তা নয় গিরীন, আমার এই মা'টি চায় তার বুড়ো ছেলেটি যেন কিছু ভাবনা-চিন্তা না করে। কিন্তু বাইরের লোক যে তোর দুঃখী মামার দুঃখটা চেয়ে দেখতেই চায় না ললিতে।

গিরীন জিজ্ঞাসা করিল, নবীনবাবু আজ কি বললেন?

গিরীন যে সমস্ত কথাই জানে ললিতা তাহা জানিত না, তাই তাহার প্রশ্নটাকে অসঙ্গত কৌতূহল মনে করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

গুরুচরণ খুলিয়া বলিলেন। নবীন রায়ের স্ত্রী বহুদিন হইতে অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছিলেন, সম্প্রতি রোগ কিছু বৃদ্ধি হওয়ায় চিকিৎসকেরা বায়ু-পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অর্থের প্রয়োজন, অতএব এই সময়ে গুরুচরণের সমস্ত সুদ এবং কিছু আসল দিতেই হইবে।

গিরীন ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া মৃদু-কণ্ঠে বলিল, একটা কথা আপনাকে বলি বলি করেও বলতে পারিনি, যদি কিছু না মনে করেন, আজ তা হলে বলি।

গুরুচরণ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, আমাকে কোন কথা বলতে কেউ কখন ত সঙ্কোচ করে না গিরীন,—কি কথা?

গিরীন বলিল, দিদির কাছে শুনেচি, নবীনবাবুর খুব বেশি সুদ। তাই বলি, আমার অনেক টাকাই ত অমনি পড়ে রয়েছে, কোনও কাজেই আসে না, আর, তাঁরও দরকার, না হয় এই ঋণটা শোধ করে দিন না?

ললিতা ও গুরুচরণ উভয়েই আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। গিরীন অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিতে লাগিল, আমার এখন ত টাকার বিশেষ কোন আবশ্যকই নাই, তাই যখন আপনার সুবিধা হবে ফিরিয়ে দিলেই চলবে, ওঁদের আবশ্যক, সেইজন্যে বলেছিলাম, যদি—

গুরুচরণ ধীরে ধীরে বলিলেন, সমস্ত টাকাটা তুমি দেবে?

গিরীন মুখ নীচু করিয়া বলিল, বেশ ত, তাঁদের উপকার হয়—

গুরুচরণ প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক এই সময়ে আন্নাকালী ছুটিয়া আসিয়া পড়িল। সেজদি, জলদি শেখরদা কাপড় পরে নিতে বললেন—থিয়েটার দেখতে যেতে হবে,—বলিয়াই যেমন করিয়া আসিয়াছিল তেমনি করিয়াই চলিয়া গেল। তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া গুরুচরণ হাসিলেন। ললিতা স্থির হইয়া রহিল।

আন্নাকালী মুহূর্ত্ত পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কৈ, উঠলে না সেজদি, সবাই দাঁড়িয়ে রয়েচি যে!

তথাপি ললিতা উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। সে শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া যাইতে চায়, কিন্তু গুরুচরণ কালীর মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া ললিতার মাথায় একটা হাত দিয়া বলিলেন, তাহলে যা মা, দেরি করিসনে—তোর জন্যে বুঝি সবাই অপেক্ষা করে আছে।

অগত্যা ললিতাকে উঠিতে হইল। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে গিরীনের মুখের পানে সে যে গভীর কৃতজ্ঞ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, গিরীন তাহা দেখিতে পাইল।

মিনিট-দশেক পরে কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সে পান দিবার ছুতা করিয়া আর একবার বাহিরের ঘরে নিঃশব্দ-পদক্ষেপে আসিয়া প্রবেশ করিল।

গিরীন চলিয়া গিয়াছে। একাকী গুরুচরণ মোটা বালিশটা মাথায় দিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন, তাঁহার মুদ্রিত চক্ষুর দুই পাশ বাহিয়া জল ঝরিতেছে। এ যে আনন্দাশ্রু, ললিতা তাহা বুঝিল। বুঝিল বলিয়াই তাঁহার ধ্যান ভাঙিয়া দিল না, যেমন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

অনতিকাল পরে সে যখন শেখরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার

নিজের চোখ দুটিও অশ্রুভারে ছল ছল করিতেছিল। কালী ছিল না, সে সকলের আগে গাড়িতে গিয়া বসিয়াছিল, একাকী শেখর তাহার ঘরের মাঝখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বোধ করি ললিতার অপেক্ষাতেই ছিল, মুখ তুলিয়া তাহার জলভারাক্রান্ত চোখ দুটি লক্ষ্য করিল।

সে আট-দশদিন ললিতাকে দেখিতে না পাইয়া মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়া ছিল, কিন্তু এখন সে তাহা ভুলিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, ও কি, কাঁদচ নাকি ?

ললিতা ঘাড় হেঁট করিয়া প্রবলবেগে মাথা নাড়িল।

এই কয়দিনের একান্ত অদর্শনে শেখরের মনের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল, তাই সে কাছে সরিয়া আসিয়া দুই হাত দিয়া সহসা ললিতার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, সত্যই কাঁদচ যে ! হ'লো কি ?

ললিতা এবার নিজেকে আর সামলাইয়া রাখিতে পারিল না, সেইখানে বসিয়া পড়িয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নবীন রায় সমস্ত সুদ আসল কড়াক্রান্তি গনিয়া লইয়া বন্ধকী কাগজখানা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, বলি, টাকাটা দিলে কে হে ?

গুরুচরণ নম্রভাবে কহিলেন, সেটা জিজ্ঞেস করবেন না দাদা, বলতে নিষেধ আছে।

টাকাটা ফেরত পাইয়া নবীন কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হন নাই, এটা আশাও করেন নাই, ইচ্ছাও করেন নাই। বরং বাড়িটা ভাঙিয়া ফেলিয়া কিরূপ নূতন অট্টালিকা প্রস্তুত করিবেন, তাহাই ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্লেষ করিয়া বলিলেন, তা এখন নিষেধ ত হবেই। ভায়া, দোষ তোমার নয়, আমার। দোষ, টাকাটা ফিরে চাওয়ার, নইলে কলিকাল বলেচে কেন !

গুরুচরণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন, সে কি কথা দাদা ! আপনার টাকার ঋণটাই শোধ করেচি, কিন্তু আপনার দয়ার ঋণ ত শোধ করতে পারিনি।

নবীন হাসিলেন। তিনি পাকা লোক, এ-সকল কথা বিশ্বাস করিলে গুড় বেচিয়া এত টাকা করিতে পারিতেন না। বলিলেন, সে যদি সত্যিই ভাবতে ভায়া, তা

হলে এমন করে শোধ করে দিতে না। না হয়, একবার টাকাটাই চেয়েছিলাম, সেও তোমারই বৌঠানের অসুখের জন্যে, আমার নিজের জন্যে কিছু নয়;—বলি কত সুদে বন্ধক রাখলে বাড়িটা?

গুরুচরণ ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, বন্ধক রাখিনি—সুদের কথাও কিছু হয়নি।

নবীন বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, বল কি, শুধু-হাতে?

হাঁ দাদা, একরকম তাই বটে। ছেলেটি বড় সৎ, বড় দয়ার শরীর।

ছেলেটি? ছেলেটি কে?

গুরুচরণ এ-প্রশ্নের জবাব দিলেন না, মৌন হইয়া রহিলেন। যতটা বলিয়া ফেলিয়াছেন এতটাও তাঁহার বলা উচিত ছিল না।

নবীন তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, যখন নিষেধ আছে তখন কাজ নেই, কিন্তু সংসাবেব অনেক জিনিসই দেখেচি বলে এইটুকু সাবধান করে দিই ভায়া, তিনি যেই হোন, এত ভাল করতে গিয়ে শেষকালে যেন ফ্যাসাদে না ফেলেন।

গুরুচরণ সে-কথার আর জবাব না দিয়া নমস্কার করিয়া কাগজখানি হাতে করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

প্রায় প্রতি বৎসরেই ভুবনেশ্বরী এই সময়টায় কিছুদিনের জন্য পশ্চিম ঘুরিয়া আসিতেন। তাঁহার অজীর্ণ রোগ ছিল, ইহাতে উপকার হইত। রোগ বেশি নয়। নবীন গুরুচরণের কাছে সেদিন কার্যোদ্ধারের জন্যই বাড়াইয়া বলিয়াছিল। যাহাই হউক, যাত্রার আয়োজন হইতেছিল।

সেদিন সকালবেলা একটা চামড়ার তোরঙ্গে শেখর তাহার আবশ্যকীয় সৌখীন জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতেছিল।

আন্নাকালী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, শেখরদা, তোমরা কাল যাবে, না?

শেখর তোরঙ্গ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, কালী, তোর সেজদিকে ডেকে দে, সে কি সঙ্গে নেবে-টেবে, এই সময়ে দিয়ে যাক। ললিতা প্রতি বৎসর মায়ের সঙ্গে যাইত, এবারেও যাইবে, তাহাই শেখর জানিত।

কালী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এবার সেজদি ত যাবে না।

কেন যাবে না?

কালী কহিল, বাঃ, কি করে যাবে। মাঘ-ফাল্গুন মাসে ওর বিয়ে হবে, বাবা বর খুঁজে বেড়াচ্ছেন যে।

শেখর নির্নিমেষ-চোখে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

কালী বাড়ির ভিতরে যাহা শুনিয়াছিল, উৎসাহের সহিত ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, গিরীনবাবু বলেচেন যত টাকা লাগে ভাল পাত্তর চাই। বাবা আজও অফিসে যাবেন না, খেয়ে-দেয়ে কোথায় ছেলে দেখতে যাবেন; গিরীনবাবুও সঙ্গে যাবেন।

শেখর স্থির হইয়া শুনিতে লাগিল এবং কেন যে ললিতা আর আসিতে চাহে না তাহারও যেন কতকটা কারণ বুঝিতে পারিল।

কালী বলিতে লাগিল, গিরীনবাবু খুব ভালমানুষ শেখরদা। মেজদির বিয়ের সময় আমাদের বাড়ি জ্যাঠামশায়ের কাছে বাঁধা ছিল ত, বাবা বলেছিলেন, আর দু'মাস তিনমাস পরেই আমাদের সবাইকে পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হ'তো, তাই গিরীনবাবু টাকা দিলেন। কাল সব টাকা জ্যাঠামশায়কে বাবা ফিরিয়ে দিয়েচেন। সেজদি বলছিল, আর আমাদের কোন ভয় নেই, সত্যি না শেখরদা।

প্রত্যুত্তরে শেখর কিছুই বলিতে পারিল না, তেমনি চাহিয়া রহিল।

কালী জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবচ শেখরদা?

এইবার শেখরের চমক ভাঙিল, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কিছু না রে। কালী, তোর সেজদিকে একবার শীগগির ডেকে দে, বল্ ডাকচি, যা ছুটে যা।

শেখর খোলা তোরঙ্গের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। কোন্ দ্রব্যে তাহার প্রয়োজন, কোন্ দ্রব্যে প্রয়োজন নাই, সমস্তই এখন তাহার চোখের সম্মুখে একাকার হইয়া গেল।

ডাক শুনিয়া ললিতা উপরে আসিয়া প্রথমে জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, তাহার শেখরদা মেঝের উপর একদৃষ্টে মাটির দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। তাহার এ-রকম মুখের ভাব সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই! ললিতা আশ্চর্য্য হইল, ভয় পাইল। ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে শেখর 'এসো' বলিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ললিতা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে ডাকছিলে?

হ্যাঁ, বলিয়া শেখর ক্ষণকাল স্থির হইয়া থাকিয়া কহিল, কাল সকালের গাড়িতেই আমি মাকে নিয়ে পশ্চিমে যাচ্চি, এবার ফিরতে হয়ত দেরি হবে। এই চাবি নাও, তোমার খরচের টাকা-কড়ি ও দেরাজের মধ্যেই রইল।

প্রতিবার ললিতাও সঙ্গে যায়। গতবারে এই উপলক্ষে সে কি আনন্দে জিনিস-পত্র গুছাইয়া লইয়াছিল, এবার সে কাজটা শেখরদা একা করিতেছে, খোলা তোরঙ্গের দিকে চাহিবামাত্রই ললিতার তাহা মনে পড়িল।

শেখর তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া, একবার কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার

করিয়া বলিল, সাবধানে থেকো—আর যদি কোন-কিছুর বিশেষ আবশ্যক হয়, দাদার কাছে ঠিকানা জেনে নিয়ে আমাকে চিঠি লিখো।

অতঃপর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। এবার ললিতা সঙ্গে যাইবে না, শেখর তাহা জানিতে পারিয়াছে, এবং তাহার কারণটাও হয়ত শুনিয়াছে মনে করিয়া ললিতা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতে লাগিল।

হঠাৎ শেখর কহিল, আচ্ছা যাও এখন, আমাকে আবার এইগুলো গুছিয়ে নিতে হবে। বেলা হ'লো, আজ একবার অফিসেও যেতে হবে।

ললিতা তোরঙ্গের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, তুমি স্নান কর গে, আমি গুছিয়ে দিচ্ছি।

তা হলে ত ভালই হয়, বলিয়া শেখর চাবির গোছাটা ললিতার কাছে ফেলিয়া দিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমার কি দরকার হয়, তা ভুলে যাওনি ত?

ললিতা মাথা ঝুঁকাইয়া তোরঙ্গের জিনিসপত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল, সে-কথার কোন জবাব দিল না।

শেখর নীচে গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কালীর সমস্ত সংবাদই সত্য। গুরুচরণ ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন, সে কথাও সত্য। ললিতার পাত্র স্থির করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, তাহাও সত্য। সে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-দুই পরে স্নানাহার শেষ করিয়া অফিসের পোষাক পরিতে নিজের ঘরে ঢুকিয়া সে সত্যই অবাক হইয়া গেল!

এই দুই ঘণ্টাকাল ললিতা কিছুই করে নাই, তোরঙ্গের একটা পাটির উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শেখরের পদশব্দে চকিত হইয়া মুখ তুলিয়াই ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। তার দুই চোখ জবাফুলের মত রক্তবর্ণ হইয়াছে।

কিন্তু শেখর তাহা দেখিয়াও দেখিল না, আফিসের পোষাক পরিতে পরিতে সহজভাবে বলিল, এখন পারবে না ললিতা, দুপুরবেলা এসে গুছিয়ে রেখো। বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আফিসে চলিয়া গেল। সে ললিতার রাঙা চোখের হেতু ঠিক বুঝিয়াছিল, কিন্তু সব দিক বেশ করিয়া চিন্তা না-করা পর্য্যন্ত আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

সেদিন অপরাহ্ণে মামাদের চা দিতে আসিয়া ললিতা সহসা জড়-সড় হইয়া পড়িল। আজ শেখর বসিয়াছিল। সে গুরুচরণবাবুর কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছিল।

ললিতা ঘাড় হেঁট করিয়া দু'বাটি চা প্রস্তুত করিয়া গিরীন ও মামার সম্মুখে দিতেই গিরীন কহিল, শেখরবাবুকে চা দিলে না ললিতা?

ললিতা মুখ না তুলিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, শেখরদা চা খান না।

গিরীন আর কিছু বলিল না, ললিতার নিজের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল! শেখর নিজেও এটা খায় না, অপরে খায় তাহাও ইচ্ছা করে না।

চায়ের বাটি হাতে তুলিয়া লইয়া গুরুচরণ পাত্রের কথা পাড়িলেন। ছেলেটি বি. এ. পড়িতেছে, ইত্যাদি বিস্তর সুখ্যাতি করিয়া শেষে বলিলেন, অথচ আমাদের গিরীনের পছন্দ হয়নি। অবশ্য ছেলেটি দেখিতে তেমন সুশ্রী নয় বটে, কিন্তু পুরুষ-মানুষের রূপ আর কোন্ কাজে লাগে, গুণ থাকলেই যথেষ্ট।

কোনমতে বিবাহটা হইয়া গেলেই গুরুচরণ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন।

শেখরের সহিত গিরীনের এইমাত্র সামান্য পরিচয় হইয়াছিল। শেখর তাহার দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গিরীনবাবুর পছন্দ হলো না কেন? ছেলেটি লেখাপড়া করছে, অবস্থাও ভাল,—এই ত সুপাত্র।

শেখর জিজ্ঞাসা করিল বটে, কিন্তু সে ঠিক বুঝিয়াছিল কেন ইহার পছন্দ হয় নাই এবং কেন ভবিষ্যতেও হইবে না। কিন্তু গিরীন সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না, তাহার মুখ ঈষৎ রক্তাভ হইল, শেখর তাহাও লক্ষ্য করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কাকা, কাল মাকে নিয়ে পশ্চিম চললুম, ঠিক সময়ে খবর দিতে যেন ভুলে যাবেন না।

গুরুচরণ বলিলেন, সে কি বাবা, তোমরাই যে আমার সব। তা ছাড়া, ললিতার মা উপস্থিত না থাকলে ত কোন কাজই হতে পারবে না। কি বলিস মা ললিতা? বলিয়া হাসিমুখে ঘাড় ফিরাইয়া বলিলেন, সে উঠে গেল কখন্?

শেখর কহিল, কথা উঠতেই পালিয়েছে।

গুরুচরণ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, পালাবে বৈ-কি—হাজার হোক জ্ঞানবুদ্ধি হয়েচে ত। বলিয়া সহসা একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, মা আমার একাধারে যেন লক্ষ্মী-সরস্বতী! এমন মেয়ে বহু ভাগ্যে মেলে শেখরনাথ। কথাটা উচ্চারণ করতেই তাঁর শীর্ণ কৃশ মুখের উপর গভীর স্নেহের এমন একটা স্নিগ্ধ-মধুর ছায়াপাত হইল যে, গিরীন ও শেখর উভয়েই আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে মনে মনে নমস্কার না করিয়া থাকিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চায়ের মজলিস হইতে নিঃশব্দে পলাইয়া আসিয়া ললিতা শেখরের ঘরে ঢুকিয়া উজ্জ্বল গ্যাসের নীচে একটা তোরঙ্গ টানিয়া আনিয়া শেখরের গরম বস্ত্রগুলি পাট করিয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল, শেখরকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া সে ভয়ে বিস্ময়ে নির্বাক্ হইয়া রহিল।

মোকদ্দমায় সর্ব্বস্ব হারিয়া মানুষ যে-রকম মুখ করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আসে, এ-বেলার মানুষকে যেন ও-বেলায় সহসা আর চিনিতে পারা যায় না, এই এক ঘণ্টার মধ্যে তেমনি শেখরকে ললিতা যেন ঠিক চিনিতে পারিল না। তাহার মুখের উপর সর্ব্বস্ব হারানোর চিহ্ন যেন কে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে।

শেখর শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হচ্চে ললিতা?

ললিতা সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়া কাছে সরিয়া আসিয়া দুই হাতে তাহার একটা হাত লইয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, কি হয়েচে শেখরদা?

কৈ, কিছুই হয়নি ত, বলিয়া শেখর জোর করিয়া একটু হাসিল। ললিতার করস্পর্শে তাহার মুখে কতকটা সজীবতা ফিরিয়া আসিল। সে নিকটস্থ একটা চৌকির উপরে বসিয়া পড়িয়া সেই প্রশ্নই করিল, তোমার হচ্চে কি?

ললিতা কহিল, মোটা ওভারকোটটা সঙ্গে দিতে ভুলেছিলুম, সেইটাই দিতে এসেচি।

শেখর শুনিতে লাগিল। ললিতা এতক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া বলিতে লাগিল, গতবারে গাড়িতে তোমার বড় কষ্ট হয়েছিল, বড় কোট ত অনেকগুলোই ছিল, কিন্তু খুব মোটা-সোটা একটাও ছিল না। তাই আমি ফিরে এসেই দোকানে মাপ দিয়ে এইটে তৈরি করিয়েছিলুম, বলিয়া সে খুব ভারি একটা ওভারকোট তুলিয়া আনিয়া শেখরের কাছে রাখিল।

শেখর হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, কই, আমাকে বলনি ত?

ললিতা হাসিয়া বলিল, তুমি বাবুমানুষ, তোমাকে বললে কি এত মোটা কোট তৈরি করতে দিতে? তাই বলিনি, তৈরি করিয়ে তুলে রেখেছিলুম।—বলিয়া সেটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিল, ঠিক উপরেই রইল, তোরঙ্গ খুললেই পাবে—শীত করলে গায়ে দিতে ভুলো না যেন!

আচ্ছা, বলিয়া শেখর নির্নিমেষ-চোখে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, না, এমন হতেই পারে না।

কি হতে পারে না? গায়ে দেবে না!

শেখর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না না, সে-কথা নয়—ও অন্য কথা। আচ্ছা ললিতা, মার জিনিস-পত্র গোছান হয়েছে কি না জানো?

ললিতা কহিল, জানি, দুপুরবেলা আমিই সে-সমস্ত গুছিয়েদিয়েছি, বলিয়া সে আর একবার সমস্ত দ্রব্য ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া চাবি বন্ধ করিতে লাগিল।

শেখর ক্ষণকাল চুপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ ললিতা, আসচে বছর আমার উপায় কি হবে বলতে পার?

ললিতা চোখ তুলিয়া বলিল, কেন?

কেন আমিই টের পাচ্চি ভাই, বলিয়া ফেলিয়াই নিজের কথাটা চাপা দিবার জন্য শুষ্কমুখে প্রফুল্লতা টানিয়া আনিয়া বলিল, কিন্তু পরের ঘরে যাবার আগে কোথায় কি আছে না আছে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে যেয়ো—নইলে দরকারের সময় কিছুই খুঁজে পাব না।

ললিতা রাগিয়া বলিল, যাও—

শেখর এতক্ষণে হাসিল, বলিল, যাও ত জানি, কিন্তু সত্যই উপায় হবে কি? আমার সখ ত আছে ষোল-আনা, কিন্তু এক কড়ার শক্তি নেই। এ-সব কাজ চাকর দিয়েও হয় না—এখন থেকে দেখচি, তোমার মামার মত হব—এক কাপড় এক চাঁদর সম্বল করে—যা হয় তাই হবে!

ললিতা চাবির গোছাটা মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

শেখর চেঁচাইয়া বলিল, কাল সকালে একবার এসো।

ললিতা শুনিয়াও শুনিল না, দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় নামিয়া গেল। বাড়ি গিয়া দেখিল, ছাদের এক কোণে চাঁদের আলোয় বসিয়া আন্নাকালী একরাশ গাঁদাফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে। ললিতা তাহার কাছে গিয়া বসিয়া কহিল, হিমে বসে কি করছিস্ কালী?

কালী মুখ না তুলিয়াই বলিল, মালা গাঁথচি—আজ রাত্তিরে আমার মেয়ের বিয়ে।

কই, আমাকে বলিস্‌নি ত?

ঠিক ছিল না সেজদি। এখন বাবা পাঁজি দেখে বললেন, আজ রাত্তির ছাড়া আর এ মাসে দিন নেই। মেয়ে বড় হয়েচে, আর রাখতে পারিনে, যেমন-তেমন করে বিদেয় করছি। সেজদি, দুটো টাকা দাও না, জলখাবার আনাই।

ললিতা হাসিয়া বলিল, টাকার বেলায় সেজদি। যা, আমার বালিশের নীচে আছে, নিগে যা। হাঁ রে কালী, গাঁদাফুলে কি বিয়ে হয়?

কালী গম্ভীরভাবে বলিল, হয়। অন্য ফুল না পেলে হয়। আমি কতগুলো

মেয়ে পার করলুম সেজদি। আমি সব জানি,—বলিয়া খাবার আনাইবার জন্য নীচে নামিয়া গেল।

ললিতা সেইখানে বসিয়া মালা গাঁথিতে লাগিল।

খানিক পরে কালী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আর সকলকেই বলা হয়েচে শুধু শেখরদাকে বলা হয়নি, যাই, বলে আসি, নইলে তিনি দুঃখ করবেন, বলিয়া ও-বাড়ি চলিয়া গেল।

কালী পাকা গৃহিণী, সমস্ত কাজ-কর্ম্মই সে সুশৃঙ্খলায় করে। শেখরদাকে সংবাদ দিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল, তিনি এক ছড়া মালা চাইলেন। যাও না সেজদি, শীগ্‌গির করে দিয়ে এসো না। আমি ততক্ষণ এদিকের বন্দোবস্ত করি—লগ্ন শুরু হয়ে গেছে, আর সময় নেই।

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি পারব না কালী, তুই দিয়ে আয়।

আচ্ছা যাচ্চি। ওই বড় ছড়াটা দাও, বলিয়া সে হাত বাড়াইল।

ললিতা হাতে তুলিয়া দিতে গিয়া কি ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা, আমি দিয়ে আসচি।

কালী গম্ভীর হইয়া বলিল, তাই যাও সেজদি, আমার অনেক কাজ—যাবার ফুরসৎ নেই।

তার মুখের ভাব ও কথার ভঙ্গি দেখিয়া ললিতা হাসিয়া ফেলিল। একেবারে পাকা বুড়ী, বলিয়া হাসিয়া মালা লইয়া চলিয়া গেল। কবাটের কাছে আসিয়া দেখিল, শেখর এক মনে চিঠি লিখিতেছে। দোর খুলিয়া পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, তাতেও শেখর টের পাইল না! তখন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাহাকে চমকিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে সে মালা-ছড়াটা সাবধানে শেখরের মাথা গলাইয়া গলায় ফেলিয়া দিয়াই চৌকির পিছনে বসিয়া পড়িল।

শেখর প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, এই কালী। পরক্ষণেই ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিল, ও কি করলে ললিতা!

ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া শেখরের মুখের ভাবে ঈষৎ শঙ্কিত হইয়া বলিল, কেন, কি?

শেখর পূর্ণমাত্রায় গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিল, জান না কি? কালীকে জিজ্ঞেস করে এসো, আজকের রাত্তিরে গলায় মালা পরিয়ে দিলে কি হয়।

এখন ললিতা বুঝিল। চক্ষের নিমেষে তাহার সমস্ত মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, সে—না, কক্ষনো না, কক্ষনো না, বলিতে বলিতে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শেখর ডাকিয়া বলিল, যেয়ো না ললিতা, শুনে যাও—কাজ আছে—

শেখরের ডাক তাহার কানে গেল বটে, কিন্তু শুনিবে কে? কোথাও সে থামিতে

পারিল না, দৌড়িয়া আসিয়া নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া একেবারে চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

এই পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া সে শেখরের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোনও দিন এমন কথা শোনে নাই। একে ত গম্ভীর প্রকৃতি শেখর কখনই তাহাকে পরিহাস করিত না, করিলেও এতবড় লজ্জাকর পরিহাস যে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে, ইহা সে ত কল্পনা করিতে পারিত না। লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া মিনিট-কুড়ি পড়িয়া থাকিয়া সে উঠিয়া বসিল। অথচ শেখরকে সে মনে মনে ভয় করিত, তিনি বিশেষ কাজ আছে বলিয়া ডাকিয়া ছিলেন, তাই যাইবে কি না ইহাই ললিতা উঠিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। ও-বাড়ির ঝির গলা শোনা গেল, ললিতাদি কোথায় গা, ছোটবাবু একবার ডাকচেন—

ললিতা বাহিরে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, যাচ্ছি, যাও। উপরে আসিয়া কবাট ফাঁক করিয়া দেখিল শেখর তখনও চিঠি লিখিতেছে। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, কেন?

শেখর লিখিতে লিখিতে বলিল, হঠাৎ কি একটা কাজ করে ফেললে বল ত?

ললিতা রুষ্টভাবে বলিল, যাও—আবার!

শেখর মুখ ফিরাইয়া বলিল, আমার দোষ কি! তুমিই ত করে গেলে—

কিছু করিনি—তুমি ওটা ফিরিয়ে দাও।

শেখর কহিল, সেইজন্যই ত ডেকে পাঠিয়েচি ললিতা। কাছে এসো, ওটা ফিরিয়ে দিচ্চি। তুমি অর্দ্ধেকটা করে গেছে, সরে এসো, আমি সেটা সম্পূর্ণ করে দি।

ললিতা দ্বারের অন্তরালে ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া বলিল, সত্য বলচি তোমাকে, ওরকম ঠাট্টা করলে আর কোনদিন তোমার সামনে আসবো না—বলচি, ওটা ফিরিয়ে দাও।

শেখর টেবিলের দিকে মুখ ফিরাইয়া মালাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, নিয়ে যাও।

তুমি ঐখান থেকে ছুঁড়ে দাও।

শেখর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, কাছে না এলে পাবে না।

তবে আমার কাজ নেই, বলিয়া ললিতা রাগ করিয়া চালিয়া গেল।

শেখর চেঁচাইয়া বলিল, কিন্তু অর্দ্ধেকটা হয়ে থাকলো—

থাকে থাক, বলিয়া ললিতা যথার্থই রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু নীচে গেল না। পূর্ব্বদিকে খোলা ছাদের একান্তে গিয়া রেলিঙ ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তখন সম্মুখের আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল এবং শীতল পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছিল। উপরে স্বচ্ছ নির্ম্মল নীলাকাশ। সে একবার শেখরের ঘরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিল। এইবার

তাহার চোখ জ্বালা করিয়া লজ্জায় অভিমানে দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। সে এত ছোট নহে যে, এসব কথার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তবে কেন তাহাকে এমন মর্ম্মান্তিক উপহাস করা! সে কত তুচ্ছ, কত নীচে, এ-কথা বুঝিবার তাহার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে। সে ঠিক জানে, সে অনাথ এবং নিরুপায় বলিয়া তাহাকে সবাই আদর ও যত্ন করে—শেখরও করে, তাহার জননীও করেন। তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই, সত্যকার দায়িত্ব তাহার কাহারও উপর নির্ভর করে না বলিয়াই গিরীন সম্পূর্ণ পর হইয়াও তাহাকে উদ্ধার করিয়া দিবার কথা তুলিতে পারিয়াছেন।

ললিতা চোখ মুদিয়া মনে মনে বলিল, এই কলিকাতার সমাজে তাহার মামার অবস্থা ত শেখরদের কত নীচে, সে আবার সেই মামার আশ্রিত গলগ্রহ। ওদিকে সমান ঘরে শেখরের বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, দুদিন আগেই হোক, পাছেই হোক, সেই ঘরেই একদিন হইবে। এই বিবাহ উপলক্ষ্যে নবীন রায় কত টাকা আদায় করিবেন সে-সব আলোচনাও সে শেখরের জননীর কাছে শুনিয়াছে।

তবে কেন তাহাকে হঠাৎ আজ এমন করিয়া শেখরদা অপমান করিয়া বসিল! এই সব কথা ললিতা সুমুখের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া নিজের মনে মগ্ন হইয়া আলোচনা করিতেছিল, সহসা চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল শেখর নিঃশব্দে হাসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে যে উপায়ে মালাটা সে শেখরের গলায় পরাইয়া দিয়াছিল, ঠিক সেই উপায়ে সেই গাঁদা ফুলের মালাটা তাহার নিজের গলায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কান্নায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু সে জোর করিয়া বিকৃতস্বরে বলিল, কেন এমন করলে?

তুমি করেছিলে কেন?

আমি কিছু করিনি, বলিয়াই সে মালাটা টান মারিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য হাত দিয়াই হঠাৎ শেখরের চোখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল। আর ছিঁড়িয়া ফেলিতে সাহস করিল না, কিন্তু কাঁদিয়া বলিল, আমার কেউ নেই বলেই ত তুমি এমন করে আমাকে অপমান করচ!

শেখর এতক্ষণ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, ললিতার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। এ ত ছেলেমানুষের কথা নয়! কহিল, আমি অপমান করছি, না তুমি আমাকে অপমান করছ?

ললিতা চোখ মুছিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, আমি কই অপমান করলুম?

শেখর ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সহজভাবে বলিল, এখন একটু ভেবে দেখলেই টের পাবে। আজকাল বড় বাড়াবাড়ি করছিলে ললিতা, আমি বিদেশ যাবার আগে সেইটেই তোমার বন্ধ করে দিলাম।—বলিয়া চুপ করিল।

ললিতা আর প্রত্যুত্তর করিল না, মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাতলে দু'জনে স্তব্ধ হইয়া রহিল। শুধু নীচ হইতে কালীর মেয়ের বিয়ের শাঁখের শব্দ ঘন ঘন শোনা যাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া শেখর কহিল, আর হিমে দাঁড়িয়ে থেকো না, নীচে যাও।

যাচ্চি, বলিয়া ললিতা এতক্ষণ পরে তাহার পায়ের নীচে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি করব বলে দিয়ে যাও।

শেখর হাসিল, একবার একটু দ্বিধা করিল, তারপর দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া, নত হইয়া তাহার অধরে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া বলিল, কিছুই বলে দিতে হবে না ললিতা, আজ থেকে আপনিই সব বুঝতে পারবে।

ললিতার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি হঠাৎ তোমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে ফেলেচি বলেই কি তুমি এ-রকম করলে?

শেখর হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না। আমি অনেকদিন থেকেই ভাবছি, কিন্তু স্থির করে উঠতে পারিনি। আজ স্থির করেছি, কেন না, আজই ঠিক বুঝতে পেরেছি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

ললিতা বলিল, কিন্তু তোমার বাবা শুনলে ভয়ানক রাগ করবেন, মা শুনে দুঃখ করবেন—এ হবে না শে—

বাবা শুনলে রাগ করবেন সত্যি, কিন্তু মা খুব খুশী হবেন। সে যাই হোক, যা হবার হয়ে গেছে—এখন তুমিও ফেরাতে পার না, আমিও পারি নে। যাও, নীচে গিয়ে মাকে প্রণাম কর গে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাস-তিনেক পরে একদিন গুরুচরণ ম্লানমুখে নবীন রায়ের ঘরে ঢুকিয়া ফরাসের উপর বসিবার উপক্রম করিতেই, তিনি চিৎকার করিয়া নিষেধ করিলেন, না না না, এখানে নয়—ঐ চৌকীর উপর ব'সো গিয়ে। আমি অসময়ে আবার স্নান করতে পারব না—বলি, জাত দিয়েচ না কি হে?

গুরুচরণ দূরে একটা চৌকীর উপর বসিয়া পড়িয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

দিন-চারেক পূর্ব্বে সে যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিল, আজ সেই সংবাদটা নানা বর্ণে বিচিত্র হইয়া গোঁড়া হিন্দু নবীনের শ্রুতিগোচর হইয়াছে। নবীনের চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু গুরুচরণ তেমনি মৌন নতমুখে বসিয়া রহিল। সে কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কাজটা করিয়া অবধি বাড়িতে কান্নাকাটি এবং অশান্তির পরিসীমা ছিল না।

নবীন পুনরায় তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, বল না হে, সত্যি কি না?

গুরুচরণ জলভারাক্রান্ত দুই চক্ষু তুলিয়া বলিল, আজ্ঞে সত্যি।

কেন এমন কাজ করলে? তোমার মাইনে ত মোটে ষাটটি টাকা, তুমি—ক্রোধে নবীন রায়ের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

গুরুচরণ চোখ মুছিয়া, রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, জ্ঞান ছিল না দাদা, দুঃখের জ্বালায় গলাতেই দড়ি দেবো, কি ব্রহ্মজ্ঞানী হ'বো, কিছুই ঠাওরাতে পাচ্ছিলুম না। শেষে ভাবলুম, আত্মঘাতি না হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী হই, তাই ব্রহ্মজ্ঞানীই হয়ে গেলুম।

গুরুচরণ চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেল।

নবীন চীৎকার করিয়া বলিলেন, বেশ করেচ, নিজের গলায় দড়ি দিতে না পেরে জাতের গলায় দড়ি টাঙিয়ে দিয়েচ—আচ্ছা যাও, আর আমাদের সামনে কালামুখ বা'র করো না, এখন যাঁরা-সব মন্ত্রী হয়েচেন, তাঁদের সঙ্গেই থাক গে—মেয়েদের হাড়ি মুচির ঘরে দাও গে যাও, বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া বসিলেন।

নবীন রাগে অভিমানে কি যে করিবেন প্রথমটা কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। গুরুচরণ হাতের ভিতর হইতে সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গিয়াছে, আর শীঘ্র মুঠার মধ্যে আসিবে, এ সম্ভাবনাও নাই—তাই নিষ্ফল আক্রোশে ছটফট করিয়া, আপাতত জব্দ করিবার আর কোন ফন্দি খুঁজিয়া না পাইয়া, সেইদিনই মিস্ত্রী ডাকিয়া ছাদের যাতায়াতের পথটা বন্ধ করিয়া একটা মস্ত প্রাচীর তুলিয়া দিলেন।

এই সংবাদ বহুদূর-প্রবাসে বসিয়া ভুবনেশ্বরী শেখরের মুখে শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন,—শেখর এ মতি-বুদ্ধি কে দিলে তাকে?

মতি-বুদ্ধি কে দিয়েছিল শেখর তাহা নিশ্চয় অনুমান করিয়াছিল। সে উল্লেখ না করিয়া বলিল, কিন্তু মা, দু'দিন পরে তোমরাই ত তাঁকে এক-ঘরে করে রাখতে। এতগুলি মেয়ের বিয়ে তিনি কি করে দিতেন, আমি ত ভেবে পাইনে।

ভুবনেশ্বরী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, কিছুই আটকে থাকে না শেখর। আর সেজন্য আগে থেকে জাত দিতে হলে অনেককেই দিতে হয়। ভগবান যাদের সংসারে পাঠিয়েচেন, তিনিই তাদের ভার নিতেন।

শেখর চুপ করিয়া রহিল। ভুবনেশ্বরী চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমার ললিতা মেয়েটাকে যদি সঙ্গে আনতুম, তা হলে যা হয় একটা উপায় আমাকেই করে দিতে হতো—দিতামও। আমি ত জানিনে, গুরুচরণ এই-সব মতলব করেই পাঠিয়ে দিলে না। আমি মনে করেছিলুম বুঝি সত্যই তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্চে।

শেখর মায়ের মুখে দিকে চাহিয়া একটুখানি লজ্জিতভাবে বলিল, বেশ ত মা, এখন বাড়ি গিয়ে তাই কর না কেন? সে ত আর ব্রাহ্ম হয়নি—তার মামাই হয়েচে—আর তিনিও কিছু তার যথার্থ আপনার কেউ ন'ন। ললিতার কেউ নেই বলেই তাঁর ঘরে মানুষ হচ্চে।

ভুবনেশ্বরী ভাবিয়া বলিলেন, তা বটে, কিন্তু কর্ত্তা এক রকমের মানুষ, তিনি কিছুতেই রাজী হবেন না। হয়ত তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করতে দেবেন না।

শেখরের নিজের মনেও এই আশঙ্কা যথেষ্ট ছিল, সে আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পরে আর এক মিনিটও তাহার বিদেশে থাকিতে ইচ্ছা রহিল না। দু-তিনদিন চিন্তিত অপ্রসন্ন-মুখে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইয়া একদিন সন্ধ্যার সময় আসিয়া বলিল, আর ভাল লাগচে না মা, চল বাড়ি যাই!

ভুবনেশ্বরী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিলেন, তাই চল শেখর, আমারও কিছু ভাল লাগচে না।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া মাতাপুত্র উভয়েই দেখিলেন, ছাদের সেই যাতায়াতের পথটা বন্ধ করিয়া প্রাচীর উঠিয়াছে। গুরুচরণের সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখা, এমন কি মুখের আলাপ রাখাও যে কর্ত্তার অভিপ্রেত নয়, তাহা কাহাকেও না জিজ্ঞাসা করিয়াই উভয়ে বুঝিলেন।

রাত্রে শেখরের আহারের সময় মা উপস্থিত ছিলেন, দুই-একটা কথার পরে বলিলেন, ওদের গিরীনবাবুর সঙ্গেই ললিতার বিয়ে দেবার কথাবার্ত্তা হচ্ছে। আমি তা আগেই বুঝেছিলাম।

শেখর মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, কে বললে?

ওর মামী। দুপুরবেলা কর্ত্তা ঘুমোলে আমি নিজেই গিয়ে দেখা করে এসেচি। সেই অবধি কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ ফুলিয়ে ফেললে। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া তিনি নিজের চোখ দুটি আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কপাল, শেখর, কপাল। এই কপালের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারে না—কার আর দোষ দিই বল। যাই হোক, গিরীন ছেলেটি ভাল, সঙ্গতিও আছে, ললিতার কষ্ট হবে না,—বলিয়া চুপ করিলেন।

প্রত্যুত্তরে শেখর কোন কথাই বলিল না—মুখ নীচু করিয়া খাবারগুলা হাত দিয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল। খানিক পরে মা উঠিয়া গেলে সেও উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পরদিন সন্ধ্যার পর একটুখানি ঘুরিয়া আসিবার জন্য সে পথে বাহির হইয়াছিল। তখন গুরুচরণের বাহিরের ঘরে প্রাত্যহিক চা-পানের সভা বসিয়াছিল এবং যথেষ্ট উৎসাহের সহিত হাসি এবং কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। তথাকার কোলাহল শেখরের কানে যাইবামাত্র সে একবার স্থির হইয়া কি ভাবিয়া লইল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ি ঢুকিয়া সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া গুরুচরণের বাহিরের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। তৎক্ষণাৎ কলরব থামিল এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সকলেরই মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

শেখর ফিরিয়া আসিয়াছিল, এ সংবাদ ললিতা ছাড়া আর কেহ জানিত না। আজ গিরীন এবং আরও একজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তিনি বিস্মিত-মুখে শেখরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন এবং গিরীন মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিল। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেঁচাইতেছিলেন গুরুচরণ নিজে, তাঁহার মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গেল। তাঁহার হাতের কাছে বসিয়া ললিতা তখনও চা তৈরি করিতেছিল, একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া মাথা হেঁট করিল।

শেখর সরিয়া আসিয়া তক্তপোশের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং একধারে বসিয়া পড়িয়া হাসিয়া বলিল, এ কি, একেবারে সমস্ত নিবে গেল যে!

গুরুচরণ মৃদুকণ্ঠে বোধ করি আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু কি বলিলেন বোঝা গেল না।

তাঁহার মনের ভাব শেখর বুঝিল, তাই সময় দিবার জন্য নিজের কথা পাড়িল। কাল সকালের গাড়িতে ফিরিয়া আসিবার কথা, জননীর রোগ উপশম হইবার কথা, পশ্চিমের কথা, আরও কত কি সংবাদ অনর্গল বকিয়া গিয়া শেষে সেই অপরিচিত যুবকটির মুখের দিকে চাহিল।

গুরুচরণ এতক্ষণে নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়াছিলেন; ছেলেটির পরিচয় দিয়া বলিলেন, ইনি আমাদের গিরীনের বন্ধু। এক জায়গায় বাড়ি, একত্রে লেখা-পড়া শেখা, অতি সৎ ছেলে—শ্যামবাজারে থাকেন, তবুও আমার সঙ্গে আলাপ হওয়া পর্য্যন্ত প্রায়ই এসে দেখা-সাক্ষাৎ করে যান।

শেখর ঘাড় নাড়িয়া মনে মনে বলিল, হাঁ, খুব ভাল ছেলে। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কাকা, আর সব খবর ভাল ত?

গুরুচরণ জবাব দিলেন না, মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। শেখর উঠিবার উপক্রম করিতেই হঠাৎ কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, মাঝে মাঝে এসো বাবা, একেবারে যেন ত্যাগ ক'রো না। সব কথা শুনেচ ত?

শুনেচি বৈ কি, বলিয়া শেখর অন্দরের দিকে চলিয়া গেল।

তার পরই ভিতর হইতে গৃহিণীর কান্নার শব্দ উঠিল, বাহিরে বসিয়া গুরুচরণ হেঁট মুখে কোঁচার খুঁট দিয়া নিজের চোখের জল মুছিতে লাগিলেন এবং গিরীন অপরাধীর মত মুখ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। ললিতা পূর্ব্বেই উঠিয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে শেখর রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দা পার হইয়া উঠানে নামিতে গিয়ে দেখিল, অন্ধকার কবাটের আড়ালে ললিতা দাঁড়াইয়া আছে। সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং দাঁড়াইয়া উঠিয়া বুকের একান্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া মুখ তুলিয়া মুহূর্ত্তকাল নিঃশব্দে কি যেন আশা করিয়া রহিল, তার পর পিছাইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, আমার চিঠির জবাব দিলে না কেন?

কই, আমি ত পাইনি—কি লিখেছিলে?

ললিতা বলিল, অনেক কথা। সে যাক। সব শুনেচ ত, এখন তোমার কি হুকুম, তাই বল।

শেখর বিস্ময়ের স্বরে কহিল, আমার হুকুম! আমার হুকুমে কি হবে?

ললিতা শঙ্কিত হইয়া মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

তা বই কি ললিতা, আমি কার ওপর হুকুম দেব?

আমার ওপর, আর কার ওপর দিতে পারো?

তোমার ওপরেইবা দেব কেন? আর দিলেই বা তুমি শুনবে কেন? শেখরের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, ঈষৎ করুণ।

এবার ললিতা মনে মনে অত্যন্ত ভয় পাইয়া, আর একবার কাছে সরিয়া আসিয়া কাঁদ কাঁদ গলায় বলিল, যাও—এখন আমার তামাশা ভাল লাগচে না। পায়ে পড়ি, কি হবে বল! ভয়ে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না।

ভয় কিসের?

বেশ যা হোক! ভয় হবে না, তুমি কাছে নেই, মা কাছে নেই, মাঝে থেকে মামা কি-সব কাণ্ড করে বসলেন—এখন মা যদি আমাকে ঘরে নিতে না চান?

শেখর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সে সত্যি, মা নিতে চাইবেন না। তোমার মামা অপরের কাছে অনেক টাকা নিয়েচেন, সে-কথা তিনি শুনেছেন তা ছাড়া, তোমরা ব্রাহ্ম, আমরা হিন্দু।

আন্নাকালী এই সময়ে রান্নাঘর হইতে ডাক দিল, সেজদি, মা ডাকচেন।

ললিতা চেঁচাইয়া বলিল, যাচ্ছি, তার পর গলা খাট করিয়া বলিল, মামা যাই হোন, তুমি যা, আমিও তাই। মা তোমাকে যদি ফেলতে না পারেন, আমাকেও ফেলবেন না। আর গিরীনবাবুর কাছে টাকা নেবার কথা বলচ—তা সে আমি ফিরিয়ে দেব। আর ঋণের টাকা, দু'দিন আগেই হোক পিছনেই হোক, দিতেই তো হবে।

শেখর প্রশ্ন করিল, অত টাকা পাবে কোথায়?

ললিতা শেখরের মুখের পানে একটিবার চোখ তুলিয়া মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া বলিল, জান না, মেয়েমানুষে কোথায় টাকা পায়? আমিও সেইখানে পাব।

এতক্ষণ শেখর সংযত হইয়া কথা কহিতে থাকিলেও ভিতরে পুড়িতেছিল, এবার বিদ্রূপ করিয়া বলিল, কিন্তু তোমার মামা তোমাকে বিক্রী করে ফেলেছেন যে?

ললিতা অন্ধকারে শেখরের মুখের ভাব দেখিতে পাইল না, কিন্তু কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন টের পাইল। সে দৃঢ়স্বরে জবাব দিল, ও-সব মিছে কথা। আমার মামার মত মানুষ সংসারে নেই—তাঁকে তুমি ঠাট্টা ক'রো না। তাঁর দুঃখ-কষ্ট তুমি না জানতে পার, কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে, বলিয়া একবার ঢোক গিলিয়া একবার ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল, তা ছাড়া তিনি টাকা নিয়েচেন, আমার বিয়ে হবার পূর্ব্বে, সুতরাং আমাকে বিক্রী করবার অধিকারও তাঁর নেই, বিক্রীও করেননি। এ অধিকার আছে শুধু তোমারি, তুমি ইচ্ছে করলে টাকা দেবার ভয়ে আমাকে বিক্রী করে ফেলতে পার বটে!—বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শেখর বিহ্বলের মত পথে পথে ঘুরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতেছিল, সেদিনকার এক ফোঁটা ললিতা এত কথা শিখিল কিরূপে? এমন নির্লজ্জ মুখরার মত তাহার মুখের উপর কথা কহিল কি করিয়া?

আজ সে ললিতার ব্যবহারে সত্যই অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এই ক্রোধের যথার্থ হেতুটা কি, এ যদি শান্ত হইয়া ভাবিয়া দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত রাগ ললিতার উপর নহে, তাহা সম্পূর্ণ নিজের উপরেই।

ললিতাকে ছাড়িয়া এই কয়টা মাসের প্রবাসবাসকালে সে নিজের কল্পনার মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ করিয়া শুধু কাল্পনিক সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতিই খতাইয়া দেখিত। কিন্তু ললিতা আজ যে তাহার জীবনের কতখানি, ভবিষ্যতের সহিত কিরূপ অচ্ছেদ্য-বন্ধনে গ্রথিত, তাহার অবর্ত্তমানে বাঁচিয়া থাকা কত কঠিন, কত দুঃখকর, বিছানায় শুইয়া এই কথাই সে বার বার আলোচনা করিতে লাগিল। ললিতা শিশুকাল হইতে নিজেদের সংসারে মিশিয়াছিল বলিয়াই তাহাকে বিশেষ করিয়া আর সে সংসারের ভিতর, বাপ-মা ভাই-বোনের মাঝখানে নামাইয়া আনিয়া দেখে নাই, দেখিবার কথাও মনে করে নাই। ললিতাকে হয়ত পাওয়া যাইবে না, পিতা-মাতা এ-বিবাহে সম্মতি দিবেন না, হয়ত সে অপর কাহারও হইবে,—দুশ্চিন্তা তাহার বরাবর এই ধার বহিয়াই চলিয়াছে, তাই বিদেশে যাইবার পূর্ব্বের রাত্রে জোর করিয়া গলায় মালা পরাইয়া দিয়া সে এইদিকের ভাঙনটার মুখেই বাঁধ বাঁধিয়া গিয়াছিল।

প্রবাসে থাকিয়া গুরুচরণের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া শুনিয়া সে ব্যাকুল হইয়া অহর্নিশি এই চিন্তাই করিয়াছিল, পাছে ললিতাকে হারাইতে হয়। সুখের হোক, দুঃখের হোক, ভাবনার এই দিকটা তাহার পরিচিত ছিল, আজ ললিতার স্পষ্ট কথা এইদিকটা সজোরে বন্ধ করিয়া দিয়া ভাবনার ধারা একেবারে উল্টা-স্রোতে বহাইয়া দিয়া গেল। তখন চিন্তা ছিল পাছে না পাওয়া যায়, এখন ভাবনা হইল পাছে না ছাড়া যায়।

শ্যামবাজারের সম্বন্ধটা ভাঙিয়া গিয়াছিল। তাহারাও অত টাকা দিতে শেষ পর্য্যন্ত পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। শেখরের জননীর মেয়েটি মনঃপূত হইল না। সুতরাং এই দায় হইতে শেখর আপাতত অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু নবীন রায় দশ-বিশ হাজারের কথা বিস্মৃত হন নাই এবং সেপক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়াও ছিলেন না।

শেখর ভাবিতেছিল, কি করা যায়! সে-রাত্রির সেই কাজটা যে এতবড় গুরুতর হইয়া উঠিবে, ললিতা যে এমন অসংশয়ে বিশ্বাস করিয়া লইবে, তাহার সত্যই বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং ধর্ম্মতঃ কোন কারণেই ইহার আর অন্যথা হইতে পারে না, সেদিন এত কথা শেখর ভাবিয়া দেখে নাই। যদিও নিজের মুখেই উচ্চারণ করিয়াছিল, যা হইবার হইয়াছে, এখন তুমিও ফিরাইতে পার না, আমিও না, কিন্তু তখন, আজ যেমন করিয়া সে ভাবিয়া দেখিতেছে, তেমন করিয়া ভাবিয়া দেখিবার শক্তিও ছিল না, বোধ করি অবসরও ছিল না।

তখন মাথার উপর চাঁদ উঠিয়াছিল, জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছিল, গলায় মালা দুলিয়াছিল, প্রিয়তমার বক্ষস্পন্দন নিজের বুক পাতিয়া প্রথম অনুভবের

মোহ ছিল, এবং প্রণয়ীরা যাহাকে অধরসুধা বলিয়াছেন, তাহাই পান করিবার অতি তীব্র নেশা ছিল। তখন স্বার্থ এবং সাংসারিক ভালমন্দ মনে পড়ে নাই, অর্থলোলুপ পিতার রুদ্র মূর্ত্তি চোখের উপর জাগিয়া উঠে নাই। ভাবিয়াছিল, মা ত ললিতাকে স্নেহ করেন, তখন তাঁহাকে সম্মত করানো কঠিন হইবে না এবং দাদাকে দিয়া পিতাকে কোনমতে কোমল করিয়া আনিতে পারিলে, শেষ পর্য্যন্ত হয়ত কাজটা হইয়াই যাইবে। তা ছাড়া, গুরুচরণ এইভাবে তখন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের আশার পথটা পাথর দিয়া এমন ভাবে আঁটিয়া বন্ধ করেন নাই। এখন যে বিধাতাপুরুষ নিজে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছেন।

বস্তুত শেখরের চিন্তা করিবার বিশেষ কিছু ছিল না। সে নিশ্চয় বুঝিতেছিল, পিতাকে সম্মত করানো ত ঢের দূরের কথা জননীকে সম্মত করানোও সম্ভব নহে। এ-কথা যে মুখে আনিবারও পথ নাই।

শেখর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আর একবার অস্ফুটে আবৃত্তি করিল, কি করা যায়। সে ললিতাকে বেশ চিনিত, তাহাকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছে—একবার যাহা নিজের ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছে, কোনমতেই তাহাকে ত্যাগ করিবে না। সে জানিয়াছে, শেখরের ধর্মপত্নী, তাই আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে অসঙ্কোচে বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া মুখের কাছে মুখ তুলিয়া অমন করিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিল।

গিরীনের সহিত তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা শুরু হইয়াছে—কিন্তু কেহই তাহাকে ত সম্মত করাইতে পারিবে না। আর ত সে কোনমতেই চুপ করিয়া থাকিবে না। এখন সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিবে। শেখরের চোখ-মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সত্যই ত! সে ত শুধু মালা-বদল করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়াছিল। ললিতা বাধা দেয় নাই—ইহাতে তাহার অধিকার আছে বলিয়াই দেয় নাই, এখন এই ব্যবহারের জবাব কার কাছে কি দিবে?

পিতামাতার অমতে ললিতার সহিত বিবাহ হইতে পারে না তাহা নিশ্চয়, কিন্তু গিরীনের সহিত ললিতার বিবাহ না হইবার হেতু প্রকাশ পাইবার পর ঘরে-বাহিরে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

দশম পরিচ্ছেদ

অসম্ভব বলিয়া শেখর ললিতার আশা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিল। প্রথম ক'টা দিন মনে-মনে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকিত, পাছে হঠাৎ সে আসিয়া উপস্থিত হয়, পাছে সব কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, পাছে এই সব লইয়া লোকের কাছে জবাবদিহি করিতে হয়। কিন্তু কেহই তাহার কৈফিয়ৎ চাহিল না, কোন কথা প্রকাশ পাইয়াছে কি না তাহাও বুঝা গেল না, কিংবা সে-বাড়ি হইতে এ-বাড়িতে কেহ আসা-যাওয়া পর্য্যন্ত করিল না। শেখরের ঘরের সুমুখে যে খোলা ছাদটা ছিল, তাহার উপরে দাঁড়াইলে ললিতাদের ছাদের সবটুকু দেখা যাইত, পাছে দেখা হয়, এই ভয়ে সে এই ছাদটায় পর্য্যন্ত দাঁড়াইত না। কিন্তু যখন নির্ব্বিঘ্নে একমাস কাটিয়া গেল, তখন সে নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, হাজার হোক মেয়েমানুষের লজ্জা-সরম আছে, এ-সকল ব্যাপার সে প্রকাশ করিতেই পারে না। সে শুনিয়াছিল, ইহাদের বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ ফুটিতে চাহে না, এ-কথা সে বিশ্বাস করিল এবং সৃষ্টিকর্ত্তা তাহাদের দেহে এই দুর্ব্বলতা দিয়াছেন বলিয়া সে মনে মনে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিল। অথচ শান্তি পাওয়া যায় না কেন? যখন হইতে সে বুঝিল আর ভয় নাই, তখন হইতেই এক অভূতপূর্ব্ব ব্যথায় সমস্ত বুক ভরিয়া উঠিতেছে কেন? রহিয়া রহিয়া হৃদয়ের অন্তরতম স্থল পর্য্যন্ত এমন করিয়া নিরাশায়, বেদনায়, আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে কেন? তবে ত ললিতা কোন কথাই বলিবে না—আর একজনের হাতে সঁপিয়া দিবার সময় পর্য্যন্ত মৌন হইয়া থাকিবে। তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গিয়াছে মনে হইলেও অন্তরে বাহিরে তাহার এমন করিয়া আগুন জলিয়া উঠে কেন?

পূর্ব্বে সে সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির না হইয়া সুমুখের খোলা ছাদটার উপর পদচারণা করিত, আজও তাহাই করিতে লাগিল, কিন্তু একটি দিনও ও বাড়ির কাহাকেও ছাদে দেখিতে পাইল না। শুধু একদিন আন্নাকালী কী করিতে আসিয়া ছিল, কিন্তু তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই চোখ নামাইয়া ফেলিল এবং শেখর তাহাকে ডাকিবে কিনা স্থির করিবার পূর্ব্বেই অদৃশ্য হইয়া গেল। শেখর মনে মনে বুঝিল, তাহারা যে পথ বন্ধ করিয়া প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে, ইহার অর্থ ঐ একফোঁটা কালী পর্য্যন্ত জানিয়াছে।

আর একমাস গত হইল।

একদিন ভুবনেশ্বরী কথায় কথায় বলিলেন, এর মধ্যে তুই ললিতাকে দেখেছিস্ শেখর ?

শেখর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, কেন ?

মা বলিলেন, প্রায় দু'মাস পরে কাল তাকে ছাদে পেয়ে ডাকলুম—মেয়েটা আমার যেন আর একরকমের হয়ে গেছে। রোগা, মুখখানি শুকনো, যেন কত বয়স হয়েচে। এমনি গম্ভীর, কার সাধ্য দেখে বলে চোদ্দ বছরের মেয়ে—তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া ভারি গলায় বলিলেন, পরণের কাপড়খানি ময়লা, আঁচলের কাছটা খানিকটা সেলাই করা। জিজ্ঞেস করলুম, তোর কাপড় নেই মা? বললে ত আছে, কিন্তু বিশ্বাস হয় না। কোনদিনই সে ওর মামার দেওয়া কাপড় পরে না, আমিই দিই, আমিও ত ছ-সাত মাস কিছু দিই নি। তিনি আর বলিতে পারিলেন না, আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিলেন—ললিতাকে যথার্থই তিনি নিজের মেয়ের মত ভালবাসিতেন।

শেখর আর একদিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে তিনি পুনরায় বলিলেন, আমি ছাড়া কোনদিন সে কারো কাছে কিছু চাইতেও পারে না। অসময়ে ক্ষিদে পেলেও বাড়িতে মুখ ফুটে বলতে পারে না,—সেও আমি—ঐ আমার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াতো—আমি তার মুখ দেখলেই টের পেতুম। আমার সেই কথাই খালি মনে হয় শেখর, হয়ত মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে বেড়ায়, কেউ তাকে বোঝেও না, জিজ্ঞেসও করে না। আমাকে ত শুধু সে মা বলেই ডাকে না মায়ের মত ভালও বাসে যে।

শেখর সাহস করিয়া মায়ের মুখের দিকে চোখ ফিরাইতে পারিল না। যেদিকে চাহিয়াছিল, সেইদিকেই চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বেশ ত মা, কি তার দরকার ডেকে জিজ্ঞেস করে দাও না কেন ?

নেবে কেন ? উনি যাওয়া-আসার পথটা পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। আমিই বা দিতে যাবো কোন্ মুখে ? ঠাকুরপো দুঃখের জ্বালায় না বুঝে যেন একটা অন্যায় করেচেন, আমরা আপনার লোকের মত কোথায় একটা প্রায়শ্চিত্ত-ট্রায়শ্চিত্ত করিয়ে ঢেকে দেব, তা নয়, একেবারে পর করে দিলুম। আর তাও বলি, এঁর পীড়া-পীড়িতেই সে জাত দিয়ে ফেলেচে। কেবল তাগাদা, কেবল তাগাদা—মনের ঘেন্নায় মানুষ সব করতে পারে। বরং আমি ত বলি, ঠাকুরপো ভালই করেচেন। ঐ গিরীন ছেলেটি আমাদের চেয়ে তাঁর ঢের বেশী আপনার, তার সঙ্গে ললিতার বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েটা সুখে থাকবে তা আমি বলচি। শুনচি, আসচে মাসেই হবে।

হঠাৎ শেখর মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, আসচে মাসেই হবে নাকি?

তাই ত শুনি।

শেখর আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, ললিতার মুখে শুনলাম, ওর মামার দেহটাও নাকি আজকাল ভাল নেই। না থাকবারই কথা। একে তার নিজের মনের সুখ নেই, তাতে বাড়িতে নিত্য কান্নাকাটি—এক মিনিটের তরেও ও-বাড়িতে স্বস্তি নেই।

শেখর চুপ করিয়া শুনিতেছিল, চুপ করিয়াই রহিল।

খানিক পরে মা উঠিয়া গেল, সে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল—সে ললিতার কথা ভাবিতে লাগিল।

এই গলিটায় দুখানা গাড়ির স্বচ্ছন্দে যাতায়াতের স্থান হয় না। একখানি-গাড়ি খুব একপাশে ঘেঁসিয়া না দাঁড়াইলে আর একটা যাইতে পারে না। দিন-দশেক পরে শেখরের আফিস-গাড়ি গুরুচরণের বাটীর সম্মুখে বাধা পাইয়া স্থির হইল। শেখর আফিস হইতে ফিরিতেছিল, নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল ডাক্তার আসিয়াছেন।

সে কিছুদিন পূর্ব্বে মায়ের কাছে শুনিয়াছিল গুরুচরণের শরীর ভাল নাই। তাই মনে করিয়া আর বাড়ি গেল না,. সোজা গুরুচরণের শোবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাই বটে। গুরুচরণ নির্জ্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া আছেন, একপাশে ললিতা ও গিরীন শুষ্কমুখে বসিয়া আছে, সুমুখে চৌকির উপর বসিয়া ডাক্তার রোগ পরীক্ষা করিতেছেন।

গুরুচরণ অস্ফুট-স্বরে বসিতে বলিলেন, ললিতা মাথায় আঁচলটা আরো একটু টানিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল।

ডাক্তার পাড়ার লোক, শেখরকে চিনিতেন। রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন। গিরীন পিছনে আসিয়া টাকা দিয়া ডাক্তার বিদায় করিবার সময় তিনি বিশেষ করিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, রোগ এখনও অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই, এই সময়ে বায়ু-পরিবর্ত্তনের নিতান্ত আবশ্যক।

ডাক্তার চলিয়া গেলে উভয়েই আর একবার গুরুচরণের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ললিতা ইসারা করিয়া গিরীনকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চুপি চুপি কথা

কহিতে লাগিল, শেখর সুমুখের চৌকিতে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া গুরুচরণের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি ইতিপূর্ব্বে ওদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়াছিলেন, শেখরের পুনরাগমন জানিতে পারিলেন না।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শেখর উঠিয়া গেল, তখনও ললিতা ও গিরীন তেমনি চুপচাপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তাহাকে কেহ বসিতে বলিল না, আসিতে বলিল না, একটা কথা পর্য্যন্ত কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল না।

আজ সে নিশ্চয় বুঝিয়া আসিল, ললিতা তাহাকে তাহার কঠিন দায় হইতে চিরদিনের মত মুক্তি দিয়াছে—এখন সে নির্ভয়ে হাঁফ ফেলিয়া বাঁচুক—আর শঙ্কা নাই, আর ললিতা তাহাকে জড়াইবে না। ঘরে আসিয়া কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সহস্রবার মনে পড়িল, আজ সে নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে গিরীনই ও-বাড়ির পরম বন্ধু, সকলের আশা-ভরসা এবং ললিতার ভবিষ্যতের আশ্রয়। সে কেহ নহে, এমন বিপদের দিনেও ললিতা তাহার একটি মুখের পরামর্শেরও আর প্রত্যাশী নহে।

সে সহসা 'উঃ'—বলিয়া একটা গদী-আঁটা আরাম চৌকির উপর ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল। ললিতা তাহাকে দেখিয়া মাথায় কাপড়-টানিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল, যেন সম্পূর্ণ পর—একেবারে অপরিচিত। আবার তাহারই চোখের সুমুখে গিরীনকে আড়ালে ডাকিয়া কত না পরামর্শ! অথচ এই লোকটিরই অভিভাবকতায় একদিন তাকেই থিয়েটার দেখিতে পর্য্যন্ত যাইতে দেয় নাই।

তখনও একবার ভাবিবার চেষ্টা করিল, হয়ত সে তাহাদের গোপন সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়াই লজ্জায় ওরূপ ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু তাই বা কি করিয়া সম্ভব? তাহা হইলে, এত কাণ্ড ঘটিয়াছে, অথচ একটি কথাও কি সে এতদিনের মধ্যে কোন কৌশলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিত না।

হঠাৎ ঘরের বাহিরে মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—তিনি ডাকিয়া বলিতেছেন, কই রে, এখনও হাত-মুখ ধুসনি—সন্ধ্যা হয় যে।

শেখর ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল এবং তাহার মুখের উপর মায়ের দৃষ্টি না পড়ে, এইভাবে সে ঘাড় ফিরাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

এই কয়টা দিন অনেক কথাই অনেকরকমের রূপ ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে অনুক্ষণ আনাগোনা করিয়াছে, শুধু একটা কথা সে ভাবিয়া দেখিত না, বস্তুত দোষ কোন্‌দিকে। একটি আশার কথা সে আজ পর্য্যন্ত তাহাকে বলে নাই, কিংবা তাহাকে বলিবারও সুযোগ দেয় নেই। বরঞ্চ পাছে প্রকাশ পায়, সে কোনরূপ দাবী করিয়া বসে, এই ভয়ে কাঠ হইয়া ছিল। তথাপি সর্ব্বপ্রকারের অপরাধ একা ললিতার মাথায় তুলিয়া দিয়াই সে তাহার বিচার করিতেছিল এবং নিজের হিংসায় ও

ক্রোধে, অভিমানে, অপমানে পুড়িয়া মরিতেছিল: বোধ করি এমন করিয়াই সংসারের সকল পুরুষ বিচার করে এবং এমনি করিয়াই দগ্ধ হয়।

পুড়িয়া পুড়িয়া তাহার সাত দিন কাটিয়াছে, আজও সন্ধ্যার পর নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে সেই আগুন জ্বালিয়া দিয়াই বসিয়াছিল, হঠাৎ দ্বারের কাছে শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়াই তাহার হৃৎপিণ্ডটা লাফাইয়া উঠিল। কালীর হাত ধরিয়া ললিতা ঘরে ঢুকিয়া নীচে কার্পেটের উপর স্থির হইয়া বসিল। কালী বলিল, শেখরদা, আমরা দুজনে তোমাকে প্রণাম করতে এসেচি—কাল আমরা চলে যাব।

শেখর কথা কহিতে পারিল না, চাহিয়া রহিল।

কালী বলিল, অনেক দোষ-অপরাধ তোমার পায়ে আমরা করেচি শেখরদা, সে-সব ভুলে যেয়ো।

শেখর বুঝিল, ইহার একটি কথাও তাহার নিজের নহে, সে শেখানো কথা বলিতেছে মাত্র। জিজ্ঞাসা করিল, কাল কোথায় যাবে তোমরা?

পশ্চিমে। বাবাকে নিয়ে আমরা সবাই মুঙ্গের যাব—সেখানে গিরীনবাবুর বাড়ি আছে। তিনি ভাল হলেও আর আমাদের আসা হবে না, ডাক্তার বলেচেন, এ-দেশ বাবার সহ্য হবে না।

শেখর জিজ্ঞাসা করিল, এখন তিনি কেমন আছেন?

একটু ভাল, বলিয়া কালী আঁচলের ভিতর হইতে কয়েক জোড়া কাপড় বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, জ্যাঠাইমা আমাদের কিনে দিয়েচেন।

ললিতা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, উঠিয়া গিয়া টেবিলের উপর একটি চাবি রাখিয়া দিয়া বলিল, আলমারির এই চাবিটা এতদিন আমার কাছেই ছিল; একটু-খানি হাসিয়া বলিল, টাকাকড়ি ওতে নেই, সমস্ত খরচ হয়ে গেছে।

শেখর চুপ করিয়া রহিল।

কালী বলিল, চল সেজদি, রাত্তির হচ্ছে।

ললিতা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই এবার শেখর হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, কালী, নীচে থেকে আমার জন্যে দুটো পান নিয়ে এস ত ভাই।

ললিতা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তুই বোস্ কালী, আমি এনে দিচ্ছি, বলিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল। খানিক পরে পান আনিয়া কালীর হাতে দিল, সে শেখরকে দিয়া আসিল।

চললুম শেখরদা, বলিয়া কালী পায়ের কাছে আসিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল।

ললিতা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উভয়েই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

শেখর তাহার ভালমন্দ ও আত্মমর্য্যাদা লইয়া বিবর্ণ পাণ্ডুর-মুখে, বিহ্বল হত-বুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে আসিল, যাহা বলিবার ছিল বলিয়া চির-দিনের মত বিদায় লইয়া গেল, কিন্তু শেখরের কিছুই বলা হইল না। যেন বলিবার কথা তাহার ছিল না, এইভাবে সমস্ত সময়টুকু কাটিয়া গেল। ললিতা কালীকে ইচ্ছা করিয়াই সঙ্গে আনিয়াছিল ; কারণ, সে চাহে না কোন কথা উঠে, ইহাও সে মনে মনে বুঝিল। তাহার পরে, তাহার সর্ব্বশরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সে উঠিয়া বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গুরুচরণের ভাঙা দেহ মুঙ্গেরের জল-হাওয়াতেও আর জোড়া লাগিল না। বৎসর-খানেক পরেই তিনি দুঃখের বোঝা নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। গিরীন যথার্থ ই তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিয়াছিল এবং শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার যথাসাধ্য করিয়াছিল!

মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সজল-কণ্ঠে তাহার হাত ধরিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, সে যে কোন দিন তাঁহার পর হইয়া না যায় এবং গভীর বন্ধুত্ব যেন নিকট আত্মীয়তায় পরিণত হয়। তিনি ইহা চোখে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, অসুখ-বিসুখে সময় হইল না, কিন্তু পরলোকে বসিয়া যেন দেখিতে পান। গিরীন তখন সানন্দে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল!

গুরুচরণের কলিকাতার বাটীতে যে ভাড়াটিয়া ছিল, তাহার মুখে ভুবনেশ্বরী মধ্যে মধ্যে সংবাদ পাইতেন, গুরুচরণের মৃত্যুসংবাদ তাহারাই দিয়াছিল।

তাহার পর এ-বাড়িতে গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিল। নবীন রায় হঠাৎ মারা গেলেন।

ভুবনেশ্বরী শোকে দুঃখে পাগলের মত হইয়া বড়বধূর হাতে সংসার সঁপিয়া দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, আগামী বৎসর শেখরের বিয়ের সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে তিনি আসিয়া বিবাহ দিয়া যাইবেন।

বিবাহের সম্বন্ধ নবীন রায় নিজেই স্থির করিয়াছিলেন। এবং পূর্ব্বেই হইয়া

যাইত, শুধু তাঁহার মৃত্যু হওয়াতেই এক বৎসর স্থগিত ছিল। কন্যা-পক্ষের আর বিলম্ব করা চলে না, তাই তাহারা কাল আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছিল। এই মাসেই বিবাহ। আজ শেখর জননীকে আনিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। আলমারি হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া তোরঙ্গ সাজাইতে গিয়া অনেকদিন পরে তাহার ললিতার কথা মনে পড়িল—সব সে-ই করিত।

তিন বৎসরের অধিক হইল, তাহারা চলিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে তাহাদের কোন সংবাদই সে জানে না। জানিবার চেষ্টাও করে নাই, বোধ করি ইচ্ছাও ছিল না। ললিতার উপর ক্রমশঃ তাহার একটা ঘৃণার ভাব আসিয়াছিল। কিন্তু আজ সহসা ইচ্ছা করিল, যদি কোনমতে একটা খবর পাওয়া যায়—কেমন আছে! অবশ্য ভাল থাকিবারই কথা, কারণ গিরীনের সঙ্গতি আছে, তাহা সে জানিত, তথাপি সে শুনিতে ইচ্ছা করে, কবে বিবাহ হইয়াছে, তাহার কাছে কেমন আছে—এই সব।

ও-বাড়ির ভাড়াটিয়ারাও আর নাই, মাস-দুই হইল বাড়ি খালি করিয়া চলিয়া গিয়াছে। শেখর একবার ভাবিল, চারুর বাপকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কারণ তাঁহারা গিরীনের সংবাদ নিশ্চয় রাখেন। ক্ষণকালের জন্য তোরঙ্গ গুছানো স্থগিত রাখিয়া সে শূন্যদৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিয়া এই সব ভাবিতে লাগিল, এমন সময়ে দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া পুরাতন দাসী কহিল, ছোটবাবু, কালীর মা একবার আপনাকে ডেকে পাঠিয়েচেন।

শেখর মুখ ফিরাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কোন্ কালীর মা ?

দাসী হাত দিয়া গুরুচরণের বাড়িটা দেখাইয়া বলিল, আমাদের কালীর মা ছোটবাবু, তাঁরা কাল রাত্তিরে ফিরে এসেচেন যে।

চল যাচ্চি, বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ নামিয়া গেল।

তখন বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, সে বাড়িতে পা দিতেই বুক-ভাঙা কান্নার রোল উঠিল। বিধবা-বেশধারিণী গুরুচরণের স্ত্রীর কাছে গিয়া সে মাটিতেই বসিয়া পড়িল এবং কোঁচার খুঁট দিয়া নিঃশব্দে চোখ মুছিতে লাগিল। শুধু গুরুচরণের জন্য নহে, সে নিজের পিতার শোকেও আর একবার অভিভূত হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা হইলে ললিতা আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। দূর হইতে গলায় আঁচল দিয়া তাহাকে প্রণাম করিল এবং ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। শেখর সপ্তদশবর্ষীয়া পরস্ত্রীর পানে চোখ তুলিয়া চাহিতে বা ডাকিয়া কথা কহিতে পারিল না; তথাপি আড়চোখে যতটা সে দেখিতে পাইয়াছিল, মনে হইল, ললিতা যেন আরও বড় হইয়াছে এবং অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছে।

অনেক কান্নাকাটির পরে গুরুচরণের বিধবা যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে,

এই বাড়িটা তিনি বিক্রয় করিয়া মুঙ্গেরে জামাইয়ের আশ্রয়ে থাকিবেন, এই তাঁর ইচ্ছা। বাড়িটা বহুদিন হইতে শেখরের পিতার ক্রয় করিবার ইচ্ছা ছিল, এখন উপযুক্ত মূল্যে তাঁহারাই ক্রয় করিলে ইহা একরকম নিজেদেরই থাকিবে, তাহার নিজেরও কোনরূপ ক্লেশ বোধ হইবে না এবং ভবিষ্যতে কখনও এদেশে আসিলে, দুই-একদিন বাস করিয়া যাইতেও পারিবেন—এইসব। শেখর, মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার যথাসাধ্য করিবে বলায় তিনি চোখ মুছিয়া বলিলেন, দিদি কি এর মধ্যে আসবেন না শেখর?

শেখর জানাইল, আজ রাত্রেই তাঁকে সে আনিতে যাইবে। অতঃপর তিনি একটি একটি করিয়া অন্যান্য সংবাদ জানিয়া লইলেন—শেখরের কবে বিবাহ, কোথায়, কত হাজার, কত অলঙ্কার, নবীন রায় কি করিয়া মারা গেলেন, দিদি কি করিলেন ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন এবং শুনিলেন।

শেখর যখন ছুটি পাইল তখন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। এই সময় গিরীন উপর হইতে নামিয়া বোধ করি তাহার দিদির বাটীতে গেল। গুরুচরণের বিধবা দেখিতে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন, আমার জামাইয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ নেই শেখরনাথ? এমন ছেলে সংসারে আর হয় না।

শেখরের তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তাহা সে জানাইল এবং আলাপ আছে বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু বাহিরের বসিবার ঘরের সুমুখে আসিয়া তাহাকে সহসা থামিতে হইল।

অন্ধকার দরজার আড়ালে ললিতা দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, শোনো, মাকে কি আজই আনতে যাবে?

শেখর বলিল, হাঁ।

তিনি কি বড় বেশী কাতর হয়ে পড়েচেন?

হ্যাঁ, প্রায় পাগলের মত হয়ে পড়েছিলেন।

তোমার শরীর কেমন আছে?

ভাল আছে, বলিয়া শেখর তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

রাস্তায় আসিয়া তাহার আপাদমস্তক ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল। ললিতার কাছাকাছি দাঁড়াইতে হইয়াছিল বলিয়া তাহার নিজের দেহটাও যেন অপবিত্র হইয়া গিয়াছে, এমনি মনে হইতে লাগিল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে যেমন-তেমন করিয়া তোরঙ্গ বন্ধ করিয়া ফেলিল এবং তখনও গাড়ির বিলম্ব আছে জানিয়া, আর একবার শয্যাশ্রয় করিয়া ললিতার বিষাক্ত স্মৃতিটাকে পোড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া দিবে মনে করিয়া সে হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘৃণার দাবানল জ্বালিয়া দিল। দাহনের যাতনায় সে তাকে মনে মনে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করিল, এমন কি, কুলটা

পর্য্যন্ত বলিতে সঙ্কোচ করিল না। তখন কথায় কথায় গুরুচরণের স্ত্রী বলিয়াছিলেন, এ সুখের বিয়ে নয়, তাই শেষ পর্য্যন্ত কারো মনে ছিল না, নইলে ললিতা তখন তোমাদের সকলকেই সংবাদ দিতে বলেছিল। ললিতার এই স্পর্দ্ধাটা যেন সমস্ত আগুনের উপরেও শিখা বিস্তার করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শেখর মাকে লইয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখনও তাহার বিবাহের দশ-বারো দিন বিলম্ব ছিল।

দিন-তিনেক পরে, একদিন সকালে ললিতা শেখরের মায়ের কাছে বসিয়া একটা ডালায় কি কতকগুলা তুলিতেছিল। শেখর জানিত না, তাই কি একটা কাজে 'মা' বলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই হঠাৎ থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। ললিতা মুখ নীচু করিয়া কাজ করিতে লাগিল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রে ?

সে যেমন আসিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়া, না এখন থাক্, বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। ললিতার মুখ দেখিতে পায় নাই কিন্তু তাহার হাত দুইটির উপর তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাহা সম্পূর্ণ নিরাভরণ না হইলেও দু'গাছি করিয়া কাঁচের চুড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না। শেখর মনে মনে ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল, এ আর এক রকমের ভড়ং। গিরীন সঙ্গতিপন্ন তাহা সে জানিত, তাঁহার পত্নীর হাত এরূপ অলঙ্কারশূন্য হইবার কোন সঙ্গত হেতু সে খুঁজিয়া পাইল না।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় সে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিতেছিল, ললিতাও সেই সিঁড়িতে উপরে উঠিতেছিল, অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোমাকে একটা কথা বলবার আছে।

শেখর একমুহূর্ত্ত স্থির হইয়া বিস্ময়ের স্বরে বলিল, কাকে ? আমাকে ?

ললিতা তেমনি মৃদুস্বরে বলিল, হাঁ তোমাকে।

আমার সঙ্গে আবার কি কথা! বলিয়া শেখর পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতপদে নামিয়া গেল।

ললিতা সেইখানে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতি ক্ষুদ্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে শেখর তাহার বাহিরের ঘরে বসিয়া সেইদিনের সংবাদপত্র পড়িতেছিল, নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত চোখ তুলিয়া দেখিল, গিরীন প্রবেশ করিতেছে। গিরীন নমস্কার করিয়া নিকটে চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। শেখর প্রতিনমস্কার করিয়া সংবাদপত্রটা একপাশে রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া রহিল। উভয়ের চোখের পরিচয় ছিল বটে, কিন্তু আলাপ ছিল না এবং সে-পক্ষে আজ পর্য্যন্ত দু'জনের কেহই কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে নাই।

গিরীন একেবারেই কাজের কথা পাড়িল। বলিল, বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এসেচি। আমার শাশুড়ীঠাকরুণের অভিপ্রায় আপনি শুনেচেন—বাড়িটা তিনি আপনাদের কাছে বিক্রি করে ফেলতে চান। আজ আমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন, শীঘ্র যা হোক একটা বন্দোবস্ত হয়ে গেলেই তাঁরা এই মাসেই মুঙ্গেরে ফিরে যেতে পারেন।

গিরীনকে দেখিবামাত্রই শেখরের বুকের মধ্যে ঝড় উঠিয়াছিল, কথাগুলা তাহার কিছুমাত্র ভাল লাগিল না, অপ্রসন্ন-মুখে বলিল, সে ত ঠিক কথা, কিন্তু বাবার অবর্ত্তমানে দাদাই এখন মালিক, তাঁকে বলা আবশ্যক।

গিরীন মৃদু হাসিয়া বলিল, সে আমরাও জানি। কিন্তু তাঁকে আপনি বললেই ত ভাল হয়।

শেখর তেমনিভাবেই জবাব দিল, আপনি বললেও হতে পারে। ও-পক্ষের অভিভাবক এখন আপনিই।

গিরীন কহিল, আমার বলবার আবশ্যক হলে বলতে পারি; কিন্তু কাল সেজদি বলছিলেন, আপনি একটু মনোযোগ করলে অতি সহজেই হতে পারে।

শেখর মোটা তাকিয়াটায় হেলান দিয়া বসিয়া এতক্ষণ কথা কহিতেছিল, সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কে বললেন?

গিরীন বলিল, সেজদি—ললিতাদিদি বলছিলেন—

শেখর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তার পরে গিরীন কি যে বলিয়া গেল তার একবিন্দুও তাহার কানে গেল না। খানিকক্ষণ বিহ্বল-দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, আমাকে মাপ করবেন গিরীনবাবু, কিন্তু ললিতার সঙ্গে কি আপনার বিবাহ হয়নি?

গিরীন জিভ কাটিয়া বলিল, আজ্ঞে না—ওদের সকলকেই আপনি জানেন—কালীর সঙ্গে আমার—

কিন্তু সে-রকম ত কথা ছিল না।

গিরীন ললিতার মুখে সব কথা শুনিয়াছিল, কহিল, না, কথা ছিল না, সে-কথা সত্য। গুরুচরণবাবু মৃত্যুকালে আমাকে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন আমি আর কোথাও যেন বিবাহ না করি। আমিও প্রতিশ্রুত হই। তাঁর মৃত্যুর পরে সেজদি আমাকে বুঝিয়ে বলেন,—অবশ্য, এ-সব কথা আর কেউ জানে না, যে, ইতিপূর্ব্বেই তাঁর বিবাহ হয়ে গেছে এবং স্বামী জীবিত আছেন। এ কথা আর কেউ হয়ত বিশ্বাস করত না, কিন্তু আমি তাঁর একটি কথাও অবিশ্বাস করিনি। তা ছাড়া, স্ত্রীলোকের একবারের অধিক বিবাহ হতে পারে না—ও কি ?

শেখরের দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন এই বাষ্প অশ্রুধারায় চোখের কোণ বাহিয়া গিরীনের সম্মুখেই ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু সেদিকে তাহার চৈতন্য ছিল না, তাঁহার মনেও পড়িল না, পুরুষের সম্মুখেই পুরুষের এই দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাওয়া অত্যন্ত লজ্জাকর।

গিরীন নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে মনে সন্দেহ ছিলই—আজ সে ললিতার স্বামীকে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিল। শেখর চোখ মুছিয়া ভারি গলায় বলিল, কিন্তু আপনি ত ললিতাকে স্নেহ করেন ?

গিরীনের মুখের উপরে প্রচ্ছন্ন বেদনার গাঢ় ছায়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। আস্তে আস্তে বলিল, সে কথার জবাব দেওয়া অনাবশ্যক। তা ছাড়া, স্নেহ যত বড়ই হোক, জেনে-শুনে কেউ পরের বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করে না—যাক, গুরুজনদের সম্বন্ধে ও আলোচনা আমি করতে চাই নে, বলিয়া সে আর একবার হাসিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ যাই, আবার অন্য সময় দেখা হবে, বলিয়া নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

গিরীনকে শেখর চিরদিনই মনে মনে বিদ্বেষ করিয়াছে, এইবার সে বিদ্বেষ নিবিড় ঘৃণায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, কিন্তু আজ সে চলিয়া যাইবামাত্র শেখর উঠিয়া আসিয়া ভূমিতলে বারংবার মাথা ঠেকাইয়া এই অপরিচিত ব্রাহ্ম-যুবকটির উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিল। মানুষ নিঃশব্দে যে কত বড় স্বার্থত্যাগ করিতে পারে, হাসিমুখে কি কঠোর প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারে, তাহা আজ সে প্রথম দেখিল।

অপরাহ্ণবেলায় ভুবনেশ্বরী নিজের ঘরে মেঝেয় বসিয়া ললিতার সাহায্যে নূতন বস্ত্রের রাশি থাক দিয়া সাজাইয়া রাখিতেছেন, শেখর ঘরে ঢুকিয়া মায়ের শয্যার উপর গিয়া বসিল। আজ সে ললিতাকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পলাইল না। মা চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, কি রে!

দর্পচূর্ণ

দর্পচূর্ণ

১

সন্ধ্যার পর ইন্দুমতী বিশেষ একটু সাজ-সজ্জা করিয়া তাহার স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, কি হচ্ছে?

নরেন্দ্র একখানি বাঙলা মাসিকপত্র পড়িতেছিল; মুখ তুলিয়া নিঃশব্দে ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া সেখানি হাতে তুলিয়া দিল।

ইন্দু খোলা পাতাটার উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া, জোড়া ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল—ইস্, এ যে কবিতা দেখছি! তা বেশ—বসে না থাকি, বেগার খাটি। দেখি এখানা কি কাগজ? 'সরস্বতী'? 'স্বপ্রকাশ' ছাপালে না বুঝি?

নরেন্দ্রের দৃষ্টি ব্যথায় ম্লান হইয়া আসিল।

ইন্দু পুনরায় প্রশ্ন করিল, 'স্বপ্রকাশ' ফিরিয়ে দিলে?

সেখানে পাঠাইনি।

পাঠিয়ে একবার দেখলে না? 'স্বপ্রকাশ', 'সরস্বতী' নয়, তাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে। এইজন্যেই আমি যা তা কাগজ কখ্খনো পড়িনে।

একটু হাসিয়া ইন্দু আবার কহিল, আচ্ছা, নিজের লেখা নিজেই খুব মন দিয়ে পড়। ভাল কথা, আজ শনিবার, আমি ও-বাড়ির ঠাকুরঝিকে নিয়ে বায়স্কোপ দেখতে যাচ্ছি। কমলা ঘুমিয়ে পড়েচে; কাব্যের ফাঁকে মেয়েটার দিকেও একটু নজর রেখো। চললুম।

নরেন্দ্র কাগজখানি বন্ধ করিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিয়া বলিল, যাও।

ইন্দু চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ একটা গভীর নিশ্বাস কানে যাইতেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আচ্ছা, আমি কিছু একটা করতে চাইলেই তুমি অমন ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল কেন বল ত? এতই যদি তোমার দুঃখের জ্বালা, মুখ-ফুটে বল না কেন, আমি বাবাকে চিঠি লিখে যা হোক একটা উপায় করি।

নরেন্দ্র মুহূর্ত্তকাল মুখ তুলিয়া ইন্দুর দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল যেন সে কিছু বলিবে। কিন্তু কিছুই বলিল না, নীরবে মুখ নত করিল।

নরেন্দ্রের মামাত ভগিনী, বিমলা ইন্দুর সখী। ও-রাস্তার মোড়ের উপরেই তাহার বাড়ি। ইন্দু গাড়ি দাঁড় করাইয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়াই বিস্মিত

ও বিরক্ত হইয়া কহিল, ও কি ঠাকুরঝি! কাপড় পরনি যে! খবর পাওনি নাকি?

বিমলা সলজ্জ হাসিমুখে বলিল, পেয়েচি বৈ-কি, কিন্তু একটু দেরি হবে ভাই। উনি এইমাত্র একটুখানি বেড়াতে বেরুলেন—ফিরে না এলে ত যেতে পারবো না।

ইন্দু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। একটা খোঁচা দিয়া প্রশ্ন করিল, প্রভুর হুকুম পাওনি বুঝি?

বিমলার সুন্দর মুখখানি স্নিগ্ধ মধুর হাসিতে ভরিয়া গেল। এই খোঁচাটুকু সে যেন ভারি উপভোগ করিল। কহিল, না, দাসীর আর্জ্জি এখনও পেশ করা হয়নি, হলে যে না-মঞ্জুর হবে না, সে ভরসা করি।

ইন্দু আরও বিরক্ত হইল। প্রশ্ন করিল, তবে পেশ হয়নি কেন? খবর ত তোমাকে আমি বেলা থাকতেই পাঠিয়েছিলুম।

তখন সাহস হ'লো না বৌ। আফিস থেকে এসেই বললেন, মাথা ধরেচে। ভাবলুম, জলটল খেয়ে একটু ঘুরে আসুন, মনটা প্রফুল্ল হোক—তখন জানাব। এখনও ত দেরি আছে, একটু ব'সো না ভাই, তিনি ফিরে এলেন বলে।

কি জানি, কিসে তোমার হাসি আসে ঠাকুরঝি! আমি এমন হলে লজ্জায় মরে যেতুম। আচ্ছা, ঝিকে কিংবা বেহারাটিকে বলে কি যেতে পার না?

বিমলা সভয়ে বলিল, বাপ রে! তা হলে বাড়ি থেকে দূর করে দেবেন—এ জন্মে আর মুখ দেখবেন না।

ইন্দু ক্রোধে বিস্ময়ে অবাক হইয়া কহিল, দূর করে দেবেন! কোন্ আইনে? কোন্ অধিকারে শুনি?

বিমলা নিতান্ত সহজভাবে জবাব দিল, বাধা কি বৌ! তিনি মালিক—আমি দাসী বৈ ত নয়। তিনি তাড়ালে, কে তাঁকে ঠেকাবে বল?

ঠেকাবে রাজা। ঠেকাবে আইন। সে চুলোয় যাক গে ঠাকুরঝি, কিন্তু নিজের মুখে নিজেকে দাসী বলে কবুল করতে কি একটু লজ্জা হয় না? স্বামী কি মোগল বাদশা? আর স্ত্রী কি তাঁর ক্রীতদাসী যে, আপনাকে আপনি এমন হীন, এমন তুচ্ছ করে গৌরব বোধ করচ?

এই ক্রোধটুকু লক্ষ্য করিয়া বিমলা আমোদ বোধ করিল, কহিল, তোমার ঠাকুরঝি যে মুখ্যু মেয়েমানুষ বৌ, তাই নিজেকে স্বামীর দাসী বলে গৌরব বোধ করে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি ভাই, তুমি যে এত কথা বলচ, তুমিই কি বাড়ি থেকে বেরিয়েচ দাদার হুকুম না নিয়ে?

হুকুম? কেন, কি জন্যে? তিনি নিজে যখন কোথাও যান—আমার হুকুমের অপেক্ষা করেন কি? আমি যাচ্ছি, শুধু এই কথা তাঁকে জানিয়ে এসেচি। নিষেধ—

মাত্র মৌন থাকিয়া, অকস্মাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল, তবে একথা মানি যে আমার মত গুণের স্বামী খুব কম মেয়েমানুষের ভাগ্যে জোটে। আমার কোন ইচ্ছাতেই তিনি বাধা দেন না। কিন্তু, এমন যদি না-ও হ'তো, তিনি যদি নিতান্তই অবিবেচক হতেন, তা হলেও তোমাকে বলচি ঠাকুরঝি, আমি নিজের সম্মান ষোল-আনা বজায় রাখতে পারতুম; কিছুতেই তোমাদের মত এ-কথা ভুলতে পারতুম না যে, আমি সঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী—তাঁর ক্রীতদাসী নই। জানো ঠাকুরঝি, এমনি করেই আমাদের দেশের সমস্ত মেয়েমানুষ পুরুষের পায়ে মাথা মুড়িয়ে এত তুচ্ছ, এমন খেলার পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েচে। নিজের সম্ভ্রম নিজে না রাখলে, কেউ কি দেয় ঠাকুরঝি? কেউ না। আমার ত এমন স্বামী, তবুও কখনও তাঁকে আমি এ-কথা ভাববার অবকাশ দিইনি—তিনিই প্রভু, আর আমি স্ত্রী বলে তাঁর বাঁদী। আমার নারীদেহেও ভগবান বাস করেন, এ-কথা আমি নিজেও ভুলিনে—তাঁকেও ভুলতে দিইনে!

বিমলা চুপ করিয়া শুনিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল; কিন্তু তাহাতে লজ্জা বা অনুশোচনা কিছুই প্রকাশ পাইল না। কহিল, জানিনে বৌ, আত্মসম্ভ্রম আদায় করা কি; কিন্তু তাঁর পায়ে আত্মবিসর্জ্জন দেওয়া বুঝি। ঐ যে উনি এলেন; একটু ব'সো ভাই; আমি শীগ্‌গির হুকুম নিয়ে আসি, বলিয়া, হঠাৎ একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া দ্রুতপায়ে প্রস্থান করিল।

ইন্দু এ হাসিটুকু দেখিতে পাইল। তার সর্ব্বাঙ্গ রাগে রি রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

বায়স্কোপ হইতে ফিরিবার পথে ইন্দু হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ঠাকুরঝি, হুকুম না পেলে ত তুমি আসতে পারতে না।

বিমলা পথের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া কি জানি কি ভাবিতেছিল, বলিল, না।

তাই আমার মনে হয় ঠাকুরঝি, আমি যখন তখন এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাই বলে, তোমার স্বামী হয়ত রাগ করেন।

বিমলা মুখ ফিরাইয়া কহিল, তা হলে আমি নিজেই বা যাব কেন বৌ! বরং আমার ভয় হয়, তুমি এমন করে এসো বলে দাদা হয়ত মনে মনে আমার উপর বিরক্ত হন।

ইন্দু সগর্ব্বে কহিল, তোমার দাদার সে স্বভাব নয়। একে ত কখনো তিনি নিজের অধিকারের বাইরে পা দেন না, তা ছাড়া আমার কাজে রাগ করবেন, আমি ঠিক জানি, এ স্পর্দ্ধা তাঁর স্বপ্নেও আসে না।

বিমলা মিনিট-দুই স্থির থাকিয়া, গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, বৌ, দাদা তোমাকে কি ভালই না বাসেন। কিন্তু তুমি বোধ করি—

এতক্ষণে ইন্দুর মুখে হাসি ফুটিল। কহিল, তাঁর কথা অস্বীকার করিনে; কিন্তু আমার সম্বন্ধে তোর সন্দেহ হ'লো কিসে?

তা জানিনে বৌ! কিন্তু মনে হয় যেন—

কেন হয় জান ঠাকুরঝি, তোমাদের মত পায়ে লুটিয়ে-পড়া ভালবাসা আমার নেই বলে। আর ঈশ্বর করুন, আমার নারী-মর্য্যাদাকে ডিঙ্গিয়ে যেন কোনদিন আমার ভালবাসা মাথা তুলে উঠতে না পারে। যে ভালবাসা আমার স্বাধীন সত্তাকে লঙ্ঘন করে যায়, সে ভালবাসাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।

বিমলা গোপনে শিহরিয়া উঠিল।

মিনিট-খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কথা কও না যে ঠাকুরঝি! কি ভাবছ?

কিছু না। প্রার্থনা করি, দাদা তোমাকে চিরদিন এমনই ভালবাসুন; কারণ, যতই কেন বল না বৌ, মেয়েমানুষের স্বামীর ভালবাসার চেয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও বড় নয়। মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া বিমলা পুনরায় কহিল, কি জানি, তোমার নারীমর্য্যাদা—আর কি তোমার স্বাধীন সত্তা! আমি ত আমার সমস্তই তাঁর পায়ে ডুবিয়ে দিয়ে বেঁচেচি। সত্যি বলচি বৌ, আমার ত এমনি দশা হয়েচে, নিজের ইচ্ছে বলেও যেন আর কিছু বাকী নেই। তাঁর ইচ্ছেই—

ছি ছি, চুপ কর—চুপ কর—

বিমলা চমকিয়া চুপ করিল। ইন্দু ঘৃণাভরে বলিতে লাগিল, আমাদের দেশের মেয়েরা কি মাটির পুতুল? প্রাণ নেই, আত্মা নেই—কিছু নেই। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এত করে কি পেয়েচ? আমার চেয়ে বেশি ভালবাসা আদায় করতে পেরেচ কি? ঠাকুরঝি, ভালবাসা মাপবার যে যন্ত্র নেই, নইলে মেপে দেখাতে পারতাম—যাক সে কথা—কিন্তু কেন জানো? নিজেকে তোমাদের মত নীচু করিনি বলে—তোমাদের এই কাঙাল-বৃত্তি মাথায় তুলে নিইনি বলে। আমার ভারি দুঃখ হয় ঠাকুরঝি, কেন তিনি এত শান্ত, এত নিরীহ। কিছুতেই একটা কথা বলেন না—নইলে দেখিয়ে দিতুম, তিনি যাকে গ্রাহ্য করেন না, সেও মানুষ; সেও অগ্রাহ্য করতে জানে। সেও আত্মমর্য্যাদা হারিয়ে ভালবাসা চায় না।

ও আবার কি? মুখ ফিরিয়ে হাসচ যে?

বিমলা জোর করিয়া হাসি চাপিয়া বলিল, কই—না।

না কেন? এখনো ত তোমার ঠোঁটে হাসি লেগে রয়েচে।

বিমলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, লেগে রয়েচে তোমার কথা শুনে। ওগো বৌ, অনেক পেয়েচ বলেই এত কথা বেরুচ্চে।

ইন্দু ক্রুদ্ধমুখে জিজ্ঞাসা করিল, না পেলে?

বেরুত না।

ভুল—নিছক ভুল। ঠাকুরঝি, সকলেই তোমার মত নয়—সকলেই ভিক্ষে চেয়ে বেড়ায় না। আত্মগৌরব বোঝে এমন নারীও সংসারে আছে।

এবার বিমলার মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল; বলিল, তা জানি।

জানলে আর বলতে না। যাই হোক, এখন থেকে জেনো, যে ভিক্ষে চায় না, নিজের জোরে আদায় করে এমন লোকও আছে।

বিমলা ব্যথিত স্বরে বলিল, আচ্ছা। এই যে বাড়ি এসে পড়েচি। একবার নামবে না কি?

নাঃ—আমিও বাড়ি যাই। গাড়োয়ান, ঐ ও গলিতে—

দাদাকে আমার প্রণাম দিও বৌ!

দেবো,—গাড়োয়ান, চলো—

২

আর নেই—সংসার-খরচের কিছু টাকা দিতে হবে যে।

স্ত্রীর প্রার্থনায় নরেন্দ্র আশ্চর্য্য হইল। কহিল, এর মধ্যেই দুশো টাকা ফুরিয়ে গেল?

না গেলে কি মিথ্যে বলচি, না, লুকিয়ে রেখে চাইচি?

নরেন্দ্রের চোখে একটা ভয়ের ছায়া পড়িল। কোথায় টাকা? কি করিয়া সংগ্রহ করিবে?

সেই মুখের ভাব ইন্দু দেখিল, কিন্তু ভুল করিয়া দেখিল। কহিল, বিশ্বাস না হয়, এখন থেকে একটা খাতা দিয়ো, হিসেব লিখে রাখব। কিংবা এক কাজ কর না—খরচের টাকাকড়ি নিজের হাতেই রেখো—তাতে তোমারও ভয় থাকবে না, আমিও সংশয়ের লজ্জা থেকে রেহাই পাব। বলিয়া তীব্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল তাঁহার মুখের গাঢ় ছায়া গাঢ়তর হইয়াছে।

নরেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল, অবিশ্বাস করিনি, কিন্তু—

কিন্তু কি? বিশ্বাসও হয় না—এই ত, আচ্ছা যাচ্ছি, যতটা পারি হিসেব লিখে

আনি। উঃ—কি সুখের ঘর-কন্নাই হয়েচে আমার! বলিয়া সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, কিন্তু কেন? কিসের জন্য হিসেব লিখতে যাব—আমি কি মিথ্যে বলি? আমার মামাত বোনের বিয়েতে কাপড়-জামা লাগল—পঞ্চাশ টাকার ওপর। কমলার জামা জুতোর দাম বার টাকা—সেদিন বায়স্কোপে খরচ হ'লো দশ টাকা—খতিয়ে দেখ দেখি, বাকি থাকে কত? তাতে এই দশ-পনর দিন সংসার-খরচটা কি এমন বেশি যে, তোমার দু'চোখ কপালে উঠেচে! আমার দাদার সংসারে মাসে সাত-আটশ' টাকাতেও যে হয় না। সত্যি বলচি, এমন করলে ত আমি আর ঘরে টিকতে পারিনে। তার চেয়ে বরং স্পষ্ট বল, দাদা মেদিনীপুরে বদলি হয়েচেন, আমি মেয়ে নিয়ে চলে যাই—আমিও জুড়োই, তুমিও বাঁচ!

নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিয়া, মুখ তুলিয়া কহিল, এ-বেলায় ত হবে না, দেখি যদি ও বেলায় কিছু যোগাড় করতে পারি।

তার মানে? যোগাড় না করতে পার, উপোস করতে হবে নাকি? দেখ, কালই আমি মেদিনীপুরে যাব। কিন্তু তুমি এক কাজ কর। এই দালালী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে, দাদাকে ধরে একটা চাকরি যোগাড় করে নাও। তাতে বরঞ্চ ভবিষ্যতে থাকবে ভাল; কিন্তু যা পার না, তাতে হাত দিয়ে নিজেও মাটি হ'য়ো না, আমাকেও নষ্ট ক'রো না।

নরেন্দ্র জবাব দিল না। ইন্দু আরও কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু এই সময় বেহারাটা শম্ভুবাবুর আগমন-সংবাদ জানাইল, এবং পরক্ষণেই বাহিরে জুতোর পদশব্দ শোনা গেল। ইন্দু পার্শ্বের দ্বার দিয়া পর্দার আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইল।

শম্ভুবাবু মহাজন। নরেন্দ্রের পিতা বিস্তর ঋণ করিয়া স্বর্গীয় হইয়াছেন। পুত্রের কাছে তাগাদা করিতে শম্ভুবাবু প্রায়ই শুভাগমন করিয়া থাকেন। আজিও উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি মৃদুভাষী। আসন গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে এমন গুটি-কয়েক কথা বলিলেন, যাহা দ্বিতীয়বার শুনিবার পূর্ব্বে অতি-বড় নির্লজ্জও নিজের মাথাটা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে দ্বিধা করিবে না। শম্ভুবাবু প্রস্থান করিলে, ইন্দু আর একবার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে?

শম্ভুবাবু।

তার পরে?

কিছু টাকা পাবেন, তাইতে এসেছিলেন।

সে টের পেয়েচি। কিন্তু, ধার করেছিলে কেন?

নরেন্দ্র এ প্রশ্নের জবাবটা একটু ঘুরাইয়া দিল। কহিল, বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, তাই—

ইন্দু অতিশয় রুক্ষস্বরে বলিল, তোমার বাবা কি পৃথিবীসুদ্ধ লোকের কাছে দেনা করে গেছেন? এ শোধ করবে কে? তুমি? কি করে করবে শুনি?

এতগুলো প্রশ্নের এক নিশ্বাসে জবাব দেওয়া যায় না। ইন্দু নিজেও সেজন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল না—তৎক্ষণাৎ কহিল, বেশ ত, তোমার বাবা না হয় হঠাৎ মারা গেছেন, কিন্তু তুমি ত হঠাৎ বিয়ে করনি। বাবাকে এ-সব ব্যাপার তোমার ত জানান উচিত ছিল। আমাকে গোপন করাও ত কর্ত্তব্য হয়নি। লোকের মুখে শুনি, তুমি ভারী ধর্ম্মভীরু লোক, বলি, এ-সব বুঝি তোমার ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখে না? বলিয়া ঠিক যেন সে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া স্বামীর মুখপানে চহিয়া রহিল।

কিন্তু হায় রে, এতগুলো সুতীক্ষ্ণ বাণ যাহার উপর এমন নিষ্ঠুরভাবে বর্ষিত হইল, ভগবান তাহাকে কি নিরস্ত্র, কি নিরুপায় করিয়াই সংসারে পাঠাইয়াছিলেন! কাহাকেও কোন কারণেই প্রতিঘাত করিবার সাধ্যটুকুও তাহার ছিল না, শুধু সাধ্য ছিল সহ্য করিবার। আঘাতের সমস্ত বেদনাই তাহার নিজের মধ্যে পাক খাইয়া, অত্যল্প সময়ের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া যাইত; কিন্তু সেই স্বল্প সময়টুকু আজ তাহার মিলিল না। শম্ভুবাবুর অত্যুগ্র কথার জ্বালা কণামাত্র শান্ত হইবার পূর্ব্বেই ইন্দু তাহাতে এমন ভীষণ তীব্র জ্বালা সংযোগ করিয়া দিল যে, তাহারই অসহ্য দহনে আজ সেও প্রত্যুত্তরে একটা কঠোর কথাই বলিতে উদ্যত হইয়া উঠিল; কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিল না। অক্ষমের নিষ্ফল আড়ম্বর মাথা তুলিয়াই ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। শুধু ক্ষীণস্বরে বলিল, বাবার সম্বন্ধে তোমার কি এমন করে বলা উচিত?

—না—উচিত—নয়—কিন্তু আমার উচিত-অনুচিতের কথা তোমাকে মীমাংসা করে দিতে ত বলিনি। কেন তোমাদের সমস্ত ব্যাপার বাবাকে খুলে বলনি?

আমি কিছুই গোপন করিনি ইন্দু। তা ছাড়া, তিনি বাবার বাল্যবন্ধু ছিলেন, নিজেই সমস্ত জানতেন।

তা হলে বল সমস্ত জেনে-শুনেই বাবা আমাকে জলে ফেলে দিয়েচেন!

অসহ্য ব্যথায় ও বিস্ময়ে নরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া থাকিয়া শির নত করিল। স্ত্রীর এই ক্রোধ যথার্থ ই সত্য কিংবা কলহের ছলনা মাত্র, হঠাৎ সে যেন ঠাহর করিতে পারিল না।

এখানে গোড়ার কথা একটু বলা আবশ্যক। এক সময়ে বহুকাল উভয় পরিবার পাশাপাশি বাস করিয়াছিলেন এবং বিবাহটা সেই সময়েই একরূপ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে ইন্দুর পিতা নিজের মত-পরিবর্ত্তন করিয়া, মেয়েকে একটু অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতে মনস্থ করায় বিবাহ-সম্বন্ধও ভাঙ্গিয়া যায়। কয়েক বর্ষ পরে ইন্দুর আঠারো বৎসর বয়সে আবার যখন

কথা উঠে, তখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শুনেন নরেন্দ্রের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সে সময় তাহার সাংসারিক অবস্থা ইন্দুর পিতা-মাতা যথেষ্ট পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, এমন কি, তাঁহাদের মত পর্য্যন্ত ছিল না; শুধু বয়স্থা শিক্ষিতা কন্যার প্রবল অনুরাগ উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই অবশেষে তাঁহারা সম্মত হইয়াছিলেন।

এত কথা এত শীঘ্র ইন্দু যথার্থই ভুলিয়াছে কিংবা মিথ্যা মোহে অন্ধ হইয়া, নিজেকে প্রতারিত করিবার নিদারুণ আত্মগ্লানি এখন এমন করিয়া তাহাকে অহরহ জ্বালাইয়া তুলিতেছে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নরেন্দ্র স্তব্ধ-নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

সেই নির্ব্বাক্ স্বামীর আনত মুখের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া, ইন্দু আর কোন কথা না বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে নিঃশব্দে গেল বটে—এমন অনেকদিন গিয়াছে; কিন্তু আজ অকস্মাৎ নরেন্দ্রের মনে হইল, তাহার বুকে বড় বেদনার স্থানটা ইন্দু যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক জোর করিয়া মাড়াইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। একবার ঈষৎ একটু ঘাড় তুলিয়া স্ত্রীর নিষ্ঠুর পদক্ষেপ চাহিয়া দেখিল; যখন আর দেখা গেল না, তখন গভীর—অতি গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নির্জ্জীবের মত সেইখানেই এলাইয়া শুইয়া পড়িল। সহসা আজ প্রথমে মনে উদয় হইল, সমস্ত মিথ্যা—সব ফাঁকি। এই সংসার, স্ত্রী-কন্যা, স্নেহ-প্রেম—সমস্তই আজ তাঁহার কাছে এক নিমিষে মরুভূমির মরীচিকার মত উবিয়া গেল।

৩

দাদা!

কে রে, বিমল? আয় বোন বোস্! বলিয়া নরেন্দ্র শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। তাহার উভয় ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যথার যে চিহ্নটুকু প্রকাশ পাইল তাহা বিমলার দৃষ্টি এড়াইল না।

অনেকদিন দেখিনি দিদি, ভাল আছিস ত?

বিমলার চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বলিল, কেন দাদা তোমার অসুখের কথা আমাকে এতদিন জানাওনি?

অসুখ তেমন তো কিছুই ছিল না বোন, শুধু সেই বুকের ব্যথাটা একটু—

বিমলা হাত দিয়া এক ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু বৈ-কি? উঠে বসতে পার না—ডাক্তার কি বললে?

ডাক্তার? ডাক্তার কি হবে রে, ও আপনি সেরে যাবে।

এঁ্যা! ডাক্তার পর্য্যন্ত ডাকাওনি? ক'দিন হলো?

নরেন্দ্র একটুখানি হাসিয়া বলিল, ক'দিন? এই ত সেদিন রে! দিন-সাতেক হবে বোধ হয়!

সাত দিন! তা হলে বৌ সমস্ত দেখেই গেছে!

না না, দেখে যায়নি বোধ হয়—অসুখ আমার নিশ্চয় সে বুঝতে পারেনি। আমি তার যাবার দিনও উঠে গিয়ে বাইরে বসে ছিলুম। না না, হাজার রাগ হোক, তাই কি তোরা পারিস বোন?

বৌ তা হলে রাগ করে গেছে, বল?

না, রাগ নয়, দুঃখ-কষ্ট—কত অভাব জানিস্ ত? ওদের এ-সব সহ্য করা অভ্যাস নেই, দেহটাও তার বড় খারাপ হয়েছে, নইলে অসুখ দেখলে কি তোরা রাগ করে থাকতে পারিস্?

বিমলা অশ্রু চাপিয়া কঠিন-স্বরে বলিল, পারি বৈ-কি দাদা, আমাদের অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। না হলে তোমরা বিছানায় না শোয়া পর্য্যন্ত আর আমাদের চোখে পড়ে না! ভোলা, পাল্‌কি এলো রে?

আনতে পাঠিয়েছি মা।

এর মধ্যে যাবি দিদি? এখনো ত সন্ধ্যে হয়নি, আর একটু বোস্ না?

না দাদা, সন্ধ্যে হলে হিম লাগবে! ভোলা, পাল্‌কি একেবারে ভেতরে আনিস।

ভেতরে কেন বিমল?

ভেতরেই ভাল দাদা। এই ব্যথা নিয়ে তোমার বাইরে গিয়ে উঠতে কষ্ট হবে।

আমাকে নিয়ে যাবি? এই পাগল দেখ! কি হয়েচে যে এত কাণ্ড করতে হবে? এ ত আমার প্রায়ই হয়? প্রায়ই সেরে যায়।

তাই যাক দাদা। কিন্তু 'ভাই' ত আমার আর নেই যে, তোমাকে হারালে আর একটি পাব। ঐ যে পাল্‌কি—এই র‍্যাপারখানা বেশ করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ো। ভোলা, আর একটু এগিয়ে আনতে বল্—না দাদা, এ-সময় তোমাকে চোখে-চোখে না রাখতে পারলে আমার তিলার্দ্ধ স্বস্তি থাকবে না।

কিন্তু, নিয়ে যেতে চাইবি বুঝলে যে তোকে আমি খবরই দিতুম না।

বিমলা মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তোমাদের বোঝা তোমাদেরই থাক্ দাদা, আমাকে আর শুনিয়ো না। আচ্ছা, কি করে মুখে আনলে বল ত? এই অবস্থায় তোমাকে একলা ফেলে যেতে পারি! সত্যি কথা বল।

নরেন্দ্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তবে চল্ যাই।

দাদা!

কি-রে ?

আজ রাত্রেই বৌকে একখানা টেলিগ্রাম করে দিই, কাল সকালেই চলে আসুক।

নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিল—না, না, সে দরকার নেই।

কেন নেই ? মেদিনীপুর ত বেশী দূর নয়, একবার আসুক, না হয় আবার চলে যাবে।

না রে বিমল, না। সত্যিই তার দেহটা ভাল নেই—দু'দিন জুড়োক।

একটুখানি থামিয়া বলিল, আমি তোর কাছ থেকে ভাল না হতে পারি ত আর কিছুতেই পারব না। হাঁ রে, আমি যে যাচ্চি, গগনবাবু শুনেচেন ?

বেশ যা হোক তুমি ! তিনি ত এখনো আফিস থেকেই ফেরেননি।

তবে।

তবে আবার কি ? তোমার ভয় নেই দাদা, তাঁর বেশ বড় বড় দুটো চোখ আছে, আমরা গেলেই দেখতে পাবেন।

নরেন্দ্র বিছানায় শুইয়া পড়িয়া কহিল, বিমল, আমার যাওয়া ত হতে পারে না।

বিমলা অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

গগনবাবুর অমতে—

অমন করলে মাথা খুঁড়ে মরব দাদা ! একটা বাড়ির মধ্যে কি ভিন্ন ভিন্ন মত থাকে যে, আমাকে অপমান করচ ?

অপমান করচি ! ঠিক জানিস বিমল, ভিন্ন মত থাকে না ?

বিমলা আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি গুছাইয়া লইতেছিল, সলজ্জে মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

দাদা, আজ ব্যথাটা টের পাচ্চ না, না ?

একেবারে না। এ আট দিন তোমাদের কি কষ্টই না দিলুম—এখন বিদেয় কর্ দিদি।

করব কার কাছে ? আচ্ছা দাদা, এই ষোল-সতের দিনের মধ্যে বৌ একখানা চিঠি পর্য্যন্ত দিলে না ?

বা, দিয়েচেন বৈ-কি। পৌছান-সংবাদ দিয়েছিলেন, কালও একখানা পেয়েচি—বরং, আমিই জবাব দিতে পারিনি ভাই।

বিমলা মুখ ভার করিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল, সেখানে গিয়ে পর্য্যন্ত সে ভাল নেই—সর্দ্দি-কাসি,—পরশু একটু জ্বরের মত হয়েছিল, তবু তার ওপরেই চিঠি লিখেচেন।

আজ তাই বুঝি সেখানে টাকা পাঠিয়ে দিলে ?

নরেন্দ্র অধিকতর লজ্জিত হইয়া পড়িল। কহিল, কিছুই ত তার হাতে ছিল না —বাড়ির পাশেই একটা মেলা বসেচে লিখেচেন, সেটা শেষ হয়ে গেলেই ফিরতে পারবেন—তোমাকে বুঝি চিঠিপত্র লিখতে পারেন নি ?

পেরেচেন বৈ-কি ? কাল আমিও একখানা চারপাতা-জোড়া চিঠি পেয়েচি—

পেয়েচিস্ ? পাবি বৈ কি—তার জবাবটা—

তোমার ভয় নেই দাদা—তোমার অসুখের কথা লিখবো না। আমার নষ্ট করবার মত অত সময় নেই। বলিয়া বিমলা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে খোলা জানালার ভিতর দিয়া লাল আকাশের পানে চাহিয়া নরেন্দ্র স্তব্ধভাবে বসিয়া ছিল, বিমলা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, চুপ করে কি ভাবচ দাদা ?

নরেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, কিছুই ভাবিনি বোন, মনে মনে তোকে আশীর্ব্বাদ করছিলুম, যেন এমনি সুখেই তোর চিরদিন কাটে।

বিমলা কাছে আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া একটা চৌকির উপর বসিল।

আচ্ছা, দুপুরবেলা অত রাগ করে চলে গেলি কেন বল্ ত ?

আমি অন্যায় সইতে পারিনে ? কেন তুমি অত—

অত কি বল্ ? ইন্দুর দিক থেকে একবার চেয়ে দেখ্ দেখি ? আমি ত তাকে সুখে রাখতে পারিনি ?

সুখে থাকতে পারার ক্ষমতা থাকা চাই দাদা। সে যা পেয়েচে, এত কজন পায় ? কিন্তু সৌভাগ্যকে মাথায় তুলে নিতে হয় ; নইলে—কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই বিমলা লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

নরেন্দ্র নীরবে স্নিগ্ধ-সস্নেহ দৃষ্টিতে এই ভগিনীর সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিয়া, ক্ষণকাল পরে কহিল, বিমলা, লজ্জা করিস্‌নে দিদি, সত্য বল্ ত, তুই কখনো ঝগড়া করিস্‌নে ?

উনি বলেচেন বুঝি ? তা ত বলবেনই।

নরেন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, না, গগনবাবু কিছু বলেননি—আমি তোকেই জিজ্ঞাসা করচি।

বিমলা আরক্ত মুখ তুলিয়া বলিল, তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে কে পারবে বল ? শেষে হাতে-পায়ে পড়ে—ওখানে দাঁড়িয়ে কে ?

আমি, আমি—গগনবাবু। থামলে কেন—বলে যাও। ঝগড়া করে কার হাতে-পায়ে কাকে পড়তে হয়—কথাটা শেষ করে ফেল।

যাও—যে সাধু-পুরুষ লুকিয়ে শোনে, তার কথার আমি জবাব দিইনে।

বলিয়া, বিমলা কৃত্রিম ক্রোধের আড়ালে হাসি চাপিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

নরেন্দ্র সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মোটা তাকিয়াটা হেলান দিয়া বসিল। গগনবাবু বলিলেন, এ-বেলায় কেমন আছ হে?

ভাল হয়ে গেছি। এবার বিদায় দাও ভাই।

বিদায় দাও? ব্যস্ত হয়ো না হে—দু'দিন থাকো। তোমার এই বোনটির আশ্রয়ে যে ক'টা দিন বাস করতে পায়, তার তত বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, সে খবর জানো?

জানিনে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

গগনবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করি কি হে, এ যে প্রমাণ করা কথা! বাস্তবিক নরেনবাবু, এমন রত্নও সংসারে পাওয়া যায়! ভাগ্য! ভাগ্যং ফলতি—কি হে কথাটা? নইলে আমার মত হতভাগ্য যে এ বস্তু পায়, এ ত স্বপ্নের অগোচর! বৌঠাকরুণ—না হে না, থেকে যাও দু'দিন—এমন সংসার ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও আরাম পাবে না, তা বলে দিচ্চি ভাই।

বিমলা বহু দূরে যায় নাই, ঠিক পর্দ্দার আড়ালেই কান পাতিয়াছিল—চোখ মুছিয়া উঁকি মারিয়া সেই প্রায়ান্ধকারেও স্পষ্ট দেখিতে পাইল তাহার স্বামীর কথাগুলো শুনিয়া নরেন্দ্রের মুখখানা একবার জ্বলিয়া উঠিয়াই যেন ছাই হইয়া গেল।

৪

দিন-পনের পরে দুপুরের গাড়িতে ইন্দু মেয়ে লইয়া মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়া আসিল। স্ত্রী ও কন্যাকে সুস্থ সবল দেখিয়া নরেন্দ্রর শীর্ণ-পাণ্ডুর মুখ মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সাগ্রহে ঘুমন্ত কন্যাকে বুকে টানিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, কেমন আছ ইন্দু?

বেশ আছি। কেন?

তোমার জ্বরের মতন হয়েছিল শুনে ভারি ভাবনা হয়েছিল। সেরে গেছে?

না হলে ডাক্তার ডাকবে না-কি?

নরেন্দ্রর হাসি-মুখ মলিন হইল। কহিল, না, তাই জিজ্ঞাসা করচি।

কি হবে করে? এদিকে ত পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়ে চিঠির ওপর চিঠি যাচ্ছিল—কেমন আছ—কেমন আছ—সাবধানে থেকো—সাবধানে থেকো। আমি কি কচি খুকি, না, পঞ্চাশটি টাকা দাদা আমাকে দিতে পারতেন না? ও টাকা পাঠিয়ে

সকলের কাছে আমার মাথা হেঁট করে দেবার কি দরকার ছিল? সেদিন বাড়িতে যেন একটা হাসি পড়ে গেল।

নরেন্দ্র ম্লান মুখ আরও ম্লান করিয়া অস্ফুটে কহিল, আর যোগাড় করতে পারলুম না।

না পাঠিয়ে তাই কেন লিখে দিলে না? উঃ—আবার সেই নিত্য নেই নেই—দাও দাও—বেশ ছিলুম এতদিন। বাস্তবিক বড়লোকের মেয়ে গরীবের ঘরে পড়ার মত মহাপাপ আর সংসারে নেই, বলিয়া এই পরম সত্যে স্বামীর হৃদয় পূর্ণ করিয়া ইন্দু অন্যত্র চলিয়া গেল।

মাসাধিক পরে স্বামী-স্ত্রীর এই প্রথম সাক্ষাৎ।

বাহিরে আসিয়া ইন্দু ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া, নিজের শোবার ঘরে ঢুকিয়া ভারি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, বাড়ির অন্যান্য স্থানের মত এখানেও সমস্ত বস্তু রীতিমত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, এত ঝাড়া-মোছা হচ্ছে কেন রে?

নূতন ঝি বলিল, আপনি আসবেন বলে।

আমি আসব বলে?

হাঁ, মা, বাবু তাই ত বলে দিলেন। আপনি ময়লা কিছু দেখতে পারেন না—আজ তিন দিন থেকে তাই—

ইন্দু অন্তরের মধ্যে একটা বড় রকমের গর্ব্ব অনুভব করিল। কিন্তু সহজভাবে বলিল, ময়লা কে দেখতে পারে? তবু ভাল যে—

হাঁ মা, লোক লাগিয়ে ওপর নীচে সমস্ত সাফ করা হয়েচে।

ঝি, রামটহলটাকে একবার ডেকে দাও ত, বাজার থেকে কিছু ফল-মূল কিনে আনুক।

ফলটল ত সব আছে মা। বাবু আজ সকালে নিজে বাজারে গিয়ে সমস্ত খুঁটিয়ে কিনে এনেচেন।

ডাব আছে? আঙুর।

আছে বৈ-কি। এখনি নিয়ে আসচি, দাসী চলিয়া গেল। ইন্দুর মুখের উপর হইতে বিরক্তির মেঘখানা সম্পূর্ণ উড়িয়া গেল। বরং অনতিপূর্ব্বে স্বামীর মলিন মুখখানা বুকের কোথায় যেন একটু খচ্ খচ্ করিতে লাগিল।

বিশ্রাম করিয়া ঘণ্টা-দুই পরে সে প্রসন্নমুখে বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, নরেন্দ্র চশমা খুলিয়া ঝুঁকিয়া বসিয়া কি লিখিতেছে। কহিল, অত মন দিয়ে কি লেখা হচ্ছে কবিতা?

নরেন্দ্র মুখ তুলিয়া বলিল, না।

কি তবে?

ও কিছু না, বলিয়া সে লেখাগুলো চাপা দিয়া রাখিল।

ইন্দুর প্রসন্ন মুখ মেঘাবৃত হইয়া উঠিল। কহিল, তা হলে 'কিছু-না'র উপর অত ঝুঁকে না পড়ে বরং যাতে দুঃখ-কষ্ট ঘোচে এমন কিছুতেই মন দাও। শুনলুম, দাদার হাতে নাকি গোটাকতক চাকরি খালি আছে। বলিয়া ভাল করিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে নিশ্চয় জানিত, এই চাকুরি করার কথাটা তাহাকে চিরদিন আঘাত করে। আজ কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, আঘাতের কোন বেদনাই তাহার মুখে প্রকাশ পাইল না।

নরেন্দ্র শান্তভাবে বলিল, চাকরি করবার লোকও সেখানে আছে।

এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উত্তরে ইন্দু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া বলিল, তা জানি। কিন্তু সেখানে আছে, এখানে নেই নাকি? আজকাল ভাল কথা বললে যে তোমার মন্দ হয় দেখচি! ঘরের কোণে ঘাড় গুঁজে বসে কবিতা লিখতে তোমার লজ্জা করে না? বলিয়া সে চোখ-মুখ রাঙা করিয়া ঘর ছাড়িয়া গেল। এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ।

অ্যাঁ—এ যে বৌ! কখন এলে!

পরশু দুপুর-বেলা।

পরশু দুপুর-বেলা! তাই এত তাড়াতাড়ি আজ সন্ধ্যাবেলায় দেখা দিতে এসেচ? না ভাই বৌ, টানটা একটু কম করো!

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, চিঠি লিখে জবাব পর্য্যন্ত পাইনে। আমি একা আর কত টানব ঠাকুরঝি?

বিমলা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, জবাব পাওনি?

সে না পাওয়াই। চার পাতার জবাব চার ছত্র ত?

বিমলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তখন এতটুকু সময় ছিল না ভাই। এ-ঘরে দাদা যদি বা একটু সারলেন, ওদিকে আবার নতুন ভাড়াটে যায় যায়।

ইন্দু কথাটার একবর্ণও বুঝিল না, হাঁ করিয়া রহিল।

বিমলা সেদিকে মনোযোগ না করিয়া বলিতে লাগিল, সেই মঙ্গলবারটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। সাত দিনের দিন খবর পেয়ে দাদাকে নিয়ে এলুম, তার দু'দিন পরে দাদার বুকের ব্যথার যেমন বাড়াবাড়ি, অম্বিকাবাবুর অসুখটাও তেমনি বেড়ে উঠল—তোমাকে বলব কি বৌ, সেক দিতে দিতে আর ফোমেণ্ট করতে করতে বাড়িসুদ্ধ লোকের হাতের চামড়া উঠে গেল—সারা দিন-রাত কারু নাওয়া-খাওয়া পর্য্যন্ত হ'লো না। হাঁ, সতী-সাধ্বী বলি ওই অম্বিকাবাবুর স্ত্রীকে। ছেলে-

মানুষ বৌ কিন্তু কি যত্ন, কি স্বামী-সেবা! তার পুণ্যেই এ-যাত্রা তিনি রক্ষে পেয়ে গেলেন—নইলে ডাক্তার-বদ্যির সাধ্য ছিল না।

অম্বিকাবাবু কে?

কি জানি, ঘাটালের কাছে কোথায় বাড়ি। চিকিৎসার জন্য এখানে এসে আমাদের ঐ পাশের বাড়িটা ভাড়া নিয়েচেন। লোকজন নেই, পায়সা-কড়িও নেই, —শুধু বৌটি—

ইন্দু মাঝখানেই প্রশ্ন করিল, তোমার দাদার বুঝি খুব বেড়েছিল?

বিমলা ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া কহিল, সে-রাতে আমার ত সত্যিই ভয় হয়েছিল। ঐ তাকের ওপর ওষুধের খালি শিশিগুলো চেয়ে দেখ না—তিনজন ডাক্তার—আর,—আচ্ছা বৌ, দাদা বুঝি এ-সব কথা তোমাকে চিঠিতে লেখেনি?

ইন্দু অন্যমনস্কের মত কহিল, না।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, এখানে এসে বুঝি শুনলে?

ইন্দু তেমনিভাবে জবাব দিল, হাঁ।

বিমলা বলিতে লাগিল, আমি ত তোমাকে প্রথম দিনেই টেলিগ্রাম করতে চেয়েছিলুম; মাত্র দু-তিন ঘণ্টার পথ স্বচ্ছন্দে আসতে পারতে, কিন্তু দাদা কিছুতেই দিলেন না। হাসিয়া কহিল, কি যে তাঁকে তুমি করেচ তা তুমিই জানো বৌ, পাছে অসুখ শরীরে তুমি ব্যস্ত হও, এই ভয়ে কোনমতেই খবর দিতে চাইলেন না। যাক—ঈশ্বরেচ্ছায় ভাল হয়ে গেছে—নইলে—

নইলে তার কি হ'তো ঠাকুরঝি! অসুখ সারতেও আমাকে দরকার হয়নি, না সারলেও হয়ত দরকার হ'তো না। বলিয়া উঠিয়া গিয়া, ঔষধের শূন্য এবং অর্দ্ধশূন্য শিশিগুলা নাড়িয়া লেবেলের লেখা পড়িয়া দেখিতে লাগিল।

কিন্তু এ কি হইল? কখনও যাহা হয় নাই—আজ অকস্মাৎ তাহার দুই চোখ অশ্রুতে ঝাপ্সা হইয়া গেল। কেন, সে কি কেহ নয় যে, এতবড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল, অথচ তাহাকে জানানো পর্য্যন্ত হইল না। সে নিজের এমন কি পীড়ার কথা লিখিয়াছিল যাহাতে সংবাদ দেওয়াটাও কেহ উচিত মনে করিলেন না!

তিনি ভাল হইয়াও ত কতকগুলো পত্রে কত কথা লিখিলেন, শুধু নিজের কথাটাই বলিতে ভুলিলেন। বেশ, এখানে আসিয়াও ত তিনদিন হইল, তবু কি মনে পড়িল না?

ইন্দুর তীব্র অভিমানের স্বর বিমলা টের পাইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শিশি-বোতল নাড়াচাড়া করে আর কি হবে বৌ, ওরা কখনও মিথ্যে সাক্ষী দেবে না, তা যতই জোর কর না। এসো তোমার চা দেওয়া হয়েচে।

চল, বলিয়া ইন্দু অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

চা খাওয়া শেষ হইলে, বিমল কি জানি ইচ্ছা করিয়া আঘাত দিল কি না—কহিল, সে এক হাসির কথা বৌ। এক বাড়িতে দুই রোগী, কিন্তু দুজনের কি আশ্চর্য্য ভিন্ন ব্যবস্থা! দাদা মর মর হয়েও তোমাকে খবর দিতে দিলেন না; পাছে ব্যস্ত হও—পাছে তোমার শরীর খারাপ হয়—আর অম্বিকাবাবু একদণ্ড ওর স্ত্রীকে সুমুখ থেকে নড়তে দিলেন না। তাঁর ভয়, চোখের সুমুখ থেকে গেলেই তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। এমন কি, সে ছাড়া তিনি কারও হাতে বিশ্বাস করে ওষুধ খেতেন না—এমন কখনও শুনেচ বৌ। আমাদের এঁকে তোমরা সবাই তামাশা কর, কিন্তু অম্বিকাবাবুরা সকলকে ডিঙিয়ে গেছেন; খেটে খেটে এই মেয়েটির ঠিক মড়ার মত আকৃতি হয়েচে।

হুঁ, বলিয়া ইন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আর একদিন এসে তোমার সতী-সাধ্বী বৌটির সঙ্গে আলাপ করে যাব—আজ গাড়ি এসেচে, চললুম।

তা হলে কাল একবার এস। আলাপ করে বাস্তবিক সুখী হবে।

দেখা যাবে যদি কিছু শিখতে পারি, বলিয়া ইন্দু মুখ ভার করিয়া গাড়িতে গিয়া উঠিল। অম্বিকাবাবুর পাগলামি তাহার মনের মধ্যে আজ সমস্ত পথটা তাহার স্বামীর গভীর মঙ্গলেচ্ছার গায়ে ধূলা ছিটাইয়া লজ্জা দিতে দিতে চলিল।

৫

দিন-দুই পরে কথায় কথায় ইন্দু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, যদি সত্যি কথা শুনলে রাগ না কর, তা হলে বলি ঠাকুরঝি, বিয়ে করা তোমার দাদারও উচিত হয়নি, এই অম্বিকাবাবুরও হয়নি।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কারণ, প্রতিপালন করবার ক্ষমতা না থাকলে, এটা মহাপাপ।

উত্তর শুনিয়া বিমলা মর্ম্মাহত হইল। ইন্দুকে সে ভালবাসিত। খানিক পরে কহিল, অম্বিকাবাবুর অন্যায় থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাঁর স্ত্রী নিজের কর্ত্তব্য করবে না? তাকে ত মরণ পর্য্যন্ত স্বামি-সেবা করতে হবে?

কেন হবে? তিনি অন্যায় করবেন, যাতে অধিকার নেই তাই করবেন—তার ফলভোগ করবো আমরা? তুমি ইংরিজি পড়নি, আর পাঁচটা সভ্য-সমাজের খবর

রাখ না ; নইলে বুঝিয়ে দিতে পারতুম, কর্ত্তব্য শুধু একদিকে থাকে না। হয় দু'দিকে থাকবে, না হয় থাকবে না। পুরুষেরা এ-কথা আমাদের বুঝতে দেয় না ; দেয়-না বলেই আমরা অম্বিকাবাবুর স্ত্রীর মত মৃত্যুপণ করে সেবা করি।

বিমলা মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, না হলে করতাম না! বৌ, সেবা করাটা কি স্ত্রীর বড় দুঃখের কাজ বলে মনে কর? অম্বিকাবাবুর স্ত্রীর বাইরের ক্লেশটাই দেখতে পাও, তার ভেতরের আনন্দটা জানতে পাও কি?

আমি জানতেও চাইনে।

স্বামীর ভালবাসাটাও বোধ করি জানতে চাও না?

না ঠাকুরঝি, অরুচি হয়ে গেছে। বরং ওটা কম করে নিজের কর্ত্তব্যটা করলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

বিমলা দাঁড়াইয়াছিল, নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, ঠিক এই কথাটা আগেও একবার বলেচ। কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি, এখনও বুঝতে পারলুম না ; আমার দাদা তাঁর কর্ত্তব্য করেন না! কি সে, তা তুমিই জানো। অনেক বই পড়েচ, অনেক দেশের খবর জানো—তোমার সঙ্গে তর্ক করা সাজে না ; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্বামী ন্যায়-অন্যায় যাই করুন, তাঁর ভালবাসা অগ্রাহ্য করবার স্পর্দ্ধা কোন দেশের স্ত্রীরই নেই। আমার ত মনে হয়, ও জিনিস হারানোর চেয়ে মরণ ভাল ; তার পরেও বেঁচে থাকা শুধু বিড়ম্বনা।

আমি তা মানিনে।

মানো নিশ্চয়ই, বলিয়া বিমলা হাসিয়া ফেলিল। তাহার সহসা মনে হইল, এ সমস্তই পরিহাস। সত্যই ত পরিহাস ভিন্ন নারীর মুখে ইহা আর কি হইতে পারে! কহিল, কিন্তু তাও বলি বৌ, আমার কাছে যা মুখে আসে বলচ, কিন্তু দাদার সামনে এ-সব নিয়ে বেশি চালাকি ক'রো না। কেন না, পুরুষমানুষ যতই বুদ্ধিমান হোন, অনেক সময়ে—

কি—অনেক সময়ে?

তামাশা কি না, ধরতে পারে না।

সে তাঁর কাজ। আমি তা নিয়ে দুর্ভাবনা করিনে।

কিন্তু আমি যে না ভেবে থাকতে পারিনে বৌ!

ইন্দু জোর করিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল, কেন বল ত?

বিমলা একটুখানি ভাবিয়া বলিল, রাগ ক'রো না বৌ ; কিন্তু সেই অসুখের সময় আমার সত্যিই মনে হয়েছিল, দাদা যে তোমাকে পাবার জন্যে একসময় পাগল হয়ে উঠেছিলেন, সেই যে কি বলে "পায়ে কাঁটা ফুটলে বুক পেতে দেওয়া"—কিন্তু, সে-ভাব আর বুঝি নেই।

হঠাৎ ইন্দুর সমস্ত মুখের উপর কে যেন কালি লেপিয়া দিল; তার পরে, সে জোর করিয়া শুক্‌নো হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ ঠাকুরঝি, তোমার দাদাকে ব'লো আমি ভ্রূক্ষেপও করিনে। আর তুমিও ভাল করে বুঝো, আমার নিজের ভালমন্দ নিজেই সামলাতে জানি। তা নিয়ে পরের মাথা গরম করাটাও আবশ্যক মনে করিনে।

ফিরিয়া আসিয়া ইন্দু স্বামীকে ঘরে ঢুকিয়াই প্রশ্ন করিল, আমি মেদিনীপুরে গেলে তোমার ব্যামো হয়েছিল?

নরেন্দ্র খাতা হইতে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, না, ব্যামো নয়—সেই ব্যথাটা।

খরচ বাঁচাবার জন্যে ঠাকুরঝির ওখানে গিয়ে পড়েছিলে?

স্ত্রীর এই অত্যন্ত কটু ইঙ্গিতে নরেন্দ্র খাতাটার উপর পুনর্ব্বার ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া মৃদু-কণ্ঠে বলিল, বিমলা এসে নিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আমি শুনতে পেলে বলে দিতাম, অক্ষমদের জন্যই হাসপাতাল সৃষ্টি হয়েচে। পরের ঘাড়ে না চড়ে সেইখানে যাওয়াই তাদের উচিত।

নরেন্দ্র আর মুখ তুলিল না—একটি কথাও কহিল না।

ইন্দু টান মারিয়া পর্দ্দাটা সরাইয়া বাহির হইয়া গেল। ধাক্কা লাগিয়া একটা ক্ষুদ্র টিপাই ফুলদানি-সমেত উল্টাইয়া পড়িল; সে ফিরিয়াও চাহিল না।

মিনিট-পাঁচেক পরে, তেমনি সজোরে পর্দ্দা সরাইয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ঠাকুরঝি খবর দিতে চেয়েছিলেন, তুমি মানা করেছিলে কি জন্যে? ভেবেছিলে বুঝি আমি এসে ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেব?

নরেন্দ্র মুখ না তুলিয়াই বলিল, না, তা ভাবিনি। তোমার শরীর ভাল ছিল না—

ভালই ছিল। যদিও খবর পেয়েও আমি আসতুম না, সে নিশ্চয়। কিন্তু, আমি সেখানে যে রোগে মরে যাচ্ছিলাম, এ-কথাও তোমাকে চিঠিতে লিখিনি। অনর্থক কতকগুলো মিথ্যে কথা বলে ঠাকুরঝিকে নিষেধ করার হেতু ছিল না। বলিয়া সে যেমন করিয়া আসিয়াছিল, তেমনি করিয়া চলিয়া গেল। নরেন্দ্র তেমনি করিয়া খাতাটার পানে ঝুঁকিয়া রহিল, কিন্তু সমস্ত লেখা তাহার লেপিয়া চোখের সুমুখে একাকার হইয়া রহিল।

* * *

ইন্দু পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া ডাক্তারকে কহিল, আপনিই গগনবাবুর বাড়িতে আমার স্বামীর চিকিৎসা করেছিলেন?

বুড়া ডাক্তার চোখ তুলিয়া ইন্দুর উদ্বেগ-মলিন মুখখানির পানে চাহিয়া ঘাড়, নাড়িয়া সায় দিলেন।

ইন্দু কহিল, কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়েচেন বলে আমার মনে হয় না। এই আপনার ফি-র টাকা—আজ একবার ওবেলা যদি দয়া করে বন্ধুভাবে এসে তাঁকে দেখে যান, বড় উপকার হয়।

ডাক্তার কিছু বিস্মিত হইলেন।

ইন্দু বুঝাইয়া বলিল, ওঁর স্বভাব চিকিৎসা করতে চান না। ওষুধের প্রেস্‌ক্রিপসনটা আমাকে লুকিয়ে দেবেন। তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলবেন।

ডাক্তার সম্মত হইয়া বিদায় লইলেন।

রামটহল আসিয়া সংবাদ দিল, মাজী, বল্লভ স্যাকরা এসেচে।

এসেচে? এদিকে ডেকে আনো।

ও বল্লভ, একটু কাজের জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম, তুমি আমাদের বিশ্বাসী লোক—এই চুড়ি ক'গাছা বিক্রি করে দিতে হবে। বড় পুরোনো ধরণের চুড়ি বাপু, আর পরা যায় না। এ দামে নতুন এক-জোড়া কিনবো মনে কচ্চি।

বেশ ত মা, বিক্রি করে দেব।

নিক্তি এনেচ ত? ওজন করে দেখ দেখি কত আছে। দামটা কিন্তু বাপু আমাকে কাল দিতে হবে। আমার দেরি হলে চলবে না।

তাই দেব।

বল্লভ চুড়ি হাতে করিয়া বলিল, এ যে একেবারে টাটকা জিনিস মা! বেচলেই ত কিছু লোকসান হবে।

তা হোক বল্লভ। এ গড়নটা আমার মনে ধরে না। আর দেখ, এ-সম্বন্ধে বাবুকে কোনও কথা ব'লো না।

বাবুদের লুকাইয়া অলঙ্কার বেচা-কেনার ইতিহাস বল্লভের অবিদিত ছিল না। একটু হাসিয়া চুড়ি লইয়া গেল।

৬

ডাক্তারবাবু, পাঁচ-সাত শিশি ওষুধ খেলেন, কিন্তু বুকের ব্যাথাটা ত গেল না!

গেল না? কৈ, তিনি ত কিছু বলেন না?

জানেন ত, ঐ তাঁর স্বভাব; কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, একটু ব্যথা লেগেই আছে—তা ছাড়া, শরীর ত সারচে না!

ডাক্তার চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেখুন আমারও সন্দেহ হয়, শুধু ওষুধে কিছু হবে না। একবার জল-হাওয়া পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

তাই কেন তাঁকে বলেন না?

বলেছিলাম একদিন। তিনি কিন্তু প্রয়োজন মনে করেন না।

ইন্দু রুষ্ট হইয়া বলিয়া ফেলিল, তিনি মনে না করলেই হবে? আপনি ডাক্তার, আপনি যা বলবেন তাই ত হওয়া উচিত।

বৃদ্ধ চিকিৎসক একটু হাসিলেন।

ইন্দু নিজের উত্তেজনায় লজ্জিত হইয়া বলিল, দেখুন, আমি বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েচি, আপনি ওঁকে খুব ভয় দেখিয়ে দিন।

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, এ-সকল রোগে ভয় ত আছেই।

ইন্দুর মুখ পাংশু হইয়া গেল, কহিল, সত্যি ভয় আছে?

তাহার মুখের পানে চাহিয়া ডাক্তার সহসা জবাব দিতে পারিলেন না।

ইন্দুর চোখে জল আসিয়া পড়িল; বলিল, আমি আপনার মেয়ের মত ডাক্তারবাবু, আমাকে লুকোবেন না। কি হয়েচে, খুলে বলুন।

ঠিক যে কি হইয়াছে তাহা ডাক্তার নিজেও জানিতেন না। তিনি নানা রকম করিয়া যাহা কহিলেন তাহাতে ইন্দুর ভয় ঘুচিল না। সে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিকালবেলা নরেন্দ্র হাতের কলমটা রাখিয়া দিয়া খোলা জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল, ইন্দু ঘরে ঢুকিয়া অদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। নরেন্দ্র একবার মুখ ফিরাইয়া, আবার সেইদিকেই চাহিয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে ইন্দু টাকা চাহে নাই, আজ সে যে কিজন্য আসিয়া বসিল, তাহা নিশ্চয় অনুমান করিয়া তাহার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল।

ইন্দু টাকা চাহিল না; কহিল, ডাক্তারবাবু বলেন, ব্যথাটা যখন ওষুধে যাচ্ছে না, তখন হাওয়া বদলানো দরকার। একবার কেন বেড়াতে যাও না?

নরেন্দ্র বাস্তবিকই চমকিয়া উঠিল। বহুদিন অজ্ঞাত বড় স্নেহের ধন যেন কোথায় লুকাইয়া তাহাকে ডাক দিল। ইন্দুর এই কণ্ঠস্বর সে ত ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাই মুখ ফিরাইয়া হতবুদ্ধির মত চাহিয়া ক্ষণকালের জন্য কি যেন মনে মনে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

ইন্দু কহিল, কি বল? তা হলে কালই গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। বেশি দূরে কাজ নেই—এই বভিনাথের কাছে—আমরা দু'জন, কমলা আর ঝি —রামটহল পুরানো বিশ্বাসী লোক, বাড়িতেই থাক্। সেখানে একটা ছোট বাড়ি নিলেই হবে। তাহলে আজ থেকেই গুছোতে আরম্ভ করুক না কেন?

কোন প্রকার খরচের কথাতেই নরেন্দ্র ভয় পাইত। এই একটা বড় রকমের ইঙ্গিতে তাহার মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া গেল। প্রশ্ন করিল, এই ডাক্তারটিকে আসতে বললে কে?

ইন্দু জবাব দিবার পূর্ব্বে সে পুনরায় কহিল, বিমলাকে বোলো আমার পিছনে ডাক্তার লাগিয়ে উত্যক্ত করবার আবশ্যক নেই, আমি ভাল আছি।

বিমলা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ডাক্তার পাঠাইতেছে,—বিমলাই সব। ইন্দু অন্তরে আঘাত পাইল। তবু চাপা দিয়া বলিল, কিন্তু তুমি ত সত্যই ভাল নেই। ব্যথাটা ত সারেনি।

সেরেচে।

তা হলেও শরীর সারেনি—বেশ দেখতে পাচ্ছি। একবার ঘুরে এলে, আর যাই হোক্—মন্দ কিছু ত হবে না।

নরেন্দ্র ভিতরে-বাহিরে এমন জায়গায় উপস্থিত হইয়াছিল যেখানে সহ্য করিবার ক্ষমতা নিঃশেষ হইয়াছিল। তবুও ধাক্কা সামলাইয়া বলিল, আমার ঘুরে বেড়াবার সামর্থ্য নেই।

ইন্দু জিদ করিয়া বলিল, সে হবে না। প্রাণটা ত বাঁচানো চাই।

এই জিদটা ইন্দুর পক্ষে এতই নূতন যে, নরেন্দ্র সম্পূর্ণ ভুল করিল। তাহার নিশ্চয়ই মনে হইল, তাহাকে ক্লেশ দিবার ইহা একটা অভিনব কৌশল মাত্র। এতদিনের ধৈর্য্যের বাঁধন তাহার নিমেষে ছিন্ন হইয়া গেল। চেঁচাইয়া উঠিল, কে বললে প্রাণ বাঁচানো চাই? না, চাই না। তোমার পায়ে পড়ি ইন্দু, আমাকে রেহাই দাও, আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

স্বামীর কাছে কটু কথা শোনা ইন্দু কল্পনা করিতেও পারিত না। সে কেমন যেন জড়-সড় হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু নরেন্দ্র জানিতে পারিল না; বলিতে লাগিল, তুমি ঠিক জানো আমি কি সঙ্কটের মাঝখানে দিন কাটাচ্চি। সমস্ত জেনে-শুনেও আমাকে কেবল কষ্ট দেবার জন্যেই অহর্নিশি খোঁচাচ্চ। কেন, কি করেচি তোমার? কি চাও তুমি?

ইন্দু ভয়ে বিবর্ণ হইয়া রহিল। একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

চেঁচামেচি উত্তেজনা নরেন্দ্রর পক্ষে যে কিরূপ অস্বাভাবিক, তাহা এইবার সে নিজেই টের পাইল। কণ্ঠস্বর নত করিয়া বলিল, বেশ, স্বীকার করলুম আমার হাওয়া বদলানো আবশ্যক, কিন্তু কি করে যাব? কোথায় টাকা পাব? সংসার খরচ যোগাতেই যে আমার প্রাণ বার হয়ে যাচ্চে!

ইন্দু নিজে কোনও দিন ধৈর্য্য শিক্ষা করে নাই; অবনত হইতে তাহার মাথা

কাটা যাইত। আজ কিন্তু সে ভয় পাইয়াছিল। নম্র-কণ্ঠে কহিল, টাকা নেই বটে, কিন্তু অনেক টাকার গয়না ত আমাদের আছে—

আছে, কিন্তু আমাদের নেই, তোমার আছে। তোমার বাবা দিয়েচেন তোমাকে। আমার তাতে একবিন্দুও অধিকার নেই—এ কথা আমার চেয়ে তুমি নিজেই ঢের বেশি জানো।

বেশ, তা না নাও—আমি নগদ টাকা দিচ্চি।

কোথায় পেলে? সংসার-খরচ থেকে বাঁচিয়েচ?

ইহা চুড়ি বিক্রির টাকা। ইন্দু সহজে মিথ্যা কহিতে পারিত না। ইহাতে তাহার বড় অপমান বোধ হইত। আজ কিন্তু সে মিথ্যা বলিল। নরেন্দ্রর মুখের ভাব ভয়ানক কঠিন হইল। ধীরে ধীরে বলিল, তা হলে রেখে দাও, গয়না গড়িয়ো। আমার বুকের রক্ত জল করে যা জমা হয়েচে, তা এভাবে নষ্ট হতে পারে না। ইন্দু, কখনও তোমাকে কটু কথা বলিনি, চিরদিন শুনেই আসচি। কিন্তু তুমি না সেদিন দম্ভ করে বলেছিলে, কখনও মিথ্যে কথা বলো না? ছিঃ—

কমলা পর্দা ফাঁক করিয়া ডাকিল, মা, পিসিমা এসেচেন।

কি হচ্চে গো বৌ? বলিয়া বিমলা ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু মেয়েকে আনিয়া, তাহার গলার হারটা দুই হাতে সজোরে ছিঁড়িয়া স্বামীর মুখের সামনে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, মিথ্যে বলতে আমি জানতাম না—তোমার কাছেই শিখেচি। তবুও এখনও পেতলকে সোনা বলে চালাতে শিখিনি। যে স্ত্রীকে ঠকায়, নিজের মেয়েকে ঠকায়, তার আর কি বাকি থাকে। সে অপরকে মিথ্যাবাদী বলে কি করে?

নরেন্দ্র ছিন্ন হারটা তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কি করে জানলে পেতল! যাচাই করিয়েচ?

তোমার বোনকে যাচাই করে দেখতে বল। বলিয়াই সে দুই চোখ রাঙা করিয়া বিমলার দিকে চাহিল।

বিমলা দু'পা পিছাইয়া গিয়া বলিল, ও কাজ আমার নয় বৌ, আমি এত ইতর নই যে, দাদার দেওয়া গয়না স্যাকরা ডেকে যাচাই করে দেখব।

নরেন্দ্র কহিল, ইন্দু, তোমাকেও দু-একখানা গয়না দিয়েচি, সেগুলো যাচাই করে দেখেচ?

দেখিনি, কিন্তু এবার দেখতে হবে।

দেখো, সেগুলো পেতল নয়।

ভগিনীর মুখের পানে চাহিয়া হারটা দেখাইয়া কহিল, এটা সোনা নয় বোন, পেতলই বটে। যে দুঃখে বাপ হয়ে ঐ একটি মেয়ের জন্মদিনে তাকে ঠকিয়েচি, সে

তুই বুঝবি। তবুও, মেয়েকে ঠকাতে পেরেচি, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে ঠকাতে সাহস করিনি।

৭

কথা শোনো বৌ ; একবার পায়ে হাত দিয়ে তাঁর ক্ষমা চাও গে।

কেন, কি দুঃখে ? আমার মাথা কেটে ফেললেও আমি তা পারব না ঠাকুরঝি।

কেন পারবে না ? স্বামীর পায়ে হাত দিতে লজ্জা কি ? বেশ ত, তোমার দোষ না হয় নেই, কিন্তু তাঁকে প্রসন্ন করা যে সকল কাজের বড়।

না—আমার তা নয়। ভগবানের কাছে খাঁটি থাকাই আমার সকল কাজের বড়। যতক্ষণ সে অপরাধ না করচি, ততক্ষণ আর কিছুই ভয় করিনে।

বিমলা রাগিয়া বলিল, বৌ, এসব পাকামির কথা আমরাও জানি, তখন কিছুই কোন কাজে আসবে না বলে দিচ্চি। চোখ বুজে বিপদ এড়ানো যায় না। দাদা সত্যই তোমার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠচেন।

ইন্দু উদাসভাবে বলিল, তাঁর ইচ্ছে।

বিমলা মনে মনে অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, সেই ইচ্ছে টের পাবে যেদিন সর্ব্বনাশ হবে। দাদা যেমন নিরীহ, তেমনি কঠিন। তাঁর এ-দিক দেখেচ, ও-দিক দেখতে এখনো বাকী আছে—তা বলে দিচ্চি।

আচ্ছা, দেখতে পেলে তোমাকে খবর দিয়ে আসব।

বিমলা আর কিছু বলিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তা সত্যি। বিশ্বাস হয় না বটে, স্বামীর স্নেহে বঞ্চিত হবো। কিন্তু সে-মানুষ যে দাদা নয়—অসুখের সময় তাঁকে ভাল করে চিনেচি। বুকের কপাট তাঁর একবার বন্ধ হয়ে গেলে আর খোলা যাবে না।

এইবার ইন্দুও মুখ গম্ভীর করিল। কহিল, খোলা না পাই, বাইরেই থাকব। খুলে দেবার জন্য তাঁর পায়ে ধরেও সাধব না—তোমাকেও সুপারিশ করতে ডাকব না। ও-কি, রাগ করে চললে নাকি ?

বিমলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, রাগ নয়—দুঃখ করেই যাচ্চি। বৌ, নিজের বোনের চেয়েও তোমাকে বেশি ভালবেসেচি বলেই প্রাণটা কেঁদে কেঁদে ওঠে। দাদা যে অমন করে বলতে পারেন, আমি চোখে দেখে না গেলে বিশ্বাসই করতুম না।

ইন্দু হঠাৎ একটু হাসিয়া বলিল, অত বক্তৃতা আর কখনো তাঁর মুখে শুনবে না।

বক্তৃতা তুমিও কিছু কম করনি বৌ। তবে তিনি যে আর কখনো করবেন না, তা আমারও মনে হয়। এক কথা একশ'বার বলবার লোক তিনি নন।

ইন্দু আবার হাসিয়া বলিল, সেও বটে,—তবে আর একটা গুরুতর কারণ ঘটেচে, যাতে আর কোনদিন স্বপ্নেও চোখ রাঙাতে সাহস করবেন না। আমার বাবার চিঠি পেলুম। তিনি আমার নামে দশ হাজার টাকা উইল করে দিয়েচেন। কি বল ঠাকুরঝি, পায়ে ধরবার আর দরকার আছে বলে মনে হয়?

বিমলার মুখ যেন আরও অন্ধকার হইয়া গেল। বলিল, বৌ, এর পূর্ব্বে কখনো তোমাকে তিনি চোখ রাঙাননি। যা করে তাঁকে ফেলে রেখে তুমি মেদিনীপুরে গিয়েছিলে, সে আমি ত জানি; কিন্তু তবুও কোনোদিন এতটুকু তোমার নিন্দে করেননি। হাসিমুখে তোমার সমস্ত দোষ আমার কাছেও ঢেকে রেখেছিলেন—সে কি তোমার টাকার লোভে? বৌ, শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা থাকে না। যে জিনিস তুমি তেজ করে হেলায় হারাচ্চো—সেইদিন টের পাবে যেদিন যথার্থই হারাবে। কিন্তু এই একটা কথা আমার মনে রেখো বৌ, আমার দাদা অত নীচ নয়। আর না, সন্ধ্যা হয়—চললুম; কাল-পরশু একবার সময় হলে আমাদের বাড়ি এসো।

আচ্ছা, বলিয়া ইন্দু পিছনে পিছনে সদর দরজা পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মৃদু পদশব্দ বিমলা যে শুনিয়াও শুনিল না, তাহা সে বুঝিল। গাড়িতে উঠিয়া বসিলে মুখ বাড়াইয়া চিরদিন এই দুটি সখী পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করিয়া, হাসিয়া কপাট বন্ধ করে। আজ গাড়িতে ঢুকিয়াই বিমলা দরজা টানিয়া দিল।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ইন্দু কমলাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল।

বিমলা চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার খরতপ্ত কথাগুলা রাখিয়া গেল। ইহার উত্তাপ যে কত, এইবার ইন্দু টের পাইল। এই তাপে তাহার অহঙ্কারের অভ্রভেদী তুষারস্তূপ যতই গলিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল, ততই এক একটি নূতন বস্তু তাহার চোখে পড়িতে লাগিল। এত কাদামাটি—আবর্জ্জনা—এত কর্কশ-কঠিন শিলাখণ্ড যে এই ঘনীভূত জলতলে আবৃত হইয়া ছিল, তাহা সে ত স্বপ্নেও ভাবে নাই।

হঠাৎ তাহার অন্তরের ভিতর হইতে কে যেন জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, এ কেমন হয় ইন্দু, যদি তিনি মনে মনে তোমাকে ত্যাগ করেন? তুমি কাছে গিয়ে বসলেও যদি তিনি ঘৃণায় সরে বসেন?

তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল।

কমলা কহিল, কি মা?

ইন্দু তাহাকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মুখে চুমা খাইয়া বলিল, তোর পিসিমা এত ভয় দেখাতেও পারে!

কিসের ভয় মা ?

ইন্দু আর একটি চুমা খাইয়া বলিল, কিছু না মা, সব মিথ্যে—সব মিথ্যে। যা ত মা, দেখে আয় ত তোর বাবা কি কচ্চেন ?

মেয়ে ছুটিয়া চলিয়া গেল। আজ দু'দিন স্বামী-স্ত্রীতে একটা কথাও হয় নাই। কমলা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বাবা চুপ করে শুয়ে আছেন।

চুপ করে ? আচ্ছা, তুই শুয়ে থাক্ মা, আমি দেখে আসি, বলিয়া ইন্দু নিজে চলিয়া গেল। পর্দ্দার ফাঁক দিয়া দেখিল তাই বটে। তিনি উপরের দিকে চাহিয়া সোফায় শুইয়া আছেন। মিনিট পাঁচ-ছয় দাঁড়াইয়া দেখিয়া ইন্দু ফিরিয়া আসিল। আজ প্রবেশ করিতে সাহস হইল না দেখিয়া সে নিজেই ভারী আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

কমলা !

কি মা ?

তোর বাবার বোধ হয় খুব মাথা ধরেচে। যা মা, বসে বসে একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দে গে।

মেয়েকে পাঠাইয়া দিয়া, ইন্দু নিজে আড়ালে দাঁড়াইয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া দুইজনের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল।

কন্যা প্রশ্ন করিল, কেন এত মাথা ধরেচে বাবা ?

পিতা উত্তর দিলেন, কই, ধরেনি ত মা ?

কন্যা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, মা বললেন যে খুব ধরেচে ?

পিতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কন্যার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে বলিলেন, তোমার মা জানে না।

পর্দ্দা ঠেলিয়া ইন্দু সহজভাবে ঘরে ঢুকিল। টেবিলের আলোটা কমাইয়া দিয়া কহিল, রোগা শরীরে এত পরিশ্রম কি সহ্য হয়! যা ত মা কমলা, ওপর থেকে ওডিকোলনের শিশিটা নিয়ে আয়—আর রামটহলকে একটু বরফ কিনে আনতে বলে দে।

মেয়েকে তুলিয়া ইন্দু শিয়রে আসিয়া বসিল। চুলের মধ্যে হাত দিয়া বলিল, মাথায় আগুন উঠচে যেন !

নরেন্দ্র চোখ বুজিয়া রহিল—কিছুই বলিল না। ইন্দু নীরবে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ঈষৎ ঝুঁকিয়া সস্নেহ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আজ বুকের ব্যথাটা কেমন আছে ?

তেমনি।

তবে এই যে রাগ করে দু'দিন ওষুধ খেলে না, বেড়ে গেলে কি হবে বল ত?

নরেন্দ্র চোখ মেলিয়া শ্রান্ত-কণ্ঠে বলিল, আমার শরীরটা ভাল নেই—একটু চুপ করে থাকতে চাই ইন্দু।

এই কথার এই জবাব!

ইন্দু তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তাই থাকো। আমার ঘাট হয়েচে, তোমার ঘরে ঢুকেছিলাম।

দ্বারের কাছে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল, নিজের প্রাণটা নষ্ট করে আমাকে শাস্তি দিতে পারবে না। এই চিঠিখানা পড়ে দেখ, বাবা আমাকে দশ হাজার টাকা উইল করে দিয়েচেন। বলিয়া বাঁ হাতের চিঠিটা সোফার দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর মুখে আঁচল গুঁজিয়া কান্না চাপিতে চাপিতে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

কথা সহিতে, হার মানিতে সে শিখে নাই—অনেক নারীই শিখে না—তাই আজ তাহার সমস্ত সাধু-সংকল্পই ব্যর্থ হইয়া গেল। সে কি করিতে গিয়া কি করিয়া ফিরিয়া আসিল।

৮

ও কি ঠাকুরঝি,—তোমরা কাঁদছিলে নাকি? চোখ দুটি তোমাদের যে জবাফুল হয়েছে!

অম্বিকাবাবুর স্ত্রী শুনিতেছিলেন এবং বিমলা উপুড় হইয়া বই পড়িতেছিল; ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিয়া হাসিল,—উঃ। দুর্গামণির দুঃখে বুক ফেটে যায় বৌ!

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কে দুর্গামণি?

ন্যাকা সেজো না বৌ। জানো ন,, কে দুর্গামণি? চারিদিকে যে এত সুখ্যাতি বেরিয়েচে, তা ঠিক বটে।

ইন্দু আর কিছুই বুঝিল না, শুধু বুঝিল একখানা বইয়ের কথা হইতেছে। হাত বাড়াইয়া কহিল, দেখি বইটা।

হাতে লইয়া উপরেই দেখিল গ্রন্থকার—তাহার স্বামীর নাম লেখা। পাতা উল্টাইতেই চোখে পড়িল উৎসর্গ করা হইয়াছে বিমলাকে! ইন্দু বইখানা আগা-গোড়া নাড়িয়া চাড়িয়া রাখিয়া দিল। লেখা হইয়াছে, ছাপা হইয়াছে, দেওয়া

হইয়াছে—অথচ সে তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানে না। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া বিমলা আর একটা প্রশ্ন করিতেও সাহস করিল না, তখন ইন্দু নিজেই বলিল, আমার নাটক-নভেল পড়তে ইচ্ছেও করে না, ভালও লাগে না। যা হোক, ভাল হয়েচে শুনে সুখী হলুম।

অম্বিকাবাবুর চাকর আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বাবু জিজ্ঞাসা কচ্চেন,আজ তাঁর যে যাদুঘর দেখতে যাবার কথা ছিল—যাবেন?

এই বধূটি সকলের ছোট; সে লজ্জা পাইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, না, তাঁর শরীর এখনো তেমন সারেনি—আজ যেতে হবে না।

চাকর চলিয়া গেল, ইন্দু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, এমন আশ্চর্য্য কথা সে জীবনে শোনে নাই।

ভোলা আসিয়া বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু অফিস থেকে জানতে লোক পাঠিয়েছেন—একটা বড় আলমারি-দেরাজ নীলাম হচ্ছে। বড় ঘরের জন্যে কেনা হবে কি?

বিমলা কহিল, না, কিনতে মানা করে দে। একটা ছোট বুককেস্ হলেই ও-ঘরের হবে।

ভোলা চলিয়া গেল। ইন্দু মহাবিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। এই স্বামীদের প্রশ্নগুলোতেও সে বেশি প্রভুত্ব দেখিতে পাইল না, ইহাদের স্ত্রী-দুটির আদেশগুলোও তাহার কাছে ঠিক দাসীদের মত শুনাইল না। অথচ, তাহার নিজের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যথা বাজিতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, কি করিয়া যেন ইহাদের কাছে সে একেবারে ছোট হইয়া গিয়াছে।

যাইবার সময় বিমলা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, বৌ, সত্যি কি তুমি দাদার এই বইটার কথা জানতে না?

ইন্দু তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, না। আমার ও জন্যে মাথা-ব্যথা করে না। সারাদিন বসেই ত লিখচে—কে অত খোঁজ করে বল? ভাল কথা ঠাকুরঝি, কাল বাপের বাড়ি যাচ্চি।

বিমলা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, বৌ, যেয়ো না।

কেন?

কেন সে কি বুঝিয়ে বলতে হবে বৌ? দাদা তোমাকে তাঁর দুঃখের সুখের কোন ভারই দেন না—তাও কি চোখে দেখতে পাও না। স্বামীর ভালবাসা হারাচ্চ—তাও কি টের পাও না?

ইন্দু হঠাৎ রুষ্ট হইয়া বলিল, অনেকবার বলেচি তোমাকে, আমি চাইনে—চাইনে

—চাইনে। আমি দাদার ওখানে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকব; ইনি যেন আর আমাকে আনতে না যান—আর যেন আমাকে জ্বালাতন না করেন।

এবার বিমলাও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কহিল, এ-সব বড়াই পুরুষমানুষের কাছে কোরো বৌ, আমি ত মেয়েমানুষ, আমার কাছে ও কোরো না। তোমার বাপেরা বড়লোক, তোমার সংস্থান তাঁরা করে দিয়েচেন—এই ত তোমার অহঙ্কার? আচ্ছা, এখন যাচ্ছো যাও; কিন্তু একদিন হুঁস হবে, যা হারালে তার তুলনায় সমস্ত পৃথিবীটাও ছোট। বৌ, যা তুমি পেয়েছিলে, কম মেয়েমানুষেই তা পায়—সে জানি, কিন্তু যে অপব্যয় তুমি করলে, তাতে অক্ষয়ও ক্ষয়ে শেষ হয়ে যায়। বোধ করি গেলও তাই।

সেই বইখানা বিমলার হাতেই ছিল। তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় ইন্দুর বুকের ভিতরটা আর একবার হু হু করিয়া উঠিল। বলিল, অহঙ্কার করবার থাকলেই লোকে করে। কিন্তু, আমার সর্ব্বনাশ হয় হবে, যায় যাবে, সেজন্যে ঠাকুরঝি, তুমিই বা মাথা গরম কর কেন, আমিই বা যা-তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনি কেন? আমার থাকতে ইচ্ছে নেই,—থাকব না। এতে যা হয় তা হবে—কারু পরামর্শ নিতেও চাইনে, ঝগড়া করতেও চাইনে।

বিমলা মৌন হইয়া রহিল। তাহার ব্যথা অন্তর্যামী জানিলেন, কিন্তু এ-অপমানের পরে আর সে তর্ক করিল না।

ইন্দু অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেই কহিল, দাঁড়াও ত বৌ, তুমি সম্পর্কে বড়, একটা প্রণাম করি।

৯

সেদিন সন্ধ্যা হইতে সমস্ত আকাশ ঝাঁপিয়া মেঘ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ইন্দু মেয়ে লইয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। আজ তার ছোট ভগিনীপতি আসিয়াছিলেন, পাশের ঘর হইতে তাঁহাকে খাওয়ানো-দাওয়ানো গল্প-গুজবের অস্ফুট কলধ্বনি যতই ভাসিয়া আসিতে লাগিল, ততই কিসের অব্যক্ত লজ্জায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

তিন মাস হইতে চলিল, সে মেদিনীপুর আসিয়াছে। ছোট ভগিনীও আসিয়াছে। তাহার স্বামী এই দুই মাসের মধ্যে শান্তিপুর হইতে অন্ততঃ পাঁচ-ছয়বার আসা-যাওয়া করিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র একটিবারও আসিলেন না, একখানা চিঠি লিখিয়াও খোঁজ করিলেন না।

কিছুদিন হইতে ব্যাপারটার উপর সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং প্রায়ই আলোচনা হইতেছে। ছোট ভগিনীপতির ঘরে সকলের সম্মুখে পাছে এই কথাটাই উঠিয়া পড়ে, এই ভয়েই ইন্দু অসময়ে পলাইয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল।

স্বামী আসেন না। তাঁহার অবহেলায় বেদনা কত, সে ইন্দুর নিজের কথা—সে যাক। কিন্তু ইহাতে এত যে ভয়ানক লজ্জা, এ-কথা সে ত একদিনও কল্পনা করে নাই! ভ্রূণহত্যা, নরহত্যার মত এ যে কেবল লুকাইয়া ফিরিতে হয়! মরিয়া গেলেও যে কাহারো কাছে স্বীকার করা যায় না, স্বামী ভালবাসেন না।

এতদিন স্বামীর ঘরে স্বামীর পাশে বসিয়া তাঁহাকে টানিয়া পিটিয়া নিজের সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা বাড়াইয়া তুলিতেই সে অহরহ ব্যস্ত ছিল, কিন্তু এখন পরের ঘরে, চোখের আড়ালে সমস্তই যে ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে—কি করিয়া সে খাড়া করিয়া রাখিবে?

আজ ভগিনীপতি আসার পর হইতে যে-কেহ তাহার পানে চাহিয়াছে, তাহার মনে হইয়াছে, তাহাকে করুণা করিতেছে। কমলাকে কেহ তাহার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইন্দু মরমে মরিয়া যায়, বাড়ি ফিরিবার প্রশ্ন করিলে লজ্জায় মাটিতে মিশিতে চায়।

অথচ, আসিবার পূর্ব্বে স্বামীকে সে অনেকগুলো মর্ম্মান্তিক কথায় বলিয়া আসিয়াছিল, প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা হইলে যেন লইয়া আসে।

হঠাৎ ইন্দুর মোহের ঘোর কাটিয়া গেল—কমলা, কাঁদচিস্ কেন মা?

কমলা রুদ্ধস্বরে বলিল, বাবার জন্যে মন কেমন কচ্চে।

ইন্দুর বুকের উপর যেন হাতুড়ির ঘা পড়িল, সে মেয়েকে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বাহিরের প্রবল বারিবর্ষণ তাহার লজ্জা রক্ষা করিল—কন্যা ছাড়া এ কান্না আর কেহ শুনিতে পাইল না।

তাহার জননী শিখাইয়া দিলেন কি না জানি না, পরদিন সকাল হইতেই কমলা পিতার কাছে যাইবার জন্য বায়না ধরিয়া বসিল। প্রথমে ইন্দু অনেক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া, শেষে দাদাকে আসিয়া কহিল, কমলা কিছুতেই থামে না—কলকাতায় যেতে চায়।

দাদা বলিলেন, থামাবার দরকার কি বোন, কাল সকালেই তাকে নিয়ে যা। কেমন আছে নরেন? সে আমাকে ত চিঠিপত্র লেখে না, তোকে লেখে ত?

ইন্দু ঘাড় হেট করিয়া বলিল, হুঁ।

ভাল আছে ত?

ইন্দু তেমনি করিয়া জানাইল, আছেন।

বিমলা অবাক হইয়া গেল—কখন্ এলে বৌ ?

এই আসচি।

ভৃত্য গাড়ি হইতে ইন্দুর তোরঙ্গ নামাইয়া আনিল। বিমলা দারুণ বিরক্তি কোনমতে চাপিয়া কহিল, বাড়ি যাওনি ?

না। শুধু কমলাকে সুমুখ থেকে নামিয়ে দিয়ে এসেচি। শুধু তার জন্যেই আসা—নইলে আসতুম না।

বিমলা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না এলেই ভাল করতে বৌ। ওখানে তোমার আর গিয়েও কাজ নেই।

ইন্দুর বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল—কেন ঠাকুরঝি ?

বিমলা সহজ গম্ভীরভাবে কহিল, পরে শুনো। কাপড় ছাড়ো, মুখ-হাত ধোও—যা হবার সে ত হয়েই গেছে—এখন, আজ শুনলেও যা, দু'দিন পরে শুনলেও তাই।

ইন্দু বসিয়া পড়িল। তাহার সমস্ত মুখ নীলবর্ণ হইয়া গেল, বলিল, সে হবে না ঠাকুরঝি, না শুনে আমি একবিন্দু জলও মুখে দেব না। তাঁকে দেখতে পেয়েচি, তিনি বেঁচে আছেন—তবুও সেখানে আমার গিয়ে কাজ নেই কেন ?

বিমলা খানিক থামিয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সত্যিই ও-বাড়িতে তোমার জায়গা নেই। এখন তোমার পক্ষে এখানেও যা, বাপের বাড়িতেও তাই। ও-বাড়িতে তুমি থাকতে পারবে না।

ইন্দু কান্না চাপিয়া বলিয়া উঠিল, আমি আর সইতে পরিনে ঠাকুরঝি, কি হয়েচে খুলে বল। বিয়ে করেচেন ?

বিশ্বাস হয় ?

না। কিছুতেই না। আমার অপরাধ যত বড়ই হোক, কিন্তু তিনি অন্যায় কিছুতেই করতে পারেন না। তবুও কেন আমার তাঁর পাশে স্থান নেই, বলবে না ? বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ বাহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিমলার নিজের চক্ষুও আর্দ্র হইয়া উঠিল, কিন্তু অশ্রু ঝরিল না! বলিল, বৌ, আমি ভেবে পাইনে কি করে তোমাকে বোঝাব, সেখানে আর তোমার স্থান নেই! শম্ভুবাবু দাদাকে জেলে দিয়েছিল।

ইন্দুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—তার পরে ?

বিমলা বলিল, আমরা তখন কাশীতে। শম্ভুবাবু টাকা যোগাড় করবার দু'দিন সময় দেয়। কিন্তু চার হাজার টাকা যোগাড় হয়ে ওঠে না। ধরে নিয়ে যাবার পরে দাদা ভোলাকে আমার কাছে কাশীতে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু আমরা তখন এলাহাবাদে চলে যাই। সে ফিরে আসে, আবার যায়; ঐ-রকম করে দশ দিন দেরি হয়ে যায়। তার পরে আমি এসে পড়ি। আমার কাছেও নগদ টাকা ছিল

না, আমার গয়নাগুলো বাঁধা দিয়ে, এগার দিনের দিন দাদাকে বার করে নিয়ে আসি। তোমারও ত চার-পাঁচ হাজার টাকার গয়না আছে বৌ, মেদিনীপুরও দূর নয়। তোমাকে খবর দিতে পারলে, এসব কিছুই হতে পারত না। দাদা বরং দশ দিন জেল ভোগ করলেন, কিন্তু তোমার কাছে হাত পাতলেন না। আর তোমার তাঁর কাছে গিয়ে কি হবে? অনেক সুখই ত তাঁকে দিলে তুমি, এবার মুক্তি দাও—তিনিও বাঁচুন, তুমিও বাঁচো।

ইন্দু একমুহূর্ত্ত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একে একে গায়ের সমস্ত অলংকার খুলিয়া ফেলিয়া, বিমলার পায়ের কাছে ধরিয়া দিয়া বলিল, এই নিয়ে তোমার নিজের জিনিস উদ্ধার করে এনো ঠাকুরঝি—আমি তাঁর কাছেই চললাম। তুমি বলচ স্থান হবে না, কিন্তু আমি বলচি, এইবারেই আমার তাঁর পাশে যথার্থ স্থান হবে। যা এতদিন আমাকে আলাদা করে রেখেছিল, এখন তাই তোমার কাছে ফেলে দিয়ে, আমি নিজের স্থান নিতে চললুম। কাল একবার যেয়ো ভাই,—গিয়ে তোমার দাদা আর বৌদিকে দেখে এসো,—চললুম। বলিয়া ইন্দু গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

ওরে ভোলা, সঙ্গে যা, বলিয়া বিমলা চোখ মুছিয়া, পিছনে পিছনে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বোঝা

বোঝা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহ

সাগরপুরে আজ মহাধুম, রসুনচৌকি আর ঢাকের বাদ্যে গ্রাম সরগরম। সপ্তাহ ধরিয়া যে কি কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে, তাহা গ্রামের এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী চারি-পাঁচ ক্রোশের সকল লোক জানে। এ রাজসূয়-যজ্ঞে ঢাক-ঢোলের এমন মহান্ একত্র সমাবেশ, সানাই-দলের এমন আদর্শ ঐক্যভাব, কাংস্য-নির্ম্মিত বাদ্য-যন্ত্রের এমন প্রচণ্ড বিক্রম দেখা গিয়াছিল যে, গ্রামের লোক ইতিপূর্ব্বে এমন কাণ্ড কখনও আর দেখে নাই। রং-বেরং বাদ্য-যন্ত্রের সাহায্যে মনুষ্যশ্রেণীর যে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রামের পশুগুলা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষ গরু-বাছুরের দল, ঢাক-ঢোলের আত্মদ্রোহিতায় তাহাদের মর্ম্মপীড়ার আর সীমা নাই। এত সমারোহের কারণ, একটা নাবালক চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকের বিবাহ। সাগরপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত হরদেব মিত্রের একমাত্র পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়াই এমন কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। হরদেব মিত্র বেশ বড়লোক, প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ হাজার টাকা তাহার বাৎসরিক আয়। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার মিত্র, হেয়ার সাহেবের স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাশে সে পড়ে। অত অল্প বয়সে বিবাহের কারণ, একমাত্র সত্যেন্দ্রর মাতার বধূ-মুখ দেখিবার একান্ত সাধ।

বর্দ্ধমান জেলার দিলজানপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলার সহিত সত্যেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল।

রাঙ্গা বৌ! সত্যেন্দ্র মহাসুখী।

দশ বছরের টুকটুকে ছোট বউটির মুখ দেখিয়া সত্যেন্দ্রর জননী বিশেষ হৃষ্টচিত্ত হইলেন। বিবাহের পরবৎসরেই হরদেববাবু বধূ আনিলেন, কারণ গৃহিণীর এরূপ অভিসন্ধি ছিল না যে, বধূকে পিতৃগৃহে রাখিয়া দেন। তিনি প্রায় বলিতেন, বিবাহ হইলে মেয়েকে আর বাপের বাটীতে রাখিতে নাই; মতটা মন্দ নহে।

সত্যেন্দ্রের পাঠের সুবিধার জন্য হরদেববাবুকে সস্ত্রীক কলিকাতাতেই থাকিতে হইত, সরলা কলিকাতায় আসিল। অল্প-বয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া সরলা হরদেববাবুর সহিত কথা কহিত, এমন কি সত্যেন্দ্র উপস্থিত থাকিলেও সে শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর সহিত কথা বলিত, গৃহিণীর তাহাতে সুখ ভিন্ন অসুখ ছিল না।

কিছুদিন পরে কামাখ্যাবাবু সরলাকে একবার বাটী লইয়া গেলেন, তাহার দুই-এক মাস পরে সত্যেন্দ্র একদিন রাগ করিয়া বলিয়াছিল, বইগুলোতে ছাতা ধরেচে, দোয়াতের কালি শুকিয়ে গেছে, এমন একজন নেই যে এগুলো দেখে!

কথাটা মা বুঝিলেন, হরদেববাবুরও কানে গেল, তিনি হাসিয়া বৌ আনিতে পাঠাইলেন; লিখিলেন, আমার বাটীতে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে, মা ভিন্ন বোধ হয় থামিবে না। সুতরাং মাকে পাঠাইয়া দিবেন।

আবার সরলা আসিল। সত্যর ছোটখাট কাজগুলি সে-ই করিত। বইগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া সাজাইয়া রাখা, কলেজের কাপড়-জামাগুলি ঠিক করিয়া রাখা, অর্থাৎ তাড়াতাড়িতে দুই হাতে দুই রকমের বোতাম, কিংবা আহার করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, কলেজের এক ঘণ্টা যায় যায় সময়ে, এক পায় কার্পেটের অপর পায় বার্নিস-করা জুতা সে না পরিয়া ফেলে, ফর্সা জামার উপর রজক-ভবনে শুভাগমনের জন্য প্রস্তুত চাদরের জুলুম না হয়, এইসব কাজগুলা সরলাই দেখিত, সরলা না থাকিলে এ-সব গণ্ডগোল তাহার প্রায়ই ঘটিত। এমন অন্যমনস্ক লোক কেহ কখনও দেখে নাই। এ-সকল কাজ সরলা ভিন্ন অপর কাহারও দ্বারা হইতও না বটে, আর হইলেও সত্যেন্দ্রর পছন্দ হইত না বলিয়াও বটে, কাজগুলি সরলাই করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুশীলার ছেলের অন্নপ্রাশন

সুশীলা সরলার বড়দিদি। তাহার ছেলের ভাত। সুতরাং কামাখ্যাবাবু দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন-উপলক্ষ্যে সরলাকে বাটী লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন।

সরলার দিদি, সরলা ও সত্যেন্দ্রকে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছে। বিশেষ, সরলা প্রায় তিন বৎসর যাবৎ দিলজানপুরে যায় নাই। সত্যেন্দ্রও যখন যাইতে সম্মত হইল, তখন কামাখ্যাবাবু পরমানন্দে জামাতা-কন্যা লইয়া দেশে আসিলেন।

গৃহিণী বহুদিবসের পর তাহাদিগকে পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন। যাহার ছেলের ভাত; সে আসিয়া দুইজনকেই অনেক কথা শুনাইয়া দিল, অনেক রকমে আপ্যায়িত করিল।

বোঝা

শুভকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া যাইবার পর সত্যেন্দ্র বাটী যাইতে চাহিল, কিন্তু গৃহিণী তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিলেন, বলিলেন, এতদিন পরে এসেচ, আরও কিছুদিন থাকতে হবে।

সরলাও ছাড়িল না, সুতরাং আরও দুই-চারিদিন থাকিতে সত্যেন্দ্র সম্মত হইল। দুই-চারিদিন কাটিয়া গেল, তবু সরলা ছাড়িতে চাহে না। কিন্তু না যাইলেও নহে, পড়াশুনার বিশেষ ক্ষতি হয়; পরীক্ষারও অধিক বিলম্ব নাই। আসিবার সময় সরলা জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে আবার কবে নিয়ে যাবে?

সত্যেন্দ্র কহিল, যখন যাবে তখনই।

তা হলে আমাকে দশ-বারদিন পরেই নিয়ে যেও।

সত্যেন্দ্র অতিশয় আহ্লাদিত হইল। সে এতটা ভাবে নাই।

তখন অশ্রুজলের মধ্যে সরলা স্বামীকে বিদায় দিয়া হাসিয়া বলিল, দেখো, আমার জন্য যেন ভেবো না, আর রাত্রি পর্য্যন্ত পড়ে যেন অসুখ না হয়।

রাত্রি দশটার অধিক না পড়িবার জন্য সরলা বিশেষ করিয়া মাথার দিব্যি দিয়া দিল। কি একটা উদাস-পারা প্রাণ লইয়া সত্যেন্দ্র সেইদিন কলিকাতায় পৌঁছিল।

সত্যেন্দ্র একখানা পুস্তক লইয়া বসিয়াছিল। পুস্তকের পৃষ্ঠার সহিত মনের একটা বিষম দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিয়াছিল।

সত্যেন্দ্র গনিয়া দেখিল, সমস্তদিনে মোটে ছাব্বিশ লাইন পড়া হইয়াছে। দুঃখিতভাবে সে ভাবিল, বাঃ! এইরকম পড়লেই পাশ হব! ক্রমে দুঃখ ঈষৎ ক্রোধে পরিণত হইল। সে ভাবিল, সমস্ত পোড়ামুখী সরোর দোষ। এই পাঁচদিন এসেচি, একটুকুও পড়তে পারিনি। আগে মনে হ'তো পড়ার সময় বিরক্ত করে, দশটার বেশি পড়তে গেলেই আলো নিভিয়ে দেয়, একে কোথাও পাঠিয়ে দিলে ভাল করে পড়বো। ঠিক উল্টো! কালই তাকে আনতে যাবো, না হলে লজ্জার খাতিরে কি ফেল্ হবো?

যাহা হৌক, সত্যেন্দ্রনাথ এইরূপ একটা মতলব আঁটিতেছিল—কি করিয়া আনাই! কেমন করিয়াই বা বলি? লজ্জা করে। এত ভালই বা বাসিলাম কেমন করিয়া? দু'দিন—

একটা ভৃত্য আসিয়া একখানা টেলিগ্রাম হাতে দিল, সত্যেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইল, আর ভাবিবার সময় নাই; কোথাকার টেলিগ্রাম? কভার খুলিতে সত্যের হৃৎকম্প হইল। ভিতরে যাহা লেখা ছিল, তাহাতে মাথা একেবারে ঘুরিয়া গেল। সরলা পীড়িত।

সেইদিনই হরদেববাবু সত্যেন্দ্রকে লইয়া দিলজানপুর যাত্রা করিলেন।

বাটীর সম্মুখে কামাখ্যাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। হরদেববাবু চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা কেমন?

কামাখ্যাবাবু কহিলেন, আসুন, চলুন।

হরদেববাবু ভিতরে গিয়ে দেখিলেন, সরলা বিসূচিকা রোগে আক্রান্তা, একদিনে সরলাকে যেন আর চেনা যায় না। চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, পদ্মের মত মুখখানিতে কালিমা পড়িয়াছে। বিজ্ঞ হরদেববাবু বুঝিলেন অবস্থা ভাল নহে। চক্ষু মুছিয়া ডাকিলেন, মা সরলা।

সরলা চাহিয়া দেখিল। তখনও সরলার বেশ চৈতন্য আছে—কেমন আছ মা?

সরলা হাসিয়া বলিল, ভাল আছি ত!

দুইজনেই বুঝিল, এটা আপোষে মিটমাট হইয়া গেল। সকলে চলিয়া যাইলে সত্যেন্দ্র আসিয়া কাছে বসিল। দারুণ আতঙ্কে কথা বাহির হইল না। তখন জোর করিয়া নীরস ভাঙ্গা গলায় সত্যেন্দ্র ডাকিল, সরো।

শুষ্ক ভাঙ্গা গলা। ক্ষতি কি! সেই পরিচিত স্বর, সেই আদরের ডাক—সরো! এ কি ভুল হয়? সরলা চাহিল। সে হরদেববাবুকে দেখিয়া পূর্ব্বেই সত্যেন্দ্রের আগমন অনেকটা অনুমান করিয়াছিল। সরলা স্বামীকে তামাশা করিতে বড় ভালবাসিত, হাসিয়া বলিল, কি, নিতে এসেচ?

কথা বসিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ কোনমতে সত্যেন্দ্র চক্ষুর জল চাপা দিয়া রাখিয়াছিল, অবস্থা দেখিয়া বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

সত্যেন্দ্র জানিত, এ-সময়ে কাঁদিতে নাই। কিন্তু পোড়া চোখের জলের কি সে বিবেচনা আছে? বেশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছন্দে তাহারা একটির পর একটি করিয়া ফোঁটায় নামিতে আরম্ভ করিল। তাহারা যে সরলার অঙ্গে মিশিতেছে! এ অবকাশ তাহাদের কখনও হইয়াছে কি? কখনও হয় নাই। তোমার কিংবা সরলার খাতিরে তাহারা কি এ সুযোগ ছাড়িয়া দিবে? সরলা স্বামীকে কখনও কাঁদিতে দেখে নাই। সেও কাঁদিল। অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া সে বলিল, ছি, কাঁদ কেন? পুরুষমানুষের কি কাঁদতে আছে?

এ কি? বটে সরলা? বেশ বুঝিয়াছ। আন্তর্দ্দাহে তাহারা শুকাইয়া কাঠ হইয়া যাউক, একফোঁটা জল যেন না পড়ে। অশ্রু স্ত্রীলোকের জন্য। পুরুষের তাহাতে হাত দিবার অধিকার নাই। যন্ত্রণায় পুড়িয়া যাও কাঁদিতে পাইবে না। কাঁদিলে স্ত্রীলোক হইয়া যাইবে। সরলা! এ ব্যবস্থা কি তোমরাই করিয়াছ? সরলা স্বামীর হাত আপনার হাতে টিপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, পরজন্ম বিশ্বাস কর কি?

সত্যেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, করতাম কি-না জানি না, কিন্তু আজ হতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করব।

সরলার মুখে ঈষৎ হাসির চিহ্ন প্রকাশ পাইল। ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে দেখিয়া কামাখ্যাবাবু, হরদেববাবু এবং ডাক্তারবাবু কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার নাড়ী টিপিয়া বলিলেন, আশা বড় কম, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরদিন বেলা সাতটার সময় সরলার মৃত্যু হইল।

সন্ধ্যার সময় হরদেববাবু সত্যেন্দ্রকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আবার বিবাহ

কি যেন একটা হইয়া গিয়াছে। রাজশয্যায় শয়ন করিয়া ইন্দ্রত্বের সুখ কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতেছিলাম, টানিয়া কে যেন সুখের স্বপ্নটুকু ভাঙ্গিয়া দিয়াছে! অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া বসিয়াছি, ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আমার আজীবন সহচর সেই অর্দ্ধছিন্ন খট্টায় শুইয়া আছি—আমি কাঁদিব, না হাসিব? সুখের স্রোতে অনন্তে ভাসিয়া যাইতেছিলাম, হঠাৎ যেন একটা অজানা দলের পাশে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছি আর বুঝি কখনও ভাসিয়া যাইতে পাইব না। সব যেন উল্টাইয়া গিয়াছে। জীবনের কেন্দ্র পর্য্যন্ত কে টানিয়া পরিধির বাহিরে লইয়া গিয়াছে? কিছুই যেন আর ঠাহর হয় না। এ কি হইল? নিশীথে সত্যেন্দ্রনাথ জানলায় বসিয়া সাগরপুরের অন্ধকার দেখিতেছিল। গাছপালা কি একটা নিস্তব্ধভাবে সত্যেন্দ্রের সহিত বিনিময় করিতেছিল।

সোঁ সোঁ করিয়া নৈশ বাতাস বহিয়া গেল। কিছু বলিয়া গেল কি? বলিল বৈ কি! সেই এক কথা। সব জিনিসেই সে এক কথা বলিয়া বেড়ায়! হইয়াছে? পাপিয়া আর চোখ গেল বলে না, ঠিক যেন বলে মরে গেল। বৌ-কথা-কও পাখীও আর আপনার বোল বলে না। সেও বলে, বৌ মরে গেছে। সব জিনিস ঐ একই কথা বার বার কহিয়া বেড়ায় কেন? সোঁ সোঁ করিয়া নৈশ বাতাস যেন ঐ কথাই কহে—নেই, নেই, সে নেই!

কেমন আছ সত্য? মাথাটা কি বড় ধরিয়াছে বলিয়া বোধ হয়? সে ত আজ অনেকদিন হইল! একটু শোও না ভাই! চিরকাল কি একইভাবে ঐ জানালায় বসিয়া থাকিবে? সত্যেন্দ্র অন্ধকারে নক্ষত্র দেখিতেছিল। যেটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ, সেটিকে বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল।

চক্ষু মুদিতে সাহস হয় না—পাছে সেটি হারাইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত

হইলে সেইখানেই সে ঘুমাইয়া পড়ে। প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আবার সেটিকে দেখিবার চেষ্টা করে। আলো ভাল লাগে না। জ্যোৎস্নায় আর আমোদ হয় না। অত ক্ষীণালোকবিশিষ্ট নক্ষত্র কি আলোকে দেখা যায়! সত্যেন্দ্র এম. এ. পরীক্ষায় ফেল হইয়া গিয়াছে। পাশ হইবার ইচ্ছাও আর নাই। উৎসাহ নিবিয়া গিয়াছে, পাশ করিলে কি নক্ষত্র কাছে আসে? হরদেববাবু সপরিবারে দেশে চলিয়া আসিয়াছেন; সত্যেন্দ্র বলে, সে বাটী হইতেই ভাল পরীক্ষা দিতে পারিবে। সহরের অত গণ্ডগোলে ভাল পড়াশুনা হয় না। সত্যেন্দ্র এখন একরকমের লোক হইয়া গিয়াছে, মুখখানা দেখিলে বোধ হয় যেন বহুদিন কিছু খাইতে পায় নাই, যেন মস্ত পীড়া হইতে সম্প্রতি আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

দুপুরবেলা সত্য ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ফটোগ্রাফ ঝাড়িয়া ধূলা পরিষ্কার করে। নিজের পুরাতন পুস্তকগুলি সাজাইতে বসে; হারমোনিয়ামের ঝাঁপ খুলিয়া মিছামিছি পরিষ্কার করে। সরলার পরিষ্কৃত পুস্তকগুলি আরও পরিষ্কার করে; ভাল ভাল কাগজ খাম লইয়া সরলাকে পত্র লিখিয়া কি একটা শিরোনামা দিয়া নিজের বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখে। সত্যেন্দ্রনাথ! তুমি একা নও। অনেকের কপাল তোমারই মত অল্প বয়সে পুড়িয়া যায়। সকলেই কি তোমার মত পাগল হয়? সাবধান সত্য! সকলেরই একটা সীমা আছে। স্বর্গীয় ভালবাসারও একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি সীমা ছাড়াইয়া যাও কষ্ট পাইবে। কেহ রাখিতে পারিবে না।

সত্যেন্দ্রর জননী বড় বুদ্ধিমতী। তিনি একদিন স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, সত্য আমার কি হয়ে গেছে দেখচ?

কর্ত্তা বলিলেন, দেখচি ত—কিন্তু কি করি?

আবার বিবাহ দাও। ভাল বৌ হলে সত্য আবার হাসবে—আবার কথা কবে।

সেদিন সত্য আহার করিতে বসিলে জননী বলিলেন, আমার একটা কথা শুনবে?

কি?

তোমাকে আবার বিবাহ করতে হবে?

সত্য হাসিয়া কহিল, এই কথা! তা বুড়ো বয়সে আবার ও-সব কেন?

মা পূর্ব্ব হইতেই অশ্রু সঞ্চিত করিয়াছিলেন, সেগুলি এখন বিনা বাক্যব্যয়ে নামিতে আরম্ভ করিল। মা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, বাবা, এই একুশ বছরে কেউ বুড়ো হয় না, কিন্তু সরলার কথা মনে হলে এ-সব আর মুখে আনতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু আমি আর একা থাকতে পারি না।

পরদিন প্রাতে হরদেববাবু সত্যেন্দ্রকে ডাকিয়া ঐ কথাই বলিলেন। সত্যেন্দ্র কোন উত্তর দিল না। হরদেববাবু বুঝিলেন, মৌনভাব সম্মতির লক্ষণমাত্র।

সত্যেন্দ্র ঘরে আসিয়া সরলার ফটোর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, শুনচো সরো, আমার বিয়ে হবে। ফটোগ্রাফ কথা কহিতে পারে না। পারিলে কি বলিত? বেশ ত, বলিত কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নলিনী

সত্যেন্দ্রর এবার কলিকাতায় বিবাহ হইল। শুভদৃষ্টির সময় সত্যেন্দ্র দেখিল মুখখানি বড় সুন্দর। হউক সুন্দর, তথাপি ভাবিল তাহার মাথায় একটা বোঝা চাপিল।

বিবাহের পর দুই বৎসর নলিনী পিতৃগৃহে রহিল। তৃতীয় বৎসরে সে শ্বশুরভবনে আসিয়াছে, গৃহিণী নূতন বধূর চাঁদপানা মুখ দেখিয়া আবার সরলাকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন, আবার সংসার পাতিবার চেষ্টা করিলেন।

রাত্রে যখন দুইজনে পাশাপাশি শুইয়া থাকে, তখন কেহই কাহারও সহিত কথা কহে না।

নলিনী ভাবে, কেন এত অযত্ন?

সত্য ভাবে, এ কোথাকার কে যে আমার সরোর জায়গায় শুইয়া থাকে?

নূতন বধূ লজ্জায় স্বামীর সহিত কথা কহিতে পারে না—সত্যেন্দ্র ভাবে, কথা কহে না ভালই।

একদিন রাত্রে সত্যেন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইলে সে দেখিল, শয্যায় কেহ নাই। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, কে একজন জানালায় বসিয়া আছে। জানালা খোলা। খোলা পথে জ্যোৎস্নালোক প্রবেশ করিয়াছে, সেই আলোকে সত্যেন্দ্র নলিনীর মুখের কিয়দংশ দেখিতে পাইল, ঘুমের ঘোরে জ্যোৎস্নার আলোকে মুখখানি বড় সুন্দর দেখিল।

কান পাতিয়া সে শুনিল, নলিনী কাঁদিতেছে।

সত্য ডাকিল, নলিনী—

নলিনী চমকিয়া উঠিল। স্বামী আহ্বান করিয়াছেন! অন্য মেয়ে কি করিত জানি না, কিন্তু নলিনী ধীরে ধীরে আসিয়া নিকটে বসিল।

সত্যেন্দ্র বলিল, কাঁদচ কেন ?—কাঁদচ কেন ?

অশ্রুবেগ দ্বিগুণ মাত্রায় বহিতে লাগিল, তাহার ষোল বৎসর বয়সে স্বামীর এই আদরের কথা !

অনেকক্ষণ চাপিয়া চাপিয়া কাঁদিয়া চোখ মুছিয়া ধীরে ধীরে সে বলিল, তুমি আমাকে দেখতে পার না কেন ?

কি জানি কেন। সত্যেরও বড় কান্না আসিতেছিল। তাহা রোধ করিয়া সে বলিল, দেখতে পারি না তোমাকে কে বললে ? তবে যত্ন করতে পারি না।

নলিনী নিরুত্তরে সকল কথা শুনিতে লাগিল।

সত্যেন্দ্র কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, ভেবেছিলাম এ-কথা কাকেও বলব না, কিন্তু না বলেও কোনও লাভ নাই, তোমাকে কিছু গোপন করব না। সকল কথা খুলে বললে বুঝতে, আমি এমন কেন। আমি এখনও সরলাকে—আমার পূর্ব্ব স্ত্রীকে ভুলতে পারিনি। ভুলব, এমন ভরসাও করি না, ইচ্ছাও করি না। তুমি হত-ভাগ্যের হাতে পড়েচ—তোমাকে কখনও সুখী করতে পারব, এ আশা মনে হয় না। নিজের ইচ্ছায় তোমাকে বিবাহ করিনি—নিজের ইচ্ছায় তোমাকে ভালবাসতে পারব না।

গভীর নিশীথে দুইজনে অনেকক্ষণ এইভাবে বসিয়া রহিল। সত্যেন্দ্র বুঝিতে পারিল, নলিনী কাঁদিতেছে। সে কাঁদিয়াছিল কি ? একে একে সরলার কথা মনে পড়িতে লাগিল, ধীরে ধীরে সেই মুখখানি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল—সেই "নিতে এসেচ ?" মনে পাড়ল। অনাহূত অশ্রু সত্যেন্দ্রর নয়ন রোধ করিল, তাহার পর গণ্ড বাহিয়া ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িল।

চক্ষু মুছিয়া সত্যেন্দ্র ধীরে ধীরে নলিনীর হাত দুটি আপনার হাতে লইয়া বলিল, কেঁদো না নলিনী, আমার হাত কি ? নিশি-দিন অন্তরে আমি কি যন্ত্রণাই যে ভোগ করি তা কেউ জানে না। মনে বড় কষ্ট। এ কষ্ট যদি কখনও যায়, তা হলে হয়ত তোমাকে ভালবাসতে পারবো, হয়ত তোমাকে আবার যত্ন করতে পারব।

এই বিষাদপূর্ণ স্নেহমাখা কথার মূল্য কয়জন বুঝে। নলিনী বড় বুদ্ধিমতী, সে স্বামীর কষ্ট বুঝিল। স্বামী তাহাকে ভালবাসেন না, এ-কথা সে তাঁহার মুখে শুনিল, তথাপি তাহার অভিমান হইল না। বোকা মেয়ে। ষোল বৎসরে যদি অভিমান করিবে না তবে করিবে কবে ? কিন্তু নলিনী ভাবিল, অভিমান আগে, না স্বামী আগে ?

সেই দিন হইতে কি করিলে স্বামীর কষ্ট যায়, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। কি করিলে স্বামী সতীনকে ভুলিতে পারেন, এ-কথা সে একবারও ভাবিল না। ব্যথার যদি কেহ ব্যথী হয়, কষ্টতে যদি কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করে,

দুঃখের কথা যদি কেহ আগ্রহ করিয়া শ্রবণ করে, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার ন্যায় বন্ধু এ-জগতে আর নাই। ইহার পর সত্যেন্দ্র নলিনীকে প্রায়ই পূর্ব্বের কথা জানাইত। কত নিশা দুইজনের সেই একই কথায় অবসান হইত। সত্যেন্দ্র যে কেবল বলিত তাহা নহে, নলিনী আগ্রহের সহিত স্বামীর পূর্ব্ব-ভালবাসার কথা শুনিতে ভালও বাসিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুই বৎসর পরে

দুই বৎসর গত হইয়াছে, নলিনীর বয়স এখন আঠার বৎসর, তাহার আর পূর্ব্বের মত কষ্ট নাই। স্বামী এখন আর তাহাকে অযত্ন করেন না। স্বামীর ভালবাসা জোর করিয়া সে লইয়াছে। যে জোর করিয়া কিছু লইতে জানে, সে তাহা রাখিতেও জানে, তাহার এখন আর কোন কষ্টই নাই। সত্যেন্দ্রনাথ এখন পাবনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। স্ত্রীর যত্নে, স্ত্রীর ঐকান্তিক ভালবাসায় তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কাছারির কর্ম্মের অবকাশে সে এখন নলিনীর সহিত গল্প করে, উপহাস করে, গান-বাজনা করিয়া আমোদ পায়। এক কথায়, সত্যেন্দ্র অনেকটা মানুষ হইয়াছে! মানুষ যেটা পায় না, সেইটাই তাহার অত্যন্ত প্রিয় সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। মনুষ্য-চরিত্রই এমনি। তুমি অশান্তিতে আছ, শান্তি খুঁজিয়া বেড়াও—আমি শান্তিভোগ করিতেছি, তবুও কোথা হইতে যেন অশান্তিকে টানিয়া বাহির করি!

ছল ধরা যেন মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ভাব। যে মাছটা পলাইয়া যায়, সেইটাই কি ছাই বড় হয়! সত্যেন্দ্রনাথও মানুষ। মানুষের স্বভাব কোথায় যাইবে? এত ভালবাসা, যত্ন ও শান্তির মধ্যে তাহার হৃদয়ে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত অশান্তি জাগিয়া উঠে। নিমিষের মধ্যে মনের মাঝে বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার মত যে বিপ্লব বাধিয়া যায়, তাহা সামলাইয়া লইতে নলিনীর অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। মাঝে মাঝে তাহার মনে হয়, বুঝি আর সে সামলাইতে পারিবে না। এতদিনের চেষ্টা, যত্ন, অধ্যবসায় সমস্তই বুঝি বিফল হইয়া যাইবে। নলিনীর এতটুকু ত্রুটি দেখিলে, সত্যেন্দ্র ভাবে সরলা থাকিলে বোধ হয় এমনটি হইত না। হইত কি না ভগবান জানেন, হয়ত হইত না, হয়ত ইহা অপেক্ষা চতুর্গুণ হইত। কিন্তু তাহাতে কি? সে মৎস্য যে পলাইয়া গিয়াছে! সত্যেন্দ্র এখনও সরলাকে ভুলিতে পারে নাই। কাছারি হইতে আসিয়া যদি নলিনীকে সে না দেখিতে পায়, অমনি মনে করে, কিসে আর কিসে!

নলিনী বড় বুদ্ধিমতী, সে সর্ব্বদা স্বামীর নিকটে থাকে, কারণ সে জানিত, এখনও তিনি সরলাকে ভুলেন নাই। একেবারে ভুলিয়া যান, এ ইচ্ছা নলিনীর কখনও মনে হয় না; তবে অনর্থক মনে করিয়া কষ্ট না পান, এইজন্যই সে সর্ব্বদা কাছে থাকিত, যত্ন করিত। নাই ভুলুন, কিন্তু তাহাকে ত অযত্ন করেন না—ইহাই নলিনীর ঢের।

গোপীকান্ত রায় পাবনার একজন সম্ভ্রান্ত উকিল। কলিকাতায় তাঁহার বাটী নলিনীদের বাটীর কাছে। কি একটা সম্বন্ধ থাকায় নলিনী তাঁহাকে কাকা বলিয়া ডাকে। রায়-খুড়িমা প্রায় প্রত্যহই সত্যেন্দ্রর বাটী বেড়াইতে আসেন। গোপীবাবুও প্রায় আসেন। গ্রাম-সম্পর্কে খুড়শ্বশুরকে সত্যেন্দ্রনাথ অতিশয় মান্য করে। সত্যেন্দ্রের বাসা তাঁহার বাটী হইতে দূরে হইলেও উভয় পরিবারে বেশ মেলামেশি হইয়া গিয়াছে।

নলিনীও মধ্যে মধ্যে কাকার বাড়ি বেড়াইতে যায়; কারণ, একে কাকার বাড়ি তাহাতে গোপীবাবুর কন্যা হেমার সহিত তাহার বড় ভাব; বাল্যকালের সখী, কেহ কাহাকেও ছাড়িতে চাহে না। সেদিন তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্র কাছারি চলিয়া গিয়াছে, কোন কর্ম্ম নাই দেখিয়া নলিনী ছবি আঁকিতে বসিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ গড় গড় করিয়া একখানা গাড়ি ডেপুটিবাবুর বাড়ির সম্মুখে আসিয়া লাগিল।

কে আসিল? হেম বুঝি? আর ভাবিতে হইল না। বিষম কোলাহল করিতে করিতে হেমাঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। হেমা আসিয়া একেবারে নলিনীর চুল ধরিল, কহিল, আর লেখা-পড়ার দরকার নেই, ওঠ, আমাদের বাড়ি চল, কাল দাদার বৌ এসেচে।

নলিনী কহিল, বৌ এসেচে, সঙ্গে আনলে না কেন?

হেম কহিল, তা কি হয়? নূতন এসেচে, হঠাৎ তোর এখানে আসবে কেন?

নলিনী কহিল, আমিই তবে যাবো কেন?

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিল, তোর ঘাড় যাবে, এই আমি টেনে নিয়ে যাচ্ছি।

চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইলে, নলিনী কেন অনেককেই যাইতে হইত। নলিনীকেও যাইতে হইল।

যাইতে নলিনীর বিশেষ আপত্তি ছিল, কারণ তাহাদের বাটী যাইলে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইত। দুই-একদিন নলিনীর বাটী ফিরিবার পূর্ব্বেই সত্যেন্দ্রনাথ কাছারি হইতে ফিরিয়াছিলেন। সেরূপ অবস্থায় সত্যেন্দ্রর বড় অসুবিধা হইত। তিনি কিছু মনে করুন আর নাই করুন, নলিনীর বড় লজ্জা করিত; কারণ সে জানিত, কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার হাতের বাতাস না খাইলে স্বামীর

গরম ছুটিত না। বিধাতার ইচ্ছা—বহু চেষ্টায় আজও নলিনী সাতটার পূর্ব্বে ফিরিতে পারিল না। আসিয়া সে দেখিল, সত্যেন্দ্র সংবাদপত্র পাঠ করিতেছে, তখনও কিছু আহার করে নাই। খাওয়াইবার ভার নলিনী আপন হস্তেই রাখিয়াছিল। কাছে আসিলে সত্যেন্দ্র হাসিল, কিন্তু সে হাসি নলিনীর ভাল বোধ হইল না। সে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। আসন পাতিয়া নলিনী জলখাবার খাওয়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সত্যেন্দ্র কিছু স্পর্শ করিল না। ক্ষুধা একেবারেই নাই। বহু সাধ্যসাধনাতেও সে কিছু খাইল না। নলিনী বুঝিল, এ অভিমান কেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কপাল ভাঙ্গিয়াছে কি?

আজ হেমাঙ্গিনী শ্বশুরবাড়ি যাইবে। তাহার স্বামী উপেন্দ্রবাবু তাহাকে লইতে আসিয়াছেন। নলিনী বহু দিবস হেমার সহিত দেখা করিতে যায় নাই। তাই আজ হেমা অনেক দুঃখ করিয়া তাহাকে যাইতে লিখিয়াছে।

নলিনী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, স্বামীর অনুমতি বিনা সে আর কোথাও যাইবে না; কিন্তু আজ সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে গেলে প্রিয়-সখীর সহিত আর দেখা হয় না। নলিনী বড় বিপদে পড়িল। হেমা লিখিয়াছে, তাহারা তিনটের ট্রেনে রওনা হইবে। তাহা হইলে স্বামীর অনুমতি লওয়া কি করিয়া হয়? বহু কু-তর্কের পর নলিনী যাওয়াই স্থির করিল। যাইবার সময় দাসীকে সে বলিয়া দিল, যেন ঠিক তিনটের সময় রায়েদের বাড়িতে গাড়ি পাঠান হয়। গাড়ি পাঠানও হইয়াছিল, কিন্তু হেমার তিনটার ট্রেনে যাওয়া হইল না। সুতরাং সে নলিনীকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিল না। অনেক জিদ করিয়াও সে হেমার হাত এড়াইতে পারিল না। হেমা আজ অনেক দিনের জন্য চলিয়া যাইতেছে। কতকাল আর দেখা হইবে না—সহজে কে ছাড়িয়া দেয়?

বাটী ফিরিতে বিলম্ব হইলে স্বামী রাগ করিবেন, এ-কথা বলিতে নলিনীর লজ্জা হইতেছিল—সহজে এ-কথা কে বলিতে চাহে? এ হীনতা কে স্বীকার করে? বিশেষ এই বয়সে? অবশেষে সে-কথাও সে বলিল, কিন্তু হেমা তাহা বিশ্বাস করিল না। সে হাসিয়া বলিল, বোকা বুঝিও না। রাগারাগির ব্যাপার আমি ঢের বুঝি। উপেনবাবুও অনেক রাগ করতে জানেন।

কথাটা হেমা হাসিয়া উড়াইয়া দিল, কিন্তু নলিনী মর্ম্মে পীড়া পাইল। সকলের স্বামী কি এক ছাঁচে গড়া? সকলেই কি উপেনবাবুর মত?

নলিনী যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। আসিয়া সে শুনিল, বাবু বাহিরে শয়ন করিয়াছেন।

মাতঙ্গিনী ওরফে মাতু, নলিনীর বাপের বাড়ির ঝি, সে নলিনীর সহিত আসিয়াছিল। অনেকদিনের লোক, বিশেষ সে নলিনীকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। তাই সে নলিনীকে আজ বিলক্ষণ দশ কথা জানাইয়া দিল। বাটীর মধ্যে সে-ই কেবল জানিত, সত্যবাবু বিলক্ষণ রাগ করিয়াই বাহিরে শয্যা রচনা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

গভীর রাত্রে যখন শয্যায় শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল, যখন সেই বহুদিনগত প্রফুল্ল-কমলসদৃশ সরলার মুখের সহিত নলিনীর মুখের ঈষৎ সাদৃশ্য আছে কিনা বিবেচনা করিতেছিল, যখন সরলার ভালবাসার নিকট নলিনীর ভালবাসা, সাগরের নিকট গোষ্পদের জল ধারণা করিবার জন্য মনের মধ্যে বিষম ঝটিকার উৎপত্তি করিতেছিল, তখন ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া নলিনী সে গৃহে প্রবেশ করিল। সত্যেন্দ্র চাহিয়া দেখিল নলিনী। নলিনী আসিয়া সত্যেন্দ্রর পদতলে বসিল। সত্যেন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিল। বহুক্ষণ এইভাবেই কাটিয়া গেল দেখিয়া সত্যেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইল, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া পরুষভাবে স্পষ্ট-স্বরে কহিল, তুমি এখানে কেন?

নলিনী কাঁদিতেছিল, কথা কহিতে পারিল না। কান্না দেখিয়া ডেপুটিবাবু আর একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিল, রাত হয়েচে, যাও, ভিতরে গিয়ে শোও গে।

নলিনী কাঁদিতেছিল; এবার চক্ষের জল মুছিয়া সে বলিল, তুমি শোবে চল।

সত্য ঘাড় নাড়িল, বলিল, আমার ঘুম পেয়েচে, আর উঠতে পারব না।

কাঁদিলে সত্যেন্দ্র বিরক্ত হয়। নলিনী চক্ষের জল মুছিয়াছে; স্বামীর কাছে আর সে কাঁদিবে না। ধীরে ধীরে পায়ের উপর হাত রাখিয়া নলিনী বলিল, এবার আমাকে ক্ষমা কর। এখানে তোমার বড় কষ্ট হবে, ভিতরে চল।

সত্যেন্দ্র আর ভিতরে যাইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সে বলিল, কষ্টের কথা এত রাত্রে আর ভেবে কাজ নেই; তুমি শোও গে, আমিও ঘুমাই।

নলিনী সত্যেন্দ্রকে চিনিত। সমস্ত রাত্রি সে আপনার ঘরে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাইল। বলি, ও হেমাঙ্গিনী, একবার দেখিয়া গেলে না? রাগারাগির ব্যাপার তুমি বোঝ ভাল—একবার মিটাইয়া দিবে না কি? পরদিনও সত্যেন্দ্র বাটীর ভিতর আসিল না, বা নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিল না।

নলিনীর একখানা পত্র মাতু সত্যেন্দ্রের হাতে দিয়াছিল। সেখানা না পড়িয়াই মাতঙ্গিনীর সম্মুখে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, এ-সব আর এনো না।

চারি-পাঁচদিন পরে একদিন নলিনীর বড় দাদা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রবাবু পাবনায়

আসিয়া পৌঁছিলেন। হঠাৎ দাদাকে দেখিয়া নলিনী অতিশয় সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু ততোধিক বিস্মিত হইল।

দাদা যে?

নরেন্দ্রবাবু নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, বাড়ি যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েচিস্ কেন বোন?

ব্যস্ত! কথাটার অর্থ নলিনী তখনই বুঝিয়া ফেলিল। সে হাসিয়া বলিল, তোমাদের যে অনেকদিন দেখিনি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভাঙ্গিয়াছে

যেদিন স্বামীর চরণে প্রণিপাত করিয়া নলিনী দাদার সহিত গাড়িতে উঠিল, সে রাত্রে সত্যেন্দ্রনাথ একটুকুও ঘুমাইতে পারিল না। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সত্যেন্দ্র ভাবিতেছিল, এতটা না করিলেও চলিতে পারিত। অনেকবার সত্যর মনে হইয়াছিল, এখনও সময় আছে, এ-সময়ও গাড়ি ফিরাইয়া আনি। কিন্তু হায় রে অভিমান! তাহারই জন্য নলিনীকে ফিরাইয়া আনা হইল না।

যাইবার সময় মাতুও সঙ্গে গিয়াছিল। সে-ই কেবল যাইবার যথার্থ কারণ জানিত। নলিনী মাতুকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিল, যেন সে বাটীতে কোন কথা না বলে। নলিনী মনে করিল, এ-কথা প্রকাশ করিলে স্বামীর অপযশ করা হইবে। ভাল হউক আর মন্দ হউক, তাহার স্বামীকে লোকে মন্দ বলিবার কে?

পিতৃ-গৃহে যাইয়া নলিনী পিতামাতার চরণে প্রণাম করিল, ছোট ভাইটিকে কোলে লইল, শুধু সে হাসিতে পারিল না।

মা বলিলেন, নলিনী আমার একদিনের গাড়ির পরিশ্রমে একেবারে শুকিয়ে গেছে। কিন্তু সে শুষ্ক মুখ আর প্রফুল্ল হইল না।

পৃথিবীতে প্রায়ই দেখা যায়, একটা সামান্য কারণ হইতে গুরুতর অনিষ্টের উৎপত্তি হয়। শূর্পনখার ঈষৎ চিত্তচাঞ্চল্যই স্বর্ণ-লঙ্কা ধ্বংসের হেতু হইয়াছিল। অকিঞ্চিৎকর রূপলালসার জন্য শুধু ট্রয় নগর ধ্বংস হইয়া গেল। মহানুভব রাজা হরিশ্চন্দ্র অতি সামান্য কারণেই অমন বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন; জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এখানেও একটা সামান্য অভিমানে বিষম বিপত্তি ঘটিয়া উঠিল। সত্যেন্দ্রনাথের দোষ দেব কি।

নলিনী কখনো অভিমান করে নাই, স্বামীর কষ্টের কথা মনে করিয়া সে নীরবে সমস্ত সহ্য করিত—আর পারিল না। সে ভাবিল, এই ক্ষুদ্র কারণে যে স্বামী-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, সে মরে না কেন ?

দারুণ অভিমানে নলিনী শুকাইতে লাগিল ; ওদিকে সত্যেন্দ্রর অভিমান ফুরাইয়া গিয়াছে ; একদণ্ড না থাকিলে যাহার চলে না, তাহার এই মিছা অভিমান কতদিন থাকে ? অভিমান দারুণ কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সত্যেন্দ্র প্রত্যহ চাহিয়া থাকে—আজ হয়ত নলিনীর পত্র আসিবে, হয়ত সে লিখিবে, আমায় লইয়া যাও ; সত্যেন্দ্র ভাবে, তাহা হইলে মাথায় করিয়া লইয়া আসিব, আর কখনও এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিব না। কিন্তু ভবিতব্য কে অতিক্রম করিবে ? যাহা হইবার তাহা হইবেই। তুমি আমি ক্ষুদ্র প্রাণী মাত্র, আজ কাল করিয়া ছয় মাস কাটিয়া গেল, হতভাগিনী কোন কথা লিখিল না। পাপিষ্ঠ সত্যেন্দ্রনাথ ভাঙ্গিল, কিন্তু মচকাইল না। ছয় মাস কাটিয়া গেল। ক্রমশঃ সত্যেন্দ্রনাথের অসহ্য হইল। লুপ্ত অভিমান আবার দৃপ্ত হইয়া উঠিল, ক্রোধ আসিয়া তাহাতে যোগ দিল। হিতাহিত রহিত সত্যেন্দ্রনাথ নিজের দোষ দেখিল না, ভাবিল, যাহার অহঙ্কার এত তাহার প্রতিশোধও তদ্রূপ প্রয়োজন।

কেহই নিজের দোষ দেখিল না। সেই অর্দ্ধমিলিত হৃদয় দুইটি আবার চিরকালের জন্য বিভিন্ন হইয়া চলিল। যৌবনের প্রারম্ভে সঙ্কুচিতা লতাকে টানিয়া বাড়াইয়াছিল কিন্তু আর সহে না, এবার ছিঁড়িবার উপক্রম হইল।

সত্যেন্দ্রনাথ! তোমার দোষ দিই না, তাহারও দিই না। দুইজনেই ভুল করিয়াছ, দোষ কর নাই। ভুল দেখাইতে পারিলে আত্মগ্লানি কাহার যে অধিক হইত, তাহা ভগবানেই জানেন। আমরাও বুঝিতে পারিতাম না, তোমরাও পারিতে না। বুঝিতে পারি না—কি আকাঙ্খায়, কি সাধ পূর্ণ করিতে তোমরা এতটা করিলে!

সাধ মিটে না ; মিটাইবার ইচ্ছাও নাই। কি সাধ তাহাও হয়ত ভাল বুঝিতে পারি না। তথাপি কাতর হৃদয় কি একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় সকল সময়ই হা হা করিয়া উঠে। কি যে হয়, কেন যে অদৃশ্য গতি ঐ লক্ষ্যহীন প্রান্তে পরিচালিত হয়, কিছুতেই তাহা নির্ণয় করা যায় না।

যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিবে। ইচ্ছা হইলেও মনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়াও তোমাকে অপরাধ হইতে অব্যাহতি দিব। দিব কি ?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফুলশয্যা

অমন রূপে-গুণে বৌ, পুত্রের পছন্দ হয় না! গৃহিণীর বড় দুঃখ। অমন চাঁদপানা বৌ লইয়া ঘর করিতে পারিলেন না ভাবিয়া গৃহিণী অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া আছেন। জননীর শত চেষ্টাতেও পুত্রের মত ফিরিল না। এখন আর উপায় কি? ছেলের যদি পছন্দ হইল না, তখন কিসের বৌ? ছেলের আদরেই ত বৌয়ের আদর! আর আমারই বা হাত কি? নিজে দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিলে আমি কি আটকাইতে পারি? ইত্যাদি মৃদু বচন আওড়াইতে আওড়াইতে অভ্যাসানুসারে গৃহিণী বরণডালা সাজাইতে বসিলেন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে হরদেববাবুর মৃত্যু হইয়াছিল। সে-কথা স্মরণ হইল--চক্ষে জল আসিল, আবার নলিনীর কথা মনে পড়িলে—জলবেগ আরও বর্দ্ধিত হইল। কি জানি, কেমন বৌ আসিবে? কর্ত্তা বাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় পোড়াকপালির এ দুরবস্থা দেখিতে হইত না।

সত্যেন্দ্র বিবাহ করিয়া আসিল। মা বৌ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। আবার পোড়া চোখে জল আসিল। জল মুছিতে মুছিতে তিনি বলিলেন, চোখে কি পড়েচে, কেবল জল আসছে। গিরিবালা বড় মুখফোড় মেয়ে—বিশেষ নলিনীর সহিত তাহার বেহান পাতানো ছিল, সে বলিয়া ফেলিল, এই বয়সে তিনবার, আরও কতবার চোখে কি পড়বে কে জানে!

কথাটা গৃহিণী শুনিলেন, সত্যরও কানে গেল। কাল সাধের ফুলশয্যা।

কোথা হইতে একটা ভারি জমকালো রকম তত্ত্ব আসিয়াছে। বর-কনের ঢাকাই শাড়ি, ধুতি, চাদর ইত্যাদি বড় সুন্দর রকমের। কনের বারাণসী চেলিখানির মত সুন্দর চেলি গ্রামে ইতিপূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছে, কোথাকার তত্ত্ব? মা এক-একবার ঢোক গিলিয়া বলিতেছেন, সত্যর কে একজন বন্ধু পাঠিয়েচে।

গৃহিণী চোখের জল চাপিয়া, যথার্থ সংবাদ চাপিয়া হাসি কান্না-মিশ্রিত মুখে তত্ত্বের মিষ্টান্নাদি বণ্টন করিলেন।

সকলে যে যাহার ভাগ লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় রাজবালা বলিল, বেশ তত্ত্ব করেচে। নৃত্যকালী বলিল, তা আর হবে না? বড়লোক তত্ত্ব পাঠালে এমনই পাঠায়। ক্রমশঃ এ-কথা চাপা পড়িল। তখন যোগমায়া বলিল, আচ্ছা, আবার বিয়ে করলে কেন? জ্ঞানদা কহিল, কি জানি বোন, এমন রূপে-গুণে বৌ। কে জানে, ও-সব বোঝা যায় না।

রামমণি জাতিতে নাপিতের কন্যা; তবে অবস্থা ভাল, দেখিতেও মন্দ নহে, এই নাকটি সামান্য চাপা মাত্র। কোন কোন পরশ্রীকাতর লোক তাহার চোখের দোষ দিত, বলিত, হাতীর চোখের চেয়েও ছোট।

যাক, এ নিন্দাবাদে আমাদের প্রয়োজন নাই। রামমণি একটু হাসিয়া বলিল, তোমাদের ঘটে যদি বুদ্ধি থাকত তা হলে কি আর ও-কথা বল? ছুঁড়ি সদাসর্ব্বদা যে ফিক্ ফিক্ করে হেসে কথা বলত, তাতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, স্বভাব-চরিত্র মন্দ লো, স্বভাব-চরিত্র মন্দ। না হলে চাকরী-স্থান থেকে তাড়িয়ে দেয়? আবার বে করে? মুখে কিছু না বলিলেও কথাটা অনেকের মতের সহিত মিলিল।

ইহার দুই-একদিন পরে, গ্রামের প্রায় সকলেই জানিল যে, রামমণি জমিদারের বাটীর গূঢ় রহস্য ভেদ করিয়াচে। নাপিতের মেয়ে না হইলে এত বুদ্ধি কি বামন-কায়েতের মেয়ের হয়? কথাটা অনেকেই স্বীকার করিল।

এবার গৃহিণীর পালা। এ-কথা যখন তাঁহার কানে গেল, তিনি ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া একেবারে ভূমে লুটাইয়া পড়িলেন। আমার নলিনী কুলটা! কি জানি কেন গৃহিণী সরলা অপেক্ষা নলিনীকে ভালবাসিয়াছিলেন। জন্মের মত সেই নলিনীর কপাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গৃহিণী মনে মনে ভাবিলেন, সত্য হয় ভালই— না হয় আমি নলিনীকে লইয়া কাশীবাসী হইব। পোড়াকপালির এ-জন্মের মত সব সাধই ত মিটিয়াছে।

তখন তিনি দ্বার খুলিয়া মাতুকে ডাকিয়া আনিয়া আবার দ্বার বন্ধ করিলেন। মাতুই তত্ত্ব লইয়া আসিয়াছিল।

দুইজনের চক্ষুজলের বহু বিনিময় হইল। কেমন করিয়া নলিনীর সোনার বর্ণ কালি হইয়াছে, কি অপরাধে সত্যেন্দ্র তাহাকে পায়ে ঠেলিয়াছে, কত কাতর বচনে সে ঠাকুরাণীকে প্রণাম জানাইয়াছে, ইত্যাদি বিবরণ মাতঙ্গিনী বেশ করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে গৃহিণীকে শুনাইল। শুনিতে শুনিতে গৃহিণীর পূর্ব্ব-স্নেহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, পুত্রের উপর দারুণ অভিমান জন্মিল। মনে মনে তিনি ভাবিলেন, আমি কি সত্যর কেউ নহি? সকল কথাই কি আমার উপেক্ষার যোগ্য? আমার কি একটা কথাও থাকিবে না? আমি আবার নলিনীকে গৃহে আনিব। অমন লক্ষ্মীর কি এ দশা করিতে আছে?

সেইদিন সন্ধ্যার সময় জননী পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, নলিনীকে নিয়ে এসো।

পুত্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

জননী কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, ওরে আমার নলিনীর নামে গ্রামময় কলঙ্ক রটচে যে, তুই তার স্বামী—তার মান রাখবিনি?

কিসের কলঙ্ক?

অমন করে তাড়িয়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে করলে আমি কার মুখ বন্ধ করব?

মুখ বন্ধ করে কি হবে?

তবু আনবিনি?

না।

জননী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইলেন, কিরূপ ক্রুদ্ধা হইতে হইবে এবং তখন কি কথা বলিতে হইবে, তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং কিছু ভাবিতে হইল না, বলিলেন, তবে কালই আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও। আমি এখানে একদণ্ড আর থাকতে চাই না।

সত্য আর সে সত্য নাই। সরলার আদরের ধন, ক্রীড়ার দ্রব্য, সখের জিনিস—অন্যমনস্ক, উচ্চমনা, সরল-হৃদয় প্রফুল্লবদন স্বামী, নলিনীর বড় যত্নের, বড় ক্লেশের, মনের মত সত্যেন্দ্রনাথ আর নাই। সেও বুকে পাষাণ চাপাইয়াছে, লজ্জা-সরম হিতাহিত জ্ঞান সকলই হারাইয়াছে—সে অনায়াসে বলিল, তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় যাও। আমি আর কাকেও আনতে পারবো না।

সত্যর মুখে এ-সব কথা শুনিবেন, মা তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই—কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় একবার বলিলেন, বৌ আমার কুলটা নয় তা বেশ জেনো। গ্রামের লোকে যা ইচ্ছা হয় বলে, কিন্তু আমি কখনও তা বিশ্বাস করব না।

পরদিন পিসিমা সত্যেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার এক বন্ধু তোমাকে তত্ত্ব করেচে, দেখেচ কি?

সত্য ঘাড় নাড়িল। বলিল, না, কে বন্ধু?

জানি না। ব'সো, কাপড়গুলো নিয়ে আসি।

অল্পক্ষণ পরে পিসিমা একতাড়া কাপড় লইয়া আসিলেন। সত্য দেখিল, বেশ মূল্যবান বস্ত্র। সে বিস্মিত হইল। কোন্ বন্ধু পাঠাইয়াছে? চেলিখানি বেশ করিয়া দেখিতে দেখিতে সে লক্ষ্য করিল, এক কোণে কি একটা বাঁধা আছে। খুলিয়া দেখিল, একখানা ক্ষুদ্র পত্র।

হস্তাক্ষর দেখিয়া সত্যেন্দ্রর মাথা ঝাঁ করিয়া উঠিল। লেখা আছে—

ভগিনী, স্নেহের উপহার প্রত্যাখ্যান করিতে নাই। তোমার দিদি যাহা পাঠাইল, গ্রহণ করিও।

সে-রাত্রের ফুলশয্যা সত্যেন্দ্রের পক্ষে কণ্টকশয্যা হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রবাবুর পত্র

যুবার অভিমান কোন বালককে দেখিয়াছ কি? সত্যেন্দ্রর ন্যায় অভিমান করিয়া এতটা অনর্থপাত করিতে কোন বালককে দেখিয়াছ কি? ছেলেবেলায় পুস্তক লইয়া খেলা করিতাম বলিয়া পিতার নিকট শাস্তি ভোগ করিয়াছি। সত্যেন্দ্রনাথ! তুমি হৃদয় লইয়া খেলা করিয়াছ; শাস্তি পাইবে ভয় হয় কি?

তোমরা যুবা; সমস্ত সংসারটাই তোমাদের সুখের নিকেতন; কিন্তু বল দেখি, তোমাদের কাহারও কি এমন একটা সময় আসে নাই—যখন প্রাণটা বাস্তবিকই ভার বোধ হইয়াছে? যখন জীবনের প্রত্যেক গ্রন্থিগুলি শ্লথ হইয়া ক্লান্তভাবে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে? না হইয়া থাকে একবার সত্যেন্দ্রনাথকে দেখ। ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয় স্বচ্ছন্দে ঘৃণা কর। ঘৃণা কর, সহানুভূতি প্রকাশ করিও না। ঘৃণা কর, কিছু বলিবে না; দয়া করিও না, মরিয়া যাইবে।

পাপী যদি মরিয়া যায়, প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিবে কে? সত্যেন্দ্র শ্রান্ত জীবনের প্রত্যেক দিন এক-একটা দুঃসহ বোঝা লইয়া আসে। সমস্তদিন ছটফট করিয়াও যেন সে বোঝা আর নামাইতে পারে না।

সত্যেন্দ্রর মাঝে মাঝে বোধ হয় যেন সে তাহার অতীত জীবন সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে; শুধু কিছুতেই ভুলিতে পারে না তাহার সাধের নলিনী পাবনায় চরিত্রহীনা হইয়াছিল, তাই সে তাহার স্বামী-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে।

প্রায় দুইমাস গত হইল, সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে; আজ একখানা পত্র ও একটি ছোট পার্শেল আসিয়া সত্যেন্দ্রর নিকট পৌঁছিল।

পত্রটি নলিনীর দাদা নরেন্দ্রবাবুর, সেখানি এই—

সত্যেন্দ্রবাবু,

অতি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও যে আপনাকে পত্র লিখিতেছি, সে কেবল আমার প্রাণাধিক ভগিনী নলিনীর জন্য। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে অনেক করিয়া বলিয়া গিয়াছে, যেন এই অঙ্গুরীয়টি আপনার নিকট পুনঃপ্রেরিত হয়। আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি পাঠাইলাম। ভগিনীর ইচ্ছা ছিল এইটি আপনার নূতন স্ত্রীকে পরাইয়া দেন, ভরসা করি তাহার আশা পুরিবে। আর মৃত্যুর পূর্ব্বে সে আপনাকে বিশেষ করিয়া অনুনয় করিয়া গিয়াছে, যেন তাহার ছোট ভগিনীটি ক্লেশ না পায়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ

নলিনীর যখন একটি ছোট পুত্র-সন্তান হইয়া মরিয়া যায়, সত্যেন্দ্রনাথ এই অঙ্গুরীয়টি তাহার হস্তে পরাইয়া দিয়াছিল ; সে-কথা মনে পড়িয়াছিল কি ?

সত্যেন্দ্রনাথ আর পাবনায় যান না। যে কোন কারণেই হৌক মাতাঠাকুরাণী আর কাশীবাসী হইতে পারিলেন না। নূতন বধূর নাম ছিল বিধু। বিধু বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে নলিনীর ভগিনী ছিল।

বাল্য-স্মৃতি

বাল্য-স্মৃতি

১

অন্নপ্রাশনের সময় যখন আমাদের নামকরণ হয়, তখন আমি ঠিক হইয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়াই হৌক, আর ঠাকুর্দ্দা মহাশয়ের জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ দখল না থাকাতেই হৌক, আমি 'সুকুমার'। অধিক দিন নহে, ঠিক দুই-চারি বৎসরে ঠাকুর্দ্দা মহাশয় বুঝিলেন যে, নামটার আমার সহিত তেমন মিশ খায় না। এবার বার-.তর বৎসর পরের কথা বলি। অবশ্য আমার আত্ম-পরিচয়ের কথা কেউ ভাল বুঝিতে পারিবে না—তবুও—

দেখুন, পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি। সেখানে আমি ছেলেবেলা হইতেই আছি। পিতা মহাশয় পশ্চিমাঞ্চলে চাকুরি করিতেন। আমি বড় একটা সেখানে যাইতাম না। ঠাকুরমার নিকট দেশেই থাকিতাম। বাটীতে আমার উপদ্রবের সীমা ছিল না। এক কথায় একটি ক্ষুদ্র রাবণ ছিলাম। বৃদ্ধ ঠাকুর্দ্দা যখন বলিতেন, তুই হলি কি? কারও কথা শুনিস্‌নে। এইবার তোর বাপকে চিঠি লিখব। আমি অল্প হাসিয়া বলিতাম, ঠাকুর্দ্দা, সে দিন-কাল আর নেই, বাপের বাপকে আমি ভয় করিনে। ঠাকুরমা কাছে থাকিলে আর ভয় কি? ঠাকুর্দ্দাকে তিনিই বলিতেন, কেমন উত্তর দিয়েচে—আর লাগবে?

ঠাকুর্দ্দা মহাশয় যদি বড় বিরক্ত হইয়া আমার পিতাকে পত্র লিখিতেন, আমি তখনই তাঁর আফিমের কৌটা লুকাইয়া ফেলিতাম। পরে পত্রখানি না ছিঁড়িয়া ফেলিলে আর কৌটা বাহির করিতাম না। এইসব উপদ্রবের ভয়ে বিশেষতঃ মৌতাত সম্বন্ধে বিভ্রাট ঘটে দেখিয়া তিনি আমাকে আর কিছু বলিতেন না। আমিও বেশ ছিলাম।

হইলে কি হয়? সকল সুখেরই একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। আমারও তাহাই হইল। ঠাকর্দ্দার খুড়তুত ভাই গোবিন্দবাবু বরাবর এলাহাবাদে চাকুরি করিতেন; এখন পেন্‌সন লইয়া তিনি দেশে আসিলেন। তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত রজনীনাথ বি. এ. পাশ করিয়া তাঁহার সহিত ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাঁকে সেজদাদা বলি। পূর্ব্বে আমার সহিত তাঁহার বিশেষ জানা-শুনা ছিল না। তিনি বড় একটা এ অঞ্চলে আসিতেন না; বিশেষতঃ তাঁদের আলাদা বাড়ি; আসিলেও আমার খোঁজ লইতেন না। কখনও দেখা হইলে—কি রে কেমন আছিস্? কি পড়িস্? এই পর্য্যন্ত।

এবার তিনি জাঁকিয়া আসিয়া দেশে বসিলেন। কাজে কাজেই আমার বিশেষ খোঁজ হইল। দুই-চারি দিবসের আলাপেই তিনি আমাকে এরূপ বশীভূত করিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহাকে দেখিলেই আমার ভয় হইত, মুখ শুকাইয়া যাইত, বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিত—যেন কত দোষই করিয়াছি, কত শাস্তি পাইব। আর যথার্থ আমি তখন প্রায়ই দোষী থাকিতাম। সর্ব্বদা একটা না একটা অন্যায় করা আমার চাই। দুই-চারটি অকর্ম্ম, দুই-চারিবার উপদ্রব করা আমার নিত্যকর্ম্ম। ভয় করিলেও আমি দাদাকে বড় ভালবাসিতাম। ভাই ভাইকে যে এত ভালবাসিতে পারে, পূর্ব্বে আমি তাহা জানিতাম না। তিনিও আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁর কাছেও কত দোষ করিয়াছি, কিন্তু কিছু বলিতেন না; আর বলিলেও মনে করিতাম, সেজদাদা ত, একটু পরে আর কিছুই মনে থাকিবে না।

ইচ্ছা করিলে হয়ত তিনি আমার চরিত্র সংশোধন করিতে পারিতেন, কিন্তু কিছুই করিলেন না। তাঁর দেশে আসাতে আমি পূর্ব্বের মত স্বাধীন নয় বটে, কিন্তু তথাপি যাহা আছি, বেশ আছি।

রোজ ঠাকুর্দ্দার এক পয়সার তামাক খাইয়া ফেলি। বুড়ো বেচারী আমার ভয়ে খাটের খুরোর পাশে, তক্তাপোশের পেটের সিন্দুকে, চালার বাতায়, যেখানে তামাক রাখিতেন, আমি খুঁজিয়া খুঁজিয়া সবটুকু টানিয়া আনিয়া খাইয়া ফেলিতাম। খাই-দাই ঘুড়ি ওড়াই, বেশ আছি। কোন জঞ্জাল নাই; পড়া-শুনা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছি। পাখী মারিতাম, কাঠবিড়াল মারিয়া পোড়াইয়া খাইতাম, বনে বনে গর্ত্তে গর্ত্তে খরগোস খুঁজিয়া বেড়াইতাম, কোনও ভাবনা ছিল না।

বাবা বক্সারে চাকুরি করিতেন। সে-স্থান হইতে আমাকে দেখিতেও আসিতেন না, মারিতেও আসিতেন না। ঠাকুরমা ও ঠাকুর্দ্দার হাল পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। সুতরাং এক কথায় আমি বেশ ছিলাম।

একদিন দুপুরবেলা বাড়ি আসিয়া ঠাকুরমার নিকট শুনিলাম, আমাকে সেজদার সহিত কলিকাতায় থাকিয়া পড়া-শুনা করিতে হইবে। আহারাদি সমাপ্ত করিয়া একছিলিম তামাক হাতে করিয়া আসিয়া ঠাকুর্দ্দাকে বলিলাম, আমাকে কলকাতায় যেতে হবে? ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, হ্যাঁ। আমি পূর্ব্ব হইতেই ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, এ-সকল ঠাকুর্দ্দার চালাকি। বলিলাম, যদি যেতে হয় আজই যাব। ঠাকুর্দ্দা হাসিয়া বলিলেন, সে জন্য চিন্তা কি দাদা? রজনী আজই কলকাতায় যাবে। বাসা ঠিক হয়ে গেছে, আজই যেতে হবে। আমি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলাম। একে সেদিন ঠাকুর্দ্দার তামাক খুঁজিয়া পাই নাই—যে একছিলিম পাইয়াছিলাম, তাহাতে আমার একটানও হইবে না—তাহার উপর আবার এই কথা। ঠকিয়া গিয়াছি; নিজে নিমন্ত্রণ লইয়া আর ফিরান যায় না। কাজেই সেদিন আমাকে কলিকাতায়

যাইতে হইল। যাইবার সময় ঠাকুর্দ্দাকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিলাম, হরি কালই যেন তোমার শ্রাদ্ধে বাড়ি ফিরে আসি! তারপর আমাকে কে কলকাতায় পাঠায় দেখে নেবো।

২

আমি এই প্রথম কলিকাতায় আসিলাম। এতবড় জমকাল সহর পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। মনে ভাবিলাম, যদি এই প্রকাণ্ড গঙ্গার উপরে কাঠের সাঁকোর মাঝামাঝি, কিংবা ঐ যেখানে একরাশ মাস্তুল খাড়া করিয়া জাহাজগুলা দাঁড়াইয়া আছে, সেই বরাবর যদি একবার তলাইয়া যাই, তাহা হইলে আর কখনও বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পারিব না। কলিকাতায় আমার একটুও ভাল লাগিল না। এত ভয়ে কি আর ভালবাসা হয়? কখনও যে হইবে—সে ভরসাও করিতে পারিলাম না।

কোথায় গেল আমাদের সেই নদীর ধার, সেই বাঁশঝাড়, মাঠের মধ্যে বেলগাছ, মিত্তিরদের বাগানের এক কোণের জামরুল গাছ, কিছুই নাই। শুধু বড় বড় বাড়ি, বড় বড় গাড়ি, ঘোড়া আর লোকজনে ঠেসাঠেসি পেষাপেষি, বড় বড় রাস্তা—বাড়ির পিছনে এমন একটি বাগান নাই যে, লুকাইয়া একছিলিম তামাক খাই। আমার কান্না আসিল। চোখের জল মুছিয়া মনে মনে বলিলাম, ভগবান জীবন দিয়েচেন—আহার তিনিই দেবেন। কলিকাতায় স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি, ভাল করিয়া পড়াশুনা করি, কাজে কাজেই আমি আজকাল ভাল ছেলে। দেশে অবশ্যই আমার নাম জাহির হইয়া গিয়াছে—যাক সে-কথা।

আমরা আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব মিলিয়া একটা মেস করিয়া আছি। আমাদের মেসে চারজন লোক। সেজদাদা, আমি, রামবাবু ও জগন্নাথবাবু। রামবাবু ও জগন্নাথবাবু সেজদাদার বন্ধু। এতদ্ভিন্ন একজন ভৃত্য ও একজন পাচক ব্রাহ্মণ আছে।

গদাধর আমাদের রসুয়ে ব্রাহ্মণ। সে আমা অপেক্ষা তিন-চারি বৎসরের বড় ছিল। অমন ভালমানুষ লোক আমি কখনও দেখি নাই। পাড়ার কোনও ছেলের সহিত আমার আলাপ ছিল না। সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক হইলেও সে আমার মস্ত বন্ধু হইয়া উঠিল। তাহাতে আমাতে যে কত গল্প হইত তার ঠিকানা ছিল না। তাহার বাড়ি মেদিনীপুর জেলার একটা গ্রামে। সেখানকার কথা, তাহার বাল্য-ইতিহাস ইত্যাদি শুনিতে আমার বড় ভাল লাগিত। সে-সব কথা আমি এতবার শুনিয়াছি যে, আমার বোধ হয় আমাকে সেখানে চোখ বাঁধিয়া

ছাড়িয়া দিলেও সমস্ত স্থানটি স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারি। রবিবারে তাহার সহিত আমি গড়ের মাঠে বেড়াইতে আসিতাম। সন্ধ্যাবেলায় রান্নাঘরে বসিয়া খিল দিয়া দুইজনে বিন্তি খেলিতাম। ভাত খাইয়া তার ছোট হুঁকোটিতে দুইজনে তামুক খাইতাম। সব কাজ আমরা দুইজনে করিতাম। পাড়ার কাহারও সহিত আলাপ নাই; সঙ্গী, দোস্ত, ইয়ার, বন্ধু, মুচিপাড়ার ভুলো, কেলো, খোকা, খাঁদা সবই আমার সে; তাহার মুখে আমি কখনও উঁচু কথা শুনি নাই। মিছামিছি সবাই তাহাকে তিরস্কার করিত; আমার গা জ্বালা করিত, কিন্তু সে কোনও কথার উত্তর দিত না—যেন যথার্থই দোষ করিয়াছে।

সকলকে আহার করাইয়া সে যখন রান্নাঘরের কোণে একটি ছোট থালায় খাইতে বসিত, তখন আমার শতকর্ম্ম থাকিলেও সেখানে উপস্থিত হইতাম। বেচারীর ভাগ্যে প্রায় কিছুই থাকিত না; এমন কি, ভাত পর্য্যন্ত কম পড়িত। কাহারো খাইবার সময় আমি থাকি নাই—খাইতে বসিয়া ভাত কম পড়ে, তরকারী কম পড়ে, মাছ কম পড়ে, আমি আগে কখনই দেখি নাই। আমার কেমন বোধ হইত।

ছেলেবেলায় ঠাকুরমা মধ্যে মধ্যে দুঃখ করিয়া বলিতেন, ছেলেটা আধপেটা খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেছে—আর বাঁচবে না। আমি কিন্তু ঠাকুরমার ভরপেট কিছুতেই খাইতে পারিতাম না। শুকাইয়া যাই, আর দড়ি হইয়াই যাই, আমার আধপেটাই ভাল লাগিত। এখন কলিকাতায় আসিয়া বুঝিয়াছি, সে আধ-পেটায় এ আধপেটায় অনেক প্রভেদ। কেহ খাইতে না পাইলে যে চোখে জল আসিয়া পড়ে, আমি পূর্ব্বে কখনও অনুভব করি নাই। পূর্ব্বে কতবার ঠাকুর্দ্দার পাত্রে উচ্ছিষ্ট জল দিয়া তাঁহাকে আহার করিতে দিই নাই; ঠাকুরমার গায়ে সারমেয় সন্তান নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার উপস্থিত কর্ম্ম হইতে তাঁহাকে বিরত করিয়াছি। তাঁহাদের আহার হয় নাই; কিন্তু চোখে কখনও জল আসে নাই। পিতামহ-পিতামহী আপনার লোক—গুরুজন, আমাকে স্নেহ করেন—তাঁহাদের জন্য কখনও দুঃখ হয় নাই; স্ব-ইচ্ছায় তাঁহাদিগকে অর্দ্ধভুক্ত, এমন কি, অভুক্ত রাখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। আর এই গদাধর কোথাকার কে—তাহার জন্য অনাহূত অশ্রু আপনি আসিয়া পড়ে।

কলিকাতায় আসিয়া যে আমার কি হইল তাহা ঠাওরাইতে পারি না। চোখে এত জলই বা কোথা হইতে আসে ভাবিয়া পাই না। আমাকে কেহ কাঁদিতে দেখে নাই। জিদ করিয়া আস্ত খেজুরের ছড়ি আমার পৃষ্ঠে ভগ্ন করিয়াও বাল্যকালে গুরুমহাশয় তাঁহার সাধ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ছেলেরা বলিত, সুকুমারের গা ঠিক পাথরের মত। আমি মনে মনে বলিতাম, গা পাথরের মত নয়—মন পাথরের

মত। কচি খোকার মত কাঁদিয়া ফেলি না। বাস্তবিক, কাঁদিতে আমার লজ্জা বোধ হইত, এখনও হয়, কিন্তু সামলাইতে পারি না। লুকাইয়া কেহ কোথাও নাই দেখিয়া, চোরের চুরি করার মত—দুবার চক্ষু মুছিয়া ফেলি। স্কুলে পড়িতে যাই, একপাল লোক ভিক্ষা করিতেছে। কাহারও হাত নাই, পা নাই, কাহারও চক্ষু দুটি নাই, এমনই কত কি নাই ধরণের লোক দেখি, তাহা আর বলিতে পারি না। তিলক কাটিয়া খঞ্জনী হাতে লইয়া "জয় রাধে" বলিয়া ভিক্ষা করে, তাহাই জানি, এ-সব ভিখারী আবার কি রকমের? মনের দুঃখে মনে মনেই বলিতাম, ঠাকুর! এদের আমাদের দেশে পাঠিয়ে দাও। যাক পোড়া ভিখারীর কথা—আমার কথা বলি। চক্ষু অনেকটা সড়গড় হইলেও আমি একেবারে বিদ্যাসাগর হইতে পারিলাম না। মধ্যে মধ্যে আমাদের দেশের মা সরস্বতী যে কোথা হইতে আসিয়া আমার স্কন্ধদেশে ভর করিতেন, বলিতে পারি না। তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া যে-সকল সৎকর্ম্ম করিয়া ফেলিতাম, তজ্জন্য এখনও আমার সে সরস্বতীর উপর ঘৃণা হইয়া আছে। বাসায় কাহার কি অনিষ্ট করিব, সর্ব্বদা খুঁজিয়া বেড়াইতাম। রামবাবু তিনঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার দেশী কালাপেড়ে কাপড় কুঞ্চিত করিলেন; বিকালে বেড়াইতে যাইবেন। আমি অবসর বুঝিয়া কাপড়খানি খুলিয়া টানিয়া প্রায় সোজা করিয়া রাখিয়া দিলাম। তিনি বিকালে বস্ত্রখানির অবস্থা দেখিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমার আর আমোদ ধরে না। জগন্নাথবাবুর অফিসের বেলা হইয়া গিয়াছে, তাড়াতাড়ি আহার করিতে বসিয়াছেন, একমুহূর্ত্ত বিলম্ব সহিতেছে না। আমি সময় বুঝিয়া তাঁহার চাপকানের বোতামগুলি সমস্ত কাটিয়া লইলাম। স্কুল যাইবার সময় একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া গেলাম, জগন্নাথবাবু ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবার উপক্রম করিতেছেন। মনের আনন্দে আমি সমস্ত পথ হাসিতে হাসিতে চলিলাম। সন্ধ্যার সময় জগন্নাথবাবু অফিস হইতে ফিরিয়া বলিলেন, আমার চাপকানের বোতামগুলো গদা-বেটা চুরি করে বেচে ফেলেচে—বেটাকে তাড়িয়ে দাও। জগন্নাথবাবুর চাপকানের বিবরণে দাদা ও রামবাবু উভয়েই মুখ টিপিয়া হাসিলেন। সেজদাদা বলিলেন, কত রকমের চোর আছে, কিন্তু চাপকানের বোতাম চুরি করে বেচে ফেলতে কখনও শুনিনি। জগন্নাথবাবু এ-কথায় আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, বেটা বোতামগুলো সকালে নিলে না, বিকালে নিলে না, রাত্রে নিলে না, ঠিক অফিস যাবার আগেই নিয়েচে। আজ দুর্গতির একশেষ করেচে, একটা কালো ছেঁড়া পিরান গায়ে দিয়ে আমার অফিস যেতে হয়েচে।

সকলেই হাসিলেন। জগন্নাথবাবুও হাসিলেন। কিন্তু আমি হাসিতে পারিলাম না। মনে ভয় হইল, পাছে গদাধরকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। সে যে নির্ব্বোধ, হয়ত কোনও কথা বলিবে না, সমস্ত অপরাধ নিজের স্কন্ধে স্বেচ্ছায় তুলিয়া লইবে।

কে বোতাম লইয়াছে, সেজদাদা বুঝিয়াছিলেন। গরীব গদাধরের উপর কোনও জুলুম হইল না। কিন্তু আমিও সেই অবধি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখনও এমন কর্ম্ম করিয়া অন্যকে বিপন্ন করিব না।

এরূপ প্রতিজ্ঞা আমি পূর্ব্বে কখনও করি নাই, কখনও করিতাম কি না জানি না। শুধু গদাধর আমাকে একেবারে মাটি করিয়া দিয়াছে।

কি উপায়ে কাহার যে চরিত্র সংশোধিত হইয়া যায়, কেহই জানে না। গুরু-মহাশয়ের, ঠাকুর্দ্দা মহাশয়ের, আরও অনেক মহাশয়ের কত চেষ্টাতেও আমি যে প্রতিজ্ঞা কখনও করি নাই, এক গদাধর ঠাকুরের মুখ মনে করিয়া আজ সেই প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলাম। এতদিনে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে কি-না জানি না; কিন্তু স্বেচ্ছায় কখনও ভঙ্গ করিয়াছি এমন মনে হয় না।

এখন আর একজন লোকের কথা বলি। সে আমাদের রামা চাকর। রামা জাতে কায়েত কি সদ্‌গোপ, এমনই কি একটা ছিল। বাড়ি কোথায়, শুনি নাই—এত হুঁশিয়ার চটপটে চাকর সর্ব্বদা দেখা যায় না। আর যদি কখনও দেখা হয়, ইচ্ছা আছে, তাহার বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া লইব।

সকল কর্ম্মে রামাকে চরকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিতাম। এই রামা কাপড় কাচিতেছে; তখনি দেখি সেজদাদা স্নানে বসিয়াছেন, সে গা রগড়াইয়া দিতেছে; পরক্ষণেই দেখি সে পান-সুপারি লইয়া মহা ব্যস্ত। এইরূপে সে সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়ায়। সেজদার "The favourite!" মস্ত লোক। আমি কিন্তু তাহাকে দেখিতে পারিতাম না। সে-বেটার জন্য আমি সেজদার নিকট প্রায়ই তিরস্কৃত হইতাম। বিশেষতঃ গদা বেচারীকে সে সর্ব্বদাই অপ্রস্তুত করিত। আমি তাহার উপর বড় চটা ছিলাম। কিন্তু হইলে কি হয়, সে সেজদার "The favourite!" আমাদের বাসার রামবাবুও তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, "The rogue!" তখন এ-কথাটার ব্যাখ্যা তিনি নিজে না করিতে পারিলেও আমরা দুজনে বিলক্ষণ বুঝিতাম, রামা "The rogue!" তাঁহার চটিবার আরও অনেক কারণ ছিল। প্রধান কারণ এই যে, সে নিজেকে রামবাবু বলিয়া পরিচিত করিত। সেজদাদাও সময়ে সময়ে রামবাবু বলিয়া ডাকিতেন। আমাদের রামবাবুর এ-সব ভাল লাগিত না। যাক বাজে কথা—

একদিন বিকালে সেজদাদা একটা ল্যাম্প ক্রয় করিয়া আনিলেন। বড় ভাল জিনিস, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট টাকা মূল্য। সকলে বেড়াইতে যাইলে আমি গদাধরকে ডাকিয়া আনিয়া সেটা দেখাইলাম। গদাধর সে-রকম আলো কখনও দেখে নাই। সে মহা আহ্লাদিত হইয়া সেটা দুই-চারিবার নাড়িয়া দেখিল; তাহার পর আপনার কর্ম্মে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। আমার কিন্তু কৌতূহল কিছুতেই থামিল না।

কি করিয়া চিমনী খুলি! কি করিয়া ভিতরের কল দেখি! অনেক নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম, অনেকবার ঘুরাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই খুলিল না। পরে দেখিলাম, নীচে একটা ইস্ক্রু আছে, অগত্যা সেটা ঘুরাইলাম। কিছুক্ষণ ঘুরাইবার পর হঠাৎ একেবারে ল্যাম্পের আধখানা খসিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি ভাল ধরিতে পারিলাম না, উপরের কাঁচগুলা টেবিল হইতে নীচে পড়িয়া একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল।

৩

সেদিন অনেক রাত্রে আমি বেড়াইয়া আসিলাম। বাসায় আসিয়া দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড হৈ-চৈ কাণ্ড বাধিয়া উঠিয়াছে। গদাধরকে মাঝখানে লইয়া সকলে গোল হইয়া বসিয়াছেন। সেজদাদা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। গদাধরের জেরা চলিতেছে।

গদাধরের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে। বলিতেছে, বাবু, আমি ওটা ছুঁয়েছিলাম বটে, কিন্তু ভাঙ্গিনি, সুকুমারবাবু আমাকে দেখালেন—আমিও দেখলাম। তার পর তিনিও বেড়াতে গেলেন, আমিও রাঁধতে গেলাম।

কেহই তাহার কথা বিশ্বাস করিল না। সাব্যস্ত হইয়া গেল, সে-ই চিমনি ভাঙ্গিয়াছে। তাহার মাহিনা বাকি ছিল; সেই টাকা হইতে সাড়ে তিন টাকা দিয়া আবার নূতন চিমনি আসিল। সন্ধ্যার সময় যখন আলো জ্বলিল; তখন সকলেই বেশ প্রফুল্ল হইল, শুধু আমার চক্ষু দুটো জ্বালা করিতে লাগিল। সর্ব্বদা মনে হইতে লাগিল, তাহার সাড়ে তিন টাকা চুরি করিয়া লইয়াছি। আর থাকিতে পারিলাম না। কাঁদিয়া কোনও মতে সেজদাদার মত করিয়া বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মনে করিয়াছিলাম, ঠাকুরমার নিকট হইতে টাকা আনিয়া গোপনে সাড়ে-তিন টাকার পরিবর্ত্তে গদাধরকে সাত টাকা দিব। আমার নিজের কাছে তখন টাকা ছিল না। সব টাকা সেজদাদার নিকট ছিল। কাজেই টাকা আনিতে আমাকে দেশে আসিতে হইল। মনে করিয়া আসিয়াছিলাম একদিনের অধিক থাকিব না। কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সাত-আট দিন দেশে কাটিয়া গেল।

সাত-আট দিন পরে আবার কলিকাতার বাসায় ঢুকিলাম। ঢুকিয়াই ডাকিলাম, গদা! কেহ উত্তর দিল না। আবার ডাকিলাম, গদাধর ঠাকুর! কোনও উত্তর নাই। গদা! এবার রামচরণ আসিয়া বলিল, ছোটবাবু, কখন এলেন?

এই আসচি—ঠাকুর কোথায়?

ঠাকুর নেই।

কোথায় গেছে?

বাবু তাকে তাড়িয়ে দিয়েচেন।

তাড়িয়ে দিয়েচেন! কেন?

চুরি করেছিল বলে।

প্রথমে আমি কথাটা ভাল বুঝিতে পারি নাই, তাই কিছুক্ষণ রামার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। রামা আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, ছোটবাবু, আশ্চর্য্য হচ্ছেন, কিন্তু তাকে ত আপনারা চিনতেন না। তাই অত ভালবাসতেন। সে মিট-মিটে ডান ছিল; ভিজে বেড়ালকে আমি চিনতাম।

কিসে সে মিট-মিটে ডাইন ছিল, কিংবা কেন যে সেই সিক্ত মার্জ্জারকে চিনিতে পারি নাই, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কার টাকা চুরি করেচে?

সেজবাবুর।

কোথায় ছিল?

জামার পকেটে।

কত টাকা?

চার টাকা।

কে-দেখেচে?

চোখ দিয়ে কেউ দেখেনি বটে, কিন্তু সে একরকম দেখাই।

কেন?

সে-কথা কি আর জিজ্ঞাসা করতে হয়? আপনি বাসায় ছিলেন না; রামবাবু নিলেন না, জগন্নাথবাবু নিলেন না; আমি নিলাম না। তবে নিলে কে? কোথায় গেল?

তুই তবে তাকে ধরেচিস্?

রামা হাসিয়া বলিল, না হলে আর কে?

ঠনঠনের চটি-জুতা আপনারা স্বচ্ছন্দে কিনতে পারেন। তেমন মজবুত চটি বোধ হয় আর কোথাও প্রস্তুত হয় না।

আমি রন্ধনশালায় গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। সেই ছোট হুঁকোটিতে ধূলা পড়িয়া রহিয়াছে। আজ চার-পাঁচদিন তাহা কেহ স্পর্শ করে নাই; কেহ জল বদলায় নাই। দেওয়ালে একস্থানে কয়লায় লেখা রহিয়াছে, সুকুমারবাবু, আমি চুরি করিয়াছি। এ-স্থান হইতে চলিলাম। বাঁচিয়া থাকি আবার আসিব।

আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলাম। নিতান্ত ছেলে-বুদ্ধিতে সেই হুঁকোটিকে বুকে টিপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কেন যে, তাহার কারণ বুঝিতে পারি না।

আমার আর সে বাসাতে মন টিকিত না। সন্ধ্যার সময় ঘুরিয়া ফিরিয়া একবার করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিতাম। আর একজন রাঁধিতেছে দেখিয়া অন্যমনে আপনার ঘরে আসিয়া বই খুলিয়া পড়িতে বসিতাম। সময় সময় আমার সেজদাদাকেও দেখিতে পাইতাম না। ভাত পর্য্যন্ত আমার তিক্ত বোধ হইত। অনেকদিন পরে একদিন রাত্রে সেজদাদাকে বলিলাম, সেজদা! কি করেচ?

কিসের কি করেচি?

গদা তোমার টাকা কখনো চুরি করেনি।

সকলেই জানিত আমি গদা ঠাকুরকে বড় ভালবাসিতাম। সেজদাদা বলিলেন, ভাল করিনি সুকুমার। যা হবার হয়েছে, কিন্তু রামাকে তুই অত মেরেছিলি কেন?

বেশ করেছিলাম। আমাকেও কি তাড়াবে নাকি?

দাদা আমার মুখে কখনও অমন কথা শোনেন নাই। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কত টাকা উসুল হয়েচে?

দাদা বড় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, ভাল করিনি। সব টাকা তার কেটে নিয়ে আড়াই টাকা উসুল করেছিলাম। আমার এতটা ইচ্ছে ছিল না।

আমি যখন রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতাম, দূরে যদি কোনও লোক ময়লা চাদর কাঁধে ফেলিয়া ছেঁড়া চটিজুতা-পায়ে চলিয়া যাইত, আমি দৌড়াইয়া গিয়া দেখিয়া আসিতাম। কি যে একটা আশা নিত্য নিরাশায় পরিণত হইত, তাহা আর কি বলিব?

প্রায় পাঁচ মাস পরে দাদার নামে একটা মণি-অর্ডার আসিল। দেড় টাকার মণি-অর্ডার। দাদাকে আমি সেইদিন চোখের জল মুছিতে দেখি। সে কুপনটা এখনও আমার নিকট রহিয়াছে।

কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আজও সেই গরীব গদাধর ঠাকুর আমার বুকের আধখানা জুড়িয়া বসিয়া আছে।

পরেশ

পরেশ

১

মজুমদার-বংশ বড় বংশ, গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের ভারি সম্মান। বড়ভাই গুরুচরণ এই বাড়ির কর্ত্তা; শুধু বাড়ির কেন, সমস্ত গ্রামের কর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বড়লোক আরও ছিল, কিন্তু এতখানি শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র শ্রীকুঞ্জপুরে আর কেহ ছিল না। জীবনে বড় চাকুরি কখনো করেন নাই,—গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে সম্মত হইলে হয়ত তাহা দুষ্প্রাপ্য হইত না, কিন্তু প্রথম যৌবনে সেই যে একদিন অনতিদূরবর্ত্তী জেলা-ইস্কুলের মাস্টারিতে ঢুকিয়াছিলেন, কোন লোভেই আর এই শিক্ষালয়ের মায়া কাটাইয়া অন্যত্র যাইতে সম্মত হন নাই। এখানে ত্রিশ টাকা বেতন পঞ্চাশ টাকা হইয়াছিল, এবং তাহার অর্দ্ধেক পঁচিশ টাকা পেন্সনে বছর তিনেক হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। পৃথিবীতে আজও হয়ত টাকাটাই একমাত্র বড় পদার্থ নয়, তা না হইলে বিবাদ মিটাইতে, নালিশ নিষ্পত্তি করিতে, দলাদলির বিচার করিয়া দিতে তাহার আদেশই শ্রীকুঞ্জপুরের সর্ব্বমান্য বস্তু হইয়া থাকিতে পারিত না। তাঁহার অপরিসীম স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা, চরিত্রের দৃঢ়তা এবং অবিচলিত সাধুতার সম্মুখে সকলেই সসম্ভ্রমে মাথা নত করিত। বয়স ষাটের কাছাকাছি—কেহ চরিত্র, সাধুতা বা ধর্ম্মের বাড়াবাড়ি করিলে, দশ-বিশখানা গ্রামের লোক তামাসা করিয়া বলিত, ইস্! এ যে একেবারে গুরুচরণ। গুরুচরণের স্ত্রী ছিল না, ছিল একমাত্র পুত্র বিমল। জগতে অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয় সত্যকার কিছু নাই, না হইলে এতবড় সর্ব্বগুণান্বিত পিতার এতবড় সর্ব্বাদোষাশ্রিত পুত্র যে কি করিয়া জন্মগ্রহণ করিল লোকে ভাবিয়া পাইত না।

পুত্রের সহিত পিতার সাংসারিক বন্ধন ছিল না বলিলেই চলে, কিন্তু তাঁহার সকল বন্ধন গিয়া পড়িয়াছিল ভ্রাতুষ্পুত্র পরেশের উপর। হরিচরণের বড় ছেলে পরেশ যেন তাঁহার আপনার ছেলে—পরেশ এম. এ. পাশ করিয়া আইন পড়িতেছে—তাহাকে বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া আজিও সমস্ত পড়া তিনি পড়াইয়া আসিতেছেন। বিমল যে কিছু শিখিল না, এ দুঃখ তাঁহার এক পরেশ হইতে মিটিয়াছে।

২

ছোট ভাই হরিচরণ এতদিন বিদেশে সামান্য চাকুরিই করিতেছিল, হঠাৎ লড়াইয়ের পরে কি জানি কেমন করিয়া সে বড়লোক হইয়া চাকুরি ছাড়িয়া বাড়ি চলিয়া আসিল। লোককে চড়া সুদে টাকা ধার দিতে লাগিল, স্ত্রীর নামে একটা বাগান খরিদ করিয়া ফেলিল, এবং আরও দু-একটা কি কি কাজ করিল যাহাতে তাহার টাকার গন্ধ পাঁচ-সাতখানা গ্রামের লোকের নাকে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না।

একদিন হরিচরণ আসিয়া সবিনয়ে কহিল, দাদা, অনেকদিন ধরেই আপনাকে একটা কথা বলব ভাবচি—

গুরুচরণ কহিল, বেশ বল।

হরিচরণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আপনি একলা আর কত পারবেন, বয়সও হ'লো—

গুরুচরণ কহিল, হ'লো বৈকি। খাট চলচে।

হরিচরণ কহিল, তাই বলছিলাম, আমি ত এখন বাড়িতেই রইলাম, বিষয়-আশয়গুলো সব এলোমেলো হয়ে রয়েচে, একটু চিহ্নিত করে নিয়ে যদি আমিই—

গুরুচরণ ক্ষণকাল ছোট ভাইয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বিষয়-আশয় আমাদের সামান্যই, আর তা এলোমেলো হয়েও নেই, কিন্তু তুমি কি পৃথক হবার প্রস্তাব করচ?

হরিচরণ লজ্জায় জিভ কাটিয়া কহিল, আজ্ঞে না না, যেমন আছে যেমন চলচে তেমনই সব থাকবে, শুধু যা যা আমাদের আছে একটু অমনি চিহ্ন দিয়ে নেওয়া, আর রান্না-বান্নাটাও বড় ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার—সমস্ত একই থাকবে—তবে ডালটা ভাতটা আলাদা করে নিলে, বুঝলেন না—

গুরুচরণ বলিলেন, বুঝেচি বইকি। বেশ, কাল থেকেই তাই হবে।

হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, চিহ্নটা কিভাবে দেবেন স্থির করেচেন?

গুরুচরণ কহিলেন, স্থির করার ত এতদিন আবশ্যক হয়নি, তবে আজ যদি হয়ে থাকে, আমরা তিন ভাই, তিন অংশ সমান ভাগ করে নিলেই হবে।

হরিচরণ মাথা নাড়িয়া বলিল, তিন অংশ কি-রকম? মেজবৌ বিধবা, ছেলে-পুলে নেই, তাঁর আবার অংশ কি? দু'ভাগ হবে।

গুরুচরণ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, তিন ভাগ হবে। মেজবৌমা আমার শ্যামা-চরণের বিধবা, যতদিন বেঁচে আছেন অংশ পাবেন বৈকি।

হরিচরণ রুষ্ট হইল, কহিল, আইনে পেতে পারেন না, শুধু খেতে-পরতে পেতে পারেন।

গুরুচরণ কহিলেন, সে ত পাবেনই, কেন না বাড়ির বৌ।

হরিচরণ কহিল, ধরুন কাল যদি বিক্রি করতে কিংবা বাঁধা দিতে চান ?

গুরুচরণ বলিলেন, আইনে যদি সে অধিকার দেয় তিনি করবেন।

হরিচরণ মুখ কালো করিয়া বলিল, হুঁ করবেন বৈ-কি।

পরদিন হরিচরণ দড়ি লইয়া ফিতা লইয়া বাড়িময় মাপ-জোপ সারিয়া বেড়াইতে লাগিল, গুরুচরণ জিজ্ঞাসাও করিলেন না, বাধাও দিলেন না। দিন দুই-তিন পরে ইট কাঠ বালি চুন আসিয়া পড়িল; বাড়ির পুরানো ঝি আসিয়া খবর দিল, কাল থেকে রাজমিস্ত্রী লাগবে, ছোটবাবুর পাঁচিল পড়বে।

গুরুচরণ সহাস্যে কহিলেন, সে ত দেখতেই পাচ্ছি গো, বলতে হবে কেন!

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন সন্ধ্যার পরে দ্বারের বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া গুরুচরণ মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পঞ্চুর মা, কি গা ?

পঞ্চুর মা বহুদিনের দাসী, সে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, মেজবৌমা দাঁড়িয়ে আছেন, বড়বাবু।

বড়বৌয়ের মৃত্যুর পর হইতে বিধবা ভ্রাতৃবধূই এ-সংসারের গৃহিণী, তিনি অন্তরাল হইতে ভাশুরের সহিত কথা কহিতেন; মৃদু-কণ্ঠে কহিলেন, শ্বশুরের ভিটেতে কি আমার কোন দাবি নেই যে ছোটবৌয়েরা আমাকে অহরহ গালমন্দ করচে ?

গুরুচরণ কহিলেন, আছে বৈ-কি বৌমা, যেমন তাঁদের আছে, ঠিক তোমারও তেমনি আছে।

পঞ্চুর মা বলিল, কিন্তু এমনধারা করলে ত বাড়িতে আর টিকতে পারা যায় না।

গুরুচরণ সমস্তই শুনিতেছিলেন, ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, পরেশকে আসতে চিঠি লিখে দিয়েছি পঞ্চুর মা, একবার সে এসে পড়লেই সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে—এ ক'টা দিন তোমরা একটু সহ্য করে থাকো।

মেজবৌ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু পরেশ কি—

গুরুচরণ বাধা দিয়া কহিলেন, কিন্তু নয় মেজবৌমা, আমার পরেশের সম্বন্ধে কিন্তু চলে না। হরি তার বাপ বটে, কিন্তু সে আমারই ছেলে, সমস্ত পৃথিবী যদি একদিকে যায়, তবু সে আমারই। তার জ্যাঠামশায় যে কখনো অন্যায় করে না এ যদি সে না বোঝে ত বৃথাই এতদিন পরের ছেলেকে বুক দিয়ে মানুষ করে এলাম।

দাসী কহিল, সে আর বলতে ? সে বছর মায়ের অনুগ্রহ হলে তুমি ছাড়া আর যমের মুখ থেকে তাকে কে কেড়ে আনতে পারতো বড়বাবু ? তখন কোথায়

বা ছোটবাবু, আর কোথায় বা তার সংমা। ভয়ে একবার দেখতে পর্য্যন্ত এলো না। তখন একলা জ্যাঠামশাই, কিবা দিন কিবা রাত্রি।

মেজবৌমা বলিলেন, পরেশের নিজের মা বেঁচে থাকলেও হয়ত এতখানি করতে পারতেন না।

গুরুচরণ কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, থাক্ মা ও-সকল আলোচনা। তাহারা প্রস্থান করিলে বৃদ্ধের চোখের সম্মুখে যেন বিমল এবং পরেশ আসিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইল। জানালার বাহিরে অন্ধকার আকাশের প্রতি চাহিয়া অকস্মাৎ মুখ দিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল। তাহার পরে মোটা বাঁশের লাঠিটা হাতে তুলিয়া লইয়া সরকারদের বৈঠকখানায় পাশা খেলিতে চলিয়া গেলেন।

পরদিন দুপুরবেলায় গুরুচরণ ভাত খাইতে বসিয়াছিলেন, বাটীর উত্তরদিকের বারান্দায় কতকটা অংশ ঘিরিয়া লইয়া হরিচরণের রান্নার কাজ চলিতেছিল, তথা হইতে তীক্ষ্ণ নারী-কণ্ঠে কি কটু কথাই যে বাহির হইয়া আসিতেছিল তাহার সীমা নাই। তাহার আহারের যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিতেছিল, কিন্তু সহসা পুরুষের মোটা গলা আসিয়া যখন তাহাতে মিশিল, তখন তিনি ক্ষণকালের জন্য কান খাড়া করিয়া শুনিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মেজঠাকুরাণী অন্তরাল হইতে হায় হায় করিয়া উঠিলেন এবং পঞ্চুর মা ক্রোধে ক্ষোভে চীৎকার করিয়া এই দুর্ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিল।

প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া গুরুচরণ ডাকিয়া কহিলেন, হরিচরণ, মেয়েদের কথায় আমি কান দিতে চাইনে, কিন্তু তুমি পুরুষমানুষ হয়ে যদি বিধবা বড়ভাজকে এমনি করে অপমান কর, তাঁর ত তা হলে বাড়িতে থাকা চলে না।

এ-কথার কেহ জবাব দিল না, কিন্তু বাহিরে যাইবার পথে ছোটবধূমাতার পরিচিত তীক্ষ্ণ-কণ্ঠ তাঁহার কানে গেল, সে তামাসা করিয়া কহিতেছে, অমন করে অপমান ক'রো না বলচি, মেজবৌঠাকরুণ তা হলে বাড়িতেই থাকবে না। কি হবে তখন ?

হরিচরণ প্রত্যুত্তরে কহিতেছে, পৃথিবী রসাতলে যাবে আর কি। কেবা থাকবার জন্যে মাথার দিব্বি দিচ্ছে—গেলেই ত বাঁচা যায়।

গুরুচরণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, বক্তব্য শেষ হইলে নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

৩

হেডমাস্টার মহাশয়ের কন্যার বিবাহ-উপলক্ষ্যে গুরুচরণ কৃষ্ণনগরের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, হঠাৎ শুনিতে পাইলেন দিন-দুই হইল পরেশ বাড়ি আসিয়াছে, কিন্তু আসিয়াই জ্বরে পড়িয়াছে। ব্যস্ত হইয়া পাশের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, সম্মুখে ছোট ভাইকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞসা করিলেন, পরেশের নাকি জ্বর ?

হুঁ, বলিয়া হরিচরণ বাহির হইয়া গেল। ছোট বধূমাতার বাপের বাড়ির দাসী পথ আটকাইয়া বলিল, আপনি ঘরের ভেতর যাবেন না।

যাবো না। কেন ?

ঘরে মা বসে আছেন।

তাঁকে একটুখানি সরে যেতে বল না ঝি।

দাসী কহিল, সরে আবার কোথায় যাবেন, ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চেন। বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

গুরুচরণ আচ্ছন্নের মত ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া ডাকিয়া বলিলেন, পরেশ, কেমন আছো বাবা ?

ভিতর হইতে এই ব্যাকুল প্রশ্নের কোন সাড়া আসিল না, কিন্তু ঝি কোথা হইতে জবাব দিয়া কহিল, দাদাবাবুর জ্বর হয়েচে শুনতে পেলেন ত !

গুরুচরণ স্তব্ধভাবে সেখানে মিনিট দুই-তিন দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিলেন এবং কাহাকেও কোন কথা না কহিয়া রেলওয়ে স্টেশনের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সেখানে বিবাহ-বাড়িতে আর কেহ তেমন লক্ষ্য করিল না, কিন্তু কাজ-কর্ম চুকিয়া গেলে, তাঁহার বহুদিনের বন্ধু হেডমাস্টারমশাই আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপারটা কি ঘটেছে গুরুচরণ ? হরিচরণ না-কি ভারি তোমার পেছনে লেগেচে ?

গুরুচরণ অন্যমনস্কের মত কহিলেন, হরিচরণ ? কই না !

না কি হে ? হরিচরণের শয়তানি কাণ্ড ত সবাই শুনেচে।

গুরুচরণের হঠাৎ যেন সমস্ত কথা মনে পড়িয়া গেল, কহিলেন, হাঁ হাঁ, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে হরিচরণ গণ্ডগোল করচে বটে।

তাঁহার কথার ধরণে হেডমাস্টার ক্ষুণ্ণ হইলেন। ছেলেবেলার অকপট বন্ধু, তথাপি গুরুচরণ ভিতরের কথা ঔদাস্যের আবরণে গোপন করিতে চাহে, ইহাই মনে করিয়া তিনি আর প্রশ্ন করিলেন না।

গুরুচরণ কৃষ্ণনগর হইতে বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার এই কয়েকদিনের অনুপস্থিতির অবসরে উঠানে নানা স্থানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া হরিচরণ এমন কাণ্ড করিয়া রাখিয়াছে যে পা ফেলা যায় না। বুঝিলেন যে তাহার মর্জ্জি এবং সুবিধামত ভদ্রাসন ভাগ হইয়া প্রাচীর পড়িবে। তাহার টাকা আছে, অতএব আর কাহারও মতামতের প্রয়োজন নাই।

নিজের ঘরে গিয়া কাপড় ছাড়িতেছিলেন, মেজবৌমাকে সঙ্গে করিয়া পঞ্চুর মা আসিয়া দাঁড়াইল। গুরুচরণ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ অস্ফুট আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া মেজবৌমা কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল। পঞ্চুর মা নিজেও কাঁদিতে লাগিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতেই জানাইল যে, পরশু সকালে মেজবৌমাকে গলায় ধাক্কা মারিয়া হরিচরণ বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল, এবং সে উপস্থিত না থাকিলে মারিয়া আধমরা করিয়া দিত।

ঘটনা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে গুরুচরণের অনেকক্ষণ লাগিল। তাহার পরেও তিনি মাটির মূর্ত্তির মত নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, হরিচরণ সত্যি-সত্যিই তোমার গায়ে হাত দিলে বৌমা? পারলে? খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, পরেশ বোধ হয় শয্যাগত।

পঞ্চুর মা কহিল, তার ত কিছুই হয়নি বড়বাবু। এই ত আজ সকালের গাড়িতে কলকাতায় চলে গেল।

হয়নি? তার বাপের কীর্ত্তি সে তবে জেনে গেছে?

পঞ্চুর মা কহিল, সমস্তই।

গুরুচরণের পায়ের তলার মাটি পর্য্যন্ত যেন দুলিতে লাগিল। কহিলেন, বৌমা, এতবড় অপরাধের শাস্তি যদি তার না হয় ত এ-বাড়ি থেকে বাস আমার উঠল। এখন সময় আছে, আমি গাড়ি ডেকে আনচি, তোমাকে আদালতে গিয়ে নালিশ করতে হবে।

আদালতে নালিশ করার নামে মেজবৌ চমকাইয়া উঠিল। গুরুচরণ বলিলেন, গৃহস্থের বৌ-ঝির পক্ষে এ কাজ সম্মানের নয় সে আমি জানি, কিন্তু এতবড় অপমান যদি মুখ বুজে সহ্য কর মা, ভগবান তোমার প্রতি নারাজ হবেন। এর চেয়ে বেশি কথা আর আমি জানিনে।

মেজবৌ ভূমিশয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনি পিতৃতুল্য। আমাকে যা আদেশ করবেন আমি অসঙ্কোচে পালন করব।

হরিচরণের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু হইল। গুরুচরণ তাঁহার সাবেক-দিনের সোনার চেন বিক্রি করিয়া বড় উকিলের মোটা ফি দাখিল করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মামলার ডাক পড়িল। হরিচরণ হাজির হইল, কিন্তু বাদিনীর দেখা নাই। উকিল কি একটা বলিল, হাকিম মকদ্দমা খারিজ করিয়া দিলেন। ভিড়ের মধ্যে গুরুচরণের নজর পড়িল পরেশের উপর। সে তখন মুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

গুরুচরণ বাটী আসিয়া শুনিলেন, বাপের বাড়িতে কাহার কি নাকি একটা ভারি অসুখের সংবাদ পাইয়া মেজবৌ স্নানাহারের সময় পান নাই, গাড়ি ডাকাইয়া সেখানে চলিয়া গেছেন।

পঞ্চুর মা হাত-মুখ ধোবার জল আনিয়া দিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, রাতও মিথ্যে, দিনও মিথ্যে বড়বাবু, তুমি আর কোথাও চলে যাও—এ পাপের সংসারে বোধ হয় তোমার আর জায়গা হবে না।

ঢাক আসিল, ঢোল আসিল, কাঁসি আসিল, মামলা জয়ী হওয়ার উপলক্ষ্যে ও-বাড়িতে ৺শুভচণ্ডীর পূজার বাদ্যভাণ্ড-রবে সমস্ত গ্রাম তোলপাড় হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল।

৪

দ্বিধা-বিভক্ত ভদ্রাসনের এক অংশে রহিল হরিচরণ ও অপর অংশে রহিলেন গুরুচরণ ও সংসারের বহুদিনের দাসী পঞ্চুর মা। পরদিন সকালে পঞ্চুর মা আসিয়া কহিল, রান্নার সমস্ত যোগাড় করে দিয়েচি বড়বাবু।

রান্নার যোগাড়? ও—ঠিক, চল যাচ্চি। বলিয়া গুরুচরণ উঠিবার উপক্রম করিতে দাসী কহিল, কিছু তাড়াতাড়ি নেই বড়বাবু, বেলা হোক না—আপনি বরঞ্চ আজ গঙ্গায় স্নান করে আসুন।

আচ্ছা তাই যাই, বলিয়া গুরুচরণ নিমেষের মধ্যে গঙ্গা-স্নানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কাজ বা কথার মধ্যে অসঙ্গতি কিছুই ছিল না, তবুও পঞ্চুর মার কেমন যেন ভারি খারাপ ঠেকিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ যেন সে বড়বাবু নয়।

পঞ্চুর মা বাড়ির ভিতরে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, কখনো ভাল হবে না, কখনো না। শাস্তি ভগবান দেবেনই দেবেন।

কাহার ভাল হইবে না, কাহাকে তিনি শাস্তি দেবেনই দেবেন, ঠিক বুঝা গেল

না, কিন্তু ছোটর তরফ হইতে এ লইয়া বিবাদ করিতে সেদিন কেহই উদ্যত হইল না।

এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল।

গুরুচরণের একমাত্র সন্তান বিমলচন্দ্র যে সুসন্তান নহে, পিতা তাহা ভাল করিয়াই জানিতেন। মাস-কয়েক পূর্ব্বে ঘণ্টা কয়েকের জন্য একবার সে বাড়ি আসিয়াছিল, আর তাহার দেখা নাই। সেবার একটা ব্যাগের মধ্যে সে গোপনে কি কতকগুলা রাখিয়া যায়। চলিয়া গেলে গুরুচরণ পরেশকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন, দেখ্ ত বাবা কি আছে ওর মধ্যে? পরেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিয়াছিল, কতকগুলো কাগজপত্র, বোধহয় দলিল-টলিল হবে। জ্যাঠামশাই, এগুলো পুড়িয়ে ফেলি।

গুরুচরণ বলিয়াছিলেন, যদি দরকারী দলিল হয়?

পরেশ কহিয়াছিল, দরকারী ত বটেই, কিন্তু বিমলদার পক্ষে বোধ হয় অদরকারী। বিপদের কাজ কি ঘরে রেখে?

গুরুচরণ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, না জেনে নষ্ট করা যায় না পরেশ, কাহারও সর্ব্বনাশ হয়ে যেতে পারে। ওগুলো তুই কোথাও লুকিয়ে রেখে দি গে বাবা, পরে যা হয় করা যাবে।

এ ঘটনা আর তাঁর মনে ছিল না। আজ সকালে গঙ্গা-স্নান করিয়া আসিয়া রাঁধিতে যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ সেই ব্যাগ হাতে পরেশ, হরিচরণ, গ্রামের জন কয়েক ভদ্র-ব্যক্তি এবং পুলিশ দারোগা কনস্টেবলের দল আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘটনাটা সংক্ষেপে এই যে, বিমল ডাকাতির আসামী, সম্প্রতি ফেরার। খবরের কাগজে খবর পাইয়া পরেশ পুলিশের গোচর করিয়াছে। ব্যাগটা এতদিন তাহার কাছেই ছিল। বিমল মন্দ ছেলে, সে মদ খায়, আনুষঙ্গিক দোষও আছে, কলিকাতায় থাকিয়া কি একটা সামান্য চাকুরি করিয়া সে এই-সব করে। কিন্তু সে ডাকাতি করিতে পারে এ সংশয় পিতার মনের মধ্যে কখনো স্বপ্নেও উদয় হয় নাই। কিছুক্ষণ নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে পরেশের মুখের প্রতি গুরুচরণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পরে সেই নিষ্প্রভ অপলক দুই চক্ষের কোণ বহিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল; বলিলেন, সমস্তই সত্যি, পরেশ একটা কথাও মিছে বলেনি।

দারোগা আরও গোটা দুই-তিন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে ছুটি দিল। যাবার সময় লোকটা হঠাৎ হেঁট হইয়া গুরুচরণের পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, আপনি বয়সে বড়, ব্রাহ্মণ, আমার অপরাধ নেবেন না। এতবড় দুঃখের কাজ আমি আর কখনো করিনি।

আর মাস-কয়েক পরে খবর আসিল, বিমলের সাত বৎসর জেল হইয়াছে।

৫

আবার ঢাক ঢোল ও কাঁসি-সহযোগ ৺শুভচণ্ডীর সমারোহ পূজার আয়োজন হইতেছিল, পরেশ বাধা দিয়া কহিল, বাবা এ-সব থাক্।

কেন?

পরেশ কহিল, এ আমি সইতে পারবো না।

তাহার বাবা বলিলেন, বেশ ত, সইতে না পার, আজকের দিনটা কলকাতায় বেড়িয়ে এসো গে। জগন্মাতার পূজা—ধর্ম্ম-কর্ম্মে বাধা দিয়ো না।

বলা বাহুল্য, ধর্ম্মে-কর্ম্মে বাধা পড়িল না।

দিন-দশেক পরে একদিন সকালে গুরুচরণের ঘরের দিকে অকস্মাৎ একটা হাঁকা-হাঁকি চেঁচামেঁচির শব্দ উঠিল, খানিক পরে গয়লা মেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে। হরিচরণ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞেস করিলেন, রক্ত কিসের মোক্ষদা, ব্যাপার কি?

কান্নার শব্দে বাটীর সকলেই আসিয়া পৌঁছিলেন। মোক্ষদা বলিল, দুধে জল দিয়েচি বলে বড়বাবু লাথি মেরে আমায় গর্ত্তে ফেলে দিয়েচেন।

হরিচরণ কহিল, কে কে? দাদা? যাঃ—

পরেশ বলিল, জ্যাঠামশাই? মিথ্যে কথা।

ছোটগিন্নী বলিলেন, বঠ্‌ঠাকুর দিয়েচেন মেয়েমানুষের গায়ে হাত? তুই কি স্বপ্ন দেখচিস্ গয়লা-মেয়ে?

সে গায়ের কাদা-মাটি দেখাইয়া ঠাকুর-দেবতার দিব্যি করিয়া বলিল, ঘটনা সত্য। ইনজাংশনের কৃপায় প্রাচীর তোলা বন্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু উঠানের গর্ত্তগুলো তেমনই ছিল—বুজানো হয় নাই। গুরুচরণ লাথি মারায় ইহারই মধ্যে মোক্ষদা পড়িয়া গিয়া আহত হইয়াছে।

হরিচরণ কহিল, চল আমার সঙ্গে, নালিশ করে দিবি।

গৃহিণী কহিলেন, কি যে অসম্ভব বল তুমি! বঠ্‌ঠাকুর মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিবেন কি! মিছে কথা!

পরেশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, একটা কথাও বলিল না।

হরিচরণ কহিল, মিছে হয় ফেঁসে যাবে। কিন্তু দাদার মুখ দিয়ে ত আর মিথ্যে বার হবে না। মেরে থাকেন শাস্তি হবে।

যুক্তি শুনিয়া গৃহিণীর সুবুদ্ধি আসিল, কহিলেন, সে ঠিক। নিয়ে গিয়ে নালিশ করিয়ে দাও। ঠিক সাজা হয়ে যাবে। হইলও তাই। দাদার মুখ দিয়া মিথ্যা

বাহির হইল না। আদালতের বিচারে তাঁহার দশ টাকা জরিমানা হইয়া গেল।

এবার শুভচণ্ডীর পূজা হইল না বটে, কিন্তু পরদিন দেখা গেল কতকগুলো ছেলে দল পাকাইয়া গুরুচরণের পিছনে পিছনে হৈ চৈ করিয়া চলিয়াছে। গয়লানী-মারার গানও একটা ইতিমধ্যে তৈরি হইয়া গিয়াছে।

৬

রাত্রি বোধ হয় তখন আটটা হইবে, হরিচরণের বৈঠকখানা গম্ গম্ করিতেছে, গ্রামের মুরুব্বিরা আজকাল এইখানে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অকস্মাৎ একজন আসিয়া বড় একটা মজার খবর দিল। কামারদের বাড়ির ছেলেরা বিশ্বকর্ম্মা পূজা-উপলক্ষ্যে কলিকাতা হইতে জন-দুই খ্যামটা আনাইয়াছে, তাহারই নাচের মজলিসে বসিয়া গুরুচরণ।

হরিচরণ হাসিয়া লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, পাগল! পাগল! শোন কথা একবার! দাদা গেছে খ্যামটার নাচ দেখতে! কোন্ গুলির আড্ডা থেকে আসা হচ্ছে অবিনাশ?

অবিনাশ মাইরি দিব্বি করিয়া বলিল, সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। একজন ছুটিয়া চলিয়া গেল সঠিক সংবাদ আনিতে। মিনিট-দশেক পরে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, সে খবর সর্ব্বাংশেই সত্য। আর শুধু নাচ দেখাই নয়, রুমালে বাঁধিয়া প্যালা দিতেও সে এইমাত্র নিজের চোখে দেখিয়া আসিল। একটা হৈ চৈ উঠিল। কেহ বলিল, এমন যে একদিন ঘটিবে তাহা জানা ছিল। কেহ কহিল, যেদিন বিনা দোষে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিয়েচে সেইদিনই সব বুঝা গেছে। একজন ছেলের ডাকাতির উল্লেখ করিয়া কহিল, ঐ থেকে বাপের চরিত্রও আন্দাজ করা যায়। এমন কত কি!

আজ কথা কহিল না শুধু হরিচরণ। সে অন্যমনস্কের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কেমন যেন আজ ছেলেবেলার কথা মনে হইতে লাগিল, এ কি তাহার বড়দা! এ কি গুরুচরণ মজুমদার!

৭

রাত্রি বোধ হয় তৃতীয় প্রহর, কিন্তু নাচ শেষ হইতে তখনও বিলম্ব আছে। বিশ্বকর্ম্মার পূজা সকালেই শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাহারই জের টানিয়া ভক্তের দল মদ খাইয়া, মাংস খাইয়া, খ্যাম্‌টা নাচাইয়া একটা দক্ষযজ্ঞের সমাপ্তি করিতেছি। অধিকাংশেরই কাণ্ড-জ্ঞান বোধ হয় আর নাই, আর তাহারই মাঝখানে বসিয়া স্মিতমুখে বৃদ্ধ গুরুচরণ।

কে একজন চাদরে মুখ ঢাকিয়া ধীরে ধীরে পিঠের উপর হাত রাখিতেই চমকাইয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, কে।

লোকটি কহিল, আমি পরেশ। জ্যাঠামশাই, বাড়ি চলুন।

গুরুচরণ দ্বিরুক্তি করিলেন না, বলিলেন, বাড়ি? চল।

উৎসব-মঞ্চের একটা ক্ষীণ আলোক রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিল; সেইখানে আসিয়া পরেশ একদৃষ্টে গুরুচরণের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। চোখে সে জ্যোতি নাই, মুখে সে তেজ নাই, সমস্ত মানুষটাই যেন ভূতাবিষ্টের ন্যায়। এতদিন পরে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, এবং এতদিন পরে আজ তাহার চোখে ঠেকিল, লোকের কাছে জ্যাঠামশায়ের জন্য লজ্জা পাইবার কিছু আর নাই। এই অর্দ্ধ-সচেতন দেহ ছাড়িয়া তিনি অন্তর্হিত হইয়া গেছেন; কহিল, আপনার কাশী যাবার বড় ইচ্ছে জ্যাঠামশাই, যাবেন?

গুরুচরণ কাঙালের মত বলিয়া উঠিলেন, যাবো পরেশ, যাবো, কিন্তু কে আমাকে নিয়ে যাবে?

পরেশ কহিল, আমি নিয়ে যাবো জ্যাঠামশাই।

তবে চল; একবার বাড়ি থেকে জিনিস-পত্র নিয়ে আসি গে।

পরেশ কহিল, না জ্যাঠামশাই, ও-বাড়িতে আর না। ওর কিছু আমরা চাইনে।

গুরুচরণের হঠাৎ যেন হুঁস হইল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, কিচ্ছু চাইনে? ও-বাড়ির আমরা কিচ্ছুটি চাইনে?

পরেশ চোখ মুছিয়া বলিল, না জ্যাঠামশাই, কিচ্ছুটি চাইনে। ও-সব নেবার অনেক লোক আছে—চলুন।

চল, বলিয়া গুরুচরণ পরেশের হাত ধরিলেন, এবং জনহীন অন্ধকার পথ ধরিয়া উভয়ে রেলওয়ে স্টেশনের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

হরিচরণ

হরিচরণ

"—" সে আজ অনেকদিনের কথা। প্রায় দশ-বারো বৎসরের কথা। তখন দুর্গাদাসবাবু উকিল হন নাই। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুমি বোধ হয় ভাল চেনো না, আমি বেশ চিনি। এসো, তাহাকে আজ পরিচিত করিয়া দিই।

ছেলেবেলায় কোথা হইতে এক অনাথ পিতৃমাতৃহীন কায়স্থ বালক রামদাসবাবুর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সকলেই বলিত, ছেলেটি বড় ভালো। বেশ সুন্দর বুদ্ধিমান চাকর, দুর্গাদাসবাবুর পিতার বড় স্নেহের ভৃত্য।

সব কাজ-কর্ম্মই সে নিজে টানিয়া লয়। গরুর জাব দেওয়া হইতে বাবুকে তেল মাখানো পর্য্যন্ত সমস্তই সে নিজে করিতে চাহে। সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে বড় ভালবাসে।

ছেলেটির নাম হরিচরণ। গৃহিণী প্রায়ই হরিচরণের কাজ-কর্ম্মে বিস্মিত হইতেন। মধ্যে মধ্যে তিরস্কারও করিতেন, বলিতেন, হরি—অন্য চাকর আছে; তুই ছেলেমানুষ, এত খাটিস কেন? হরির দোষের মধ্যে ছিল সে বড় হাসিতে ভালবাসিত। হাসিয়া উত্তর করিত, মা, আমরা গরীব লোক, চিরকাল খাটতেই হবে, আর বসে থেকেই বা কি হবে?

এইরূপ কাজ-কর্ম্মে, সুখে, স্নেহের ক্রোড়ে হরিচরণের প্রায় এক বৎসরকাল কাটিয়া গেল।

সুরো রামদাসবাবুর ছোট মেয়ে। সুরোর বয়স এখন প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর। হরিচরণের সহিত সুরোর বড় আত্মীয়ভাব দেখা যাইত। যখন দুগ্ধ-পানের নিমিত্ত গৃহিণীর সহিত সুরো দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিত, যখন মা অনেক অযথা বচসা করিয়াও এই ক্ষুদ্র কন্যাটিকে স্বমতে আনিতে পারিতেন না এবং দুগ্ধ-পানের বিশেষ আবশ্যকতা-ও তাহার অভাবে কন্যারত্নের আশু প্রাণবিয়োগের আশঙ্কায় শঙ্কান্বিত হইয়া বিষম ক্রোধে সুরোবালার গণ্ডদ্বয় বিশেষ টিপিয়া ধরিয়াও তাহাকে দুধ খাওয়াইতে পারিতেন না, তখনও হরিচরণের কথায় অনেক ফল লাভ হইত।

যাক, অনেক বাজে কথা বকিয়া ফেলিলাম। আসল কথাটা এখন বলি, শোনো। না হয় সুরো হরিচরণকে ভালবাসিত।

দুর্গাদাসবাবুর যখন কুড়ি বৎসর বয়স, তখনকার কথাই বলিতেছি। দুর্গাদাস এতদিন কলিকাতাতেই পড়িত। বাড়ি আসিতে হইলে ষ্টীমারে দক্ষিণ দিকে যাইতে হইত, তাহার পরেও প্রায় হাঁটা-পথে দশ-বারো ক্রোশ আসিতে হইত; সুতরাং পথটা বড় সহজগম্য ছিল না। এইজন্যই দুর্গাদাসবাবু বড় একটা বাড়ি যাইতেন না।

ছেলে বি. এ. পাশ হইয়া বাড়ি আসিয়াছে। মাতাঠাকুরাণী অতিশয় ব্যস্ত। ছেলেকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে, দাওয়াইতে, যত্ন-আত্মীয়তা করিতে, যেন বাটীসুদ্ধ সকলেই একসঙ্গে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে।

দুর্গাদাস জিজ্ঞাসা করিল মা, এ ছেলেটি কে গা? মা বলিলেন, এটি একজন কায়েতের ছেলে; বাপ-মা নেই, তাই কর্ত্তা ওকে নিজে রেখেচেন। চাকরের কাজ-কর্ম্ম সমস্তই করে, আর বড় শান্ত; কোন কথাতেই রাগ করে না। আহা! বাপ-মা নেই—তাতে ছেলেমানুষ—আমি বড় ভালবাসি।

বাড়ি আসিয়া দুর্গাদাসবাবু হরিচরণের এই পরিচয় পাইলেন।

যাহা হৌক, আজকাল হরিচরণের অনেক কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। সে তাহাতে সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট নহে। ছোটবাবুকে (দুর্গাদাসকে) স্নান করানো, দরকার-মত জলের গাড়ু, ঠিক সময়ে পানের ডিবে, উপযুক্ত অবসরে হুঁকা ইত্যাদি যোগাড় করিয়া রাখিতে হরিচরণ বেশ পটু। দুর্গাদাসবাবুও প্রায় ভাবেন, ছেলেটি বেশ **intelligent** সুতরাং কাপড় কোঁচান তামাক সাজা প্রভৃতি কর্ম্ম হরিচরণ না করিলে দুর্গাদাসবাবুর পছন্দ হয় না।

কিছু বুঝি না, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। মনে আছে কি? একবার দুজনে কাঁদিতে কাঁদিতে পড়ি বড়ই দুরূহ তত্ত্ব। আমার বোধ হয় সব কথাতেই এটা খাটে। দেখেছি কি—ভাল থেকে কেবল ভালই দাঁড়ায়, মন্দ কি কখনও আসিয়া দাঁড়ায় না? যদি না দেখিয়া থাকো তবে এসো আজ তোমাকে দেখাই বড়ই দুরূহ তত্ত্ব।

উপরি-উক্ত কথা কয়টি সকলের বুঝিতে পারা সম্ভবও নয়, প্রয়োজনও নাই, আর আমারও **Philosophy** নিয়ে **deal** করা উদ্দেশ্য নহে; তবুও আপোষে দুটো কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি কি?

আজ দুর্গাদাসবাবুর একটা জাঁকাল ভোজের নিমন্ত্রণ আছে। বাড়িতে খাইবেন না, সম্ভবতঃ অনেক রাত্রে ফিরিবেন। এইসব কারণে হরিচরণকে প্রাত্যহিক কর্ম্ম সারিয়া রাখিয়া শয়ন করিতে বলিয়া গেছেন।

এখন হরিচরণের কথা বলি। দুর্গাদাসবাবু বাহিরে বসিবার ঘরেই রাত্রে শয়ন করিতেন। তাহার কারণ অনেকেই অবগত নহে। আমার বোধ হয় গৃহিণী বাপের বাড়িতে থাকায়, বাহিরের ঘরে শয়ন করাই তাঁহার অধিক মনোনীত ছিল।

রাত্রে দুর্গাদাসবাবুর শয্যা রচনা করা, তিনি শয়ন করিলে তাঁহার পদসেবা ইত্যাদি কাজ হরিচরণের ছিল। পরে বাবুর রীতিমত নিদ্রাকর্ষণ হইলে হরিচরণ পাশের একটি ঘরে শুইতে যাইত।

সন্ধ্যার প্রাক্কালেই হরিচরণের মাথা টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। হরিচরণ বুঝিল, জ্বর আসিতে অধিক বিলম্ব নাই। মধ্যে মধ্যে তাহার প্রায়ই জ্বর হইত; সুতরাং এ-সব লক্ষণ তাহার বিশেষ জানা ছিল। হরিচরণ আর বসিতে পারিল না, ঘরে যাইয়া শুইয়া পড়িল। ছোটবাবুর যে বিছানা প্রস্তুত হইল না, এ-কথা আর মনে রহিল না। রাত্রে সকলেই আহারাদি করিল, কিন্তু হরিচরণ আসিল না। গৃহিণী দেখিতে আসিলেন। হরিচরণ ঘুমাইয়া আছে; গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, গা বড় গরম। বুঝিলেন জ্বর হইয়াছে; সুতরাং আর বিরক্ত না করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে। ভোজ শেষ করিয়া দুর্গাদাসবাবু বাড়ি আসিয়া দেখিলেন শয্যা প্রস্তুত হয় নাই। একে ঘুমের ঘোর, তাহাতে আবার সমস্ত পথ কি করিয়া বাড়ি যাইয়া চিত হইয়া শুইয়া পড়িবেন, আর হরিচরণ শ্রান্ত পদযুগলকে বিনামা হইতে বিমুক্ত করিয়া অল্প অল্প টিপিয়া দিতে থাকিবে এবং সেই সুখে অল্প তন্দ্রার ঝোঁকে গুড়গুড়ির নল মুখে লইয়া একেবারে প্রভাত হইয়াছে দেখিতে পাইবেন, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলেন।

একেবারে হতাশ হইয়া বিষম জলিয়া উঠিলেন, মহা ক্রুদ্ধ হইয়া দুই-চারিবার হরিচরণ, হরি, হরে—ইত্যাদি রবে চিৎকার করিলেন। কিন্তু কোথায় হরি? সে জ্বরের প্রকোপে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া আছে। তখন দুর্গাদাসবাবু ভাবিলেন, বেটা ঘুমাইয়াছে। ঘরে গিয়া দেখিলেন, বেশ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে।

আর সহ্য হইল না। ভয়ানক জোরে হরির চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বসাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হরি ঢলিয়া বিছানার উপর পুনর্ব্বার শুইয়া পড়িল। তখন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্গাদাসবাবু হিতাহিত বিস্মৃত হইলেন। হরির পিঠে সবুট পদাঘাত করিলেন। সে ভীম প্রহারে চৈতন্য লাভ করিয়া উঠিয়া বসিল। দুর্গাদাসবাবু বলিলেন, কচি খোকা ঘুমিয়ে পড়েচে, বিছানাটা কি আমি করব? কথায় কথায় রাগ আরও বাড়িয়া গেল; হস্তের বেত্র-যষ্টি আবার হরিচরণের পৃষ্ঠে বার-দুই-তিন পড়িয়া গেল।

হরি রাত্রে যখন পদসেবা করিতেছিল, তখন এক ফোঁটা গরম জল বোধ হয় দুর্গাদাসবাবুর পায়ের উপর পড়িয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি দুর্গাদাসবাবুর নিদ্রা হয় নাই। এক ফোঁটা জল বড়ই গরম বোধ হইয়াছিল। দুর্গাদাসবাবু হরিচরণকে বড়ই ভালবাসিতেন। তাহার নম্রতার জন্য সে দুর্গাদাসবাবুর কেন, সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিল। বিশেষ এই মাস-খানেকের ঘনিষ্ঠতায় সে আরও প্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

রাত্রে কতবার দুর্গাদাসবাবুর মনে হইল যে, একবার দেখিয়া আসেন, কত লাগিয়াছে, কত ফুলিয়াছে। কিন্তু সে যে চাকর, তা ত ভাল দেখায় না! কতবার মনে হইল, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আসেন, জ্বরটা কমিয়াছে কি না! কিন্তু তাহাতে লজ্জা বোধ হয়! সকালবেলায় হরিচরণ মুখ ধুইবার জল আনিয়া দিল, তামাক সাজিয়া দিল। দুর্গাদাসবাবু তখনও যদি বলিতেন, আহা! সে ত বালক মাত্র, তখনও ত তাহার ত্রয়োদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই। বালক বলিয়াও যদি একবার কাছে টানিয়া লইয়া দেখিতেন, তোমার বেতের আঘাতে কিরূপ রক্ত জমিয়া আছে, তোমার জুতার কাঠিতে কিরূপ ফুলিয়া উঠিয়াছে। বালককে আর লজ্জা কি?

বেলা নয়টার সময় কোথা হইতে একখানা টেলিগ্রাম আসিল। তারের সংবাদে দুর্গাদাসবাবুর মনটা কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল। খুলিয়া দেখিলেন, স্ত্রীর বড় পীড়া। ধড়াস করিয়া বুকখানা একহাত বসিয়া গেল। সেইদিনই তাঁহাকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইল। গাড়িতে উঠিয়া ভাবিলেন, ভগবান! বুঝি-বা প্রায়শ্চিত্ত হয়।

প্রায় মাস-খানেক হইয়া গিয়াছে। দুর্গাদাসবাবুর মুখখানি আজ বড় প্রফুল্ল, তাঁহার স্ত্রী এ-যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছেন। অন্ন পথ্য পাইয়াছেন।

বাড়ি হইতে আজ একখানা পত্র আসিয়াছে। পত্রখানি দুর্গাদাসবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার লিখিত। তলায় একস্থানে 'পুনশ্চ' বলিয়া লিখিত রহিয়াছে—বড় দুঃখের কথা, কাল সকালবেলা দশ দিনের জ্বর-বিকারে আমাদের হরিচরণ মরিয়া গিয়াছে। মরিবার আগে সে অনেকবার আপনাকে দেখিতে চাহিয়াছিল।

আহা! মাতৃ-পিতৃহীন অনাথ!

ধীরে ধীরে দুর্গাদাসবাবু পত্রখানা শতধা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

———

আগামী কাল

(অপ্রকাশিত অসমাপ্ত উপন্যাস)

আগামী কাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বদেশ-কল্যাণ সঙ্ঘের মাসিক অধিবেশন বসবে সন্ধ্যা সাতটায়, এখন ঘড়িতে বাজল চারটে। অনেক দেরি। এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেণ্ট এককড়ি। প্রদীপে আলো জ্বালাবার লোকের অভাব হয়নি, কিন্তু তেল যোগাতে হয় একাকী তাকেই। তার গৃহেই সঙ্ঘের অফিস, তার বসবার ঘরেই বসে সঙ্ঘের বৈঠক। মেঝেয় আগাগোড়া সতরঞ্চি পাতা, তার উপর ফরসা চাদর এবং দেয়ালের ধারে ধারে রাখা অনেকগুলি তাকিয়া। এরই একটা অধিকার করে এককড়ি গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে চোখ বুজে বোধ করি বা একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, এমন সময় নিঃশব্দ পদক্ষেপে প্রবেশ করল জলধি। আসন গ্রহণ করে ডাকলে, এককড়িদাদা কি ঘুমিয়ে পড়লেন?

এককড়ি চোখ মেলে উঠে বসলো। হাই তুলে তুড়ি দিয়ে গম্ভীর-মুখে বললে, গভীর চিন্তামগ্ন ছিলাম। তার পরেই একটু হেসে বললে, ঘুমিয়ে পড়লেও দোষ নেই রে জলধি, বয়স তো হ'লো। এখন এইটেই স্বধর্ম্ম।

জলধিও হাসলে, বললে, ইস্। ভারী ত বয়েস!

যৌবনের প্রথম দিকটা এককড়ির শেষ হয় হয়। রগের কাছটায় চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু সুগঠিত দেহে শক্তি ও উদ্যমের অবধি নেই। এককড়ি বিপত্নীক। প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে আছে শুধু তার বছর-দশেকের মেয়ে আর এক বিধবা পিসি। পাটের ও তিসির ব্যবসায়ে পিতা এত অর্থ-সম্পদ রেখে গেছেন যে, তাকে প্রভূত বলা চলে। পরে পরে অনেকগুলি ভাই-বোন মরার পরে এককড়ির জন্ম, তাই ছেলেবেলায় এত সাবধানে তাকে রক্ষা করা হয় যে, সে প্রায় একপ্রকার পাগলামির অন্তর্গত। পিতা স্কুলে পর্য্যন্ত কথনো ছেলেকে পাঠাননি,—বাড়িতেই নিযুক্ত ছিল মাস্টার ও পণ্ডিত, নামজাদা ও উচ্চ বেতনের। ছাত্রের সম্বন্ধে তাদের সার্টিফিকেটের ভাষা ছিল উদার, কিন্তু বিদ্যার পরীক্ষা যাকে দিতে হয়নি তার বাজার-দর কত এবং বাগ্‌দেবী সত্যই তাকে বর দিলেন কি পরিমাণ, এ তথ্য নিরূপণ করা আজ কঠিন। পাঠ সাঙ্গ হ'লো, শিক্ষকগণ বিদায় নিলেন, তবু লাইব্রেরী-ঘরেই দিন কাটলো তার এতদিন। পিসিমার বহু অশ্রুপাত অগ্রাহ্য করেও সে যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেনি, বইয়ের শেলফগুলো ছাড়া এ রহস্য আর কেউ জানে না। এমনি করেই তার দিন কাটতে পারতো, কিন্তু পরলো না। হঠাৎ বন্দে-মাতরমের বিরাট কঠিন ধ্বনি

কোটর থেকে টেনে তাকে বার করলে। তারপরে জেলে গেলো, দলাদলির আবর্ত্তে পড়ে নাকে-মুখে পাঁক ঢুকলো, দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রদত্ত নানা বিচিত্র বিশেষণের মালা শিরোপা পেলে, শেষে একদিন যাদের সংসার চালিয়েছিল তারাই চোর বলে যখন কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলে, তখন সে আর সইলো না, পলিটিক্সে জলাঞ্জলী দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে আবার তার লাইব্রেরী-ঘরে এসে আশ্রয় নিলে। কিন্তু দেশোদ্ধারের নেশা তখন পাকা করে ধরেচে, তাই পুরানো বইয়ের মধ্যে আর তার মৌতাতের খোরাক মিললো না, আবার তাকে অস্থির করে তুললে। এবার কতকগুলি ছেলেমেয়ে জুটলো—তারাও তখন পলিটিক্সে তোবা করে বেকার হয়ে পড়েছে। বললে, এককড়িদা, রাজনীতি আর না, কিন্তু জীবনটাকে কি নিতান্তই ব্যর্থ করে আনবো, দেশের একটা কাজেও লাগবে না? এ দুর্গতি থেকে বাঁচাও—যাতে হোক লাগিয়ে আমাদের দিয়ে তুমি কাজ করিয়ে নাও।

এককড়ি রাজী হ'লো। স্থির হ'লো এবারের প্রোগ্রাম সোশাল সার্ভিস। গ্রামে, নগরে, পল্লীতে—সর্ব্বত্র কেন্দ্র স্থাপন করা। জলধি বললে, বিদ্যায়, জ্ঞানে, চরিত্রে, অর্জ্জনে, সঞ্চয়ে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে দেশের মানুষকে সচেতন না করতে পারলে ঘরে-ঘরে কেবল বিদ্বেষ আর কলহ দিয়েই সঙ্কট মোচন হবে না। যোগ্য না হলে যোগ্যতার পুরস্কার পাবে কার কাছে? পেলেই বা থাকবে কেন? ধনীর কুপুত্রের মতো, বিত্ত সম্পদ যে দেখতে দেখতে লোপ পাবে—চক্ষের পলক সইবে না,—কমলা অন্তর্হিত হবেন। এ সব যুক্তি শাশ্বত সত্য—অকাট্য। এর বিরুদ্ধে তর্ক চলে না।

অতএব প্রতিষ্ঠিত হ'লো কল্যাণ-সঙ্ঘ। গ্রামে গ্রামে প্রসারিত হ'লো শাখা-প্রশাখা। অধ্যক্ষ এককড়ি, সচিব জলধি। নানা শাখার সদস্য-সংখ্যা দু'শোর বেশি। আজকের দিনে মাসিক অধিবেশনের বৈঠকে সাধারণতঃ হাজিরা যারা হয় সেও জন-পঞ্চাশের কম নয়। দূরের সদস্যদের ট্রেন-ভাড়া দেবার ব্যবস্থা আছে।

নীচের যে ঘরটার সঙ্ঘের অফিস সেখানে বসে যে মেয়েটি অবিশ্রাম কেরানীর কাজ করে তার নাম মণিমালা। মাসিক ত্রিশ টাকায় সে ভর্তি হয়, সম্প্রতি খুশী হয়ে এককড়ি মাইনে বাড়িয়েছে পঞ্চাশ টাকায়। গোড়ায় এককড়ি তাকে বাড়িতে থাকতেই বলেছিল, কারণ ঘরের অভাব নেই, কিন্তু সে রাজি হয়নি। কাছেই কোথায় তার বাসা—সেখানে নিজে রেঁধে খায়। একলা থাকে। একটা দিনের জন্যে তার কামাই নেই, একটা কাজে তার শৈথিল্য প্রকাশ পায় না। একদা অসহ-যোগের প্রবল বন্যায় ভাসতে ভাসতে ঠেকতে ঠেকতে সে এ-অঞ্চলে এসে পড়ে। সঙ্গে বাবা ছিলেন, কিন্তু বুড়ো বয়সে জেলের দুঃখ তার সইলো না—বাইরে এসে যশোর না কোথায় উদরাময়ে মারা গেলেন। মণিমালার প্রাক্তন ইতিবৃত্ত এর বেশি

কেউ জানে না। স্বল্পভাষী মেয়ে,—নিজের মুখে প্রায়ই কিছু বলে না। দেখতে সে সুন্দরী নয়, মুখের পরে একটা পুরুষালি ভাব, কাউকে টানে, কাউকে দূরে ঠেলে। বর্ণ কালোর দিকে, কিন্তু মেদ-মাংসের বাহুল্যবর্জ্জিত দীর্ঘছন্দের দেহ কর্ম্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু, তা দেখা মাত্রই বুঝা যায়, এবং জন্মভূমি যে পূর্ব্ববাঙলার কোন এক স্থলে সে পরিচয়ও ধরা পড়ে তার উচ্চারণে। মনে হয় একদিন কলেজে পড়েছিল সে নিশ্চিত, হয়ত বা কিছু কিছু পরীক্ষা পাসও করেছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে বলে না, শুধু হাসে। তার ইংরাজী ও বাঙলা লেখার শুদ্ধতা ও ক্ষিপ্রতা দেখে এককড়ি অবাক্ হয়ে যায়। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে প্যামপ্লেট ছেপে প্রচার করার বিধি আছে। আগে রচনার ভার ছিল জলধির, এখন পড়েছে মণিমালার 'পরে। পূর্ব্বে এই লেখাটা আদায় করতে এককড়ি গলদঘর্ম্ম হ'তো, এখন বলা মাত্র লেখা আপনি আসে। জলধি সেক্রেটারি, কাটকুট না করে, কলম না চালিয়ে তাঁর মান বাঁচে না। এককড়ি বিরক্ত হয়ে মণিমালাকে আড়ালে ডেকে বলে, ফুলের ক্ষেতে ফাল চালাবার যদি ওর সখ, কিন্তু উলুবনের তো অভাব নেই,—আমাকে বললে একটা দেখিয়ে দিতেও পারতাম,—তাতে কাজ না হোক অকাজ ঘটতো না। কিন্তু এ লেখাটা যে দশজনে পড়বে মণি, একে নাম-সই করে ছাপাতে দেবো কি করে? ওকে ব'লো এবার থেকে ও-ই যেন দস্তখত করে।

মণিমালা জলধির হয়ে সলজ্জে বলে, কিছু খারাপ হয়নি এককড়িদা, প্রেসে পাঠিয়ে দিন। সংশোধনগুলো আমার ভালই লেগেছে।

সেই ভাল, বলে এককড়ি ছাপতে পাঠিয়ে দেয়। সঙ্ঘের বাইরের চেহারার একটা নমুনা দিলাম, ভিতরের মূর্ত্তিটা ক্রমশ প্রকাশ পাবে।

জলধি হাত-ঘড়িটা মিলিয়ে দেখে বললে, চারটে পনেরো—ভিড় জমতে ঘণ্টা-তিনেক দেরি। কিন্তু সঙ্ঘের সেক্রেটারি আমি, সকাল সকাল আসাই আমার উচিত। খেয়ে-দেয়েই আসবো ভেবেছিলাম, কিন্তু ঘটে উঠলো না। পথের মধ্যে ভাবলাম সুরেন আর তারিণীকে ডেকে নিই, কিন্তু পরের কাছে আপনি পাছে মন না খোলেন সেই ভয়ে বিরত হলুম।

এককড়ি বললেন, সুরেন, তারিণী পর হ'লো? তবে আপনার বলো কাকে?

বলি শুধু আমার নিজেকে। ওদের সামনে মন খুললেও আমি মুখ খুলতে পারতাম না। ইতিমধ্যে গোটা-দুই অনুরোধ আছে দাদা।

কিসের অনুরোধ?

একটা এই যে সঙ্ঘের আপনিই দেহ, আপনিই প্রাণ। আত্মার আলোচনা করবো না, অচিন্তনীয় পদার্থ হয়ে তিনি চিন্তার অনধিগম্যই থাকুন। আমরা শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তিনটে বছর ত এই দেহ-যন্ত্রটা টেনে টেনে বেড়ালাম, এবার অনুমতি

করুন পরের হাতে ঠেলে ফেলবার আগেই এর গঙ্গাযাত্রাটা সমাধা করে যাই। দোহাই দাদা, অমত করবেন না, হুকুমটি দিন।

প্রার্থনার রসটা এককড়ি বুঝলো না, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, কার গঙ্গাযাত্রা করতে চাও, আমাদের সঙ্ঘের ?

জলধি বললে, ঠিক তাই। মরবেই ত, শুধু নিশ্বাসটুকু বেরোবার পূর্ব্বে একটু সমারোহে ঘাটে নিয়ে যাওয়া।

এককড়ি স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলো।

জলধি বলতে লাগলো, অফিস-ঘরে খাতাপত্রগুলো আছে। সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। তা হোক, ওগুলো শুধু মুমূর্ষুর গায়ের নোঙরা কাপড়-চোপড়। দাম কানা-কড়িও নয়, বরঞ্চ রোগের বীজাণু ছড়াবার আশঙ্কা আছে। চলুন, সদস্যবৃন্দ সমাগত হবার পূর্ব্বে দেশলাই জ্বালিয়ে সৎকার করে ফেলা যাক।

এককড়ি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে, আজ তোমার হ'লো কি জলধি ?

জলধি বললে, কি হয়েছে সে বিবরণ আপনাকে সবিস্তারে দেবার নয়। মণিমালা উপস্থিত থাকলে সে হয়ত আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারতো।

এককড়ি আবার কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলো, বোধ হয় মনে মনে কারণ বোঝবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুই স্পষ্ট হ'লো না। প্রশ্ন করলে, তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ ?

জলধি বললে, এটা আরও বেশী দরকারি দাদা। আপনার মামা মস্ত লোক, তাঁকে ধরে করপোরেশনে হোক, মিউনিসিপ্যালিটিতে হোক, জেলা বোর্ডে হোক, ইনসিওর কোম্পানীতে হোক,—অর্থাৎ আপনাদের স্বরাজ-পাণ্ডারা যেখানে বেশ একটু আসনপিঁড়ি হয়ে বসতে পেরেছেন, আমার চাকরি একটা করে দিন। যেন দু'মুঠো খেতে পরতে পাই।

এককড়ি ক্ষুব্ধ মুখে, কাতর স্বরে বললে, দু'মুঠো খেতে পরতে কি পাও না জলধি ?

পাই বইকি দাদা, নইলে বেঁচে আছি কি করে ? দেশের সেবা করি, একেবারে নিঃস্বার্থ। গোলামি করিনে বলে লোক ঠকিয়ে ইজ্জত বজায় করি—ডান হাতটা ত রেখেছি দিনরাত বক্তার ঘুষিতে পাকিয়ে! তবু অলক্ষ্যে অগোচরে বাঁ-হাতের তেলোর পরে আপনার ছিটে-ফোঁটা মুষ্টি-ভিক্ষে যা এসে পড়ে তাতেই শোধ করি মেসের দেনা, খদ্দরের বিল। কুকুর-বেড়ালে যেভাবে বাঁচে প্রায় তেমনি। আপনি বড়লোক, বিশ-পঁচিশ-পঞ্চাশ আপনার হিসেবের মধ্যেই নয়। কিন্তু আর নয় দাদা, এর থেকে ছুটি দিন।

এককড়ি চুপ করে রইলো, কথা কইলো না। দেয়ালের ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো।

যে চাকরটা তামাক বদলে দিতে ঢুকেছিল তাকে বললে, গোপাল, নীচে থেকে মণিদিদিকে ডেকে দিয়ে যা তো। জলধি, পরের কাছে লজ্জাই যদি বোধ করো—

না না দাদা, পর কোথায়? যে সব মহাত্মাদের মাঝে ঘোরা-ফেরা করি তাঁরা সবাই অন্তরঙ্গ, সবাই আত্মীয়। তাঁদের অজানা কিছুই নেই। বছর-দশেক স্বদেশ-সেবাব্রতে লেগে আছি, লজ্জা থাকলে বাঁচবো কেন?

চাকরটা গুড়গুড়ির মাথায় কলকে রেখে নীচে যাচ্ছিলো, জলধি তাকে বারণ করে বললে, গোপাল তোর কাজে যা। একটু হেসে বললে, মণিমালা আসেনি এককড়িদা, মিছে সিঁড়ি ভাঙিয়ে ওকে লাভ কি?

আসেনি? এমনধারা ত কখনো হয় না!

হয় না বলেই হতে নেই দাদা? আজ তার দেহটা একটু বে-এক্তার—আমিই আসতে বারণ করে দিয়েছি!

কিন্তু অধিবেশনের কাগজপত্র?

কাগজপত্র আজ থাক্ গে।

এককড়ি চিন্তিত-স্বরে বললে, যাদের কখনো কিছু হয় না, তাদের একটা কিছু হলে সহজে সারতে চায় না। ভয় হয় পাছে ওকে ভোগায়।

জলধি চুপ করে রইলো। এককড়ি বলতে লাগলো, চমৎকার মেয়ে। যেমন বিদ্যে-বুদ্ধি, তেমনি চরিত্রের নির্ম্মলতা, সাহসও তেমনি,—ভয় কাকে বলে জানে না।

জলধি সায় দিয়ে বললে, সাহস আছে তা মানি।

আমাদের গোপাল ওর বাসা চেনে। সন্ধ্যার পরে তাকে পাঠাবো। যদি ডাক্তারের দরকার হয়, দত্ত সাহেবকে ডেকে নিয়ে যাবে।

ডাক্তার-বদ্যির দরকার হবে না এককড়িদা, বরঞ্চ গোপালকে দিয়ে বলে পাঠাবেন আর বেশি অত্যাচার না করে।

কিন্তু অত্যাচার ত সে করে না জলধি।

আপনি বড় সেকেলে দাদা! সব তাতেই পূর্ব্বকালের দোহাই পাড়েন, পরিবর্ত্তন মানতে চান না। সে যা হোক গে, মণিমালা এখন যা শুরু করেছেন সাধারণ মানুষে তাকে অত্যাচার না বলে পারে না। ওর বাসায় গিয়ে দেখলাম বিছানায় শুয়ে, আর সেই বন্ধুটি শিয়রে বসে দিচ্ছে মাথা টিপে।

এককড়ি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বন্ধু আবার কে? এ-কথা ত কখনো শুনিনি!

আবার সেই পূর্ব্বকালের নজির! কিন্তু তে হি নো দিবসা গতাঃ—বন্ধু কিছু দিন হ'লো এসেছেন। কোথায় না কি আগে আলাপ হয়েছিল। চোখ রাঙা, গলা ভেঙেছে; জিজ্ঞেস করলাম, ঠাণ্ডা লাগালে কি করে মণি? মণি লোকটিকে

দেখিয়ে বললে, কাল রমেনের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম বজবজে। বাস ছেড়ে গাঁয়ের পথ ধরে দু'জনে হাঁটলাম অনেকদূর। গঙ্গার ধারে একটা পুরোনো বটগাছ, তার তলায় গিয়ে দু'জনে বসে পড়লাম। আকাশে চাঁদ উঠলো, পাতার ফাঁকে ফাঁকে নামলো জ্যোৎস্নার আলো, সুমুখে নদীর জলে দিলে স্বপ্ন মাখিয়ে,—ভুলে গেলাম ওঠবার কথা। হঠাৎ খেয়াল যখন হ'লো তখন ঘড়িতে দেখি বারোটা বেজে গেছে। অত রাত্রে ফেরবার বাস পাওয়া যাবে কোথায়, কাজেই রাত কাটাতে হ'লো গাছতলায় দাঁড়িয়ে। জলের ধারে খোলা জায়গায় একটু ঠাণ্ডা লাগলো বটে, কিন্তু সময় কাটলো যে কি করে দু'জনের কেউ টেরই পেলাম না। কাব্যের চরম।

এককড়ি হতবুদ্ধি হয়ে বললে, বলো কি জলধি, এ কি সত্য ঘটনা, না সে তামাসা করলে?

খামোকা তামাশার ত কোন হেতু ছিল না দাদা। সে সত্য কথাই বলেছে।

বলতে লজ্জা পেল না?

না। বরঞ্চ শুনে আমিই লজ্জা পেলাম ঢের বেশি। আসবার সময় বললাম, এ-বয়সে এ্যাডভেনচারে রস আছে মণি, কিন্তু এককড়িদা শুনে এ্যাপ্রিসিয়েট করবেন বলে ভরসা করিনে। হয়ত বা অ-খুশীই হবেন। সে বললে, তাঁর অ-খুশী হবার কারণ তো নেই। আমি ছেলেমানুষ নই, এ তাঁর বোঝা উচিত।

এককড়ি আস্তে আস্তে বললে, বিলাতী গল্পের বইয়ে এ-রকম ঘটনা পড়েছি, কিন্তু দেশটাকে কি ওরা বিদেশ বানিয়ে তুলতে চায় না কি?

জলধি ক্রুর হাসি হেসে বললে, ওরা মানে মণিমালা আর তার নতুন বন্ধু। কিন্তু দেশে ওরা ছাড়াও অন্য লোক আছে তারা এ-সব পছন্দ করে না। অন্ততঃ আমি ত না। এর পরেও যদি আমাদের মধ্যে ওকে রাখতে হয়, আমাদের কল্যাণ-সঙ্ঘের নামটা একটুখানি পালটে নিতে হবে।

এককড়ি নিরুত্তরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

জলধি বলতে লাগলো, এতাবৎ সঙ্ঘের বাবদে আপনার টাকা কম যায়নি। আমাদের টাকা নেই বটে, কিন্তু যা গেছে তার হিসেব নেই। হিসেব করতেও চাইনে। শুধু আবেদন, এবার বেকার যুবকটির একটা চাকরি করে দিন।

এককড়ি তেমনি নীরবে বসে রইলো, জলধির কথাগুলো তার কানে গেল কি না সন্দেহ। দেয়ালের ঘড়িতে সাতটা বাজলো। গোপাল এসে খবর দিলে বাবুরা আসছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রমেন বললে, আমার এক কাকা ছিলেন, তাঁর দু'পাটি দাঁতই বাঁধানো। খুড়ো দামী টুথ-পেস্ট ঘষতেন, বিশ্বাস ছিল ওতে দাঁতের গোড়া শক্ত হয়। তোমার জলধিরও বুদ্ধি দেখি তেমনি। ও জানে পাহারা জিনিসটা দরকারী, অতএব তোমাকে ঘিরে বসে পাহারা লাগিয়েছে। শুনি ও-ই না কি তোমার আধা-মনিব। তাই মনিব-আনার দুরমুশ ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করে নিতে চায় মণিমালার নৈতিকতার বনেদে কোথাও মাটি আলগা আছে কি না। ওকে খামোকা বজবজের গল্প করতে গেলে কেন ?

সত্যি কথা বলায় দোষটা হ'লো কি ?

হায় রে কপাল ! সত্যি বোঝার শক্তি থাকলে বজবজের ব্যাপার শুনে ও হাসতো, বেড়ালের মতো মুখ ফোলাতো না। ভাবি, তোমাকে ভালবাসতে গেছে ও কোন্ বুদ্ধিতে ? ইডিয়ট !

মণি হেসে ফেললে। বললে, তোমার বুদ্ধিই বা এমন কি ধারালো ! তোমার বিদ্যের বিস্তৃতি দেখে অবাক হই। শুনতে শুনতে হুঁস থাকে না, গঙ্গার ঘাটে বারোটা বেজে যায়,—কিন্তু বুদ্ধির বেলায় সব পুরুষই সমান। তবু জলধিবাবুর প্রশংসা করি, আমাকে সে যা-ই ভাবুক, অনন্ত রূপসী ভাবে না। কিন্তু তুমি আরও বেহায়া, আরও বড় ইডিয়ট।

ওগো আমি যে কালী-ভক্ত। বলিনে তুমি রূপসী, বলি তুমি ভীমা, ভয়ঙ্করী, —তোমার মুখের হাঁ কুমীরের মতো, গায়ের রং অমাবস্যা-রাত্রির চেয়ে গাঢ়তর, তুমি আশ্চর্য্য ! দেবতারা বোঝেন না তা নয়, কিন্তু, ভক্তের মুখে বাড়িয়ে শুনতে ভালবাসেন। যদি আমি বাঙালী না হয়ে হিন্দুস্থানী হতাম, উপাস্য দেবতা হতেন হনুমানজী, তাহলে তাঁরও পোড়ামুখে তেল-সিঁদুরের ঘন প্রলেপ লাগিয়ে হাতজোড় করে বলতাম, হে জবাকুসুমসঙ্কাশ, তুমি তীক্ষ্ণদ্রংষ্ট, বজ্রনখ, তোমার গায়ের রোঁয়ায় ইন্দ্রধনুর দ্যুতি, তোমার ল্যাজ গিয়ে ঠেকেছে আকাশে, তোমার মত বীর দ্বিতীয় নেই, তুমি প্রসন্ন হয়ে আমার প্রতি কৃপা-দৃষ্টি কর। হনুমানজীর অজ্ঞাত থাকতো না, ভক্ত খোশামোদ করছে, কিন্তু বর দিয়েও ফেলতেন। অভিষ্ট লাভ হ'তো।

মণি হেসে বললে, হনুমানজী তোমার গলায় ল্যাজ জড়িয়ে সাত সমুদ্দুর পারে রেখে আসতেন,—যেখান থেকে এসেছ সেইখানে।

আহা, সে-ই কি কম লাভ মণি ! ফিরে যাবার ভাড়া লাগতো না, এরোপ্লেনের

চেয়েও শীগ্‌গির গিয়ে পৌঁছতাম। তাতে অন্ততঃ এই লাভ হ'তো, ওই বর্ব্বরটাকে হিংসে করে বেড়ানোর দুর্গতি থেকে রক্ষে পেতাম।

সে দুর্গতি থেকে আমিই তোমাকে বাঁচাবো। এ-বাসায় আর ঢুকতে দেবো না।

ঢুকতে দেবে না? কাকে? আমাকে, না তাকে?

তোমাকে। আমার রংটা কালো মানি, মুখের হাঁও একটু বড়, কিন্তু তাই বলে কুমীরের মতো?

না না, অত বড় নয়, একটু ছোট। কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছ, অতিশয়োক্তি শুনতে যে তোমরা ভালবাস মণি, তাই ত বাড়িয়ে বলি।

আর কাউকে শোনাও গে, আমার দরকার নেই।

কে বললে নেই? সবচেয়ে দরকার তোমারই। যে মেয়ের দেহের রূপ আছে, বাপের টাকা আছে, তাকে বাইরে থেকে যাচাই করে নেবার লোকের অভাব হয় না। কিন্তু সম্পদ যার অন্তরে লুকানো, তার আমার মতো একজন অকপট ভক্ত নইলে চলেই না। কিন্তু সে কি ওই জলধি? বুঝেছি, ওর তোমাকে ভাল লেগেছে। কেন জানো? ও ভেবেছে, ও যে তোমাকে পছন্দ করে সে ওর নিজেরই মহত্ব। তোমার নিজের গুণে নয়, ওর স্বকীয় ঔদার্য্যে।

কিন্তু তুমি পছন্দ করেছ কার গুণে শুনি?

রমেন গম্ভীর হয়ে বললে, নেহাৎ মিথ্যে বলনি মণি। খুব সম্ভব তাই বটে। ওটা আমার নিজেরই মহত্ব। নইলে তোমাকে হয়ত চিনতেই পারতাম না। কিংবা কি জানো মণি, নদীর স্রোত যেখানটায় ঘুর্ণিপাকে ঘোরে, কুটো-কাটা না বুঝেও সেই দিকে ছোটে। ঘুরে ঘুরে আবর্ত্তে ডুব মারে, তার পরে কোথায় যায় কে জানে। ছিলাম ইউরোপে, ছেলেবেলায় সেইটুকু পরিচয়, কতকাল পরে কি ভেবে হঠাৎ চিঠি লিখে খোঁজ নিলে, মন অমনি চঞ্চল হয়ে উঠলো। চাকরি ছেড়ে দিলাম, যা কিছু সম্বল ছিল বিক্রী করে ভাড়া যোগাড় করে তোমার কাছে ছুটে এসে উপস্থিত হলাম। এর কি নিগূঢ় অর্থ নেই ভাবো? ঘূর্ণাবর্ত্তের উপমাটা একটু চিন্তা করে দেখো। আর রূপের কথা যদি তোলো, একটু চেয়ে দেখলেই টের পাবে তুমি আমার পায়ের কড়ে আঙুলেও লাগো না। ইউরোপের গল্প নিজের মুখে আর করতে চাইনে, কিন্তু তোমাদের এই খাঁদা-বোঁচা বেঁটের দেশের কত রূপসী মেয়ের মাথা ঘুরে যায় এমন চেহারা কি আমার নয়? সত্যি বলো।

মণি হেসে ফেলে বললে, কি বিনয়! প্রভুপাদ গোস্বামীরা পর্য্যন্ত হার মানে। আচ্ছা রমেন, তোমার প্রণয় নিবেদনের ভাষাটা কি তুমি মুখস্থ করে রেখেছ? রোজই ঠিক একই রকম বলো কি করে? কোথাও একটা কমা সেমিকোলন পর্য্যন্ত বাদ পড়ে না, হুবহু একই কথা প্রত্যহ বলতে তোমার লজ্জা করে না?

নিশ্চয় করে।

তবে বল কেন?

বলবার হেতু আছে মণি। দেবতাদের প্রসন্ন করার দুটো ধারা আছে। এক স্তব, আর এক মন্ত্র। স্তব মনের আবেগে যথা-ইচ্ছা বানানো যায়, তার একদিনের বাক্য আর একদিনের সঙ্গে মেলার দরকার নেই। শুনে দেবতা খুশী হয়ে বর দিতেও পারেন, না-ও পারেন। তাঁর অনুগ্রহ, ভক্তর জোর নেই। কিন্তু মন্ত্র তা নয়, ইচ্ছামত বানানো যায় না, মুখস্থ করে আবৃত্তি করতে হয়। উচ্চারণ নির্ভুল হলে দেবতার না বলবার জো নেই, চুলের ঝুঁটি ধরে বর আদায় হয়। একেই বলে সিদ্ধমন্ত্র। সাহেবেরা বলে ম্যাজিক। বুনোদের মধ্যে এই মন্ত্রে যারা সিদ্ধি লাভ করেচে, সমাজের ভিতর তাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতাপের অবধি নেই—লোক থর থর করে কাঁপে।

মণি বললে, বুনোদের মন্ত্র তুমিও জানো না, আমিও না। নিশ্চয় তার গভীর অর্থ আছে, কিন্তু তুমি যা আমার কাছে আবৃত্তি করো তার বারো আনার মানে হয় না।

রমেন বললে, শুনে আহ্লাদে তোমার পিঠে চাপড়াতে ইচ্ছে করচে। আশা হচ্চে হাতড়ে হাতড়ে এতদিনে ঠিক জিনিসটিতে হাত লেগেচে, মণি, ও-বস্তু যত অর্থহীন হয় ততই খাঁটি। একদম অবোধ্য হলে তার আর মার নেই—সেই হ'লো একেবারে সিদ্ধমন্ত্র। তখন দেবতার গলায় গামছা দিয়ে টেনে এনে অভীষ্ট আদায় করা যায়।

মণি গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেললে। বললে, বুনোদের অনেক দেবতা, তাদের মন্ত্র-সিদ্ধ ওস্তাদদের ভাবনা নেই—যাকে হোক একটা ধরতে পারলেই হ'লো, কিন্তু তুমি কোন্ দেবতার ঝুঁটি ধরে বর আদায় করবে শুনি?

এখন শুনে কি হবে? শুধু এইটুকু জেনে রেখো, ঝুঁটি খুললে তার চুল পা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, সেইটি বাগিয়ে যখন ধরবো, তখন দেবতা আপনিই টের পাবেন। কথাটি কবেন না, সুড় সুড় করে পিছনে পিছনে আসবেন। শুধু বাঙলা মুলুক নয়, হয়ত ইউরোপ পর্য্যন্ত।

তোমার ভারি আস্পর্দ্ধা রমেন।

আস্পর্দ্ধাই ত। নইলে সব ছেড়ে এত দূরে আসতাম কোন্ সাহসে?

তোমার ভুল। তুমি জানো দেশের কাজে আমি নিজেকে সঁপে দিয়েচি।

দিলেই বা গো। মন্ত্রের জোর যে তারও উপরে। দেশ-টেশ কোথায় ভেসে যায়।

মণি রাগ করে বললে, দেখো, মন্ত্র মন্ত্র করে চালাকি ক'রো না। আমার

কুমীরের মতো হাঁ, অমাবস্যার মতো রং—আমার আশা তুমি ছাড়ো। সত্যি ভালোবাসলে কেউ অমন বলে না। তা আবার প্রিয়ার মুখের উপর। তার চেয়ে বরঞ্চ তুমি যেখান থেকে এসেচে সেইখানেই ফিরে যাও।

ফেরবার জো নেই মণি, ভাড়ার টাকা পাবো কোথায় ?

আমি জোগাড় করে৷ দেবো।

তা হলে সে-ই ভালো। দু'জনের ভাড়া যোগাড় করো।

দু'জনের নয়, একজনের। কিংবা আর একট, কাজ ক'রো রমেন ? নানা দেশের নানা ইউনিভারসিটি থেকে পাশ করার যে লম্বা ফর্দ্দ তোমার নামের পিছনে আছে তাতে বিদেশ ফিরে যাবার দরকার কি ? চেষ্টা করলে এখানেই যে একটা বড় চাকরি পাবে। অনেক সুন্দরী ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার আলাপ আছে, কেউ তাদের সম্বন্ধে এতটুকু কলঙ্কের আভাস পর্য্যন্ত দিতে পারে না, তারা এমনি মেয়ে। চিরদিন সাধ্বী পতিব্রতা হয়ে তোমার ঘর আলো করবে আমি লিখে দেবো। এমন কি. জামিন পর্য্যন্ত হবো। কথা দিচ্ছি তুমি সত্যিই সুখী হবে রমেন। শুধু একটি প্রার্থনা, যখন তখন এসে এক কথা নিয়ে আমাকে আর জ্বালাতন ক'রো না। বলতে বলতে তার চোখ-মুখের ভাব গম্ভীর হয়ে এলো, বললে, তা ছাড়া নিজেকেও ত চিনি। আমার মতো একটা দজ্জাল দুর্দ্দান্ত কুশ্রী মেয়ে নিয়ে তোমার হবে কি ? আমি কি কোন অংশেই তোমার যোগ্য ?

রমেন উত্তর দিলে, কোনদিন কি বলেচি তুমি আমার যোগ্য ? নিজেকে কি আমিই চিনিনে ? তোমার ঐ ভাল-ভাল সতী-লক্ষ্মী বান্ধবীদের যথাকালে যথাযোগ্য পাত্রে অর্পণ ক'রো, আমি তিলার্দ্ধ আপত্তি করবো না। কিন্তু জাত-সাপুড়ের কল্যাণ-কামনায় যদি উপদেশ করো তাকে গোখরো কেউটে ছেড়ে হেলে আর ঢোঁড়া সাপ নিয়ে খেলাতে, তবে বরঞ্চ পেশা ছেড়ে দেব, কিন্তু আত্মমর্য্যাদা নষ্ট করবো না। মরণ আছে জেনেও।

আমি বুঝি গোখরো কেউটে, আর তুমি জাত-সাপুড়ে ?

আমি নয় ত কি জলধিটা যে কেবল তোমার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করছে আর নানা ছলে পাহারা দিয়ে ফিরছে—সে ?

তাই সে ফিরুক, কিন্তু তুমি আর আমাকে জ্বালাতন করতে পাবে না, তোমাকে বলে দিলাম।

ওগো মণি, কাঁদবে তুমি কাঁদবে। এখন মস্ত বাহাদুরি হচ্ছে, কিন্তু একদিন বুঝবে জ্বালাতন করবার যার কেউ নেই তার চেয়ে দুর্ভাগা মেয়েও আর জগতে নেই।

তোমার চিন্তা নেই রমেন, সম্প্রতি জলধিবাবু আছেন, তিনি একাই যথেষ্ট। যখন তিনিও থাকবেন না তখন তোমাকে চিঠি লিখে জানাবো।

তাই জানিও। কিন্তু আমার যে বিশ্বাস হতে চায় না, তুমি সত্যই আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাও।

এতক্ষণে তার পরিহাসের হাল্কা কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো দেখে মণির মুখের 'পরেও একটা ব্যথার ছায়া পড়লো। হয়ত ভাবলে কি জবাব দেবে, কিন্তু দেবার পূর্ব্বেই নীচে সদর রাস্তায় একটা মোটর এসে দাঁড়ালো এবং পরক্ষণেই এককড়ির গলা শোনা গেল—মণি মণি, তুমি কোন্ ঘরটায় থাকো?

কে একজন বলে দিলে তে-তলায় উঠে বাঁ-দিকের ফ্ল্যাটটা।

মণি ব্যস্ত হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে সাড়া দিলে—আসুন এককড়িদা, এই আমার ঘর।

মিনিট-খানেক পরে এককড়ি এসে ঢুকলো, যে-চাকরটা চিনিয়ে দিতে তাঁর সঙ্গে এসেছিল, সে বারান্দার একধারে দাঁড়িয়ে রইলো।

এককড়ি আসন গ্রহণ করে চারিদিকটা একবার চেয়ে নিয়ে বললে, বাঃ—দিব্যি সাজানো-গোছানো ঘরটি ত।

মণি শুধু একটু হাসলে। কিন্তু পিছনের থেকে রমেন এ-কথার জবাব দিয়ে বললে, তার কারণ আছে এককড়িদা, এ হ'লো লক্ষ্মীর বাসস্থল, গাছতলা হলেও এর পারিপাট্যটুকু আপনার চোখে পড়বেই। আপনার বাড়ি কখনো দেখিনি, কিন্তু জোর করে বলতে পারি সে-ও এত সুন্দর নয়। আপনি ভাবছেন না দেখেই লোকটা বলে কি করে? বলি এইজন্যে যে, জানি বৌ-ঠাকরুণ স্বর্গীয় হয়েছেন, বেঁচে থাকলে এমন কথা মুখে আনতেও পারতাম না।

কথাগুলো এককড়ির ভালই লাগলো, তথাপি এই অপরিচিত যুবকের গায়ে-পড়া আলাপ ও আত্মীয় সম্বোধনে সে বিরক্ত-মুখে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, কে আপনি?

আমি রমেন, দাদা! মণির ছেলেবেলার বন্ধু। কিন্তু আমাকে 'আপনি' বলবেন না। কেবল বয়েসে নয়, সকল দিকেই আপনার ঢের ছোট। আমাকে 'তুমি' বলতে হবে।

যাকে চিনিনে, কোনদিন আলাপ-পরিচয় নেই, তাকে কি হঠাৎ 'তুমি' বলা সাজে?

সাজে দাদা, সাজে। কিন্তু হঠাৎ ত নয়। আপনি চেনেন না বটে, কিন্তু মণির মুখ থেকে আপনাকে যে আমি খুব চিনি। সন্দেহ হচ্ছে, জলধিবাবু আমার প্রতি মন আপনার বিষিয়ে না দিলে 'তুমি' বলতে আপনি একটুও দ্বিধা করতেন না। তিনি ঠিক কি কি বলেছেন জানিনে, কিন্তু মণিকে আড়ালে জিজ্ঞাসা করলে টের পাবেন, আমি দুর্জ্জন, দুর্ব্বৃত্ত মোটেই নয়। নিরীহ মানুষ, বিদেশে ছেলে পড়িয়ে

খেতাম, বহুদিন পরে অকস্মাৎ মণির একটা পত্র পেয়ে মন কেমন করে উঠলো, কোনমতে ভাড়াটা যোগাড় করে চলে এলাম। মোটামুটি এই আমার পরিচয়, এর মধ্যে মিথ্যে একটুও নেই।

কথাগুলি বলার এমন একটি সরল আবেদন যে, যে ক্রোধ মনের মধ্যে নিয়ে এককড়ি এখানে এসেছিল তার অনেকখানিই শান্ত হয়ে গেল। ইচ্ছে হ'লো এই প্রসঙ্গে সদয়-কণ্ঠে একটু আলাপ করে, কিন্তু তাও পারলে না, জলধির অভিযোগ বাধা দিলে। তাই বলি বলি করেও চুপ করে বসে রইলো।

মণি প্রশ্ন করলে, আজকের অধিবেশনের কি হ'লো এককড়িদা?

অধিবেশন হয়নি। স্থগিত রইলো।

কেন? আমি না যাবার জন্যে নয় ত?

কতকটা তাই বটে। আজ কি তুমি খুব অসুস্থ?

না, ঠাণ্ডা লেগে সামান্য একটু জ্বরের মতো হয়েছে, অনায়াসে যেতে পারতাম জলধিবাবু বারণ না করলে। বললেন, আটকাবে না, আজকের দিনটা তিনি বেশ চালিয়ে নিতে পারবেন। তাই যাইনি এককড়িদা।

শুনে এককড়ি ভারি বিস্মিত হ'লো, জিজ্ঞাসা করলে, জলধি কি তোমাকে যেতে বারণ করেছিলো?

হাঁ, বারণই ত করলেন। একটু থেমে মণি বললেন, অথচ এমন দিন গেছে যখন সত্যই বড় অসুস্থ হয়ে ছুটি চেয়েও পাইনি।

আমাকে জানাওনি কেন?

মণি চুপ করে রইলো, কিন্তু তার হয়ে জবাব দিলে রমেন। বললে, একটা কারণ বোধ করি এই যে, উপরি-ওয়ালার বিরুদ্ধে নালিশ করা ওঁর স্বভাব নয়।

ওঁর স্বভাবের খবর আপনি জানলেন কি করে?

আবার 'আপনি' দাদা? বরঞ্চ আর কোথাও উঠে যাবো, তবু বসে বসে আপনার মুখ থেকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' শুনতে পারবো না।

এককড়ি হেসে বললে, বেশ 'তুমিই' সই। বল তো রমেন, ওর স্বভাবের পরিচয় তুমি পেলে কি করে? শুনছি থাকতে ইউরোপে, বহুদিন কেউ কারও খবর রাখোনি—এই ত সেদিন মাত্র দেশে ফিরেছ।

সবই সত্যি দাদা। তবু আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি, সহসা কেন যে মণি আমার সংবাদ নিতে গেল, আর আমিই বা কেন তেমনি হঠাৎ সব-কিছু পিছনে ফেলে চলে এলাম। কিন্তু সে-কথা থাক্, আপনার প্রশ্নের জবাব দিই। ছেলেবেলায় ওর আমি মাস্টার ছিলাম। ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ি, মণি পড়ে আমার দু'ক্লাশ নীচে। যে-ভদ্রলোকটি আমার ইস্কুলের মাইনে, বইয়ের দাম যোগাতেন, হঠাৎ একদিন

তিনি মারা গেলেন। মণির বাপ আমাকে ডেকে বললেন, সেজন্য ভাবনা নেই রমেন, তুমি আমার মেয়েটিকে ঘণ্টাখানেক করে পড়িয়ে যেয়ো। দুশ্চিন্তা ঘুচলো, কিন্তু দিন দুই-তিন পড়ানোর পরেই বুঝলাম ওকে আমি পড়াবো বটে, কিন্তু আমাকেও ও পড়াতে পারে। কামাই করতে শুরু করলাম, যদি-বা যাই গল্প করে কাটাই, তবু দেখা গেল পরীক্ষায় মণি প্রথম হয়েচে। মণির বাপের ছিল দেশোদ্ধারের ব্যাধি, বাড়ির কোন খবরই রাখতেন না, অত্যন্ত খুশী হয়ে আমাকে ডেকে পিঠ ঠুকে দিলেন, বললেন, আমার মতো কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক আর নেই এবং আমার কলেজের অর্দ্ধেক খরচ তিনিই দেবেন। আমার কর্ত্তব্যপরায়ণতার বিবরণ বাপের কাছে মণি কোনদিন বলেনি। এমন কি, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ও যখন জলপানি পেলে, তারও অর্দ্ধেক কৃতিত্ব আমার ভাগেই জুটলো। জানিনে কি কারণে বাপের বিশ্বাস ছিল মেয়ের লেখাপড়ার বনেদ আমিই পাকা করে দিয়ে গেছি।

তার পরে?

কার পরে দাদা?

ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পাবার পরে মণি কি করলে?

মণি একটা আঙুল তুলে নিঃশব্দে তর্জ্জন করে শেষে মাথা নেড়ে বললে, ও হবে না রমেন। নিজের সম্বন্ধে বলতে চাও বলো, কিন্তু আমার সম্বন্ধে না।

কিন্তু উনি যে মনিব। জানতে চাইলে কি না বলা সাজে?

মনিব আমার, তোমার নয়। আমার কাছে যখন জানতে চাইবেন আমি তার উত্তর দেবো।

এককড়ি প্রশ্ন করলে, বেশ তুমিই বলো। তোমার কাছেই জানতে চাইছি কি করলে তার পরে! কলেজে গিয়ে ভর্ত্তি হলে?

এ কৌতূহলে লাভ কি এককড়িদা? আপনার কাজ ত চালিয়ে দিচ্ছি।

সে অস্বীকার করিনে মণি, বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, আমাদের সঙ্ঘের কাজ অনেক বড় করেই এতদিন চালিয়ে এসেছ। কিন্তু আমাদের সঙ্ঘের প্রয়োজন যদি তোমাতে শেষ হয়ে থাকে আর কোন একটা উপায় করে ত দিতে পারি। কিছু একটা তোমার ত করা চাই।

জীবিকার জন্ম বলছেন?

ধরো তাই।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করে রইলো। শেষে মণি জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে কি আপনি আর চান না?

জলধি চায় না। সে বলে তুমি থাকলে কল্যাণ-সঙ্ঘের নাম পালটে দিতে হবে।

বুঝেছি। কিন্তু আপনি নিজে কি বলেন ?

এখনও বলিনি কিছুই। জানি জলধির অনেক দোষ, তবুও জানি স্বদেশসেবায় জমা-খরচের খাতায় তার খরচ বাদেও বাকি যেটা আছে সেও অনেক। তার মতো স্বার্থত্যাগ করেছে ক'জন ? কত লোকে তার মতো দুঃখ ভোগ করেছে ? তাকে বাদ দিলে সঙ্ঘ আমার টিকবে না।

তাঁকে বাদ না দিয়েও সঙ্ঘ আপনার টিকবে না এককড়িদা।

এককড়ি মুখ ফিরিয়ে রমেনের প্রতি খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, তুমি কি করে জানলে রমেন ?

জানিনে, শুধু আমার অনুমান। জলধিবাবু যাই হোন, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কর্তা আপনি। কিন্তু, একটা কথা বলি এককড়িদা, পারা-আঁচড়ানো আরশিতে মুখ দেখে যে মুখের বিচার করে, সে সুবিচার করে না। ভাবে, মুখের ঐ ক্ষতচিহ্নগুলোই সত্যি। আপনারও হয়েছে সেই দশা। সঙ্ঘের অশুভ কামনা করিনে, কিন্তু উদ্দেশ্য যত মহৎ হোক, মনে হচ্ছে টিকবে না। কিন্তু মণি, তুমি বিষণ্ণ হয়ে উঠলে কেন, এ ত তোমাকে মানাচ্ছে না।

মণি একটুখানি ম্লান হেসে বললে, আমার প্ল্যানটা যে ফেঁসে গেল।

এককড়ি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কিসের প্ল্যান মণি ?

মণি একবার দ্বিধা করলে, হয়ত ভাবলে বলা উচিত কি-না, কিন্তু এককড়ি তেমনি আগ্রহে চেয়ে আছে দেখে আস্তে আস্তে বললে, একটু পূর্ব্বেই ভাবছিলাম আপনার কাছে হাজারখানেক টাকা ধার চেয়ে নেবো।

এককড়ি ক্ষণমাত্রও দ্বিধা না করে বললে, বেশ ত, তাই নিয়ো।

রমেন জিজ্ঞাসা করলে, চাকুরি ত গেল, শোধ দেবে কি করে ?

এককড়ি বললে, সে ও-ই জানে। আমি জানি ও যেখানেই থাক্, বেঁচে থাকলে শোধ দেবেই। আর মরে যদি যায় সে এতবড় ক্ষতি যে, হাজার টাকার শোক আমার মনেও পড়বে না। টাকাটা তোমাকে আমি কালই পাঠিয়ে দেবো।

রমেন বললে, কিসের প্রয়োজন তা-ও জিজ্ঞাসা করবেন না ?

না। আমি জানি ও অপব্যয় করে না। কিন্তু এখন উঠি। সঙ্ঘের তরফ থেকে তোমাকে সাধুবাদ দেওয়া চলে না, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ রইলো। যদি কখনও তোমার উপকারে আসতে পারি আন্তরিক খুশী হবো—এই বলে এককড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, রমেন, তোমার সঙ্গে পরিচয় শুধু ঘণ্টাখানেকের, আর কখনও আলাপ করবার সুযোগ হবে কি-না জানিনে, কিন্তু এটুকু জেনে গেলাম যে, আমার সম্বন্ধে ধারণা তোমার খুব খারাপ হয়েই রইলো।

রমেশ হেসে বললে, তাতে আপনার ক্ষতি হবে না দাদা। কিন্তু এ-কথাটা

বলাই ভাল যে, রুগী যখন মরে তখন আড়ালে ডাক্তারের বাপান্ত করা ছাড়া গৃহস্থের আর কোন সান্ত্বনাই থাকে না।

এককড়িও হাসলে এবং উভয়কেই নমস্কার করে বেরিয়ে গেল। মণিমালাকে আজ সে প্রথম নমস্কার করলে। আর কোনদিন করেনি।

মিনিট পাঁচ-ছয় ঘরটা নিঃশব্দ হয়ে রইলো।

মণি বললে, কি রমেন, এবার বাপান্ত শুরু করবে নাকি?

রমেন বললে, সে নেপথ্যে। তবে প্রত্যক্ষে বলার আজ এইটে পেলাম যে, এত কাল রমেন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল তাঁর চেয়ে মহাশয় ব্যক্তি ভূ-ভারতে নেই। এতদিনে সেই অহঙ্কার চূর্ণ হ'লো।

হ'লো ত?

হ্যাঁ। আর একটা কথা বলবো? ভয়ে না নির্ভয়ে?

নির্ভয়েই বলো।

দাদার একটু বয়স হয়েছে, বেশ মানাবে, না—কিন্তু সংসারে মণিমালার বর যদি কেউ থাকে ত এই ব্যক্তি।

মণি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো, আহা রমেন, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

পড়তেও পারে গো বন্ধু, পড়তেও পারে। কিন্তু আর না, উঠি। রাস্তায় একলা ঘুরে-ফিরে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নিই গে। নইলে সারারাত ঘুম হবে না। এই বলে সে ধীরে ধীরে উঠে পড়লো। দোর পর্য্যন্ত এগিয়ে ফিরে চেয়ে বলল, তোমার সতী-লক্ষ্মী বিদুষী বান্ধবীদের একবার দেখাতে পারো না মণি?

পারি, কিন্তু কি হবে?

একটু বাজিয়ে দেখবো।

সর্ব্বনাশ! তুমি কি তাদের বিদ্যের পরীক্ষা নেবে না-কি?

ওগো না না। তোমাদের ও-দিকটা আমার জানা আছে, তুমি নিঃশঙ্ক হও। দীর্ঘদিন দেশছাড়া, ইতিমধ্যে দেশের মেয়েদের বহু পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ বহু উন্নতি ঘটেছে, এমনি একটি জনশ্রুতি বিদেশে থেকেই কানে পৌঁচেছে। শানে আছড়ালে তাঁরা কি-রকম আওয়াজ দেন, অর্থাৎ খাদটা কি পরিমাণে মিশেছে দেখতে একটু সাধ হয় মণি।

তাঁরা তোমাকেও ত আছড়াতে পারেন?

তা-ও পারেন, বিচিত্র নয়।—এই বলে রমেন হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বুকের নীচে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে এককড়ি একমনে লিখে যাচ্ছে। এক পাশে গুড়গুড়ির কলকেটা বৃথা পুড়ছে, হাতের কাছে নলটা অনাদরে পড়ে, টেনে নেবার সময় হয়নি, চায়ের বাটিটা ঠাণ্ডা জল হয়ে গেলো, মুখে তোলবার ফুরসৎ পায়নি, এমনি সময়ে জলধি এসে উপস্থিত। মিনিট পাঁচ-ছয় চুপচাপ বসে থেকে বললে, এককড়িদা, আপনার অভিনিবেশটা একটু বিচলিত করতে চাই। বড় দরকার।

এককড়ি মুখ না তুলেই বললে, বলো।

কি এত লিখছেন ?

আমাদের কল্যাণ-সঙ্ঘের আইন-কানুনগুলোর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। তারই একটা খসড়া করচি।

করুন। পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়েচে নিশ্চিত। Rather overdue.

হুঁ, বলে এককড়ি পুনরায় লেখায় মন দিলে।

আবার মিনিট পাঁচ-ছয় নীরবে কাটলো। জলধি বললে, অন্য সব কিছু তাচ্ছিল্য করা যেতেও পারে, কিন্তু মানুষের নৈতিক চরিত্রটা নয়। কারণ, সুনাম যদি ঘোচে, হাজার চেষ্টাতেও সঙ্ঘকে আমরা খাড়া রাখতে পারবো না, কাত হয়ে পড়বেই। এখানে আমাদের শক্ত হতে হবে।

নিশ্চয়।

এই দুটো দিন আমি অনেক ভেবেচি এককড়িদা। কষ্ট খুবই হয়, কারণ এই ওর জীবিকা। শুনেচি কে একজন অন্ধ আত্মীয়কেও মণি প্রতিপালন করে। তবু মণিকে রাখা চলবে না, বিদায় দিতেই হবে। জানি আপনার মন ভারি নরম; কিন্তু এ এতবড় Serious matter যে, আপনাকে দুর্ব্বল হতে আমি কিছুতেই দিতে পারবো না।

এককড়ি কলম রেখে উঠে বসলো। চামড়ার কালো পোর্টফোলিওটা কোলে তুলে নিয়ে খুঁজে খুঁজে একখানা কাগজ বার করে জলধির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গুড়-গুড়ির নলটা মুখে নিয়ে নিঃশব্দে তামাক টানতে লাগলো।

কাগজখানা পড়তে পড়তে জলধির মুখ পাংশু হয়ে গেল। শেষ করে বললে, মণিকে জবাব দেবার পূর্ব্বে একবার আমাকে জানালেন না কেন ?

এককড়ি মুখের নলটা সরিয়ে রেখে বললে, এইমাত্র ত তুমি নিজেই বলছ আমাদের শক্ত হতে হবে, মণিকে রাখা চলবে না। তা ছাড়া কোথায় তুমি ছিলে

হে ? তিন্নদিন এলে না, এলে কথাটা নিশ্চয়ই শুনতে পেতে। আর যাকে সরাতেই হবে তাকে শীঘ্র সরানোই ভাল। অবিচার করিনি, তিনমাসের মাইনে বেশি দিয়ে দিয়েছি। এই দেখ রসিদ।—এই বলে একটুকরো টিকিট-মারা কাগজ জলধির সামনে এগিয়ে দিয়ে বলতে লাগলো, শুনলাম সেও বাড়ি-ওয়ালাকে নোটিশ দিয়েছে। লোকটা ভাল, পনেরো দিনের কড়ারেই রাজি হয়েছে, একমাসের নোটিশ দাবী করেনি।

জলধি তিক্তকণ্ঠে বললে, হাঁ, মহাশয় ব্যক্তি। মণি কোথায় যাবে কিছু জানিয়েছে ?

না, বলেছে, চিঠি লিখে পরে জানাবে।

তাকে জবাব দিলেন আপনি, কিন্তু আমার নাম করতে গেলেন কেন ?

বেশ কথা ! তুমি সেক্রেটারী, তোমার ঘোরতর আপত্তি তাকে না জানিয়ে চলে ?

শুধু আমারই আপত্তি, আপনার নয় ?

নিশ্চয় ?

জানিয়েছেন তাকে ?

নিশ্চয় জানিয়েছি।

জলধির মুখে আর কথা যোগালো না, শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

এককড়ি খসড়ার কাগজগুলো একে একে গুছিয়ে নিয়ে জলধির পানে এগিয়ে দিলে, বললে, পড়ে দেখ।

লেখা শেষ হোক না দাদা, ঢের সময় আছে।

তার ঔদাসীন্যে এককড়ি বিস্ময়াপন্ন হয়ে বললে, কোথায় ঢের সময় ! ছাপতে হবে, যেখানে যত মেম্বার আছে সারকুলেট করতে হবে,—গড়িমসির ত কাজ নয়। এই দিকটায় আমার চোখ খুলে দিয়ে তুমি মস্ত কাজ করেছ, জলধি। সত্যই ত ! চরিত্রই যদি না রইলো ত রইলো কি ? সঙ্ঘ দাঁড়াবে কিসের 'পরে ? এখন থেকে এই সুনামই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় asset—সত্যিকার মূলধন। সঙ্ঘ-সংক্রান্ত যে যেখানে আছে—পেড্‌ বা আনপেড্‌—সকলেই বুঝবে এদিকে সেক্রেটারীর লেশ-মাত্র গাফিলতি নেই। সেই মণির মতো কাজের লোককেও বিদায় দিতে একমুহূর্ত বিলম্ব করেনি। আমি তোমাকে congratulate করি জলধি।

জলধি অন্তরে জ্বলে গিয়ে বললে, আপনার ইচ্ছেটা কি মণির ব্যাপার আমরা ঢাক পিটে সর্বত্র প্রচার করি ?

তা না হোক, কিন্তু দলের লোক ত জানবেই, চাপা দেবে কি করে, আর দিয়েই বা লাভ হবে কি ?

অর্থাৎ, কল্যাণ-সঙ্ঘের পক্ষ থেকে মণিমালার এই হবে বিদায় অভিনন্দন। না দাদা, মাপ করুন, রাজি হতে পারলাম না। আর কিছু না মনে করি, সঙ্ঘের কল্যাণে এই তিনটে বছর তার অবিশ্রান্ত খাটুনি ভুলতে পারবো না।

ভোলার কথা নয় হে জলধি, কিন্তু উপায় কি? আমাদের কাগজপত্রে মণির বদলে অজয়ের দস্তখত দেখলে লোকে কারণটা জানতে চাইবেন, তখন ঢাকবে কি করে?

জলধি কথাটা ভাল বুঝতে পারলে না,—অজয় আবার কে এলো দাদা?

এককড়ি বললে, সেই ত মণির জায়গায় কাজ করবে। Economics-এ এম. এ., একটুর জন্যে first classটা গেছে, নইলে যে-কোন কলেজে দেড়-শ টাকা তার ঘোচায় কে? মাইনে বাড়াতে হয়নি,—পঞ্চাশ টাকাতেই রাজি হ'লো। কুড়িয়ে পাওয়া বললেই হয়।

জলধির রাগের সীমা রইলো না, কিন্তু যথাসাধ্য চেপে রেখে প্রশ্ন করলে—রত্নটি কুড়িয়ে পেলেন কখন?

আজ সকালেই। অজয়ের বাপের সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল, বছরখানেক ধরে সে ছেলের জন্যে একটা সুপারিশ চিঠি চাইছিল মামার ওপরে। নানা কারণে দিতে পারিনি, তাই—

তাই মামার দায় আমার কাঁধে চাপালেন?

না হে না। সে কাল থেকে যখন অফিসের ভার নেবে, তার কাজ দেখে তুমি খুশী হবে। মণির চেয়ে অযোগ্য হবে না বলে দিলাম—

জলধি আর তর্ক করলে না। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললে, আসলে আপনার প্রকৃতিটা বড় নির্ম্মম, এককড়িদা। আমি নিজে যদি কখনো বিদায় নিই, কেবল এই জন্যেই নেবো। ইতিমধ্যে আপনার গণেশের কলম চলতে থাক্‌, আমি উঠলাম। এই বলে সে ক্ষুদ্র একটা নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এককড়ি ডেকে বললে, কোথায় যাচ্ছ জলধি?

যাবার মুখ নেই, তবু যেতে হবে। পুরুষত্ব বলুন, মনুষ্যত্ব বলুন, দেশের পায়ে আজো একেবারে জলাঞ্জলি দিতে পারিনি। মায়া-মমতা আজও যেন বুকের মধ্যে কোথায় বেঁধে এককড়িদা।

অর্থাৎ মণির বাসায় গিয়ে তাকে একটু সান্ত্বনা দিতে চাও?

সান্ত্বনা দেবার দরকার হবে না, এটুকু অন্ততঃ তাকে জানি। সে যাই হোক আমি হলে কিন্তু এমন সরাসরি জবাব দিতাম না,—এবারের মত শুধু একটা warning দিয়েই পালা শেষ করতাম।

শুনে এককড়ি প্রথমটা গম্ভীর হ'লো তার পরে হঠাৎ হেসে ফেলে বললে, দূর

গাধা! তোর পালা আরম্ভ করার বুদ্ধিটাও যেমন অসাধারণ, পালা শেষ করার ফন্দিটাও তেমনি চমৎকার। এই warning দেবার মতলব কে যোগালেন? এই বুঝি তারে চিনেছিস্ এতদিন একসঙ্গে কাজ করে?

জলধি এ তিরস্কারের উত্তর খুঁজে না পেয়ে হতবুদ্ধির মতো চেয়ে রইলো।

এককড়ি বলতে লাগলো, তার আচরণ আমরা অনুমোদন করিনে, এই ধরণের স্বেচ্ছাচার আমার ভাল লাগে না। অতএব, বিদায় দেওয়া হ'লো এ-কথাটা মণি অনায়াসে বুঝবে, কিন্তু তোর চোখ রাঙিয়ে ধমক দেওয়া বুঝবে না। বরঞ্চ, এইজন্যে সে কৃতজ্ঞ থাকবে যে, আমরা তার সংস্রব ত্যাগ করেছি, কিন্তু অসম্মান করিনি? বলিনি, প্রভুর রুচির সঙ্গে ভৃত্যের রুচি মেলেনি বলে এবার শুধু তার কান মলে দেওয়া হ'লো, ভবিষ্যতে নাক কেটে দেওয়া হবে।

জলধি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, তা হলে জবাবটা একেবারে settled? এর নড়চড় হতে পারবে না?

না, কল্যাণ-সঙ্ঘের নামটা তার জন্যে পালটাতে পারবো না।

জবাব শুনে জলধি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে নতমুখে বসে রইলো; তার পরে মুখ তুলে অনুতপ্ত স্বরে ধীরে ধীরে বললে—এবারের মতো আমার অভিযোগটা আমি প্রত্যাহার করছি এককড়িদা। এবার তাকে আমি ক্ষমা করতে প্রস্তুত।

এককড়ি ঘাড় নেড়ে বললে, আমি প্রস্তুত নয় জলধি।

কিন্তু সত্যই সে কোন অপরাধ করেছে কি না তাও বিচার করবেন না?

সত্যিকার অপরাধ তুই কারে বলিস জলধি? যা ইঙ্গিত করেছিস্ তা-ই?—না দোষ সে কখনো করেনি, কখনো করবে না।

তবু বিদায় করে দেবেন?

হাঁ তবুও। আমাদের মধ্যে ওকে রাখতে পারবো না।

কতখানি বিপদের মধ্যে তাকে ঠেলে দিচ্ছেন একবার তাও চিন্তা করবেন না?

সে চিন্তায় লাভ? বিপদকে সে ভয় করে না কি? তোর হলে চিন্তা করতাম। এই বলে এককড়ি একটু হেসে গুড়গুড়ির নলটা তুলে নিয়ে মুখে দিলে।

জলধি গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চললাম।

এককড়ি তামাকের ধুঁয়ার সঙ্গে আবার একটু হেসে বললে, কাল একবার আসিস্। বুঝেছি, তোর আসল মতলব ছিল মণিকে ধমকানো,—জবাব দেওয়া নয়। যখন সেখানে যাচ্ছিস, তখন কথা উঠলে বলিস, জবাব তাকে আমিই দিয়েছি—তুই নয়, তুই বরঞ্চ তাকে রাখতে চেয়েছিলি।

জলধি ভেবে পেলে না কথাটা তামাসা, না আর কিছু। অন্তর মর্ম্মান্তিক জ্বলে গেল, কিন্তু প্রকাশ না করে শুধু বললে, অত্যন্ত বাহুল্য কথা এককড়িদা। জবাব

লেখার সত্যিকার মালিক যে তুমি, আমি নয়, এ-কথা সে জানে। এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ দোরের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে বললে, তবু সেই বাহুল্য কথাটাই বলার জন্যে একবার তার বাসায় যেতে হবে। আমার সম্বন্ধে মণি আর যাই মনে করুক, এ না মনে করে এক অভাগা আর এক অভাগার অন্ন মেরে দিলে। এই বলেই দ্রুতবেগে চলে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ওদিকে মণিমালার ঘর থেকে এইমাত্র গুটিচারেক মেয়ে নেবে গেল। তারা মণির বন্ধু। এসেছিল নারী-সমিতির পক্ষ থেকে। আগামী সপ্তাহে বসবে অধিবেশন, ডেলিগেট আসছেন নানা জেলা থেকে প্রায় শতাধিক, প্রস্তাব এই যে, উক্ত সভায় মণিমালাকে মুভ করতে হবে একটা omnibus resolution—তাতে বাবাহ-বিচ্ছেদ থেকে চাকরিতে নরনারীর সমান মাইনে পর্য্যন্ত নানা দাবিই বেশ কড়া করে থাকবে। মণি কিন্তু রাজি হ'লো না, হেসে বললে, যে চেহারা ভাই আমার—কেউ বিয়ে করলেই বেঁচে যাই, তা আবার বিবাহ-বিচ্ছেদ। এনা হেনা দুই বোন, তাদের ঝাঁঝই সবচেয়ে প্রখর; রেগে বললে, বিয়ে কি আমাদেরই হয়েছে নাকি? আমরা নিজেদের কথা ত ভাবছিনে, ভাবছি সমস্ত নারী-জাতির হয়ে। তুমি বলতে পারো চমৎকার, ডিবেট করতে তোমার জোড়া নেই, তাই সুকল্যাণী মিটারের ইচ্ছে এ resolution তোমাকে দিয়েই প্রস্তাবিত করা। আমরা ফিরে আসছি তাঁর চিঠি নিয়ে, দেখি কি করে অস্বীকার করো।

মণি বললে, আমাকে মাপ করো ভাই।

এনা বললে, জানো এতে তাঁকে অপমান করা হবে?

অপমান ত করছিনে ভাই, আমি হাত-জোড় করছি।

আচ্ছা সে দেখা যাবে। আসছি চিঠি নিয়ে। হয়ত বা তিনি নিজেই এসে হাজির হবেন। এই বলে মেয়েরা চলে গেল। তাদের কাপড়ের এসেন্সের গন্ধে তখনও ঘরের বাতাস ভারী, উত্তেজিত কণ্ঠের ঝাঁঝালো তর্ক তখনও চারটে দেওয়ালের গায়ে মাথা ঠুকে বেড়াচ্ছে। মণি ডাকলে, রমেন কি ঘুমুচ্ছো?

ঘরের অপর প্রান্তে একটি কেম্বিসের ইজিচেয়ারে রমেন চোখ বুজে শুয়েছিল, সাড়া দিয়ে বললে, না আমার ট্রেনের শব্দেই ঘুম হয় না, এ ত চার চারটে অ্যারোপ্লেনের সার্কাস চলছিল।

তুমি ভারি অসভ্য, রমেন। মেয়েদের সম্বন্ধে কখনও কি শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা কইতে পারো না?

রমেন চুপ করে রইলো। মণি বলতে লাগলো, আমি আশা করেছিলাম আমাদের আলোচনায় তুমি যোগ দেবে, কিন্তু একটি কথা কইলে না, ওধারে গিয়ে রইলে। তোমার সম্বন্ধে ওঁরা কি ভেবে গেলেন কল্পনা করতে পারো?

না।

ভেবে গেলেন একটি আস্ত জানোয়ার। ভেবে গেলেন এ পশুটাকে মণি যখন-তখন তার ঘরের মধ্যে সহ্য করে কি করে।

উঃ—

কিসের উঃ—?

ধরো, এই মেয়ে চারটির যদি কোনদিন বিয়ে হয়। উঃ—

মণি রেগে বললে, বিয়ে ত হবেই একদিন। ওঁরা কি চিরকাল আইবুড়ো থাকবেন না কি?

রমেন গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলে, সে মতলব এঁদের নেই তাহলে? ঠিক জানো?

মণি হেসে বলল, না নেই। ঠিক জানি।

উঃ—

তোমার বুকে কি শেল বিঁধছে না-কি?

হাঁ বিঁধছে। মানস-চক্ষে আমি সেই দুর্ভাগাগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসলো। বললে, জানো মণিমালা, পরম জ্ঞানী Aristotle সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে। কোথায় যেতে পথের ধারে একটা গাছের ডালে দেখতে পান, একটি মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। মুগ্ধ-চোখে চেয়ে থেকে বলেছিলেন, আহা, এমনি ফল যদি পৃথিবীর সমস্ত গাছের ডালে ফলতো, জগৎ স্বর্গ হয়ে যেত। ত্রিবিধ দুঃখ-নাশের মীমাংসা বুদ্ধদেব দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু দুনিয়াকে স্বর্গ করবার থিওরি একমাত্র তিনিই আবিষ্কার করে গেছেন! হাঁ জ্ঞানী বটে!

রমেন ভেবেছিল, মণি খুব এক-চোট হাসবে, কিন্তু ফল হ'লো উল্টো। দেখতে দেখতে তার মুখের চেহারা কঠোর হয়ে এলো, শান্ত গম্ভীর-স্বরে বললে, রমেন, তোমার এই কথাটা আমি চিরদিন মনে রাখবো!

রমেন অপ্রতিভ হয়ে বললে, কথা ত আমার নয় মণি, এরিস্টটলের। তা-ও সত্যি কি বানানো তা-ই বা কে জানে।

না, সত্যি। তাও শুধু তাঁরই নয়, সমস্ত পুরুষের মুখেই এই এক কথা। সেই বুড়ো Aristotle আজও আড়াই হাজার বছর পরে তোমার মধ্যে বেঁচে আছে।

সে আছে জলধির মধ্যে, সে আছে এককড়িদা'র ভিতরে। তাই ত গেল আমার চাকরি! তিন বছরের রাত্রিদিনের সেবা একমুহূর্ত্তের ভর সইলো না। তুমি নিজে মনিব হলেও আমার চাকরি ঠিক এমনি করেই যেতো, রমেন।

রমেন ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, আমি মনিব যখন নয় তখন সে প্রমাণ দিতে পারলাম না। কিন্তু তুমি মিথ্যে তিলকে তাল করছো, মণি। বুড়োর তামাসাটা সত্যি হলে কি মানুষ আজও বেঁচে থাকতো! কোন্ কালে নিঃশেষ হয়ে যেতো।

নিঃশেষ না হবার অন্য হেতু আছে, রমেন। কারণ, মানুষকে রাখার ভার পুরুষের 'পরে নেই, সে আছে আর একজনের 'পরে। তাই ত দেখি নর-নারী এত-কাল এক সঙ্গে থেকেও আজও সন্ধির একটা ফরমূলা খুঁজে পেলে না, কোন্ পথে দুঃখের নিরসন, সে দিকটাই তাদের চোখে পড়লো না চিরদিন কানা হয়ে রইলো।

রমেন আস্তে আস্তে বললে, মণি কেন জানিনে, কিন্তু মনে হচ্ছে আজ তোমার মনটা অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছে।

উদ্‌ভ্রান্ত? হতে পারে। কিন্তু একটা প্রশ্নের হঠাৎ জবাব পেয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম ওদের অনুরোধ শুনবো না, বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব আমার মুখ দিয়ে বার হবে না, কিন্তু এখন স্থির করলাম, এ প্রস্তাব আমি নিজেই আনবো।

রমেন একটু হেসে বললে, সে না হয় করলে, কিন্তু জিনিসটা ভাল কি মন্দ, মানুষের অভিজ্ঞতায় এর দাম কি নির্দ্দিষ্ট হয়েছে তার কি জ্ঞান তোমার আছে মণি?

মণি বললে, কোন জ্ঞানই নেই,—ইতিহাস ত জানিনে,—আর যেটুকু আছে সে-ও তুমি ইচ্ছে করলে খণ্ড খণ্ড করে দিতে পার, কিন্তু তোমার কথা আমি শুনবো না। বরঞ্চ এই কথাই জোর করে বলবো, আমার অন্তরের সত্য অনুভূতি আমাকে সত্য পথ দেখিয়ে দেবেই দেবে।

সত্য অনুভূতি পেলে কখন?

এইমাত্র। তুমি পরিহাসের ছলে যা বললে তার মধ্যে।

সে কি কখনো হয়?

হয় রমেন, হয়। গল্প শোননি, আমাদের লালাবাবু মেছুনির মুখের একটা উড়ো কথা শুনে সংসার ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। অথচ কত লোক ত দিন-রাত শোনে, তারা কি ঘর-দোর ফেলে সন্ন্যাসী হয়ে যায়? কিন্তু যে শুনতে পায় সে-ই শুনতে পায়।

মণি, তুমি যে এত বড় পাগল আমার ধারণা ছিল না।

মণি হেসে বললে, পাগলই ত। নইলে কি দেশের জন্যে জেল খাটতে যেতে পারতাম? প্রাণ দিতেও রাজী ছিলাম। তুমি পারো?

সে পরীক্ষা ত আমাকে দিতে হয়নি, মণি।

পরীক্ষা দেবার দিন যদি আসে পারবে দিতে?

রমেন হঠাৎ এ-প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেলে না। এমনি সময়ে দোরের বাইরে থেকে ডাক এলো, মণি, আসতে পারি কি?

মণি খুশী হয়ে সাড়া দিলে, আসুন, জলধিবাবু!

অসম্পূর্ণ

গ্রন্থ-পরিচয়

দেনা-পাওনা

প্রথম প্রকাশ—মাসিক 'ভারতবর্ষ'—১৩২৭ সালের আষাঢ়—আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র; ১৩২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক ও চৈত্র; ১৩২৯ সালের বৈশাখ—শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্ত্তিক, মাঘ ও চৈত্র; ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—১৪ই আগস্ট, ১৯২৩ (ভাদ্র, ১৩৩০)।

পরিণীতা

প্রথম প্রকাশ—১৩২০ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'যমুনায়'।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—১০ই আগস্ট, ১৯১৪।

দর্পচূর্ণ

প্রথম প্রকাশ—১৩২১ সালের মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়।

পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রথম প্রকাশ—'মেজদিদি' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহার প্রথম প্রকাশ হয় ১২ই ডিসেম্বর, ১৯১৫ (অগ্রহায়ণ, ১৩২২)।

বোঝা

প্রথম প্রকাশ—১৩১৯ সালের কার্ত্তিক—পৌষ সংখ্যা 'যমুনা'।

পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রথম প্রকাশ—'কাশীনাথ' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহার প্রথম প্রকাশ হয় ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ (ভাদ্র, ১৩২৪)

বাল্য-স্মৃতি

প্রথম প্রকাশ—১৩১৯ সালের মাঘ সংখ্যা 'সাহিত্য'।

পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রথম প্রকাশ—'কাশীনাথ' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহার প্রথম প্রকাশ হয় ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ (ভাদ্র, ১৩২৪)।

হরিচরণ

প্রথম প্রকাশ—১৩২১ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'সাহিত্য'।

পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রথম প্রকাশ—'কাশীনাথ' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহার প্রথম প্রকাশ হয় ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ (ভাদ্র, ১৩২৪)।

পরেশ

প্রথম প্রকাশ—১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত পূজা-বার্ষিকী 'শরতের ফুল'-এ প্রথম প্রকাশিত।

পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রথম প্রকাশ—'অনুরাধা, সতী ও পরেশ' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহার প্রথম প্রকাশ হয় ১৮ই মার্চ, ১৯৩৪ (ফাল্গুন, ১৩৪০)।

আগামী কাল

প্রথম প্রকাশ—প্রথম পরিচ্ছেদটি 'অনাগত' নামে ১৩৪২ সালের শ্রাবণ-সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় প্রথম প্রকাশিত। ঐ বৎসরেই চৈত্র-সংখ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সহিত প্রথম পরিচ্ছেদটিও 'আগামী কাল' এই পরিবর্তিত নামে পুনঃ-প্রকাশিত হয়। সর্বসমেত মাত্র চারিটি পরিচ্ছেদ 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'আগামী কাল' নামটি বিচিত্রা-সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দেওয়া। ইহা অসম্পূর্ণ।

পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রথম প্রকাশ—'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহার প্রথম প্রকাশ হয়, শ্রাবণ, ১৩৫৮ সালে।

পঞ্চম সম্ভার
সমাপ্ত